শিশু-বিশ্বকোষ : তৃতীয় খণ্ড

ঝ থেকে প

# শিশু-বিশ্বকোষ

গভীর অরণ্যে পশুপক্ষী, সরীসৃপ ইত্যাদির পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠা এক মানবশিশু। বনের যত ধরনের প্রাণী আছে সকলেরই সে বন্ধু এবং অন্যদের যেমন সে বিপদ থেকে রক্ষা করে, তেমনি তার বিপদেও সমস্ত জীবজন্তু ছুটে এসে তাকে বাঁচায়। তার নাম কী ? —টারজান।

একটি নেংটি ইঁদুরের চরিত্র সৃষ্টি করে 'মিকি মাউস' নামে একটি কার্টুন ছবি বানিয়ে এক জন চলচ্চিত্র নির্মাতা রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি কে ? —ওয়াল্ট্ ডিজ্‌নি।

জলে স্থলে সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী, দেখতে মাছের মতো হলেও কিন্তু মাছ নয়। এই প্রাণীর নাম ? —তিমি।

রোম সাম্রাজ্যের এক সম্রাট নিজের মা, স্ত্রী ও গুরুসহ অজস্র মানুষকে হত্যা করেছিলেন। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরী পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়; অনেকেই মনে করেন যে সম্রাট নিজেই আগুন লাগিয়েছিলেন। কথিত আছে, জ্বলন্ত রোমের লেলিহান শিখা দেখতে-দেখতে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ও বাঁশি বাজিয়েছিলেন। এই কুখ্যাত সম্রাট কে ? —নিরো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি ও ছোট পাখির নাম কী ? —উটপাখি ও হামিং বার্ড।

(বাকি অংশ শেষ প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে)

www.pathagar.com

পেঁয়াজ বায়ুনাশক ও বলকারক। অথচ বেশি খেলে আবার গুরুপাক ও পেটের পক্ষে উত্তেজক। লু হাওয়ার সময় পেঁয়াজ খেলে কষ্ট কমে, মরুভূমিতে পথের কষ্টে ও জলতেষ্টায় পেঁয়াজ খেলে উপকার মেলে। আমাদের এত পরিচিত এই ঝাঁঝাল বস্তুটি কিন্তু এ দেশেরই নয়। পশ্চিম এশিয়া থেকে আর্যরা এটি নিয়ে এসেছিল ভারতে। এখন অবশ্য ঝাঁজহীন বড় বড় পেঁয়াজও ফলছে এখানে।

ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে শিশু-বিশ্বকোষের তৃতীয় খণ্ড। ভুক্তি-বিষয়গুলোকে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—প্রধানত এই তিন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি এখানে তুলে আনা হয়েছে। বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে বিন্যস্ত শিশু-বিশ্বকোষের এই খণ্ডে ঝ থেকে প বর্ণের মোট ৬৮৩টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভাগ অনুসারে ভুক্তি-বিষয়ের সংখ্যা এরকম :

| বিভাগ | মূলভুক্তি | দ্রষ্টব্যভুক্তি | মোট |
|---|---|---|---|
| মানববিদ্যা | ২২৯ | ৬১ | ২৯০ |
| সমাজবিজ্ঞান | ১৩০ | ৫৬ | ১৮৬ |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৫৭ | ৫০ | ২০৭ |
| মোট ভুক্তি | ৫১৬ | ১৬৭ | ৬৮৩ |

মূল্য : ৳ ২০০.০০

ISBN : 984-09-0376-4

www.pathagar.com

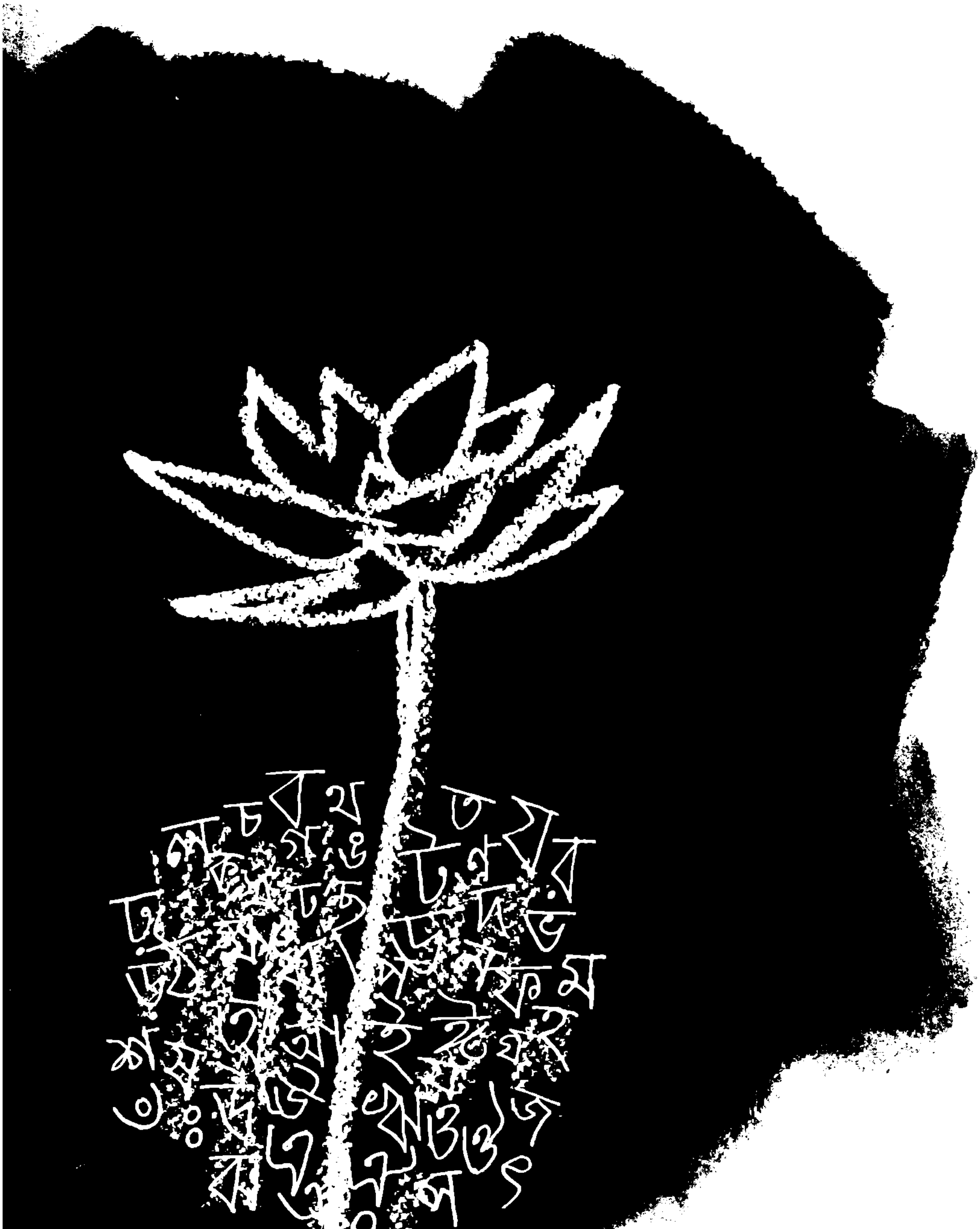

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : ৩য় খণ্ড

বাশিশুএ ৩৭৬

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০৩, জানুয়ারি ১৯৯৭।

মূল্য : ৳ ২০০.০০

SHISHU-BISWAKOSH ( Children's Encyclopaedia ) Vol - 3. Publisher: Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy. Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : January 1997

Price : Tk. 200.00
US $ 10.00

ISBN : 984-09-0376-4

---

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন : হাশেম খান, মোহাম্মদ আলী

আলোকচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা : রশীদ তালুকদার, মীর আহমদ মীরু, সৈয়দ আবদুল করিম, শিহাব উদ্দিন,স্বপন সাহা, প্রবীর রায়, উত্তম কুমার রায়, শান্তনু খান, হাশেম খান ও ঢাকা নগর জাদুঘর।

www.pathagar.com

তৃতীয় খণ্ড

# শিশু-বিশ্বকোষ

## ঝ থেকে প

প্রকল্প পরিচালক
গোলাম কিবরিয়া
প্রকল্প সহযোগী
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মো. নাজিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা সহযোগী
সুজন বড়ুয়া
মুদ্রণ সহায়ক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
টিপু কিবরিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আহমদ রফিক—সমাজবিজ্ঞান
মনসুর মুসা—মানববিদ্যা
হায়াৎ মামুদ—শৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক
হাশেম খান—শিল্প সম্পাদক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

## শিশু-বিশ্বকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ :

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | ঋ | এ | ঐ | ও | ঔ |
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | | | | | | |
| চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | | | | | | |
| ট | ঠ | ড | ড় | ঢ | ঢ় | ণ | | | | |
| ত | ৎ | থ | দ | ধ | ন | | | | | |
| প | ফ | ব | ভ | ম | | | | | | |
| য | য় | র | ´(রেফ্) | ল | | | | | | |
| শ | ষ | স | হ | | | | | | | |

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ :

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | অং | অঃ | অঁ | অক | অক্‌ত | অক্ক ইত্যাদি | | |
| ক | কই | কউ | কও | কং | কঃ | কঁ | | |
| ক ক | ককো | ককি | ককী | ককু | ককূ | ককৃ | ককে | ককৈ |
| | ককো | ককৌ | কক্ | | | | | |
| কক্ক... | কক্ত... | কক্ব... | কক্য... | কক্র... | কক্ল... | কক্ষ | | |
| কখ... | কঠ... | কড... | কড়... | কঢ... | কঢ়... | কণ... | কত... | কৎ... |
| | কথ... | কদ... | কধ... | কন... | কপ... | কফ... | কব... | কভ... |
| | কম... | কয... | কয়... | কর... | করৌ... | কর্... | কর্ক... | কর্ক্... |
| | কর্কট... | কর্হ... | | | | | | |
| কল | কশ | কষ | কস | কহ... | কহৌ | ইত্যাদি | | |

www.pathagar.com

গ. দেশী বা বিদেশী যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে : নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশী নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে—পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন—উইলিয়াম শেক্সপীয়র, আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুণ্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে উইলিয়াম, আলবার্ট, জিগমুণ্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (Surname বা family name) শেক্সপীয়র, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পেতে হলে ঠাকুর বা ইসলাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাজী' খুঁজে বের করতে হবে। অন্য দিকে আতাউল গনি ওসমানী কি সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ-কে পেতে হলে ওসমানী (যেহেতু নামের এই অংশটুকুই সবাই জানেন) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন (যেহেতু এঁদের নামের পূর্বে সর্বদা আমরা 'ওস্তাদ' বলে থাকি) খুঁজতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক—'ওদিসি' ভুক্তির রচনাতে হোমার, মহাকাব্য, ভার্জিল, ঈনীদ ও জয়েস শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ, এই বিশ্বকোষের নির্দিষ্ট খণ্ডের ভিতরে উপর্যুক্ত পাঁচটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ :

| | | |
|---|---|---|
| আ. | = | আলায়হিস্ সালাম |
| আনু. | = | আনুমানিক |
| কিমি | = | কিলোমিটার |
| কেজি | = | কিলোগ্রাম |
| খ্রি. | = | খ্রিস্টাব্দ |
| খ্রি. পূ. | = | খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
| ড. | = | ডক্টর |
| ডা. | = | ডাক্তার |
| দ্র | = | দ্রষ্টব্য |
| ব. | = | বঙ্গাব্দ |
| ফা. | = | ফারেনহাইট |
| মি. | = | মিটার |
| মিমি | = | মিলিমিটার |
| মো. | = | মোহাম্মদ |
| রা. | = | রাদি'য়াল্লাহু আন্‌হু |
| শা. | = | শাসনকাল |
| স. | = | সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম |
| সিসি | = | কিউবিক সেন্টিমিটার |
| সে. | = | সেন্টিগ্রেড / সেলসিয়াস |
| সেমি | = | সেন্টিমিটার |

www.pathagar.com

## লেখকদের নাম-সঙ্কেত

| | | |
|---|---|---|
| অ. ব. | = | অজয় বড়ুয়া |
| আ. আ. | = | ড. আলী আসগর |
| আ. আ. মু. | = | ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী |
| আ. আ. হা. | = | ডা. আফরোজা আখতার হালিদা |
| আ. ই. | = | আমীরুল ইসলাম |
| আ. ক. | = | অধ্যাপক আহমদ কবির |
| আ. কা. | = | আবু কায়সার |
| আ. ন. ম. আ. র. | = | ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান |
| আ. মা. | = | আহমাদ মাযহার |
| আ. র. | = | ডা. আহমদ রফিক |
| আ. হ. খ. | = | আবদুল হক খন্দকার |
| আ. হা. | = | আবুল হাসানাত |
| আ. হু. | = | আখতার হুসেন |
| আজ. ই. | = | আজহার ইসলাম |
| ক. গো. | = | ড. করুণাময় গোস্বামী |
| ক. চৌ. | = | অধ্যাপক কবীর চৌধুরী |
| কা. আ. আ. | = | কাজী আবদুল আলীম |
| কা. ম. | = | কাজী মদিনা |
| খু. জা. | = | অধ্যাপক খুরশীদ জাহান |
| টি. কি. | = | টিপু কিবরিয়া |
| ত. চ. | = | তপন চক্রবর্তী |
| নি. অ. | = | নিরঞ্জন অধিকারী |
| ফ. মা. | = | ফরহাদ মাহমুদ |
| ফ. র. | = | ফরিদুর রহমান |
| ফা. ন. | = | ফারুক নওয়াজ |
| ব. চৌ. | = | ডা. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী |
| বি. ব. | = | বিপ্রদাশ বড়ুয়া |
| ম. আ. | = | মতলুব আলী |
| ম. আ. খা. | = | মনসুর আহমদ খান |
| ম. মু. | = | অধ্যাপক মনসুর মুসা |
| ম. র. | = | মনজুরুর রহমান |
| ম. হ. | = | মফিদুল হক |
| মা. র. | = | ডা. মাসউদুর রহমান |
| মু. আ. | = | মুহাম্মদ আলী |
| মু. ই. | = | ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম |
| মু. এ. | = | মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন |
| মু. মা. | = | মুস্তাফা মাসুদ |
| মু. হা. | = | মুনির হাসান |
| মে. খা. | = | মেহ্‌জাবীন খান |
| মো. ই. | = | মোহাম্মদ ইবরাহিম |
| মো. হো. | = | মোস্তফা হোসেইন |
| র. শা. | = | রহীম শাহ |
| র. হা. | = | রশীদ হায়দার |
| রু. হা. | = | ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন |
| শ. আ. | = | শফিউল আলম |
| শ. আহ. | = | শফি আহমেদ |
| শ. খা. | = | শরীফ খান |
| শা. চৌ. | = | শামসুদ্দিন চৌধুরী |
| শা. ত. | = | ড. শাহজাহান তপন |
| শা. হ. | = | শামসুল হক |
| শু. চৌ. | = | ডা. শুভাগত চৌধুরী |
| স. রা. | = | ড. সত্যব্রত রায় |
| সা. এ. | = | ডা. সাইফুদ্দীন একরাম |
| সি. আ. | = | সিরাজউদ্‌দীন আহমেদ |
| সি. না. হ. | = | ডা. সিকদার নাজমুল হক |
| সু. ব. | = | সুব্রত বড়ুয়া |
| সুজ. ব. | = | সুজন বড়ুয়া |
| সে. এ. | = | সেতারা এলিন |
| সে. শা. | = | সেলিনা শাহজাহান |
| সে. হো. | = | সেলিনা হোসেন |
| সৈ. আ. ই. | = | সৈয়দ আমীরুল ইসলাম |
| সৌ. মা. | = | সৌম্য মামুদ |
| হা. খা. | = | অধ্যাপক হাশেম খান |
| হা. মা. | = | ড. হায়াৎ মামুদ |
| হা. র. | = | হাসানুর রহমান |
| হো. আ. | = | হোসনে আরা |

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ঝ

**ঝংকার** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

## ঝড়

ঝড় বলতে সাধারণভাবে প্রবল বায়ুপ্রবাহকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা পরিমাপের আন্তর্জাতিক স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে আবহাওয়া-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। বিউফোর্ট স্কেলে (Beaufort scale) ঝড় হচ্ছে সেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বা বাত্যা, যার গতি ঘণ্টায় ১০৬ থেকে ১২০ কিলোমিটার। বাতাসের গতি যেখানে ঘণ্টায় ১০৬ কিলোমিটারের নিচে—যেমন ঘণ্টায় ৯১ থেকে ১০৫ কিলোমিটার, তাকে বলা হয় সার্বিক বাত্যা। ঘণ্টায় ৭৬ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে তীব্র বাত্যা। ঝড়ের বেগকে অতিক্রম করে যে বায়ুপ্রবাহ তাকে বলা হয় হারিকেন (hurricane)।

আমাদের পৃথিবী (দ্র), এর বায়ুমণ্ডল (দ্র) ও সূর্য (দ্র) একত্রে একটি তাপীয় ইঞ্জিনের মতো কাজ করে। সূর্যের বিকিরণ (দ্র) বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে উত্তপ্ত করে। গ্রীষ্মমণ্ডলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায়। কারণ উত্তপ্ত হলে বায়ু হালকা হয়ে যায়। এর ফলে সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায়। বায়ু চাপের এই পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বায়ু গ্রীষ্ম এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় আয়ন বায়ু। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির জন্য এই বায়ুপ্রবাহ পাক খেতে খেতে চলে। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে হারিকেন বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন। এদের উদ্ভব ঘটে বিশেষ করে পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের (দ্র) ক্যারিবিয়ান (দ্র) ও মেক্সিকো অঞ্চলে এবং ভারত মহাসাগরের (দ্র) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে এবং অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) দক্ষিণ অঞ্চলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের (দ্র) পূর্বাঞ্চলে।

হারিকেন বা সাইক্লোন গ্রীষ্মমণ্ডলের মহাসমুদ্রে সৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হয়ে গরম বাতাস ও জলীয় বাষ্প ওপরে উঠতে থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি বাতাসের এই স্তম্ভকেও একটি ঘূর্ণনগতি দেয়। এর ফলে এই স্তম্ভের কেন্দ্রের দিকে বায়ুচাপ

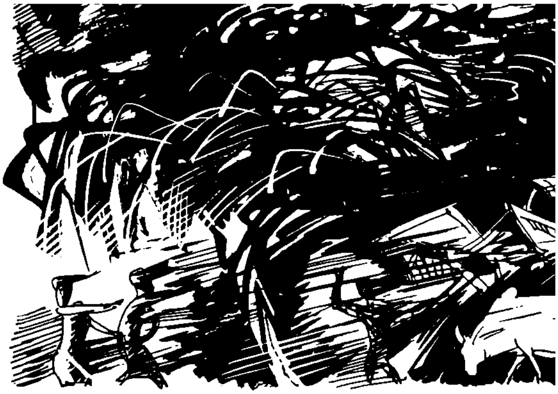

কমতে থাকে। পুরো ব্যাপারটাই একটি পাক-খাওয়া লাটিমের মতন কাজ করে। বাইরে থেকে বাতাস যখন ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে তখন এই পাকের মধ্যে পড়ে যায় এবং ঘূর্ণনগতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এখানে লক্ষণীয় যে, কেউ যদি প্রসারিত দুই বাহুতে ভারি বস্তু ধরে পাক খেতে থাকে এবং এর পর বাহু দুটো ভাঁজ করে দেহের দিকে নিয়ে আসে তার ঘূর্ণনগতি বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ঘূর্ণনভরবেগ অপরিবর্তিত রাখতে এটা প্রয়োজন। প্রচণ্ড শব্দ করে এই

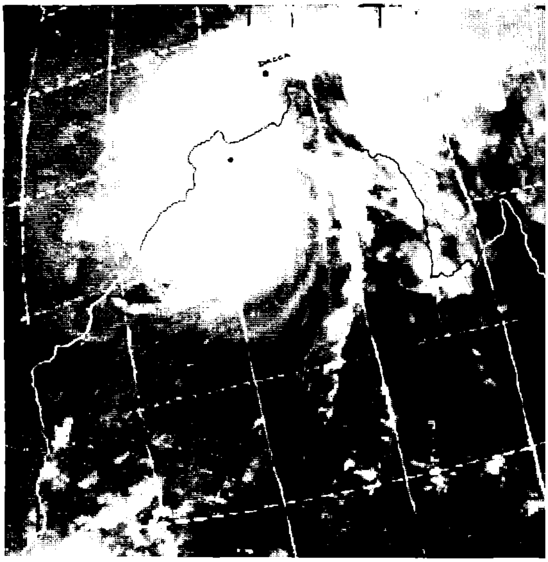

*১৯৭০ সালে ১২ই নভেম্বর সকালে আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে পাওয়া বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনের ছবি। ঝড়ের কেন্দ্র ঢাকা থেকে ২৫০ মাইল দক্ষিণে রয়েছে*



www.pathagar.com

*সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ ও প্রকৃতি*

ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে থাকে। যখন এই হারিকেন উপকূলে এসে আঘাত করে তখন বিপুল ধ্বংসলীলা ঘটায়। ভূমির উপর দিয়ে চলার সময় এই ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

হারিকেনেরই যমজ ভাই হল টাইফুন। দুটোই মূলত ভয়াবহ ঘূর্ণিবাত্যা, তবে একেক স্থানে একেক নাম। হারিকেন শব্দের উৎস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (দ্র) একটি শব্দ— 'হারাকান্' (huracan), যার অর্থ হল 'বড় হাওয়া'। আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্ব-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঝড়কে বলা হয় 'হারিকেন'। আর সেই একই ঝড় যদি হয় পশ্চিম-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, তখন তাকে বলে টাইফুন (typhoon)। শব্দটা আসলে চৈনিক, 'তাইফুন'—এর মানে হল 'বিশাল হাওয়া'।

আ. আ.

## ঝিনুক ( Shell )

ঝিনুক খোলসযুক্ত অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। প্রধানত সমুদ্রে বাস করে। কিছু প্রজাতি মিঠা পানির বাসিন্দা। কোনো কোনো প্রজাতি মুক্তা উৎপাদনে সক্ষম। কিছু প্রজাতি মানুষের প্রিয় খাদ্য। এদের খোলস থেকে চুন (দ্র) তৈরি হয়। পৃথিবীতে প্রায় ৮,৫০০ প্রজাতির সামুদ্রিক ঝিনুক রয়েছে।

ঝিনুকের নরম দেহটি একজোড়া শক্ত খোলসে আবৃত থাকে। খোলসদ্বয় একপাশে কব্জার মতো যুক্ত থাকে। নিচের খোলসটি বড়, তাতে নরম দেহটি অবস্থান করে। ওপরেরটি ছোট, মাংসপেশির মাধ্যমে ঝিনুক এটি খোলে ও বন্ধ করে। এদের মাথা ও চোখ নেই। খোলসের ভিতরে ম্যান্ট্ল্ (mantle) নামক অঙ্গ থাকে। ম্যান্ট্লের কিনারায়

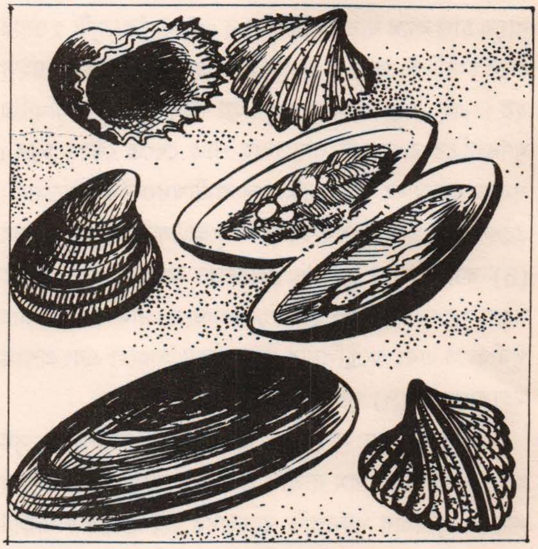

*বিভিন্ন ধরনের ঝিনুক*



www.pathagar.com

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থান। তা ছাড়া পেশিবহুল পা ও কতকগুলো চুল (সিলিয়া) আছে।

প্রজাতিভেদে আকার, আকৃতি ও বর্ণে এর পার্থক্য হয়। এটি লম্বায় ০.১–১৩৭ সেন্টিমিটার হয়। বৃহত্তর ঝিনুক ৩০০ কেজি পর্যন্ত হয়। ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ খায়। সিলিয়ার মাধ্যমে পানি শোষণ করে তা থেকে জৈব পদার্থ গ্রহণ করে।

স্ত্রী-ঝিনুক বছরে প্রায় ৫০ কোটি ডিম পাড়ে। প্রায় দশ ঘণ্টায় বাচ্চা ফোটে। ঝিনুক ৬–২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

## ঝিন্দের বন্দী

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র) রচিত রোমাঞ্চ-উপন্যাস। অত্যন্ত জনপ্রিয় কিশোরপাঠ্য বই। তবে, এ উপন্যাস লেখকের সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নয়, ইংরেজি একটি বইয়ের আদলে লেখা।

এই কিশোর-উপন্যাস সর্বপ্রথম মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়, পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। সেখানে ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন : "যেদিন Anthony Hope-এর The Prisoner of Zenda প্রথম বাহির হয় সেদিন রোমান্স রাজ্যের একটি নতুন পথ খুলিয়া গিয়াছিল। তার পর সেই পথে দেশবিদেশের অনেক যাত্রীই চলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে এই জাতীয় রোমাঞ্চের প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে কেহই তাহা ব্যবহার করেন নাই।" অর্থাৎ অ্যান্টনি হোপের রচনার ভাবানুবাদ হল 'ঝিন্দের বন্দী'। অথচ আসলে ভাবানুবাদ নয়। কাহিনীর কাঠামোতেই শুধু মিল আছে, নইলে পটভূমি, চরিত্র, আচারব্যবহার সবই এদেশের। না জানলে কারো বোঝার সাধ্য নেই যে 'ঝিন্দের বন্দী'র উৎস হল বিদেশী।

মধ্য-ভারতের একটি অত্যন্ত ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য, নাম—ঝিন্দ্। রাজা মারা গেলে তাঁর দু' ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। বড় ভাই শঙ্কর সিংহের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসার কথা, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের মানুষ অবশ্য তা জানে না। আসলে তাকে বন্দি করে লুকিয়ে রেখেছে ছোট ভাই উদিত সিংহ। এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে কলিকাতা শহরে (দ্র) খুঁজে পাওয়া গেল গৌরীশঙ্কর রায় নামে এক বাঙালি যুবককে, যিনি হারানো রাজকুমারের মতো অবিকল দেখতে। ঝিন্দ্ রাজের পুরনো শুভার্থী অমাত্যবর্গ এঁকেই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝিন্দে নিয়ে গেলেন বড়ভাই সাজিয়ে। অভিষেক সম্পন্ন হল, মৃত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই নতুন রাজা হল দেশের। কেবল ছোটভাই বুঝল যে এ রাজা নকল রাজা, কেননা সে-ই তো বড় ভাইকে লুকিয়ে রেখেছে, অথচ গোপন কথা ফাঁসও করতে পারছে না। ওদিকে অত্যন্ত সাবধানে অনুসন্ধান চলতে লাগল জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শঙ্কর সিংহের। কলিকাতার গৌরীশঙ্কর তো সত্যি সত্যি প্রতারণা করে রাজা হওয়ার জন্য আসে নি!

প্রাসাদচক্রান্তের অনবদ্য কাহিনী এই গল্প। পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই পাঠকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এখনো করে।

হা. মা.

## ঝুমুর

বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) প্রধান পাঁচ ধারার অন্যতম। অপর চারটি ধারা হচ্ছে : বাউল, ভাটিয়ালি (দ্র), ভাওয়াইয়া (দ্র), গম্ভীরা (দ্র)। ঝুমুর মূলত আদিবাসীদের (দ্র) সঙ্গীত। সাঁওতালদের (দ্র) মধ্যে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভারতের (দ্র) বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলে আদিবাসীদের (দ্র) মধ্যে এই সঙ্গীতের প্রচলন। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত নানা ভাষায় ঝুমুর রচিত হয়। এর পদ ছোট এবং সঙ্গীত নৃত্যসঙ্গীতের ঢঙে গঠিত। কেননা এই গানের সঙ্গে নাচের সম্পর্ক গভীর। আদিবাসীরা একই সঙ্গে ঝুমুর গায় ও নাচে। সঙ্গে আবশ্যকভাবে বাজানো হয় মাদল (দ্র) ও বাঁশি (দ্র)। ঝুমুরের সুর সরল কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তালের (দ্র) মধ্যে একটি চমৎকার আড় দোলা আছে। এ যে নৃত্যসঙ্গীত তা শোনামাত্র বোঝা যায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সীমান্তে বা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের ভেতরে বসবাসরত সাঁওতালদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাংলা লোকসঙ্গীতে ঝুমুরের প্রভাব পড়ে এবং বাংলায়ও তেমনি ছোট পদ ও নাচের ঝোঁক লাগানো সুরে বাংলা ঝুমুর গাওয়া হতে থাকে। কিন্তু ক্রমে বাংলায় ঝুমুর রচনার ধারায় পরিবর্তন আসে। গানের পদ দীর্ঘ হয়ে ওঠে, সুরেও বৈচিত্র্য আসে নানাভাবে। বাংলা লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত যন্ত্র ও



www.pathagar.com

*সাঁওতালদের ঝুমুর নৃত্য*

তালছন্দও ঝুমুরে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে ব্যাপকভাবে বাংলা ঝুমুর রচিত হয়। সাঁওতালি ঝুমুর ও পদাবলী কীর্তনের (দ্র) মিশ্রণে একপ্রকার ঝুমুর পদাবলীও রচিত হতে দেখা যায়। তা ছাড়া সামাজিক অবস্থা, অভাব-অনটন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনেও ঝুমুর রচিত হয়। বিভিন্ন লৌকিক উৎসবে ঝুমুর গান গাওয়া হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে দাঁড়শানিয়া ঝুমুর, ছৌনাচের ঝুমুর, খেমটি ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর, পাতানাচের ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর, করমনাচের ঝুমুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাচ বাংলা ঝুমুরেরও একটি বিশেষ অঙ্গ। কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) তাঁর গানে ঝুমুর-সঙ্গীতের চিত্তাকর্ষক ব্যবহার করেছেন।

ক. গো.

**ঝুলন**

দোল (দ্র) উৎসবের মতো একটি উৎসব। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রাধা-কৃষ্ণ বা অন্য বৈষ্ণব দেবমূর্তি দোলায় স্থাপন করে দোল দেওয়াই এই উৎসবের প্রধান আনুষ্ঠানিকতা। এর সংস্কৃত নাম হিন্দোল।

সুজ. ব.

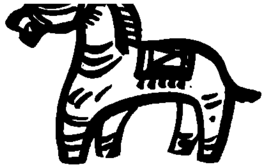

# ট

**টইটম্বুর** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

**টপ্পা**

রাগসঙ্গীত (দ্র) পদ্ধতির নাম। রাগসঙ্গীতের প্রধান চার পদ্ধতির অন্যতম। পদ্ধতি চারটি হচ্ছে: ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা, ঠুম্‌রি (দ্র)। গঠনের দিক থেকে টপ্পা খেয়াল অপেক্ষা লঘু। সঙ্গীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় টপ্পার সংজ্ঞার্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, "টপ্পা হিন্দি শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে সংক্ষেপ। এই সংক্ষেপার্থেই ইহা গানে ব্যবহার হইতেছে। অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষিপ্ত তাহার নাম টপ্পা।" লখ্‌নৌনিবাসী গোলাম নবী (১৭৪২—১৭৯২) এই সঙ্গীতপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। গানে তিনি শোরী মিঞা নামে ভণিতা করতেন বলে এই নামেই তার পরিচয় ঘটে। পাঞ্জাবের উটচালকদের মধ্যে প্রচলিত গানের সঙ্গে খেয়াল অঙ্গের সঙ্গীতপদ্ধতির মিশ্রণে এই টপ্পা প্রচলিত হয়। সে সময় পাঞ্জাব থেকে মালামাল নিয়ে উটের বহর লখ্‌নৌ আসত। উটচালকেরা ধুনজাতীয় পাঞ্জাবি লোকসঙ্গীত (দ্র) গাইতেন। এই সঙ্গীতের সঙ্গে খেয়ালপদ্ধতির সঙ্গীত মিশ্রিত করেই গোলাম নবী 'টপ্পা' নামক সঙ্গীতপদ্ধতি রচনা করেন। স্থায়ী (দ্র) ও অন্তরা (দ্র) —এই স্তবকে টপ্পা রচিত হয়। এর গতি দ্রুত ও লঘু। টপ্পায় সুরবিস্তারেরও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতি আছে। এই গানে কথাগুলোকে সুরের সাহায্যে বেশ খেলিয়ে উচ্চারণ করা হয়। এক স্বর থেকে আরেক স্বরে যেতে একটি লাফিয়ে চলবার ভঙ্গি আছে এই গানে। টপ্পায় লঘু ও মিষ্টি রাগসুরগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগে টপ্পায় মধ্যমান তালের ব্যবহার ছিল বেশি। পরে খেয়ালে ব্যবহৃত অনেক তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হতে থাকে। টপ্পার প্রধান ঘরানা হচ্ছে লখ্‌নৌ ঘরানা, বারানসি ঘরানা ও রামপুর ঘরানা।



www.pathagar.com

নিধুবাবু (দ্র) ও কালী মীর্জা (১৭৫০–১৮২০) বাংলায় টপ্পা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। সমগ্র উনবিংশ শতক জুড়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালি গীতিকার টপ্পা রচনা করেছেন। টপ্পার সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীতের মিশ্রণে নানা সঙ্গীতরীতির উদ্ভব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) ওপর টপ্পার গভীর প্রভাব ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীতে টপ্পার সঙ্গীতরীতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

ক. গো.

**টম চাচার কুটির** আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ কেবিন দ্র

**টম সয়্যার** (Tom Sawyer)

মার্ক টোয়েন (দ্র) রচিত কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস। বইটির সম্পূর্ণ নাম The Adventures of Tom Sawyer, প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। এটি একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী এবং পৃথিবীতে কিশোর-সাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য বইয়ের একটি।

টম-এর মা-বাবা ছিল না, মানুষ হচ্ছিল মাতৃস্থানীয় আত্মীয়া পলির বাড়িতে। টম খুব দুরন্ত, ছটফটে ছেলে, পড়াশুনোয় খুব মনোযোগী নয়। সকলের বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে হাক্‌ল্‌বেরি ফিন্-এর সঙ্গে। এই ছেলেটিকে সবাই ডাকে 'হাক' আর জানে গোল্লায় যাওয়া ছেলে হিসাবে। ফিন পরিবারটি খুবই গরিব আর হাকের বাবা মাতাল—এতেই যত গণ্ডগোল। কিন্তু এতে দুই কিশোরের মনের মিলমিশ তো আটকানো যায় না। এক রাত্রে দু'জনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে নির্জন গোরস্তানে গিয়ে দেখা করে। এমন অদ্ভুত জায়গায় সাক্ষাতের কারণ, গোরস্তানে তো কেউ আসে না, অতএব চমৎকার গল্প করা যাবে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ঐ গোরস্তানেই একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় এবং ওরা আড়ালে থেকে দেখে ফেলে। হত্যার দায়ে যাকে ধরা হল, সে আসল হত্যাকারী নয়—এ কথা জেনেও ভয়ে ওরা মুখ খুলতে পারে না। যাই হোক ঘটনাপ্রবাহে টম, হাক আর জো নামে আর এক বন্ধু অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। একটা দ্বীপে গিয়ে কত কষ্ট, গুপ্তধন খোঁজা ইত্যাদি ঘটে। ঐ দ্বীপে এক গুহায় তারা অকস্মাৎভাবে সেই হত্যাকারীকে দেখতে পায়। কিন্তু সে তখন জীবন্ত নয়, মৃত। আর গুহার ভেতরে চুরি-ডাকাতি করা অনেক ধন-সম্পত্তি। স্বাভাবিকভাবে ঐ

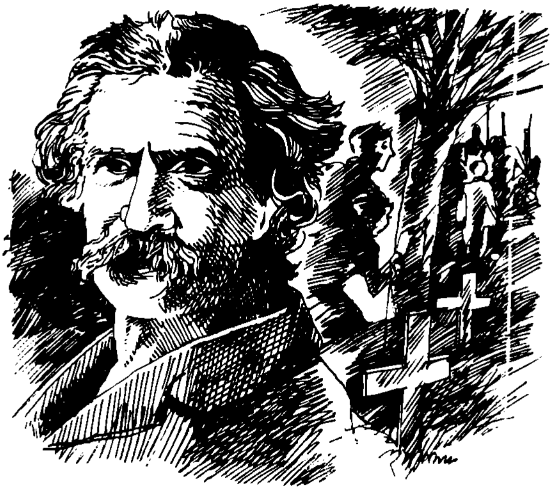

*অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়্যারের লেখক মার্ক টোয়েন*

ধন-সম্পত্তির মালিক এখন তারাই। গরিব হাক তার ভাগ পেয়ে বড়লোক হল। কিন্তু হাক তো আর টম নয়। সে সভ্য কেতাদুরস্ত শহরে মানুষ হতে চায় না। তার প্রকৃতির মধ্যে এক আদিম, বন্য সরলতা থেকেই যায়।

এর পরবর্তী ঘটনা মার্ক্ টোয়েন্ লিখেছেন আর একটি কিশোর-উপন্যাসে—তার নাম হাক্‌ল্‌বেরি ফিন্ (দ্র)।

হা. মা.

**টমটম**

এক ধরনের ঘোড়ায় টানা গাড়ি। অভিধানে এই শব্দটির যে অর্থ পাওয়া যায়, তা হল এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি। টমটম শব্দটি ইংরেজি tandem শব্দের বিকৃত উচ্চারণরূপ। ট্যাণ্ডেম শব্দের অর্থ দুই বা ততোধিক ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িবিশেষ।

ভারতীয় উপমহাদেশ ইংরেজ শাসনকবলিত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে যে নব্য বাঙালি বা ভারতীয় বিত্তশালী শ্রেণীর উদ্ভব, তাদেরকে বলা হত 'বাবু' এবং তাদের জাঁকজমকপূর্ণ নৈমিত্তিক জীবনাচারকে অভিহিত করা হত 'বাবু কালচার' বলে। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে এইসব 'বাবু' ইংল্যাণ্ড থেকে নানা রকমের গাড়ি আমদানি করতেন, যেমন–ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন ইত্যাদি। আর এসব গাড়ি টানত ওয়েলার ঘোড়া ও আরবি ঘোড়া। অস্ট্রেলিয়া (দ্র) কি



www.pathagar.com

আরব— সব জায়গা থেকেই ঘোড়া আমদানি করা হত। কলিকাতা (দ্র) শহরকে মূল কেন্দ্র করেই যেহেতু ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন, তাই এসব ঘোড়ায় টানা গাড়ির প্রথম প্রচলন হয় এর শহরসীমানার ভেতরেই। এদের চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে শুরু করে—ইট-সুরকি, সিমেন্ট, পরে পিচে মোড়া।

ঘোড়ায় টানা গাড়ি সেই কালের দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি ইংরেজদেরও প্রধান যানবাহন ছিল। ধীরে ধীরে অবিভক্ত ভারতের প্রথমে বড় বড় শহরে, পরে মফস্বলেও এর প্রচলন ঘটে। অঞ্চল বিশেষে এইসব গাড়ির নামের ও বৈশিষ্ট্যের হেরফের আছে—কোথাও এটিতে চার চাকা, কোথাও-বা এটি দুই চাকার, সওয়ারিদের আসন চারদিক থেকে আবৃত (দু'দিকে দু'টি জানালাসহ) কিংবা পুরোপুরি খোলা। কোথাও এটি পরিচিত টাঙ্গা, জুড়িগাড়ি, এক্কা এবং টমটম নামে। যাঁরা এসব চালাতেন বা এখনো চালান, তাঁদেরকে বলা হয় কোচোয়ান বা সহিস। এখনো এই যন্ত্রচালিত যানবাহন বা পরিবহনের ব্যাপক প্রচলনের যুগে কোনো কোনো এলাকায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি বা টমটমের ছিটেফোঁটা অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তাদের আগের সে রমরমা নেই। মানুষ এসব ঘোড়ায় টানা যানে এখন কালেভদ্রে শখের সওয়ার হয়ে থাকেন বিশেষ কোনো উৎসব-দিবস বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

**আ. হু.**

**টমেটো**

সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ (দ্র)। এর বৈজ্ঞানিক নাম *লাইকোপার্সিকন্ লাইকোপার্সিকাম্* মিল্ (*Lycopersicon lycopersicum* Mill): *লাইকোপার্সিকন্ এস্কুলেন্টাম (L. esculentum)*। বাংলায় একে বিলেতি বেগুন বলা হয়। এটি ফল, সবজি, জেলি, চাটনি এবং সালাদ হিসাবে খাওয়া হয়। এতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকে।

উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য টমেটো এ দেশের খুব প্রিয় সবজি। কাঁচা ও পাকা অবস্থায় এটি সালাদ করে ও রান্না করে খাওয়া যায়। টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। রুমা, মারগ্লোব, অক্সহার্ট, সান সার্জানো, পুশা রবী ও ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশে টমেটোর কয়েকটি পরিচিত জাত। এ ছাড়া রতন ও মানিক নামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (দ্র) দু'টি উন্নত জাত বের করেছে।

জমি তৈরি করার পর বিকেলে টমেটোর চারা লাগানো ভাল। চারা লাগানোর পর এর গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হয়। এ ছাড়া হাল্কা পানি সরবরাহ ও ছায়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। জমি তৈরি করার সময় গোবর ও ফসফেট সার (দ্র) ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া চারা লাগানোর ১০–১৫ দিন পর থেকে তিন-চার কিস্তিতে পটাশ ও ইউরিয়া (দ্র) সার উপরিপ্রয়োগ করা হলে ফলন বাড়ে।

টমেটো গাছের গোড়ায় ডালপালা বেশি হলে সেগুলো ছেঁটে মূল গাছটি কাঠি দিয়ে সোজা রাখা দরকার। অন্যথায় গাছ মাটিতে গড়িয়ে গেলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়। আগাছা দমন করে মাটি নরম রাখলে ফলন ভাল হয়। চারা লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে কাঁচা এবং আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়।

**মু. আ.**

**টরেটক্কা** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

**টলস্টয়, লেভ** তল্‌স্তোয়, লিয়েফ্ নিকলাইয়েভিচ্ দ্র

**টলেমি–১** [আনু. ৩৬৭—২৮৩ খ্রি.পূ.]

টলেমি ১ বা প্রথম টলেমি (Ptolemy) বিজ্ঞান ও গণিতে তাঁর অবদানের জন্য বিখ্যাত। তিনি মহাবীর



www.pathagar.com

আলেকজাণ্ডারের অধীনে ম্যাসিডোনিয়ার একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি মিশরের প্রখ্যাত গ্রিক রাজবংশ টলেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ক্লিওপেট্রার (দ্র) রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশ টিকে ছিল।

টলেমি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (দ্র) মৃত্যুর পর তাঁর সম্প্রতি জয় করা সাম্রাজ্যের ভূমির জন্য লড়াই করেন। টলেমি মিশর দখল করেন এবং প্রথমে তিনি (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ থেকে ২৮৫ সাল পর্যন্ত) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে রাজ্য শাসন করেন, পরে খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ সাল থেকে স্বঘোষিত সম্রাট হিসাবে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এ সময়ে এন্টিগোনাসসহ (Antigonus) আলেকজাণ্ডারের অন্যান্য সেনাপতিরা টলেমির উপর সব সময় আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করত। টলেমিকে অবিরাম এসব আক্রমণ প্রতিহত করতে হত। টলেমি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় (দ্র) গ্রন্থাগার ও জাদুঘর তৈরি করে শহরটিকে হেলেনীয় সংস্কৃতিজগতের রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন।

ধারণা করা হয়, প্রখ্যাত গ্রিক জ্যোতির্বিদ ও ভূগোল বিশারদ ক্লদিয়াস টলেমি এই রাজবংশেরই কোনো এক অধস্তন পুরুষ। বিজ্ঞান ও গণিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

হো. আ.

**টাইটানিক** পর্বত দ্র

**টাইপরাইটার** (typewriter)

এক প্রকার লিখন-যন্ত্র—যার সাহায্যে মুদ্রণাক্ষরের অনুরূপ অক্ষর সাজিয়ে লেখা যায়। এই যন্ত্রে বর্ণ, সংখ্যা, দাঁড়ি ও কমা চিহ্ন ইত্যাদি বিন্যাস করা একটি কী-বোর্ড (key-board) থাকে। সরু সরু লোহার অগ্রভাগে চিহ্নগুলো বসানো থাকে। লেখার জন্য এতে বেলনাকারের সমান্তরাল একটি বস্তুর সঙ্গে কাগজ এঁটে দিতে হয়। সমান্তরাল বস্তুটির সামনে কালিমাখা একটি কাপড়ের ফিতা আলগাভাবে বসানো থাকে। প্রয়োজনীয় অক্ষরের কী-এর ওপর চাপ দিলে অক্ষরটি ফিতার ওপর গিয়ে আঘাত করে এবং কাগজে এর ছাপ মুদ্রিত হয়।

টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে অক্ষরগুলো বর্ণক্রম অনুসারে সাজানো থাকে না, ভাষায়-ব্যবহারের আধিক্যের ভিত্তিতে অক্ষরগুলো সাজানো হয়। টাইপরাইটারের লেখার জন্য দু' হাতের দশ আঙুলই ব্যবহার করতে হয়।

আঠারো শতকের শুরুতে চেষ্টা চললেও ১৮৬৮ সালে ক্রিস্টোফার্ ল্যাথাম্ শোল্স্ (Christopher Latham Sholes)-এর হাতে টাইপরাইটার তৈরির পরিকল্পনা উন্নত রূপ লাভ করে। এর ছ' বছর পর ইলিফেলেট রেমিংটন অ্যাণ্ড সন্স (Eliphalet Remington and Sons) নামে এক বন্দুক নির্মাতা-প্রতিষ্ঠান প্রথম টাইপরাইটার বাজারজাত

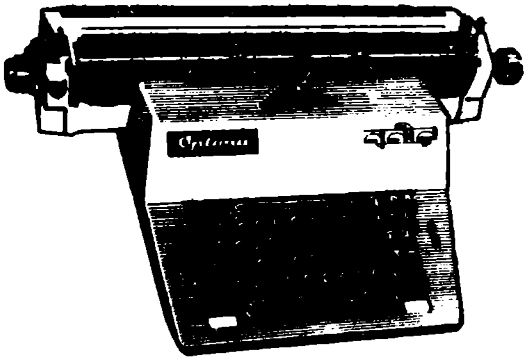


*অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, টাইপরাইটার মুনীর অপটিমা*

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হয়। প্রথম মডেলটির নাম ছিল রেমিংটন। এটি কেবল বড় হাতের অক্ষর (capital letters) সংবলিত ছিল। ১৮৭৮ সালে পরিবর্তনশীল চাবিযুক্ত টাইপরাইটার চালু হয়। ১৯০৪ সালে টেলি-টাইপরাইটার—যা টেলিফোন (দ্র) বা অন্য কোনো বিদ্যুৎপ্রবাহের ভিতর দিয়ে টাইপ আদানপ্রদান করতে পারে—এবং ১৯২০ সালে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার প্রবর্তিত হয়।

টাইপরাইটারের জন্য নতুন নতুন অক্ষরছাঁদ (letter face) উদ্ভাবনের চেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বাংলা টাইপরাইটারের অক্ষরছাঁদ উদ্ভাবন করেন শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (দ্র)। তাঁর স্মরণে জার্মান অপটিমা কোম্পানি নির্মিত বাংলা টাইপরাইটারের নাম রাখা হয়েছে 'অপটিমা মুনীর'।

প্রথম দিকে টাইপরাইটার প্রধানত দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য তৈরি হত। কিন্তু সমাজ-অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার এত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় যে এটি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে এর নানাবিধ প্রযুক্তিগত উত্তরণ ঘটে। আগে এক টাইপরাইটারে এক ভাষায় মাত্র লেখা যেত; এখন একাধিক ভাষায় লেখার উপযোগী টাইপরাইটারও চালু হয়েছে।

সুজ. ব.

**টাইফয়েড জ্বর** (typhoid fever)

'সালমোনেলা টাইফি' *(Salmonella typhi)* নামক জীবাণু সংক্রমণে টাইফয়েড জ্বর দেখা দেয়। জীবাণুদূষিত খাবার, পানি (দ্র), দুধ (দ্র) ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে।

এ রোগের প্রধান লক্ষণ অবিরাম জ্বর। তা ছাড়া রোগীর গায়ে পীড়কা বা র‍্যাশ (rash) সৃষ্টি হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, প্লীহার আকৃতি বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণও দেখা দিতে পারে। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে রোগীর মৃত্যুও ঘটা বিচিত্র নয়।

টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহারযোগ্য সুনির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক (দ্র) ও কেমোথেরাপিউটিক ঔষধ আবিষ্কারের পর থেকে এ রোগে মৃত্যুর হার কমে গেছে। টিকায় (দ্র) এ রোগের প্রতিরোধ সুনিশ্চিত নয়।

সি. না. হ.

**টাইফুন** ঝড় দ্র

**টাং-টুইস্টার** (tongue-twister)

উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় এবং জিভ প্রায় দুমড়ে এবং দাঁত প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম হয় সে রকম শব্দ বা পঙ্‌ক্তিকে টাং-টুইস্টার বলা হয়।

সাধারণত অর্থহীন আবোলতাবোল ছড়া অথবা শিশুদের জন্য রচিত ঘুমপাড়ানি গানে ব্যবহৃত ঐ রকম চরণকে টাং-টুইস্টার নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একটি সুপরিচিত টাং-টুইস্টার নিচে উদ্ধৃত করা হল :

"Theophilus Thistledown,
the successful thistle sifter,
In sifting a sieve of unsifted thistles
Thrust three thousand thistles
Through the thick of his thumb.
If then, Theophilus Thistledown,
the successful thistle sifter
In sifting a sieve full of unsifted thistles,
Thrust three thousand thistles
Through the thick of his thumb,
See that thou, in sifting a sieve of unsifted
thistles,
Do not get the unsifted thistles stuck in
thy tongue."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার মধ্যে অনুপ্রাস ও উচ্চারণের দুরূহতাসূত্রে টাং-টুইস্টারের উপাদান আছে, কিন্তু কবিতাটি যথার্থ টাং-টুইস্টার নয়, সেখানে আবোলতাবোল কিছু নেই। নিচে 'বর্ষামঙ্গল'-এর প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত হল :

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে



www.pathagar.com

দিগবধূ চিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা।"

ক. চৌ.

**টাংস্টেন** (tungsten)

এটি একটি রাসায়নিক ধাতব পদার্থ, যা ক্রোমিয়াম (দ্র), মলিবডেনাম ও ইউরেনিয়াম শ্রেণীভুক্ত। সাংকেতিক চিহ্ন W, পারমাণবিক সংখ্যা ৭৪ এবং পারমাণবিক ওজন ১৮৪.০। সঙ্কর ধাতু (দ্র) তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দরকার হয় এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাত (দ্র) তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিজলিবাতিতে ফিলামেন্ট তৈরি করার কাজে ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

টাংস্টেন ধাতু উলফ্রাম (wolfram) নামক আকরিক পিণ্ড থেকে নিষ্কাশিত হয়। এই মৌলিক ধাতুটির রাসায়নিক প্রতীক W (উলফ্রাম থেকে)। ধাতুটির অত্যধিক তাপসহ গলনাঙ্ক প্রায় ৩৩৭০° সে.। কোনো কোনো শ্রেণীর ইস্পাত, বিশেষত হাইস্পিড স্টিল উৎপাদনে ধাতুটির ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন অনুপাতে টাংস্টেন ও কার্বনের (দ্র) মিলনে উৎপন্ন যৌগিকগুলো টাংস্টেন কার্বাইড নামে পরিচিত। এর সঙ্গে আবার সামান্য কোবাল্ট ধাতুর সংযোগ ঘটালে যে উৎকৃষ্ট ধাতুসঙ্কর উৎপন্ন হয় তার বিশেষ নাম কার্ব্যালয়। এই শ্রেণীর ধাতুসঙ্কর হীরকের (দ্র) মতো কঠিন হয় এবং ধাতু কাটার করাত তৈরি করতে যে হাইস্পিড টাংস্টেন স্টিল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার চেয়েও এই কার্ব্যালয় অধিকতর উপযোগী এবং অত্যুচ্চ তাপেও বেশ কর্মক্ষম থাকে।

আ. হ. খ.

**টাপুর টুপুর** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

**টারজান** (Tarzan)

মার্কিন ঔপন্যাসিক এড্গার্ রাইস্ বারোজ্ (Edger Rice Burroughs : ১৮৭৫—১৯৫০) রচিত উপন্যাসমালার নায়ক চরিত্র।

টারজান গভীর অরণ্যে পশুপক্ষী, সরীসৃপ (দ্র) ইত্যাদির পরিমণ্ডলে বড়-হয়ে-ওঠা এক মানবশিশু। বনের

যত ধরনের প্রাণী আছে সকলেরই সে বন্ধু এবং অন্যদের যেমন সে বিপদ থেকে রক্ষা করে, তেমনি তার বিপদেও সমস্ত জীবজন্তু ছুটে এসে তাকে বাঁচায়। টারজান এবং অরণ্যবাসী প্রাণিকুলের প্রকৃত শত্রু আমরা—সভ্য জগতের বাসিন্দা শিক্ষিত মানুষ।

টারজান বস্তুতপক্ষে শান্তিময় আদিম ও সরল জীবনের প্রতীক, যে জীবন তথাকথিত 'সভ্যতা'য় মানুষ নষ্ট করেছে।

টারজানকে নিয়ে মোট ২৪টি উপন্যাস লিখেছিলেন বারোজ্। রোমাঞ্চকর কাহিনী হিসাবে সেসব সুখপাঠ্য তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও অধিক জনপ্রিয় এসব গল্পের চলচ্চিত্র রূপায়ণ। জনি ওয়েস্‌মুলার (দ্র) নামে আমেরিকার এক বিখ্যাত সাঁতারু তো টারজান্ চরিত্রে অভিনয় করে পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

হা. মা.



www.pathagar.com

## টার্বাইন (turbine)

জলচক্র ও বাতচক্র ব্যবহার করে যন্ত্রশক্তি উৎপাদনের কাজ মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে করে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জলপ্রবাহের দ্বারা চালিত টার্বাইন উদ্ভাবিত হয়। জলচক্র ও বাতচক্র ব্যবহারের কৌশল এখানে প্রয়োগ করা হয়। এই টার্বাইনের চক্রের প্যাডেলগুলো বালতির আকৃতির করা হত। উপর থেকে পড়া পানির দ্বারা এই বালতি একটি করে পূর্ণ হয়ে এদের ওজনে চাকাকে ঘোরাত। কোনো বালতি যখন নিচে নেমে আসত তখন এর পানি উপচে পড়ত এর আকৃতির জন্য।

বিদ্যুৎ (দ্র) আবিষ্কৃত হওয়ার পর জলচালিত এই টার্বাইন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় (টার্বাইনের ঘূর্ণন-শক্তি এখানে জেনারেটরকে ঘোরায় এবং যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফ্যারাডের (দ্র) সূত্র এখানে

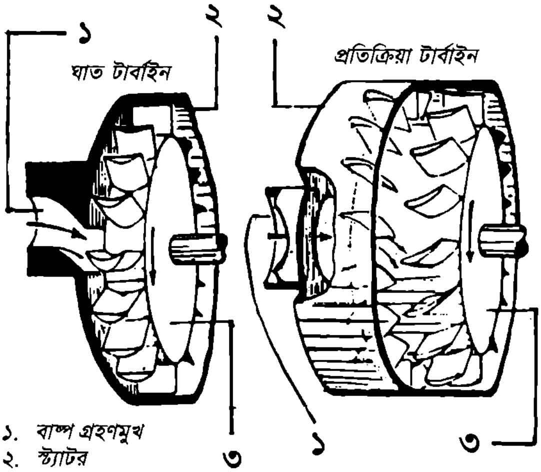


১. বাষ্প গ্রহণমুখ
২. স্ট্যাটর
৩. রোটর

কাজ করে। একে বলে টার্বোজেনারেটর (turbo-generator)।

তাপশক্তির ব্যবহারে উচ্চ চাপের জলীয় বাষ্প তৈরি করে এর দ্বারা টার্বাইন চালনা করা সম্ভব। উচ্চ চাপের গ্যাস দ্বারা চালিত টার্বাইনকে গ্যাসটার্বাইন বলা হয়। টার্বোজেট ইঞ্জিনে টার্বাইন ব্যবহার করে কম্প্রেসারকে শক্তিশালী করা হয়। এরোপ্লেনে বায়ুস্ক্রুর সঙ্গে টার্বাইন যুক্ত করে টার্বো-ইঞ্জিন চালনা করা হয়।

আ. আ.

**টিউব লাইট** বিজলি বাতি দ্র

**টিউবারকিউলোসিস্** যক্ষ্মা দ্র

## টিউমার (tumour)

দেহস্থ কোষকলার (দ্র) অস্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধিকে টিউমার হলা হয়। সাধারণত এপিথেলীয় ও সংযোজক কলা থেকে টিউমারের উদ্ভব। টিউমার-কোষের চরিত্র, অবয়ব ও ক্রিয়া দেহের স্বাভাবিক কোষ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। টিউমারের উপস্থিতি তাই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

টিউমার সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। বিনাইন (benign) বা নির্দোষ টিউমার এবং ম্যালিগন্যান্ট (malig-nant) বা ক্ষতিকর টিউমার। এপিথেলীয় কোষ থেকে উদ্ভূত ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে বলা হয় ক্যান্সার (দ্র) বা কার্সিনোমা (carcinoma), আর সংযোজক কলার ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের নাম সার্কোমা (sarcoma)। এই দুই ধরনের টিউমারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। এদের বৃদ্ধি খুব দ্রুত।

ক্যান্সার সর্বাধিক সংঘটিত টিউমার। তুলনায় সার্কোমার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত কম। অস্থি, তন্তুকলা এবং কখনো স্নায়ুকোষে সার্কোমা দেখা যায়, যেমন অস্টিয়োসার্কোমা, ফাইব্রোসার্কোমা, নিউরোসার্কোমা ইত্যাদি। সার্কোমার বৃদ্ধি যেমন দ্রুত তেমনি দ্রুত রক্তপথে দেহের অন্যত্র এর বিস্তার।

বিনাইন টিউমার এপিথেলীয় ও সংযোজক উভয় কোষকলা থেকেই জন্ম নিতে পারে। এদের বৃদ্ধি খুব ধীরগতির এবং বিস্তারও স্থানিক। রক্ত (দ্র) বা লসিকাবাহিত হয়ে এদের দূরবিস্তার (মেটাস্টেসিস) ঘটে না। তাই এরা জীবনের প্রতি ঝুঁকিও সৃষ্টি করে না। সচরাচর দৃষ্ট বিনাইন টিউমারের মধ্যে রয়েছে এপিথেলীয় কোষজাত প্যাপিলোমা, এডেনোমা এবং সংযোজক কলা থেকে উদ্ভূত ফাইব্রোমা, অস্টিয়োমা, লাইপোমা ইত্যাদি। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বিনাইন টিউমারের অপসারণই সফল চিকিৎসাব্যবস্থা।

রু. হা.

## টিকটিকি

টিকটিকি অতি পরিচিত ছোট আকারের সরীসৃপ (দ্র)। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের এ প্রাণীটি রাতে বেশি সক্রিয়। এদের



www.pathagar.com

আঙুলের নিচের দিকে স্পঞ্জের মতো বিশেষ ধরনের প্যাড থাকে। ফলে আনুভূমিক, উল্লম্ব যে কোনো তলে, এমনকি ছাদের নিচের দিকেও সমান গতিতে এটি চলতে পারে।

টিকটিকি সাধারণত ১০–১৮ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এর চ্যাপ্টা দেহটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকাযুক্ত নরম চামড়ায় মোড়ানো। মাথা ত্রিকোণাকৃতির। চোয়ালে ক্ষুদ্রাকৃতির সূচালো দাঁত থাকে। পা চারটি, প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে নখর। মাথা ও দেহের চেয়ে লেজ লম্বা। এটি সহজেই খসে পড়তে পারে। পরবর্তী কালে মাংসল লেজ গজায়, তাতে হাড় থাকে না।

এরা ঘরবাড়ি, গাছ-গাছড়ায় বাস করে। পোকা-মাকড় ধরে খায়। স্ত্রী-টিকটিকি যে কোনো স্থানে বছরে এক বার দুটো সাদা ডিম পাড়ে। ডিমের যত্ন নিতে হয় না, এমনিতেই বাচ্চা ফোটে।

এ দেশে চার প্রজাতির টিকটিকির বাস। আকারে গোদা টিকটিকি বৃহত্তম ও ছোট টিকটিকি ক্ষুদ্রতম। খসখসে টিকটিকির পিট বড় ও উঁচু গুটিকায় পূর্ণ, পিঠে কালো ফোঁটাও থাকতে পারে। মসৃণ টিকটিকির গুটিকা ক্ষুদ্রাকার। এদের পুরুষগুলোই ঘরময় টিক্‌টিক্ শব্দে ডেকে বেড়ায়। স্ত্রী-টিকটিকি ডাকতে পারে না।

আ. ন. ম. আ. র.

**টিকা** (vaccine)

দেহে কোনো রোগের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য টিকা দেওয়া হয়। টিকা দেহে প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন 'এন্টিবডি' তৈরি করে, যার ফলে যে কোনো রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদান দেহের মধ্যে তৈরি হয়।

টিকা তৈরি করা হয় বিভিন্নভাবে। যেমন—যক্ষ্মা (দ্র) রোগের জন্য 'বিসিজি' টিকা তৈরি হয় সজীব জীবাণু তনুকরণ (attenuation) করার মাধ্যমে। মৃত জীবাণু থেকে তৈরি হয় কলেরা (দ্র) টিকা, টাইফয়েড (দ্র) ও প্যারাটাইফয়েড রোগ প্রতিরোধককারী 'টি এ বি' টিকা ইত্যাদি। তনুকৃত জীবন্ত ভাইরাস (দ্র) থেকে গুটি বসন্তের টিকা তৈরি হয়। জলাতঙ্ক (দ্র) রোগের টিকা তৈরি হয় তনুকৃত ভাইরাস থেকে। অধিবিষ (টক্সিন) নিঃসরণকারী অণুজীব থেকে সংগৃহীত অধিবিষ প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমেও টিকা তৈরি হয়। এ জাতীয় টিকাকে বলা হয় টক্সয়েড (toxoid)। ডিফথেরিয়া (দ্র) বিরোধী 'ডিফথেরিয়া টক্সয়েড' এবং ধনুষ্টঙ্কার (দ্র) বিরোধী 'টিটেনাস টক্সয়েড' এ জাতীয় টিকার উদাহরণ।

অধিকাংশ টিকাই গায়ের চামড়ার মধ্য দিয়ে শরীরে ঢোকানো হয়। ব্যতিক্রম কেবল পোলিও (দ্র) রোগের টিকা। এ টিকা মুখে খেতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় টিকা দেওয়ার পর শরীরের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা অধিকতর জোরালো করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের শেষে কোনো কোনো টিকা আবার নিতে হয়। এ অবস্থাকে বুস্টার (booster) বলা হয়।

সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির আওতায় এ দেশের শিশুদের যেসব টিকা দেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে—যক্ষ্মা প্রতিরোধে 'বি সি জি' টিকা, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টংকারের জন্য ডি পি টি টিকা, পোলিও রোগবিরোধী 'পোলিও' টিকা এবং হাম (দ্র) রোগ প্রতিরোধক 'মিজেল্‌স্' টিকা।

এ ছাড়াও যে সকল রোগের বিরুদ্ধে টিকা কার্যকর, সেগুলো হল—গুটিবসন্ত, টাইফয়েড, জলাতঙ্ক, কলেরা, হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসজনিত জণ্ডিস (দ্র) এবং মাম্প্‌স্ (দ্র)। টিকা দেওয়ার মাধ্যমে গুটিবসন্তের মতো ভয়াবহ রোগটিকে বাংলাদেশ (দ্র) থেকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

সি. না. হ.

**টিটেনাস** ধনুষ্টঙ্কার দ্র

**টিটো, ইওসিপ্ ব্রোজ্** [১৮৯২—১৯৮০]

সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনেতা। মার্শাল টিটো নামেই সমধিক পরিচিত। প্রকৃত নাম ইওসিপ্ ব্রোজ্ (Josip Brož)। টিটো তাঁর ছদ্মনাম। জন্ম ১৮৯২ সালের ২৫শে মে। ১৯৪৩ সালে তিনি ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশের রাষ্ট্রীয় নেতায় পরিণত হন।

১৯২৭ থেকে ১৯২৮ সাল সময়কালের মধ্যে টিটো ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং



www.pathagar.com

*জোটনিরপেক্ষ নেতা মার্শাল টিটো ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৩ সালে মার্শাল টিটো বাংলাদেশ সফর করেন*

যোগ দেন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৩৪ সালে তিনি পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের (১৯৩৬–৩৮) জন্য সৈন্য সংগ্রহ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় নাৎসি (দ্র) জার্মানির হামলা থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে রক্ষায়, পার্টিজান বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনায় টিটো বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটির প্রধান হিসাবে নাৎসিবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং ১৯৪৫ সালে নতুন ফেডারেশন সরকারের প্রধান হন।

যুগোশ্লাভিয়ার উপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করায় স্তালিনের (দ্র) সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। ফলে ১৯৪৮ সালে যুগোশ্লাভিয়াকে সোভিয়েত ব্লক থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর পর থেকে তিনি অনুসরণ করতে থাকেন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি।

টিটো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের স্থপতিদের একজন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে মার্শাল উপাধিতে ভূষিত এবং দেশের প্রেসিডেন্ট করা হয়। তিনি ১৯৭৪ সালে নির্বাচিত হন দেশের আজীবন প্রেসিডেন্ট। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮০ সালের ৪ঠা মে।

আ. হ.

**টিপু সুলতান** [১৭৫০—১৭৯৯]

টিপু সুলতান ভারতীয় উপমহাদেশের এক অসমসাহসী যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক শাসক। তাঁর জন্ম মহীশূরে, ১৭৫০ সালে। মহীশূরের সুলতান হায়দার আলী (দ্র) ছিলেন টিপুর পিতা।

১৭৮২ সালে হায়দার আলীর মৃত্যুর পর মাত্র ৩২ বছর বয়সে টিপু সুলতান মহীশূরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার নীতি অবলম্বন করে যে কোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্রত গ্রহণ করেন। ইংরেজেরাও এই দৃঢ়চেতা যুবক সুলতানকে পরাভূত করে মহীশূর দখল করার জন্য একাধিক যুদ্ধে টিপুর মুখোমুখি হয়, এমনকি নানা রকম কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ও তারা গ্রহণ করে।

১৭৮২ সালে এক যুদ্ধে টিপু ইংরেজদের পরাজিত

করেন ; কিন্তু ১৭৮৩ সালে কর্নেল ফুলার্টনের আক্রমণের মুখে তিনি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন (১৭৮৪)। এই সন্ধি বেশি দিন টেকে নি। আবারও তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং এই যুদ্ধ চার বছর ধরে চলে। টিপু অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিসের (দ্র) নেতৃত্বে



www.pathagar.com

পরিচালিত বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন (১৭৯১)।

কিন্তু পরের বছরই মারাঠা ও নিজামের (দ্র) সম্মিলিত বাহিনীর সহযোগিতায় ইংরেজ বাহিনী মহীশূর আক্রমণ করে। এই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে বাধ্য হয়ে টিপু সন্ধির প্রস্তাব করেন, এবং রাজ্যের বিশাল অংশ ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামকে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এই পরাজয়ের পরও টিপু হতোদ্যম হন নি। তিনি প্রতিরক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নসহ অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর ১৭৯৯ সালে পুনরায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে টিপুর বাহিনী মুখোমুখি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিপু সুলতান পরাজিত ও নিহত হন। তিনি 'শেরে মহীশূর' বা 'মহীশূরের বাঘ' নামে খ্যাত ছিলেন।

মু. মা.

**টিয়াপাখি** (parakeet)

টিয়াপাখির সঙ্গে এদেশের সকলেই পরিচিত। এরা তোতা পরিবারের ছোট ও মাঝারি আকারের সদস্য। লেজ লম্বা ও চোখা। তবে কোনো কোনো প্রজাতির লেজ ছোট ও চৌকোণা। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সব দেশেই বাস করে। বিশ্বে প্রায় ১১৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশে চারটি। চট্টগ্রাম-সিলেটের পাহাড়-টিলা, সুন্দরবনসহ সারা দেশে টিয়া রয়েছে।

প্রজাতিভেদে টিয়ার আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। 'ভারতীয় ধূসর টিয়া' বৃহত্তম প্রজাতি। 'ক্ষুদ্র ঝুলন্ত টিয়া' গাছের ডালে পা আটকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুমায়। টিয়াপাখির নিচের ঠোঁট ছোট। ওপরের ঠোঁট বঁড়শির মতো নিচের দিকে বাঁকানো, অত্যন্ত ধারালো ও শক্ত—মানুষ ও পশুর চামড়াও ফুটো করে ফেলতে পারে।

টিয়াপাখি সুন্দর। প্রধানত সবুজ রঙের। তবে সবুজের সঙ্গে লাল, নীল, হলুদ, সাদার ছোঁয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) টিয়াগুলো সুন্দরতম।

এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় পোষা পাখি। বেশ বুদ্ধিমান। ঠোঁট ও পায়ের সাহায্যে নানা ধরনের খেলা দেখায়। মানুষের কথাও নকল করে। তবে ময়নার মতো স্পষ্ট হয় না।

এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওড়ে। শস্যদানা, ফলাদি খায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে। টিয়া গাছের খোড়লে বাস করে। এরা দুঃসাহসী। অন্য পাখিদের হটিয়ে বাসা দখল করতেও এরা ওস্তাদ। মৌসুমে স্ত্রী-পাখি ৪–৮টি সাদা ডিম পাড়ে। প্রজাতিভেদে ১৮–২০ দিনে বাচ্চা ফোটে। টিয়া ১০–২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

**টিয়ার গ্যাস** (tear gas)

টিয়ার গ্যাস বা কাঁদানে গ্যাসের সঙ্গে বাংলাদেশের (দ্র) শহরাঞ্চলের লোকজন কমবেশি সকলেই পরিচিত। সরকারি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে মারমুখী জনতা ছত্রভঙ্গ করার লক্ষ্যে এই গ্যাস নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। বিশেষ ধরনের বন্দুকের মধ্যে এই গ্যাসের 'শেল' ভরে তা ছুঁড়তে হয়। নিক্ষিপ্ত শেল ফেটে গেলে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, সেই ধোঁয়া বাতাসে ভেসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং তখন বাতাসে মিশে যাওয়া এই গ্যাসে লোকের নাক ও চোখমুখ জ্বালা-পোড়া করতে থাকে; এই গ্যাসের ঝাঁজে চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরতে থাকে, চোখ খোলা রাখা সম্ভব হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই গ্যাস জার্মানেরা আবিষ্কার করে। কাঁদানে গ্যাস নানান ধরনের হতে পারে এবং নানাভাবে তৈরি করা যেতে পারে। স্বল্পস্থায়ী, কম কষ্টকর কাঁদানে গ্যাস যেমন সম্ভব তেমনি বেশিক্ষণ স্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক কাঁদানে গ্যাসও তৈরি করা সম্ভব। এর চরিত্র নির্ভর করে কোন কোন উপাদানে তৈরি করা হচ্ছে তার ওপর।

এই গ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট লাঘব হয় চোখেমুখে ক্রমাগত পানি দিলে। পানির অভাবে মুখমণ্ডলের সামনে আগুন জ্বালিয়ে ধরে রেখেও এর প্রকোপ কমানো যেতে পারে।

হা. মা.

**টুর্গেনিভ, ইভান্** তুর্গিয়েনেফ্, ইভান্ সের্গিয়েইয়েভিচ্ দ্র

**টেকচাঁদ ঠাকুর** প্যারীচাঁদ মিত্র দ্র

**টেনিদা** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্র



www.pathagar.com

**টেনিস** (tennis) / **লন টেনিস** (lawn tennis)

খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর পূর্বে মিশর অথবা পারস্যে এই খেলার জন্ম হয়। পরবর্তী কালে ১৫০০ শতকে ফ্রান্সের পৃষ্ঠপোষকতায় খেলাটি সমৃদ্ধ হয় ও বিস্তারলাভ করে। আরো পরে ১৮৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের মেজর ওয়াল্টার উইঙ্‌ফিল্ড (Walter Clopton Wingfield) এটাকে আধুনিক এক খেলায় রূপদান করেন। ঘরের ভেতরে এবং বাইরে উভয় জায়গায় টেনিস খেলা যায়। বাইরের খেলার কোর্ট ঘাস, মাটি এসফল্ট বা কংক্রিটের এবং ঘরের ভেতরের কোর্টে কাঠের মেঝে হয়ে থাকে। এই চতুষ্কোণ জায়গাটি মধ্যরেখায় দুই ভাগে ভাগ করে দুই পোস্টে ৩ ১/২ ফুট উঁচু ও মাঝখানে ৩ ফুট উঁচু জাল টাঙানো হয়। টেনিসের একক কোর্ট লম্বায় ৭৮ ফুট, চওড়ায় ২৭ ফুট হয়ে থাকে। আর দ্বৈত বা ডবল কোর্ট ৭৮´ × ৩৬´ হয়ে থাকে। র‍্যাকেট ও বলের সাহায্যে খেলা হয়ে থাকে।

১৮৭৭ সালে উইম্বল্‌ডনে (Wimbledon) প্রথম টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলারা ১৮৮৪ সাল হতে টেনিসে অংশ নিচ্ছে। ডেভিস কাপ, ওয়াইটম্যান কাপ, মহিলাদের জন্য ফেডারেশন কাপ ইত্যাদি অনেক প্রতিযোগিতামূলক পেশাদারি প্রতিযোগিতা রয়েছে। প্রত্যেক মহাদেশেই নিজেদের মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে প্রচুর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ লন টেনিস ফেডারেশন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। পরবর্তী কালে টেনিসের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ায় এই খেলার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটছে। বাংলাদেশ নিজস্ব জাতীয় প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় দেশে ও বিদেশে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও জেলাশহরগুলিতে টেনিস

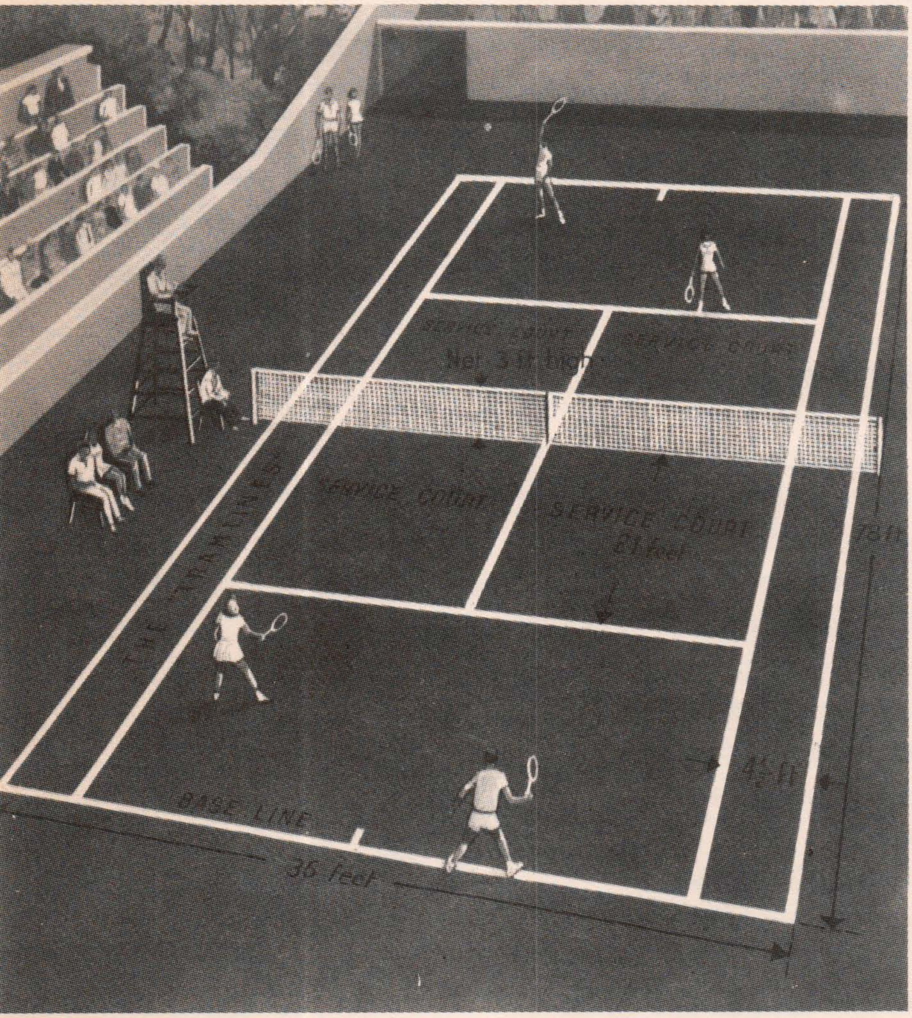


*টেনিস খেলার মাঠ ও তার মাপ :*
*বেস লাইন পাশে ৩৬ ফুট, লম্বা ৭৮ ফুট কোর্টের দু'পাশে ১/৪ ফুট চওড়া ট্রাম লাইন, মাঝখানে জালের দু'পাশে চারটি সার্ভিস কোর্ট রয়েছে, প্রতিটি জাল থেকে কোর্টের দৈর্ঘ্য ২১ ফুট। মাঝখানে জালের উচ্চতা ৩ ফুট। উপরের কোর্টটি দ্বৈত বা ডবল কোর্ট। সিঙ্গল কোর্ট পাশে ২৭ ফুট, তবে লম্বা ডবল কোর্টের মতো ৭৮ ফুটই হয়ে থাকে*



www.pathagar.com

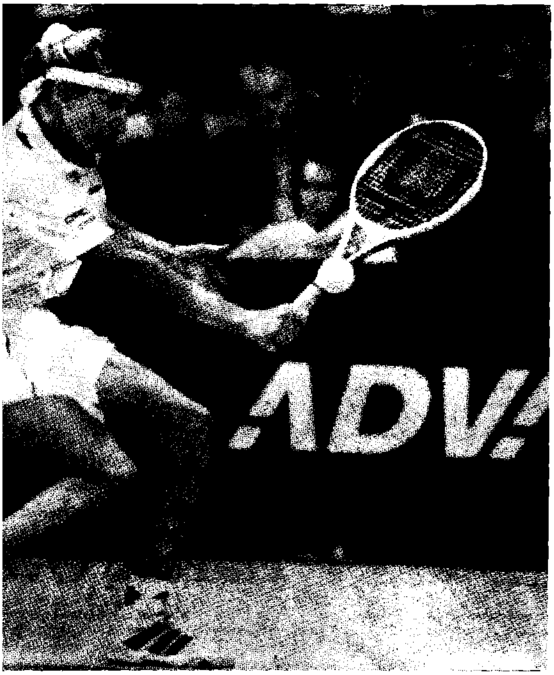


*বিশ্বের অন্যতম এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় স্টেফি গ্রাফ্*

খেলার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তবে এই খেলার সরঞ্জামের মূল্য বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে রয়ে গেছে এই খেলা। বর্তমানে এশিয়া (দ্র) ও সার্ক (দ্র) দেশগুলির মধ্যে এ দেশের ক্রীড়ার মান তেমন উঁচু নয়। বর্তমানে মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চলছে।

কা. আ. আ.

**টেনিসন, লর্ড্ আলফ্রেড** [১৮০৯—১৮৯২]

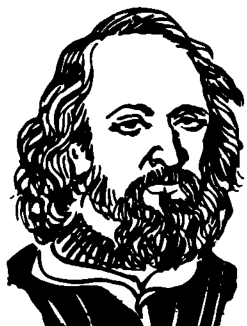

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ইংরেজ কবি। টেনিসন (Lord Alfred Tennyson) ইংল্যাণ্ডে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মানুরাগী পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি ভর্তি হন ট্রিনিটি কলেজে এবং মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এর পরপরই টেনিসন কবিতা (দ্র) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৫০ সাল পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে কবিতা লিখে যান এবং ইংল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয় কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৮৪ সালে তাঁকে 'লর্ড্' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

টেনিসনের বয়স যখন আশি বছর, তখন তাঁর কবিতার সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৮৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

**টেপ রেকর্ডার** ক্যাসেট ও টেপ রেকর্ডার দ্র

**টেবিল টেনিস** (table tennis)

ইংল্যাণ্ডে ১৮৮০ সালে লন টেনিসের (দ্র) অনুরূপ একটি ঘরোয়া খেলা আবিষ্কৃত হয়। এটা 'গোসিমা', 'পিং পং' (Ping Pong) ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল। ১৯২৬ সালে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশনই অন্যান্য নামকরণ বাদ দিয়ে এই খেলার নাম টেবিল টেনিস রাখে। পুরুষদের জন্য সোয়াথলি কাপ ও মহিলাদের জন্য মারসেল করবিলন কাপের প্রচলন করে। ১২০টির বেশি দেশ এখন টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সদস্য।

ইউরোপে (দ্র) টেবিল টেনিস একটি জনপ্রিয় খেলা এবং প্রাচ্যেও এ খেলা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পূর্বে ইউরোপীয় দেশের হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ ১৯৫০ অবধি এই খেলায় শীর্ষে ছিল। পরবর্তী কালে চীন (দ্র), জাপান (দ্র), কোরিয়া, ভিয়েৎনাম আধিপত্য বিস্তার করে ইউরোপীয় দেশগুলির কাছ থেকে প্রাধান্য কেড়ে নেয়। এখন এই খেলায় প্রাধান্যের লড়াই যাচ্ছে ইউরোপ বনাম এশিয়া (দ্র) ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ভিতরে। এশিয়ান গেম্সে (দ্র) ১৯৫৮ সাল থেকে এই খেলা চলে আসছে।

এই খেলাটি ৩০´´ উঁচু ৯´ X ৫´ দৈর্ঘ্য-প্রস্থের টেবিলে মাঝখানে ছয় ইঞ্চি উঁচু নেট টাঙিয়ে সেলুলয়েডের $৪\frac{১}{২}$ থেকে $৪\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি ব্যাসের এক আউন্সের $\frac{১}{১০}$ ওজনের বল দিয়ে খেলা হয়। খেলোয়াড়েরা প্লাইউডের ছোট র‍্যাকেট দিয়ে



www.pathagar.com

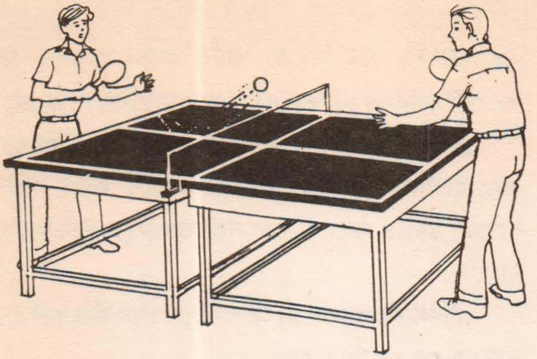

খেলে থাকে। বাংলাদেশে এই খেলার বহুল প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশ সাফ গেম্‌স্‌ (দ্র), এশিয়ান গেম্‌স্‌ (দ্র) এবং আরো অনেক আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আসছে। বিদেশী কোচদের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে অলিম্পিক সলিডারিটি কোর্সের দৌলতে বহু টেবিল টেনিস প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ দানের ফলে দেশে টেবিল টেনিসের মান দ্রুত উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

কা. আ. আ.

**টেম্পারা** ইতালীয় চিত্রকলা দ্র

## টেরাকোটা (terracota)

শব্দটি লাতিন : 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহার্য সব রকম জিনিসই টেরাকোটা হিসাবে পরিচিত। উৎকৃষ্ট আঠালো মাটির সঙ্গে বালি, খড়কুটো, তুষ, ভুষি প্রভৃতি মিশিয়ে প্রয়োজনীয় কাদামাটি প্রস্তুত করা হয়। তা থেকে তৈরি নানা

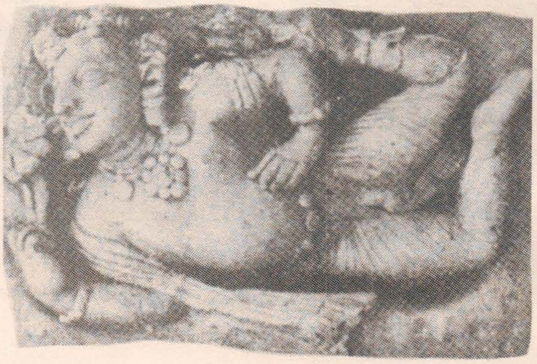

*বগুড়া ও রাজশাহীতে পাওয়া দু'টি ফলকচিত্র*

*দিনাজপুরে কান্তজীর মন্দির-গাত্রে ফলকচিত্রের সারি*

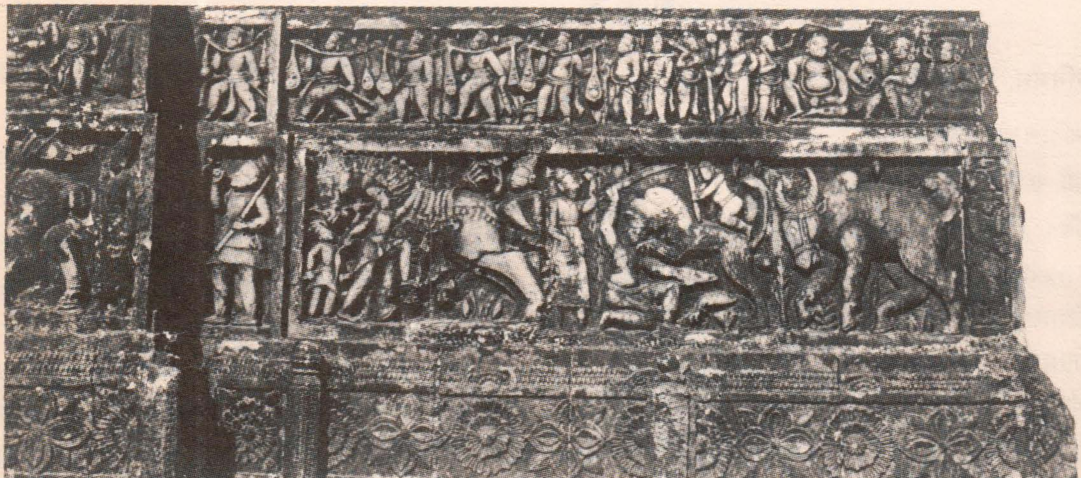



www.pathagar.com

রকম মূর্তি, প্লেট বা দৃশ্যাবলি রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্য তৈরি হয়। পোড়ানোর পর মূর্তি বা দৃশ্যাবলি নানা রঙে চিত্রিত করার নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার চকচকে পালিশ করা রীতিও বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। মহেন-জোদারোতে (দ্র) পালিশ করা মৃৎপাত্রের কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। মুসলিম যুগে পালিশ করা টালির ব্যবহার ছিল।

মানবসভ্যতার শৈশব থেকে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা যায়। চীন (দ্র), ভারত (দ্র), মিশর, ক্রিট, সুমেরীয় (দ্র) ব্যাবিলনীয় (দ্র), গ্রিক (দ্র), ইতালি, দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) মায়া সভ্যতায় (দ্র) এই শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে গ্রিসে উৎকৃষ্ট টেরাকোটার নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রিস থেকে ইতালিতে এর প্রভাব পড়ে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর টেরাকোটা শিল্পের অবনতি ঘটে। এর পর মধ্যযুগে (দ্র) ইতালিতে টেরাকোটা পুনরুজ্জীবন লাভ করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স নগরীতে পালিশ করা টেরাকোটা শিল্পের প্রচলন হয়। সেখান থেকে স্পেন ও পরে সমগ্র ইউরোপে (দ্র) এই শিল্প বিস্তার লাভ করে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক শিল্পী টেরাকোটাকে শিল্পমাধ্যম রূপে ব্যবহার করেন।

প্রাচীন ভারতের সিন্ধু উপত্যকা ও বেলুচিস্তান থেকে

*রাজশাহীর বাঘা মসজিদের মেহরাব টেরাকোটা শিল্পকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন*



www.pathagar.com

টেরাকোটা শিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। মহেনজোদারোতে উন্নত কলাকৌশলের কিছু মূর্তি এবং দেবদেবী ও নারীমূর্তি থেকে ষাঁড়ের মূর্তি, বাঁশি, গাড়ি প্রভৃতি অনেক খেলনাও পাওয়া গেছে। তক্ষশীলা, মথুরা, ভিটা, বক্সার, পাটনা (দ্র) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত টেরাকোটা মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার (দ্র) পরবর্তী। দাক্ষিণাত্যেও (দ্র) প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে।

মৌর্য (দ্র) যুগ, কুষাণ (দ্র) যুগ, গুপ্ত (দ্র) যুগে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরের গাত্র ছাড়া গৃহসজ্জার কাজে ও সামাজিক নানা উৎসবের সময় টেরাকোটার মূর্তি ও অলঙ্করণের ব্যবহার ছিল। খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে কাশ্মীর, বাংলা ও আসাম ছাড়া এই উপমহাদেশের অন্যান্য জায়গায় টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন কম। রাজশাহী জেলায় পাহাড়পুরে (দ্র) খননকার্যের ফলে বিখ্যাত সোমপুর বিহার (দ্র) ও আশেপাশে সুবৃহৎ বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ৮ম শতাব্দীর এই নিদর্শন উৎকৃষ্ট টেরাকোটার টালি বা ফলক ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু সোমপুর বিহারেই দুই হাজার টেরাকোটার চিত্রফলক পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে নির্মিত কিছু ফলকও পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে। কুমিল্লার ময়নামতীতে (দ্র) আবিষ্কৃত ৮ম-৯ম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীর-গাত্রে টেরাকোটার মনোরম নকশা পাওয়া গেছে। শালবন বিহারের (দ্র) টেরাকোটার ফলকে নারীপুরুষ, জীবজন্তু, লতাপাতা, ফুল, আধামানুষ ও আধাপশু, দেবদেবীর মূর্তির বিশাল ভাণ্ডার পাওয়া যায়। এ ছাড়া মাটির তৈরি অলঙ্কার, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রও আছে। ১৭৫২ সালে মহারাজা রামনাথ রায় নির্মিত কান্তজীর মন্দির (দ্র) টেরাকোটা শিল্পের শেষ উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই শিল্পের অবনতির লক্ষণ দেখা যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার এই টেরাকোটা শিল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে টেরাকোটা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (দ্র) এবং নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্পী ও শিল্পীগোষ্ঠী মৃৎশিল্পের উজ্জীবনের কাজে হাত দিয়েছেন। বিদেশী ক্রেতার কাছে এর কদর এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাজসজ্জার কাজে পোড়ামাটির পাত্র ও ফলকের ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে।

টেরাকোটার মনোরম নকশা হাতে বা ছাঁচে ফেলে তৈরি হয়। পরে তা চুল্লিতে দিয়ে প্রায় ২০০° থেকে ৩০০° ফারেন্‌হাইট উত্তাপে পোড়ানো হয়। এই উত্তাপ আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়। সঠিকভাবে পোড়ানোর ওপর টেরাকোটার উৎকর্ষ নির্ভর করে।

বি. ব.

## টেরিডোফাইট্ (pteridophyte)

গ্রিক শব্দ 'টেরিস্' (pteris) অর্থ ফার্ন (দ্র) এবং 'ফাইটন' (phyton) অর্থ উদ্ভিদ। এক ধরনের উদ্ভিদ জলজ পরিবেশ ছেড়ে কালক্রমে স্থলভাগে স্থানান্তরিত হতে থাকে। স্থানান্তরকালে এদের কিছু সদস্য জলজ পরিবেশ থেকে স্থলজ পরিবেশের অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে রয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের বহিরঙ্গের পরিবর্তনের ফলে মূল, কাণ্ড ও পাতার উৎপত্তি হয়। ফার্ন জাতীয় এ সকল উদ্ভিদ টেরিডোফাইট্ নামে পরিচিত। টেরিস্, আইসোইটিস্, মার্সেলিয়া, লাইকোপোডিয়াম্ ও ইকুইসিটাম্ প্রভৃতি এদের উদাহরণ।

টেরিডোফাইট্-এর বেশির ভাগ প্রজাতিতেই পরিবহন কলাগুচ্ছ থাকে। এদের জননাঙ্গ বহুকোষী এবং বন্ধ্যাকোষ

*টেরিডোফাইট্ বা ফার্ন জাতীয় গাছ*



www.pathagar.com

দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরা মূলত স্থলজ উদ্ভিদ হলেও বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে এদের পানির প্রয়োজন হয়। ডিম্বকের সঙ্গে নিষেকক্রিয়ার জন্য এদের পরিণত শুক্রকোষকে পানিতে সাঁতার কেটেই দেহের একাংশ থেকে অন্যাংশে যেতে হয়।

টেরিডোফাইট্ উদ্ভিদের জীবনচক্র গ্যামেটোফাইট্ (লিঙ্গধর উদ্ভিদ) ও স্পোরোফাইট্ (রেণুধর উদ্ভিদ)—এ দুই জনুতে বিভক্ত। দুই জনুর মধ্যে স্পোরোফাইটিক জনু বেশি প্রভাবশালী। ভ্রূণ গঠনকালীন প্রাথমিক অবস্থা ছাড়া স্পোরোফাইট্ হচ্ছে গ্যামেটোফাইট্ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরিণত অবস্থায় এরা উভয়েই স্বাবলম্বী। অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে টেরিডোফাইট্ই হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও এরা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে কোনো কোনো উদ্ভিদ শাক-সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শোভা বর্ধনের জন্য এদের অনেক প্রজাতি টবে লাগানো হয়। টেরিডোফাইট্ ছায়াযুক্ত, স্যাঁৎসেঁতে জায়গায়, পুরনো দেয়ালে এবং বড় গাছের কাণ্ডে জন্মে থাকে।

মু. আ.

## টেলিগ্রাফ (telegraph)

আধুনিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হবার মূলে অনেক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের অবদান রয়েছে। চার্লস মরিসন ১৭৫৩ সালে প্রথম এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করে দ্রুত এবং দূরে সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব। মরিসনের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ভিন্ন বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করতে হত। বৈদ্যুতিক তারের উপরে আস্তরক দেওয়ার কৌশল উদ্ভাবিত হবার ফলে বিদ্যুতের ক্ষরণ না ঘটিয়ে উচ্চ তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ সম্ভব হল। বিদ্যুতের শক্তিশালী উৎসের উদ্ভাবন ছিল আরেকটি সহায়ক অগ্রগতি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ কয়েক জন উদ্ভাবক মাত্র দু'টি তার ব্যবহার করে টেলিগ্রাম পাঠাবার ধারণা উদ্ভাবন করেন, যা ছিল টেলিগ্রামের ক্ষেত্রে আরেকটি অগ্রগতি। ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী উর্স্টিড্ (দ্র) তড়িৎ-চুম্বক আবিষ্কার করেন ১৮২০ সালে। উর্স্টিড্ দেখালেন যে

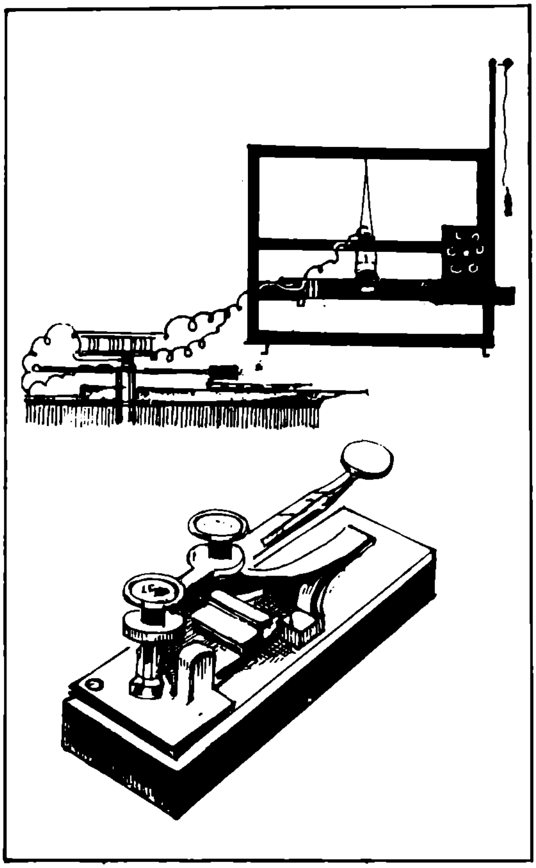

*টরেটক্কা সঙ্কেত ব্যবহার করে টেলিগ্রাফ যন্ত্র*

একটি তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং এর প্রভাবে একটি চুম্বক-শলাকা নড়ে উঠতে পারে। ফরাসি গণিতবেত্তা ও পদার্থবিজ্ঞানী অঁপ্যার্ (দ্র) ধারণা দিলেন যে চুম্বক-শলাকা ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা বাস্তবে রূপলাভ করে ১৮৩৭ সালে, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী হুইটস্টোন (Charles Wheatstone) ও কুকের (William F. Cooke) অবদানের ভিতর দিয়ে। একই বছরে স্যামুয়েল এফ. বি. মোর্স (Samuel Finley Breese Morse) আধুনিক টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, যেখানে যে কোনো তথ্যকে টরেটক্কা সঙ্কেত ব্যবহার করে সহজেই বহু দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। মোর্স অবশ্য ডক্টর চার্লস টি. জ্যাকসনের সঙ্গে একই জাহাজে ভ্রমণের সময় তাঁর সংলাপ থেকে ১৮৩২ সালে



www.pathagar.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A .- | F ..-. | K -.- | P .--. | U ..- |
| B -... | G --. | L .-.. | Q --.- | V ...- |
| C -.-. | H .... | M -- | R .-. | W .-- |
| D -.. | I .. | N -. | S ... | X -..- |
| E . | J .--- | O --- | T - | Y -.-- |
| | | | | Z --.. |

*টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা এফ. বি. মোর্স ও তার কোড*

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের ধারণাটি লাভ করেন বলে মনে করা হয়। মোর্সের মূলনীতিটি দীর্ঘদিন ধরে সব টেলিগ্রাফেই ব্যবহার করা হয়।

মূলনীতিটি হচ্ছে নিম্নরূপ : প্রেরণ স্টেশনে একটি চাবিতে চাপ দিলে গ্রাহক-প্রান্তে একটি তড়িৎ-চুম্বককে কার্যকর করে। স্প্রিংয়ের সাহায্যে কিছুটা দূরে ধরে রাখা একটি লোহার পাত এই তড়িৎ-চুম্বকের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রেরণ-প্রান্তের চাবিটি ছেড়ে দিলে স্প্রিংয়ের টানে লোহার পাত্রটি তড়িৎ-চুম্বক থেকে আবার সরে যায়। মোর্সের প্রথম টেলিগ্রামে একটি কলম লোহার পাতটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। পাতটি যখন তড়িৎ-চুম্বকটির দিকে যেত এবং ফিরে আসত তখন কলমটি একটি চলন্ত কাগজের ফিতার উপরে দাগ কাটত। প্রেরণ-প্রান্তে চাবিটি কতক্ষণ চেপে রাখা হল, তার উপরে এই দাগের দৈর্ঘ্য নির্ভর করত। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘতর রেখা মোর্সের টরেটক্কা সংকেত রূপে কাজ করত। পরবর্তী কালে সঙ্কেত-প্রেরক ও গ্রাহক এত দক্ষ হয়ে ওঠে যে টরেটক্কা সঙ্কেতের বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে প্রেরিত অক্ষর তারা শব্দ শুনেই বুঝে ফেলতে পারত। ১৮৬৬ সালে যে সফল টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে লর্ড কেলভিনের (William Thomson Kelvin) উদ্ভাবিত মিরর গ্যালভ্যানোমিটার ও সাইফোন রেকর্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেই সঙ্গে অ্যাংলো-আমেরিকান টেলিফোন কোম্পানি। ১৯১৫ সালে প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ ও ১৯৩০ সালে ফ্যাকসিমিল টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে মানুষের ত্রুটি দূর করতে সক্ষম হয়।

আ. আ.

**টেলিফোন** (telephone)

দূরে কারো সঙ্গে কথোপকথনের যন্ত্র হল টেলিফোন। এখন টেলিফোন এমন উন্নত হয়েছে যে পথ চলতে চলতে যেমন যে কাউকে টেলিফোন করা যায়, তেমনি মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার নানা মহাদেশে যে কারো সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। টেলিফোনে কথা বলার সময় মুখের কাছে থাকে বলার যন্ত্র, কানের কাছে শোনার যন্ত্র। বলার যন্ত্রে শব্দের কাঁপুনি একটি বিদ্যুৎবর্তনীতে বৈদ্যুতিক রোধের ওঠানামা ঘটিয়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহে নিজের রূপটি আরোপ করে। টেলিযোগাযোগে এই প্রবাহের প্যাটার্নটি অন্য টেলিফোনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে শোনার যন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহিত একটি বিদ্যুৎচুম্বকের (দ্র) কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঐ চুম্বকের স্থান অনুরূপভাবে বাড়ায়-কমায়। সেই অনুসারে সামনে রাখা একটি ধাতব পাত কাঁপতে থাকে ও মূল শব্দটি সৃষ্টি করে।

একেকটি এলাকায় বিভিন্ন টেলিফোন থেকে আসা সব



www.pathagar.com

তার সাধারণত কয়েক হাজার করে একটি গুচ্ছে এলাকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয় মাটির তলা দিয়ে। এক্সচেঞ্জগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সুইচিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেকগুলো টেলিফোনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। স্বয়ংক্রিয় ডায়ালিং ব্যবস্থায় ডায়াল ঘোরালে প্রত্যেক বার ঘোরাবার নম্বর অনুযায়ী একটি বিদ্যুৎসুইচ তত বার অন্-অফ হয় এবং ততগুলো বিদ্যুৎসঙ্কেত এক্সচেঞ্জে সুইচিং-এর নিজের অংশে যায়। চাবি টিপে ডায়াল করলেও একই রকম হয়। এক্সচেঞ্জে সুইচিং ব্যবস্থা দু' রকমের হতে পারে। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা এখনো চালু সেটি ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল বা বিদ্যুৎযান্ত্রিক। ডায়ালিং থেকে আসা সঙ্কেত অনুযায়ী একটি বিদ্যুৎচুম্বক কিছু আড়াআড়ি দণ্ড ও কিছু খাড়া দণ্ডকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঘুরিয়ে কাঙ্ক্ষিত টেলিফোনের সুইচিং অংশের সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করে। আজকাল উন্নততর ইলেক্ট্রনিক সুইচিং ব্যবস্থাও আমাদের দেশে চালু হচ্ছে। এতে কোনো যান্ত্রিক নড়াচড়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু কিছু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ অনেকটা কম্পিউটারের (দ্র) ভঙ্গিতে কাজ করে। এই ব্যবস্থা অনেক বেশি দ্রুত, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য। আজকাল যে বিশ্বের নানা স্থানের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ

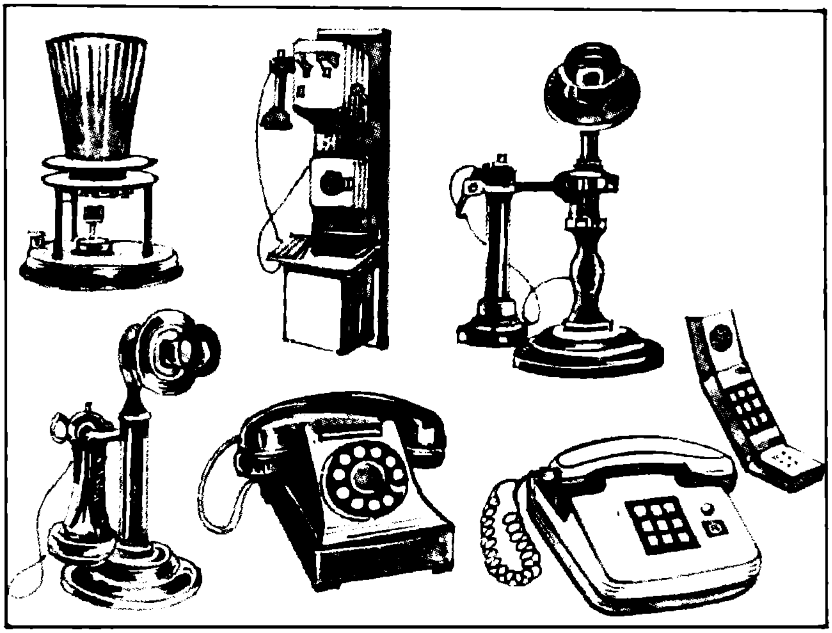

*বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারের টেলিফোন সেট। নিচে : উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা*

*গ্রাহাম বেল*

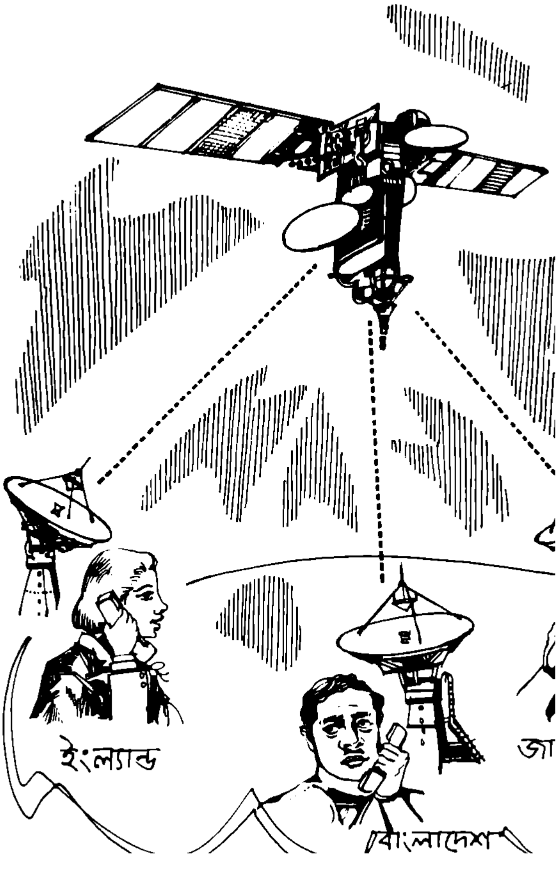


www.pathagar.com

সম্ভব হয়েছে তার মূলে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ-এ রেডিও-তরঙ্গের ব্যবহার এবং ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে রেডিওতরঙ্গ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে আদান-প্রদান করার সুযোগ।

টেলিফোন উদ্ভাবন করেন যুক্তরাষ্ট্রে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (দ্র) ১৮৭৫ সালে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত টেলিফোনব্যবস্থা নানাভাবে উন্নত হয়েছে। এর একটি সর্বাধুনিক উন্নয়ন হল সাধারণ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎসঙ্কেতের বদলে দু'টি মাত্র নির্দিষ্ট সঙ্কেতের বিচ্ছিন্ন পরম্পরায় প্রবাহের ওঠা-নামাকে সূচিত করা, যাকে বলা হয় ডিজিটাল (digital) ব্যবস্থা। এতে আরো নিখুঁতভাবে কণ্ঠস্বর বা অন্য বার্তা চলে যেতে পারে। এখন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের আকারে না গিয়ে কাচতন্তুর মধ্য দিয়ে আলোকের আকারেও সঙ্কেত প্রেরণ করা হচ্ছে। একে ফাইবার অপটিক্স (fibre optics) সিস্টেম বলা হয়। বহনযোগ্য বেতার টেলিফোন এখন সেলুলার (cellular) প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক উন্নত হয়েছে। এতে পুরো শহরকে কতকগুলো সেল বা কক্ষে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে রেডিও (দ্র) প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র বসানো হয়।

মু. ই.

**টেলিভিশন** (television)

টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র যা থেকে একই সঙ্গে ছবি দেখা যায় এবং শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশন কথাটি গ্রিক শব্দ

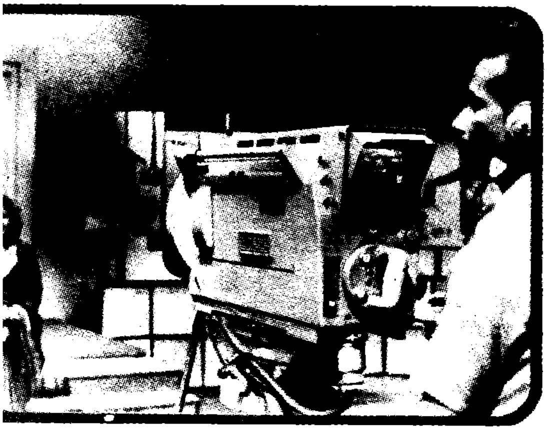

tele (যার অর্থ দূর) এবং ইংরেজি শব্দ vision (যার অর্থ দর্শন) মিলিয়ে তৈরি হয়েছে। টেলিভিশনকে বাংলায় 'দূরদর্শন' বলা যেতে পারে। টেলিভিশন বলতে আমরা বুঝি আমাদের ঘরের টেলিভিশন সেটটি যা আসলে একটি টেলিভিশনগ্রাহকযন্ত্র। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন্ লগি বেয়ার্ড (দ্র) ১৯২৩ সালে প্রথম টেলিভিশন-ছবি দূরে পাঠাতে সক্ষম হন। ১৯৪০ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেলিভিশন চালু হয়।

টেলিভিশন সম্প্রচারকেন্দ্র থেকে দু'টি প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে পৃথক পৃথকভাবে শব্দ ও ছবির সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়। টেলিভিশন সেটেও দু'টি গ্রাহকযন্ত্র থাকে। এরা শব্দ ও ছবির সঙ্কেত পৃথকভাবে গ্রহণ করে।

টেলিভিশনে আমরা চলমান ছবি দেখলেও প্রকৃতপক্ষে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় স্থিরচিত্র। স্থিরচিত্রগুলোকে এত দ্রুত (প্রতি সেকেণ্ডে ৩০টি) দেখানো হয় যে ছবিগুলো আমাদের চোখে চলমান মনে হয়।

প্রতিটি ছবি অনেকগুলো (বর্তমান সেটগুলোতে ৬২৫টি) রেখায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি রেখা লক্ষাধিক অতি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বিন্দুর সমষ্টি। উত্তম চিত্রের ক্ষেত্রে বিন্দুর সংখ্যা হয় প্রায় ২ লক্ষ। টেলিভিশন ক্যামেরায় আলোকসংবেদী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর প্রলেপ দেওয়া একটি সিগন্যাল প্লেট থাকে। এই প্রতিটি ক্ষুদ্র বিন্দু পূর্বের ২ লক্ষ ক্ষুদ্র বিন্দুর একেকটির আনুষঙ্গিক।

ইলেক্ট্রন (দ্র) বীম প্লেটকে একটি একটি রেখা ধরে অতিক্রম করে এবং ক্ষুদ্রবিন্দুর সংগ্রহ করা সিগন্যাল বা সঙ্কেতকে প্রেরণ করে। প্রেরণের পূর্বে এই সঙ্কেতকে বিবর্ধিত করা হয়।

আমাদের ঘরের টেলিভিশন সেটটি দিয়ে সঙ্কেত গৃহীত ও বিবর্ধিত হয় এবং টিউব বা পিক্চার টিউবে প্রদর্শিত হয়। ক্যাথোড-রে টিউবে (cathode-ray tube) অন্য একটি ইলেক্ট্রন বীম তৈরি হয়। এই বীম টেলিভিশনের পর্দাকে ৬২৫ বার অতিক্রম করে ৬২৫টি রেখা তৈরি করে। প্রত্যেক রেখার শেষ প্রান্ত অতিক্রম করে বীমটি পরবর্তী রেখার শুরুতে ফিরে আসে। এই ৬২৫টি রেখা $\frac{১}{৩০}$ সেকেণ্ডে তৈরি হয়। ৬২৫টি রেখার একটি সেটকে বলা হয় ফ্রেম (frame)। বীমটি যখন ছবির পর্দায় ভিতরের দিকটি অতিক্রম করে তখন এটি প্রেরিত সঙ্কেত অনুসারে দুর্বল ও সবল/প্রবল হয় (ক্যামেরায় আলোকসংবেদী ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে যেমন দুর্বল বা সবল হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঠিক সে



www.pathagar.com

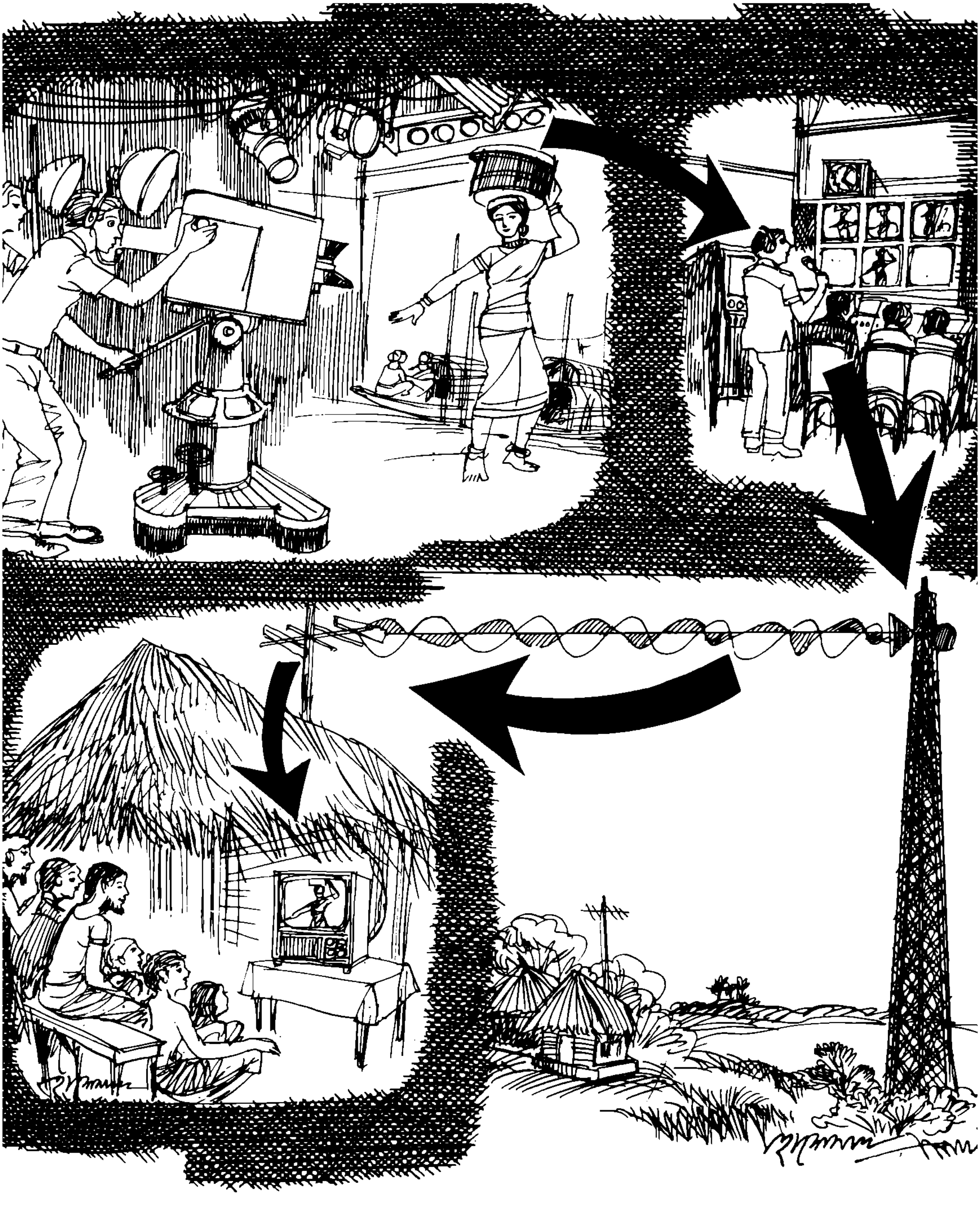

*বেতারের সাহায্যে টিভি যোগাযোগ। প্রেরণ-কেন্দ্রে ছবি আর কথা পরিণত হয় বিদ্যুৎ-তরঙ্গে। তারপর বেতার-তরঙ্গে। গ্রাহক টিভি সেট বেতার-তরঙ্গ ধরে তাকে প্রথমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে, তারপর আলো আর শব্দ-তরঙ্গে পরিণত করে*



www.pathagar.com

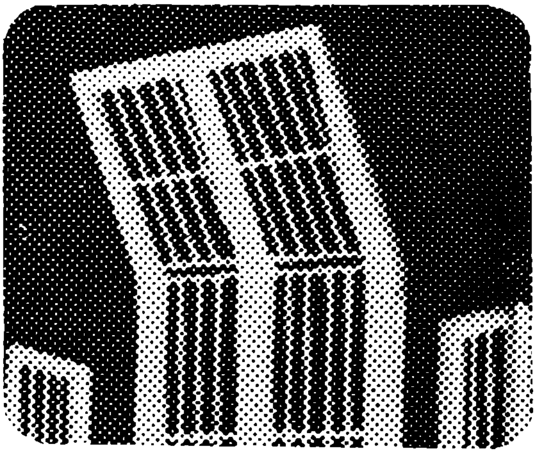

টেলিভিশনে প্রতিটি ছবি অসংখ্য রেখায় বিভক্ত। রেখাগুলো হল লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বিন্দুর সমষ্টি

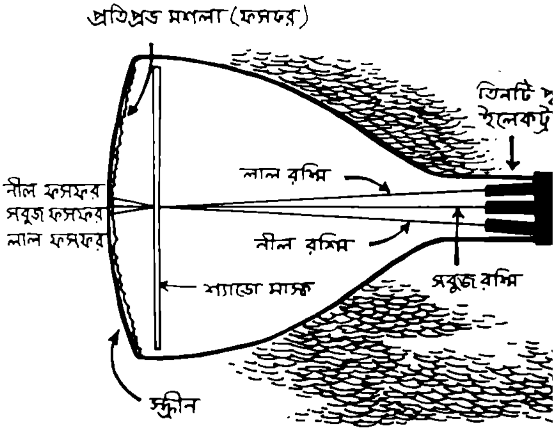


রঙিন টেলিভিশনের টিউবে আসলে রয়েছে তিন রঙের জন্য ৩টি ইলেক্ট্রন উৎস। তা থেকে সূক্ষ্ম ফুটোওয়ালা 'শ্যাডো-মাস্ক'-এর ভেতর দিয়ে তিনটি রশ্মি পড়ে পর্দার ওপর। ৩টি রশ্মি মিলেই হয় রঙিন ছবি।

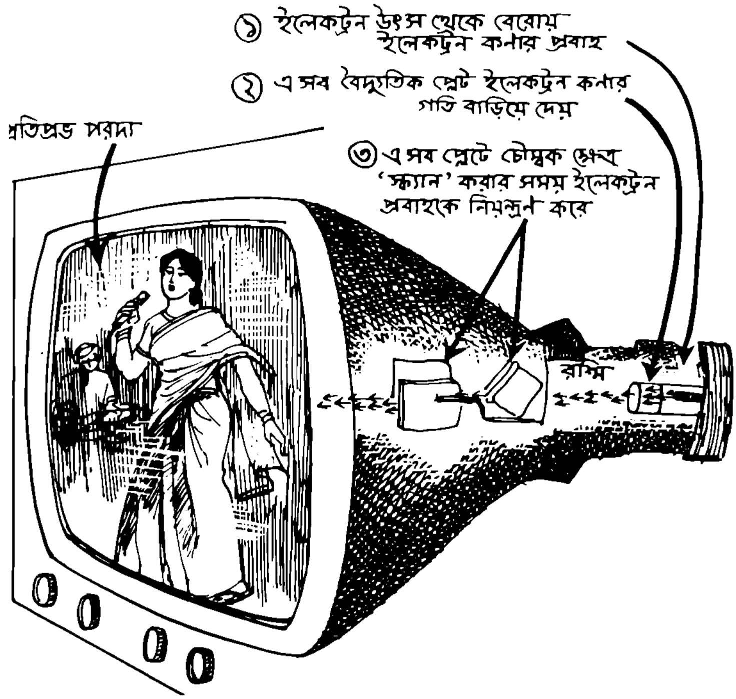


টিভি সেটের ক্যাথোড রশ্মি টিউব। এর সরু প্রান্তে রয়েছে ইলেক্ট্রন রশ্মি সৃষ্টির ক্যাথোড। চওড়া প্রান্তটি টিভির ছবি দেখার পর্দা

অনুসারে ক্যাথোড-রে টিউবের ভিতরের গায়ে প্রতিপ্রভ পদার্থের যে প্রলেপ থাকে তা ইলেক্ট্রন বীমের আঘাতে আলোকছটা বিকিরণ করে। বীম যত সবল হয় আলো তত উজ্জ্বল হয়। শব্দ উৎপাদনের জন্য টেলিভিশন সেটে একটি লাউড স্পিকার থাকে এবং শব্দ ও ছবিকে সমন্বিত করার জন্য থাকে একটি সিনক্রোনাইজার বা সমন্বয়ক।

রঙিন টেলিভিশনের কার্যপ্রণালী আরো জটিল। এতে তিনটি প্রধান রঙ লাল, নীল ও সবুজের জন্য তিনটি পৃথক ইলেক্ট্রন বীম থাকে। পিকচার টিউবের পর্দায় থাকে



www.pathagar.com

ফস্‌ফর বা প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রায় সোয়া মিলিয়ন ক্ষুদ্র বিন্দু (dot)। এই ক্ষুদ্র বিন্দুগুলো থাকে তিনটি রঙের এক একটি দল হিসাবে। এই ফস্‌ফরের ওপর ইলেক্ট্রন বীম এসে পড়লে তা থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়। যে ফস্‌ফরে যে রঙের সঙ্কেতের ইলেক্ট্রন বীম পড়ে ফস্‌ফর থেকে সে রঙের আলো বেরোয়। এভাবে তিন রকমের রঙের বিভিন্ন সমন্বয়ে টেলিভিশন পর্দায় রঙিন চিত্র ফুটে ওঠে। টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যেতে পারে অথবা তারের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরিত হলে ঐ টেলিভিশনকে বলা হয় ক্লোজড্‌ সার্কিট টেলিভিশন।

বর্তমানে প্রিন্টারসহ টেলিভিশন, পকেট টেলিভিশন, ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো পাতলা 'ফ্ল্যাট স্ক্রিন টেলিভিশন'ও তৈরি হয়েছে।

শা. ত.

**টেলিস্কোপ** দূরবীক্ষণ যন্ত্র / দূরবীন দ্র

## টোকিও

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের (দ্র) রাজধানী তোকিও। Tokyo-কে ইংরেজি উচ্চারণের প্রভাবে আমরাও 'তোকিও' না বলে 'টোকিও' বলে থাকি। এই শহর টোকিও উপসাগরের তীরে অবস্থিত হন্‌শু দ্বীপের একটি বন্দর। জাপানের প্রাণকেন্দ্র এই শহর খ্রিস্টীয় ১১ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এদো' (Edo) নামে। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে শোগুন্‌ পরিবারের প্রথম শোগুন্‌ শহরটিতে প্রথম সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে শহরটি সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। সে সময়ে শোগুনেরা ছিল জাপানের সম্রাটের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে শোগুন্‌দের পরাজয়ের পর 'এদো'র নাম হয় তোকিও। ভৌগোলিক দিক থেকে জাপান ভূমিকম্প অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তাই ভূমিকম্প এখানে স্বাভাবিক ঘটনা। ১৯২৩ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে টোকিওর প্রায় অর্ধেকের চেয়েও বেশি অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময়ও এটি প্রতিপক্ষের বোমার আঘাতে ধ্বংসনগরীতে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে বাড়িঘরসহ বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয় এবং বহু লোক প্রাণ হারায়। টোকিও মহানগরীর আয়তন ২১৩৩ বর্গকিলোমিটার। জানুয়ারি মাসে এর গড় তাপমাত্রা হয় ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

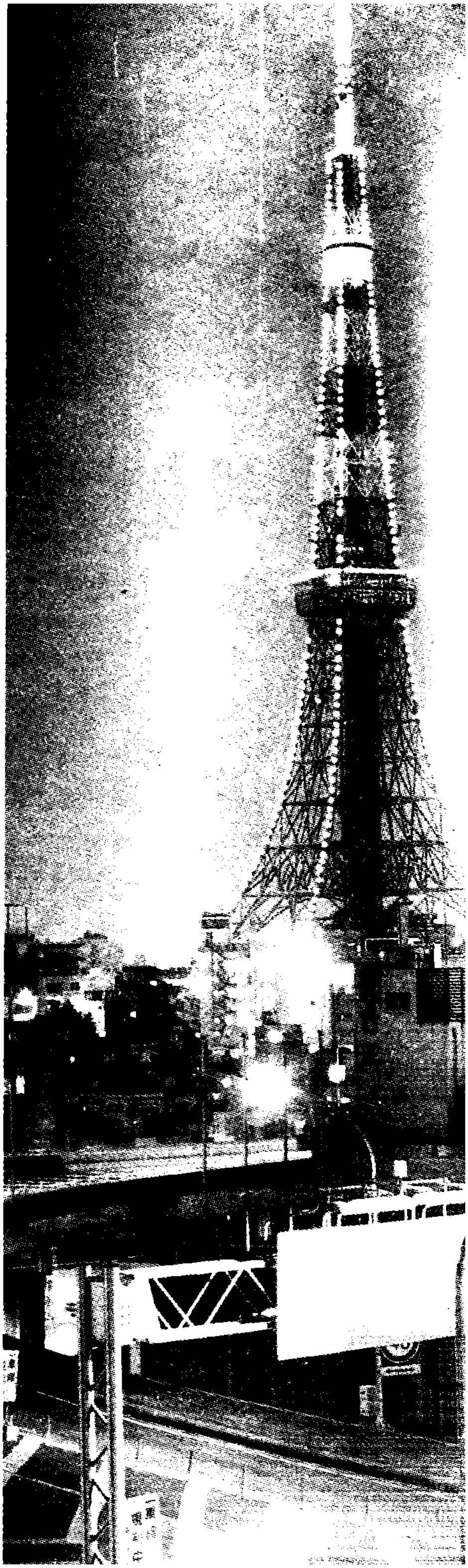

*রাতের বেলায় টোকিও টাওয়ার*

www.pathagar.com

এবং জুলাই মাসে এই তাপমাত্রা গড়ে ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। বর্তমানে টোকিও শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য আর অর্থনীতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই নগরীতে ১৩টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর 'দ্য ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরি' একটি প্রখ্যাত গ্রন্থাগার। এ ছাড়া এখানে জাদুঘর, ক্রীড়াগার আর পর্যটকদের জন্য উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থস্থান মেইজি স্মৃতিসৌধ টোকিওতে অবস্থিত। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে টোকিও বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

হো. আ.

**টোটেম** (totem)

টোটেম আদিম মানবসমাজে প্রচলিত পবিত্র প্রতীক। সাধারণত গাছপালা, প্রাণী অথবা অনুরূপ কিছুকে পূর্বপুরুষের প্রতীক বলে বিশ্বাস করার প্রথা আদিম সমাজে প্রচলিত ছিল। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, রক্তের সম্বন্ধযুক্ত নির্দিষ্ট গোত্রের উদ্ভব ঘটেছে নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে। এরাই সেই গোত্রের রক্ষাকর্তা বা দেবতা। তাই এদেরকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখার বিধান চালু হয়।

অস্ট্রেলিয়া (দ্র) এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) আদিবাসীদের (দ্র) মধ্যে এখনো টোটেম-বিশ্বাসের পরিচয় মেলে। এমনকি আধুনিক সমাজের প্রচলিত কোনো কোনো অনুষ্ঠান বা অনুশাসনে টোটেম-বিশ্বাসের প্রতীকী রূপ লক্ষ করা হয়।

আ. র.

**টোয়েন্, মার্ক** মার্ক টোয়েন্ দ্র

**টোল**

সংস্কৃত ভাষা (দ্র) ও সে ভাষায় লিখিত শাস্ত্রাদি শিক্ষার পাঠশালা। এর অন্য নাম চতুষ্পাঠী। প্রাচীন কালে জমিদারদের অর্থ ব্যয়ে এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হত। জমিদারেরাই ছাত্র ও শিক্ষকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। দূরের ছাত্রদের টোলে বাস করার ব্যবস্থা থাকত। সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন ইত্যাদি টোলে পড়ানো হত। একেকটি টোলে এক জন করে শিক্ষক থাকতেন। টোলে তাঁর শিক্ষাদানের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তাঁর সুবিধামতো দিনের যে কোনো সময়ে তিনি ছাত্র পড়াতেন। সম্পূর্ণ পাঠক্রম শেষে তিনি ছাত্রকে উপাধি দান করতেন। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টোলের প্রতি মানুষের আগ্রহও কমে যায়। টোলের পূর্ব ঐতিহ্য এখন আর নেই।

সুজ. ব.

**ট্রপোস্ফিয়ার** (troposphere)

আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডলকে (দ্র) ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে কয়েক শ' কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত মোটামুটি পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের যে স্তর তাকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তর হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যা দশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। মেজোস্ফিয়ার হচ্ছে চল্লিশ থেকে সত্তর কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। থার্মোস্ফিয়ার হচ্ছে সত্তর থেকে চার শ' কিলোমিটার পর্যন্ত। চার শ' কিলোমিটারের উপরে হল এক্সোস্ফিয়ার।

এর উচ্চতার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত এই স্তরগুলোর বিস্তার অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থান ও ঋতুর উপর নির্ভর করে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ট্রপোস্ফিয়ার স্বভাবতই বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। আমাদের জলবায়ু (দ্র) ও আবহাওয়া (দ্র) ট্রপোস্ফিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রপোস্ফিয়ারের পুরুত্ব যদিও বেশি নয়, বায়ুমণ্ডলের সমগ্র বাতাসের প্রায় শতকরা আশি ভাগ এবং জলীয় বাষ্পের প্রায় সবটাই রয়েছে এই স্তরে। বায়ুমণ্ডল এই এলাকায় সবচেয়ে ঘন। এই ঘনত্ব উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) থাকে বলে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ও এখানে জীবনের বিকাশে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয় বাষ্প সূর্যের (দ্র) অবলাল রশ্মি শোষণে বেশি দক্ষ। ট্রপোস্ফিয়ারের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত অবলাল রশ্মির অনেকটা শোষণ করে নেয়। এর ট্রপোস্ফিয়ার দুইভাবে উত্তপ্ত হয়। সূর্যের বিকিরণ (দ্র) ও পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ থেকে।

ট্রপোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে কমতে থাকে।



www.pathagar.com

ভূপৃষ্ঠের কাছে তাপমাত্রা যেখানে ২৫° সেলসিয়াস প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য এই তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে কমে; দশ বা এগারো কিলোমিটার উচ্চতায় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকেও প্রায় ষাট ডিগ্রি নিচে নেমে যায়। বিষুবরেখা (দ্র) থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও তাপমাত্রা কমতে থাকে ট্রপোস্ফিয়ারে। মানুষসহ অন্যসব প্রাণী ও জীবের জন্য ট্রপোস্ফিয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ এতে ধারণকৃত অক্সিজেন (দ্র), জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য।

আ. আ.

## ট্রয়ের যুদ্ধ

গ্রিক কবি হোমারের (দ্র) মহাকাব্য (দ্র) 'ইলিয়াদ' (দ্র)-এ উল্লিখিত গ্রিক ও ট্রয়বাসীদের যুদ্ধ। ট্রয় নগরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে এটি 'ট্রয়ের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

*স্পার্টার রাজা মেনেলেয়াসের স্ত্রী হেলেন*

স্পার্টার রাজা মেনেলেয়াসের স্ত্রী হেলেন। ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের পুত্র প্যারিস। একদিন এই প্যারিস হেলেনকে নিয়ে ট্রয় নগরে পালিয়ে যান। গ্রিকেরা এই ঘটনাকে তাদের

*ট্রয় নগরীর তোরণে বিশাল কাঠের ঘোড়া*

দেশ ও জাতির প্রতি চরম অবমাননাকর মনে করে সংঘবদ্ধভাবে ট্রয় আক্রমণ করে। আগামেম্ননের নেতৃত্বে দশ বছর তারা ট্রয় নগর ঘিরে রাখে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু নগরের রক্ষাব্যবস্থা এতই সুদৃঢ় ছিল যে তারা ট্রয় নগরের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। শেষে গ্রিক সেনাপতি ওদিসিউস এক অভিনব ফন্দি আঁটেন। তাঁর নির্দেশে বিশাল এক ঘোড়া তৈরি করে তাতে ১০০ জন সৈন্য ঢুকিয়ে দিয়ে নগরের দ্বারপ্রান্তে রেখে দেওয়া হয়। শত্রুদের পরিত্যক্ত জিনিস ভেবে ট্রয়বাসীরা এই বিশাল আকারের ঘোড়াটিকে টেনে নগরের ভিতরে নিয়ে যায়। ঘোড়ার ভিতরে লুকিয়ে থাকা গ্রিক সৈন্যরা সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে বের হয় এবং গ্রিক বাহিনীর জন্য নগরের ফটকগুলো খুলে দেয়। ট্রয়বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই গ্রিক সৈন্যদের আক্রমণে ট্রয় নগর তছনছ হয়ে



www.pathagar.com

যায়। যুদ্ধে গ্রিকবাহিনী জয়লাভ করে।

গ্রিক বীরদের মধ্যে একিলেস, পেট্রোক্লাস, ওদিসিউস ও নেস্‌টর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। হেক্টরের নেতৃত্বাধীন ট্রয়বাহিনীর বীরদের মধ্যে প্যারিস, ইনিয়াস, মেম্‌নন্‌ ও পেনথেসিলিয়ার নাম করা যায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় বীরযোদ্ধা নিহত হন।

**সুজ. ব.**

## ট্রানজিস্টর (transistor)

আধুনিক ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হল ট্রানজিস্টর। এক সময় বৈদ্যুতিক বাল্ব সদৃশ ভ্যাকুয়াম টিউব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে সিগ্‌ন্যাল বিবর্ধন ও সুইচিং-এর কাজ করত। এখন ট্রানজিস্টর তার স্থানে একই কাজ করছে। অথচ ট্রানজিস্টর তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট, অভঙ্গুর, স্থায়ী, সস্তা এবং কম বিদ্যুৎ খরচ করে। আরো বড় কথা, সাম্প্রতিক কালে কড়ে আঙুলের নখের চেয়েও ছোট একটুখানি সিলিকনের (দ্র) চিল্‌তের ভিত্তিতে হাজার হাজার ট্রানজিস্টরকে সমন্বিত করে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রকে অনেক বেশি খুদে আর সস্তা করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক এবং কম্পিউটার (দ্র) বিপ্লবের মূলে রয়েছে ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার ও তার এ রকম বিকাশ।

ট্রানজিস্টর তৈরি হয় সেমিকণ্ডাক্টর বা আধা-পরিবাহী বস্তু ব্যবহার করে। এর মধ্যে সিলিকনই সর্বাধিক প্রচলিত। বিশুদ্ধ কেলাসিত সিলিকনে সামান্য পরিমাণ সুনির্ধারিত বিজাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে একে পি টাইপ অথবা এন টাইপ নামে অভিহিত ভিন্ন প্রকৃতির সিলিকনে রূপ দেওয়া যায়। পরপর অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত পি. এন. এবং পি. অথবা এন. পি. এবং এন—এরকম পরম্পরায় সিলিকন-টুকরা ট্রানজিস্টরের কাজ করতে পারে। যথাক্রমে এমিটার, বেইস এবং কালেক্টার নামে পরিচিত এই তিনটি অংশ থেকে তিনটি সংযোগ নেওয়া হয়। এরকম ট্রানজিস্টরকে বলা হয় জাংশন ট্রানজিস্টর। এ ছাড়া আরেক রকম ট্রানজিস্টর হল ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর—যা সমন্বিত বর্তনীতে অধিকতর ব্যবহৃত। উভয় ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর কাজ করে পি সিলিকন এবং এন সিলিকনের সংযোগস্থলের বিশেষ কিছু বৈদ্যুতিক গুণের কারণে। মাত্র দু'এক ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রয়োগেই এই গুণের সুযোগ আমরা নিতে পারি। অথচ ভ্যাকুয়াম টিউবের অনুরূপ কাজের জন্য শ'খানেক ভোল্টের প্রয়োজন হত। আজকের ট্রানজিস্টর রেডিওর সঙ্গে আগেকার টিউবভিত্তিক রেডিওর আকার, ওজন. দাম, স্থায়িত্ব, জটিলতা ইত্যাদি তুলনা করলেই বোঝা যায় ট্রানজিস্টর আমাদের নিত্যকার জীবনে কতখানি পরিবর্তন এনেছে। ১৯৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিদ জন বার্ডিন (John Bardeen), ওয়াল্টার ব্র্যাটেইন (Walter Brattain) ও উইলিয়াম শক্‌লি (William Bradford Shockley) ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন এবং এর জন্য তাঁরা পরে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

**মু. ই.**

## ট্রান্সফর্মার (transformer)

সচরাচর সরবরাহকৃত পরিবর্তী বা এ. সি. বিদ্যুতের ভোল্টেজকে বাড়ানো অথবা কমানোর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র হল ট্রান্সফর্মার। এর সাহায্যে সহজে ও কম শক্তি অপচয় করে ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানোর কাজটি করা যায়। বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপাদিত হবার পর তাকে দূরে সরবরাহ করতে হলে উচ্চ ভোল্টেজে তা করতে হয়, কারণ অন্যথায় পথে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয়ে শক্তির ব্যাপক অপচয় হবে। ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎকে এ জন্য উচ্চ ভোল্টেজে নিয়ে যায়। আবার ঘরে বা কারখানায় কর্মস্থলে পৌঁছানোর পর বিদ্যুৎকে ২২০ বা ৪৪০ ভোল্টের মতো সাধারণ ভোল্টেজে ব্যবহার করতে হয়। তাই সে পর্যায়ে গিয়ে আবার ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেই ভোল্টেজ কমিয়ে আনা হয়। বাড়ির বিদ্যুৎ দিয়ে ছোট রেডিও চালাবার জন্য যে অ্যাডাপ্‌টার সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি ট্রান্সফর্মার ২২০ ভোল্টকে ৬ বা ৯ ভোল্টে নামিয়ে আনে।

ট্রান্সফর্মারের মৌলিক গঠন হল পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানকারী অন্তরিত তারের দু'টি কুণ্ডলী নিয়ে। এদের একটিকে বলা হয় প্রাইমারি, যার মধ্য দিয়ে মূল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয়। অন্যটিকে বলা হয় সেকেণ্ডারি—যার মধ্যে ভোল্টেজ-পরিবর্তিত বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সাধারণত উভয় কুণ্ডলীকে জড়ানো হয় স্তরায়িত লোহার পাতে তৈরি একটি বর্গাকার রিং-এর দুই বিপরীত বাহুকে ঘিরে, তাকে বলা হয় 'কোর'। কুণ্ডলী দু'টির পরস্পরের মধ্যে বা এদের সঙ্গে



www.pathagar.com

লোহার রিং-এর কোনো রকম সরাসরি বিদ্যুৎসংযোগ থাকে না। তবুও প্রাইমারির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত পরবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ সেকেণ্ডারিতে একই রকম পরিবর্তী প্রবাহ আবিষ্ট করে। এবং লোহার 'কোরে' সঞ্চারিত চৌম্বক ক্ষেত্র (দ্র) এ কাজে সহায়তা করে। প্রাইমারির তুলনায় সেকেণ্ডারিতে তারের প্যাঁচের সংখ্যা বেশি হলে, সে সংখ্যা যতগুণ বেশি সেকেণ্ডারির ভোল্টেজও হবে তত গুণ বেশি। এ রকম ট্রান্সফর্মারকে বলা হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার। আবার প্রাইমারির তুলনায় সেকেণ্ডারিতে প্যাঁচের সংখ্যাও কম হলে তা যত গুণ কম সেকেণ্ডারিতে ভোল্টেজও হবে প্রাইমারির তত গুণ কম। এরকম ট্রান্সফর্মারকে বলা হয় স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।

মু. ই.

**ট্রায়োড** ইলেক্ট্রনিক্স দ্র

**ট্রেজার আইল্যাণ্ড** (Treasure Island)

স্কটল্যাণ্ডের কবি-উপন্যাসিক রবার্ট লুই স্টিভেন্সন (দ্র) রচিত রোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনী। ১৮৮৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তার পর থেকে বিশ্বের শিশু-কিশোর সাহিত্যে প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

*রবার্ট লুই স্টিভেন্সন*

কাহিনীর নায়ক জিম্ হকিন্স নামে এক ভদ্র, শান্তশিষ্ট কিন্তু রোমাঞ্চপ্রিয় কিশোর। সমুদ্রতীরবর্তী এক ছোট শহরে ওদের একটা সরাইখানা ছিল। জিমের মা-ই তা দেখাশোনা করতেন, জিম্ তাঁকে সাহায্য করত। জিমের রুগ্ণ অসুস্থ বাবা শয্যাশায়ী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মারাই গেলেন। জিম্‌দের সরাইখানা 'দ্য অ্যাডমিরাল বেনহৌ'তে অচেনা এক অতিথি থাকতে আসে, সে ছিল কোন এক জাহাজের ক্যাপ্টেন; তার সম্পত্তি বলতে ছিল একটা সিন্দুক। মানুষটা ভাল ছিল না, বদরাগী, ঝগড়াটে, গুণ্ডাবদমায়েশ শ্রেণীর। সে আসলে কিছু লোকের ভয়ে ঐ সরাইখানায় গা ঢাকা দিয়েছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত লোকটি হার্টফেল করে মারা গেলে তার সিন্দুকের ভিতর থেকে একটা মানচিত্র পাওয়া যায়। কোন এক দূরবর্তী দ্বীপে সাত রাজার ধন লুকোনো আছে নাকি, সেই রত্নদ্বীপে যাওয়ার সমুদ্রপথ ও দ্বীপের ভিতরে ঐ ধনরত্নের অবস্থান—সবই দেখানো ছিল ঐ ম্যাপে।

জিম্‌দের দুই পারিবারিক বন্ধু ও শুভার্থী এবং শহরের গণ্যমান্য লোক জাহাজ কিনে মাঝিমাল্লা ঠিক করে ঐ রত্নদ্বীপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন, সঙ্গে তাঁরা জিম্‌কেও নিয়েছিলেন। এমনই কপাল! জাহাজের সব মাঝিমাল্লাই দেখা গেল খুনে জলদস্যু। ঐ দ্বীপ, লুকোনো সম্পদ ইত্যাদি ব্যাপার সবই তাদের জানা; কেবল ঐ প্রয়োজনীয় মানচিত্রটির সন্ধান তারা জানত না।

এই অবস্থায় যা ঘটবার কথা সবই ঘটল। জলদস্যুদের বিশ্বাসঘাতকতা, খুনখারাবি, জিম্‌দের সঙ্গে প্রতারণা। তবে, সমস্ত সঙ্কটেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে গোপনে টুকটাক এমন সব ছোটখাট কাজ জিম্ করে গেছে যে শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয়। গুপ্তধন তাদের দখলে আসে, জলদস্যুরা বেশির ভাগই মারা পড়ে।

এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো লোভনীয় বই। বাংলা ভাষাতেও অনেক লেখক নানান শিরোনামে বইটির অনুবাদ করেছেন।

হা. মা.

**ট্রেড ইউনিয়ন**

কলকারখানা, অফিস-আদালতে কর্মরত মেহনতি মানুষ ও কর্মচারীগণ তাদের নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষের কাছ থেকে তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকেই ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার অধিকার একটি স্বাভাবিক সর্বজনস্বীকৃত বিষয়।

উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডসহ সমগ্র ইউরোপ (দ্র) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলন থেকে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়। তবে বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে লণ্ডন শহরে ১৬৬৭ সালে। টুপি শ্রমিকদের এই সংগঠনের নাম



www.pathagar.com

ছিল 'জার্সিমেন হ্যাটার্স ইউনিয়ন'।

বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠন 'ন্যাশনাল লেবার' (১৮৮৪), ১৮৮৬ সালের ১লা থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত দেশটির শিকাগোর হে মার্কেট এলাকার কারখানা শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে পরিচালিত ধর্মঘট ও তাদের আত্মাহুতির ঘটনা এবং এর পরিণতিতে গড়ে ওঠা 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'।

তবে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও আট ঘণ্টা কর্মদিবস বেঁধে দেওয়ার দাবি আদায়ে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৮৮৯ সালে প্যারিস শহরে গঠিত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' নামের একটি সংস্থা সবিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতকে এসে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নতুন চরিত্র ও মাত্রা লাভ করে।

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৬ সাল নাগাদ প্রায় ২ শত পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে, পরবর্তী কালে যার আরো প্রসার ঘটেছে।

পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলে পেশাজীবীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করার অধিকারের বিষয়টি 'জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ' ও 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র অন্যতম ঘোষিত মূলনীতি।

আ. হু.

**ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড** অ্যাথ্‌লেটিক্স্ দ্র

## ট্র্যাজেডি (tragedy)

কোনো সাহিত্যকর্মে যখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি পরিণতিতে প্রধান চরিত্রের জন্য চরম বিপর্যয়, অনেক সময়ই মৃত্যু ডেকে আনে, তখন তাকে ট্র্যাজেডি বলা হয়। তবে অনেকে, সাধারণভাবে, ট্র্যাজেডি বলতে ট্র্যাজিক নাটক তথা বিয়োগান্তক নাটকই বোঝেন। ট্র্যাজেডির শেষে দর্শক-শ্রোতার চিত্ত বেদনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্রের মধ্যে আমরা তার অনেক গুণের পাশাপাশি কিছু দুর্বলতাও লক্ষ করি, তবে ট্র্যাজেডির নায়কের চরম বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্য বা নিয়তিও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেসের (দ্র) রাজা ঈডিপাস (দ্র) ও ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের (দ্র) হ্যামলেট (দ্র), ওথেলো, ম্যাকবেথ ও কিং লীয়র বিশ্বসাহিত্যের সুপরিচিত ট্র্যাজেডি। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি হল—মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) কৃষ্ণকুমারী নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) বিসর্জন, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা, মুনির চৌধুরীর (দ্র) রক্তাক্ত প্রান্তর প্রভৃতি।

ক. চৌ.

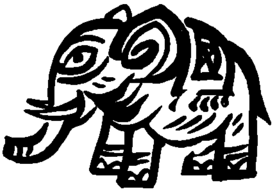

# ঠ

## ঠগী

আঠারো-উনিশ শতকে এই ছদ্মবেশী দস্যুদের সর্বাধিক উপদ্রব ছিল। দল বেঁধে এরা পথিকের বেশে ভ্রমণ করত ও সহযাত্রীদেরকে নির্জনে হত্যা করে যথাসর্বস্ব হরণ করত। অর্থসম্পদ অপহরণ করে লাশ মাটির নিচে পুঁতে ফেলত। প্রতারণা করা থেকেই এরা ঠক বা ঠগ হিসেবে পরিচিত হত। সম্প্রদায় হিসাবে তারা 'ঠগী' নামে চিহ্নিত ছিল। ফাঁস দেওয়ার বস্ত্রখণ্ড ও লাশ পুঁতে ফেলার কোদাল উভয় বস্তুকেই তারা যথাবিহিত মন্ত্র-উপচারে পূজা করে দস্যুতায় যাত্রা করত।

ভারতে (দ্র) ইংরেজ শাসনামলে এদের অত্যাচার চরমে পৌঁছলে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক্ (দ্র) আলাদা দপ্তর স্থাপন করেন। স্লিম্যান নামে এক জন ইংরেজ এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে এই ছদ্ম-দস্যুদের ভাষার সঙ্কেত উদ্ধার করে ১৮৫০ সাল নাগাদ ঠগীদের চিরতরে নির্মূল করতে সমর্থ হন।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ঠগীদের উপদ্রব ছিল। দিল্লির শাসক জালালুদ্দিন খলজিও ত্রয়োদশ শতকের শেষে একবার ঠগী দমনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শা. চৌ.



www.pathagar.com

## ঠাকুরমার ঝুলি

বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত রূপকথার সঙ্কলন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলো পুরোপুরি দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের (দ্র) মৌলিক কিছু নয়, বাংলাদেশের লোকসমাজে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রূপকথার সংগ্রহসম্ভার মাত্র। তবে, সংগৃহীত হলেও, সঙ্কলক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের লিখনভঙ্গির গুণে গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো অতুলনীয় শিশু-মনোরঞ্জক সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে, অর্জন করেছে মৌলিক রচনার গুণ-বৈশিষ্ট্য।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সেই জাদুকর, যাঁর হাতের ছোঁয়ায় সংগৃহীত রূপকথাগুলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) 'ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে পেয়ে বলেছিলেন, "তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

সংগ্রহ করার পর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার চেয়েছিলেন, গল্পগুলো তিনি যেভাবে শুনেছিলেন, যে আঞ্চলিক ভাষায় শুনেছিলেন, তার রূপ বা রসটি অবিকৃত রেখে তাঁর লেখায় পরিবেশন করতে। তিনি ভেবেছিলেন, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতার আশ্রয় নিলে তাঁর সংগ্রহের কোনো মূল্যই থাকবে না। গল্পগুলো তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে।

উল্লিখিত আদর্শ থেকেই তিনি রূপকথার আবহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে মনোযোগী হন। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে তিনি যেমন 'ছেদ', হাইফেন্' ও 'হরফ' চিহ্ন ব্যবহারে আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখান, তেমনি 'রূপকথা-কথকে'র বাচনভঙ্গির উত্থান-পতনের ছন্দটিকেও প্রতিটি গল্পে সুচারুরূপে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেন। আঞ্চলিক শব্দ ও ইডিয়ম ব্যবহারেও তিনি অপূর্ব মুনশিয়ানার স্বাক্ষর রাখেন।

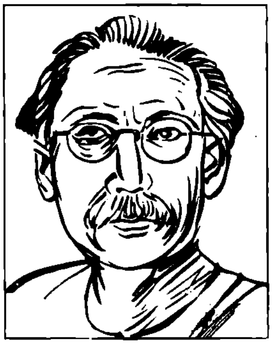

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থে মোট দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর শিরোনাম হচ্ছে : 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্ত পুরী', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'শীত বসন্ত', 'কিরণমালা', 'নীলকমল আর লাল কমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতালকন্যা মণিমালা' এবং 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি'। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন সেকালের নাম করা প্রকাশক কলিকাতার 'ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স'। লেখকের জীবদ্দশাতেই এর বহু সংস্করণ হয়, তাঁর মৃতুর পরও আজো তা অব্যাহত। 'ঠাকুরমার ঝুলি' বাংলা শিশুসাহিত্যে ধ্রুপদ বা চিরায়ত সাহিত্যকর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

আ. হ.

**ঠাণ্ডা লড়াই** স্নায়ুযুদ্ধ / ঠাণ্ডা লড়াই দ্র

## ঠুম্‌রি / ঠুংরি

রাগসঙ্গীত-পদ্ধতির নাম। রাগসঙ্গীতের প্রধান চার পদ্ধতির অন্যতম। পদ্ধতি চারটি হচ্ছে : ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র), ঠুম্‌রি বা ঠুংরি। সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক ফকিররুল্লাহ্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাগদর্পণ'-এ ঠুম্‌রির উল্লেখ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে পূর্বে বারোঁয়া রাগে এক পৃথক গান গাওয়া হত, তার নাম ছিল ঠুম্‌রি। এই গান অবলম্বনে ঠুম্‌রি নামে একটি সঙ্গীতপদ্ধতি গড়ে ওঠে। ঠুম্‌রির সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে এ বলে যে খেয়াল অপেক্ষা লঘু নিয়মের দিক থেকে খেয়াল অপেক্ষা অনেক শিথিল এবং শুনতে খেয়াল অপেক্ষা অনেক মিহি ও মিষ্টি সঙ্গীতরীতির নাম ঠুম্‌রি। ফকিরুল্লাহ্'র মতে এই সঙ্গীতপদ্ধতিটি প্রাচীন। বর্তমান কালে আমরা যে ঠুম্‌রি শুনতে পাই তার প্রচলন উনবিংশ শতকে। লখ্নৌর রাজদরবার থেকে এর সূচনা।



www.pathagar.com

*ওয়াজেদ আলী শাহ*

নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৮২২—১৮৮৭) এই সঙ্গীতপদ্ধতির সুস্পষ্ট রূপ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন। নবাব স্বয়ং অনেক ঠুম্‌রি গান রচনা করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাদিক আলী খাঁ নামে জনৈক সঙ্গীতগুণী ঠুম্‌রি সঙ্গীতপদ্ধতি উদ্ভাবনে বিপুল কাজ করেন। যা কিছু সুরের কাজ মিহি, মিষ্টি ও মনোহর তাই ঠুম্‌রিতে প্রযুক্ত হল। ক্ষুদ্র ও সুমিষ্ট রাগসমূহেই কেবল ঠুম্‌রি রচিত হল। খেয়াল বা টপ্পার মতো ঠুম্‌রিও দুই তুকে বা স্তবকে রচিত হয়। ঠুম্‌রির তিন প্রধান ঘরানা হচ্ছে : লখ্‌নৌ ঘরানা, বারানসি ঘরানা ও পাঞ্জাব ঘরানা। মৌজুদ্দিন খাঁ ও ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও ঠুম্‌রির বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। ওয়াজিদ আলী শাহ্ কলিকাতার নিকটবর্তী মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত হলে তাঁর লখ্‌নৌ সঙ্গীত-দরবারও মেটিয়াবুরুজে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর দরবার থেকে ঠুম্‌রির ধারা বঙ্গদেশেও বিস্তার লাভ করে। তবে বাংলা ভাষায় ঠুম্‌রি রচনা বা ঠুম্‌রির সঙ্গীত-আদর্শে প্রথম গান রচনা করেন অতুলপ্রসাদ সেন (দ্র)। কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) রচনায় এই ধারাটি বিপুল হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা গান রচনার প্রধান প্রেরণা আসে ঠুম্‌রি থেকে।

ক. গো.

# ড

## ডক্টর জেকিল্ অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড্

ইংরেজ কথাসাহিত্যিক রবার্ট্ লুই স্টিভেন্সন্ (দ্র) রচিত রহস্য-উপন্যাস। বইটির পূর্ণ শিরোনাম The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. অর্থাৎ ড. জেকিল্ ও মি. হাইডের অদ্ভুত ঘটনা। উপন্যাসটি ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

ডাক্তার জেকিল্ ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন যা প্রয়োগ করলে তিনি বিপরীত চরিত্রের এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবেন। বিপরীত চরিত্রের মানুষ অর্থ তাঁর মনের মধ্যে যত খারাপ গুণ, দোষ রয়েছে সেসব মুখ্য হবে এবং তিনি সেভাবেই ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে বেড়াবেন। অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিলিয়ে তো মানুষ, এই ডাক্তার মানুষের ভিতরে এ দুটো স্বভাবকে আলাদা করে নিয়ে একই দেহের দুটো মানুষ তৈরি করলেন। যে মানুষটির সব কিছুই ভাল তিনি হলেন ডাক্তার জেকিল। আর ঔষধ ব্যবহারের পর পাল্টে-যাওয়া মানুষটি—যার সমস্ত কিছুই খারাপ, তাকে তিনি নাম দিলেন মিস্টার হাইড। কেউ জানতে পারল না যে মহৎ ও দয়াবান ডাক্তার জেকিল্ই প্রায় পশু হয়ে যান মিস্টার হাইড হয়ে গেলে। যাই হোক, মিস্টার হাইড তো এক লোককে খুন করে বসল। এদিকে ক্রমে ক্রমে এমন হল যে ডাক্তার না-চাইলেও মিস্টার হাইডে রূপান্তরিত হতে লাগলেন। তিনি তো ঔষধের বলে হাইড হতেন, আবার হাইড থেকে ডাক্তার জেকিলে যে পরিণত হতেন তা-ও ঔষধের বলেই। দেখা গেল দ্বিতীয় ঔষধ আর তেমন কাজ দিচ্ছে না। যত দ্রুত তিনি হাইড হতে পারেন তত দ্রুত আর ডাক্তার হতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁর মনুষ্যত্বের বদলে পশুত্বই বেশি স্থায়ী হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল, তিনি ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠের শাস্তি ও অপমান থেকে



www.pathagar.com

বাঁচলেন।

গল্পটি খুবই বিখ্যাত ও প্রতীকধর্মী। শিশু-কিশোরদের প্রিয় তো বটেই, বয়স্কদেরও কম প্রিয় নয়।

হা. মা.

**ডক্টর শহীদুল্লাহ** শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ দ্র

**ডগার ব্যাংক** আটলাণ্টিক মহাসাগর দ্র

**ডয়েল্, স্যার আর্থার্ কোনান্** [১৮৫৯—১৯৩০]

ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ডয়েল (Sir Arthur Conan Doyle) ব্যাপকভাবে পরিচিত কাল্পনিক ডিটেকটিভ 'শার্লক্ হোম্‌স্' (দ্র) চরিত্রের স্রষ্টা হিসাবে। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। ১৮৫৯ সালের ২২শে মে তিনি ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

শার্লক্ হোম্‌স্‌কে নিয়ে তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' ১৮৮৭ সালে 'বিটন্‌স্ ক্রিস্‌মাস অ্যানুয়াল' সাময়িকীতে ছাপা হয়। ১৮৯০ সালে তিনি সার্বক্ষণিক লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। শার্লক্ হোম্‌স্‌কে চরিত্র করে এর পর তাঁর যে ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলো হচ্ছে : 'দ্য মেমোয়ার্স্ অব শার্লক্ হোম্‌স্' (১৮৯৪), 'দ্য হাউণ্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স্' (১৯০২) এবং 'দ্য কেস্‌বুক অব শার্লক্ হোম্‌স্' (১৯২৭)। ডয়েল সর্বমোট ৪টি উপন্যাস এবং ৫৬টি ছোটগল্প রচনা করেন। এসবের প্রত্যেকটিতে তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা হোম্‌সের উপস্থিতি রয়েছে।

শার্লক্ হোম্‌স্ এমন এক চরিত্র যাঁর রয়েছে প্রখর গোয়েন্দা বুদ্ধিবৃত্তি। জটিল সব রহস্যের উন্মোচনে তাঁর সহযোগী হচ্ছেন ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ এবং অধ্যাপক মোরিয়ার্টি। ডয়েলের লেখনী-শক্তির জোরে শেষোক্ত চরিত্র দু'টিও জীবন্ত।

১৮৯৩ সালের দিকে এসে ডয়েল তাঁর প্রিয় গোয়েন্দা শার্লক্ হোম্‌স্‌কে নিয়ে আর কিছু লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ভবিষ্যৎ কোনো গ্রন্থে বা রচনায় তাঁর (হোম্‌সের) মৃত্যু ঘটাবার উদ্যোগ নিলে পাঠকদের তরফ থেকে জোর দাবি ওঠে, হোম্‌সের মৃত্যু ঘটানো চলবে না। ফলে ডয়েলকে ১৯০৪ সালে লিখতে হয় 'দ্য রিটার্ন্ অব শার্লক্ হোম্‌স্' শীর্ষক গ্রন্থ।

তাঁর রচিত গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের জন্য পাঠকেরা তাঁকে স্মরণে রাখুক, ডয়েল প্রকৃতপক্ষে সেটা চান নি। বরং তাঁর রচিত গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'স্যার নিগেল' (১৯০৬), 'মিকাহ্ ক্লার্ক' (১৮৯৪) এবং 'দ্য হোয়াইট কোম্পানি' (১৮৯০)—এই তিনটি রচনাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন, যদিও এগুলো বর্তমান কালের পাঠকদের কাছে স্বল্প পরিচিত।

ডয়েল এ ছাড়া প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে মুখ্য চরিত্র করে কল্পবিজ্ঞান (দ্র)-ভিত্তিক উপন্যাসসহ বেশ কিছু রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনীও রচনা করেছেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারও কল্পিত চরিত্র। এসব গল্প-উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য লস্ট্ ওয়ার্ল্ড' (১৯১১) এবং 'দ্য পয়জন বেল্ট' (১৯১২)।

১৯০২ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

বুয়র যুদ্ধে (দ্র) ইংল্যাণ্ডের অপরাধমূলক ভূমিকাকে মার্জনা করে ডয়েল দু'টি প্রচারপত্র রচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) তাঁর সন্তানের মৃত্যু হলে তিনি আধ্যাত্মিকতাবাদের চর্চায় শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পান। এর পর তাঁর 'হিস্ট্রি অব স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্' (১৯২৬-২৭) শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেমোয়ার্স্ অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চার'।

১৯৩০ সালের ৭ই জুলাই স্যার আর্থার্ কোনান্ ডয়েল্ মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

**ডলফিন** (dolphin)

সিটেসিয়া (Cetacea) বর্গের স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী। এটি দেখতে অনেকটা তিমির মতো, তবে আকারে তিমির চেয়ে বেশ ছোট। তাই ডলফিনকে অনেকেই ছোট জাতের তিমি বলে থাকেন। দাঁতাল শ্রেণীর তিমির মতো এটিরও ধারালো পরিপাটি দাঁত আছে। এর মাথার ওপর আড়াআড়ি যে ছিদ্র আছে, তার সাহায্যে এটি যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ



www.pathagar.com

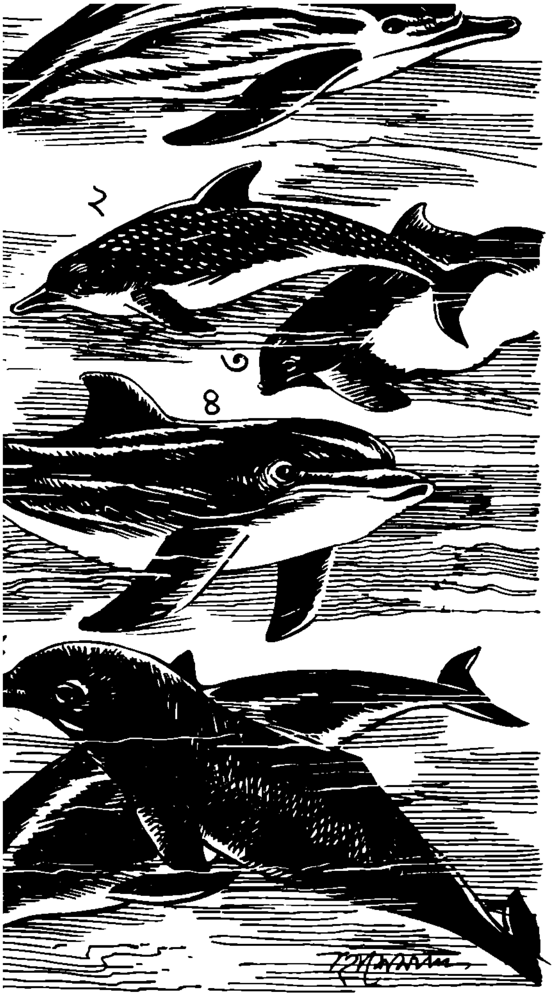


*নানা রকম ডলফিন*

*১. সাধারণ ডলফিন* *২. দাগযুক্ত ডলফিন*
*৩. ডালস শুশুক* *৪. বোতলনাকু ডলফিন*
*৫. পদ্মার শুশুক* *৬. সাধারণ শুশুক*

চালায়, তেমনি হুইসেল বা শিস দেওয়ার মতো শব্দও করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে এভাবে শব্দ করে ডলফিনেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে।

ডলফিনের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর, তবে পেটের দিকের রঙ হালকা। সবচেয়ে বড় জাতের ডলফিনের নাম বোতলনাকু ডলফিন (Bottle-Nosed Dolphin)। এটি ৯ ফুট বা ৩ মিটারেরও বেশি লম্বা এবং ২০০ কিলোগ্রামেরও বেশি ওজনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। এদের অ্যাকোয়ারিয়ামে (দ্র) পোষ মানাতে দেখা যায়। প্রশিক্ষণ দিলে বিভিন্ন কলাকৌশল ও খেলা শিখে এরা দর্শকদের দেখাতে পারে। এরা অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। পৃথিবীর (দ্র) সকল মহাসাগর, সাগর (দ্র) ও কোনো কোনো বড় নদীতে ডলফিন পাওয়া যায়। এরা দল বেঁধে বাস করতে ভালবাসে। সাগরে মানুষের বন্ধু হিসাবে এদের সুনাম আছে। এদের প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মাছ।

সমুদ্র-উপকূলে প্রায় ৫০ প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়। এর মধ্যে ছোট আকারের অনেকগুলোকে শুশুক (porpoise) বলা হয়। এরা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট বা ১.৫০ মিটার এবং ওজনে ৪৫ কিলোগ্রামেরও বেশি হয়ে থাকে। এদের মুখমণ্ডল চামচের মতো বাঁকানো। ঠোঁট ডল্‌ফিনের মতো ধারালো হয় না। এরা পানির নিচে ৬-৭ মিনিটের বেশি সময় থাকতে পারে না। তাই এরা গভীর জলে ডুব দেয় না। কখনো কখনো ছোট নদীতেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের (দ্র) নদীতে শুশুক প্রায়ই দেখা যায়।

**সুজ. ব.**

## ডাইনোসর (dinosaur)

ডাইনোসর এক প্রকারের সরীসৃপ (দ্র)। যেসব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সরীসৃপ বলা হয়। পৃথিবীর (দ্র) ট্রায়াসিক যুগে অর্থাৎ এখন থেকে সাড়ে বাইশ কোটি বছর আগে ডাইনোসরেরা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করত। ১৮৪১ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ স্যার রিচার্ড ওয়েন (Sir Richard Owen) গ্রিক শব্দ 'দেইনোস্' ও 'সাউরস্' মিলিয়ে ডাইনোসর শব্দটি তৈরি করেন। দেইনোস্ অর্থ ভয়ঙ্কর। সাউরস্ অর্থ গিরগিটি। পুরো অর্থ দাঁড়ায় ভয়ঙ্কর গিরগিটি। ১৮৪১ সালের কয়েক দশক আগে বিশাল কিছু হাড়ের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। বিজ্ঞানী ওয়েন ওসবের ওপর ভিত্তি করে এই সরীসৃপদের চরিত্র ও জাতি নিরূপণ করেন। ডাইনোসর সম্পর্কে সর্বজনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ (দ্র) তাঁর 'দ্য এজ্ অব্ রেপ্‌টাইল্‌স্' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজও খারিজ হয়ে যায় নি। তিনি লিখেছেন : কিছু এমন জন্তু (জীব বলেন নি) পৃথিবীর সর্বকালের সব ভূমিবাসী জন্তুদের অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আকারে। তারা ছিল তিমি মাছের সমান। যেমন—ডিপ্লোডোকাস কার্নেগি ঠোঁট থেকে লেজের ডগা



www.pathagar.com

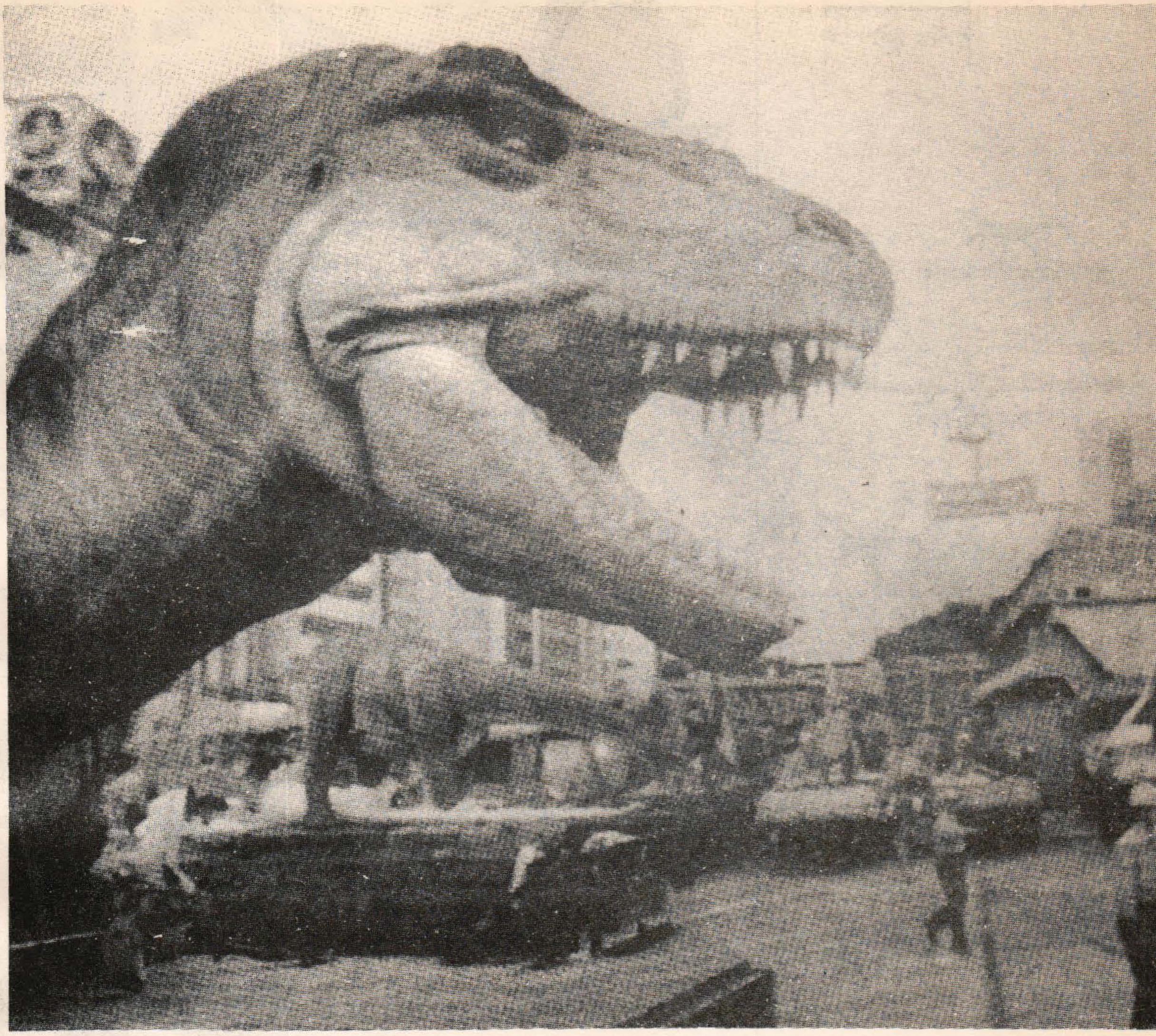

*জাপানের ডাইনো পার্ক*
*যেখানে রয়েছে ৭০টি ডাইনোসরের মডেল*

পর্যন্ত ছিল ২১ মিটার লম্বা, জায়গান্টোসরাসরা ছিল লম্বায় প্রায় ৩২ মিটার। এরা ছিল উদ্ভিদভোজী। এদের মেরে খেয়ে বাঁচত টির‍্যানোসরাসের মতো ভয়ঙ্কর গিরগিটি। এদের সময়ে পৃথিবীতে একটিই মাত্র ভূখণ্ড ছিল। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন প্যাঞ্জিয়া (Pangea)। ডাইনোসরেরা জল, স্থল, বায়ু, সর্বত্রই বিচরণ করত। এরা পৃথিবীতে টিকে ছিল প্রায়



www.pathagar.com

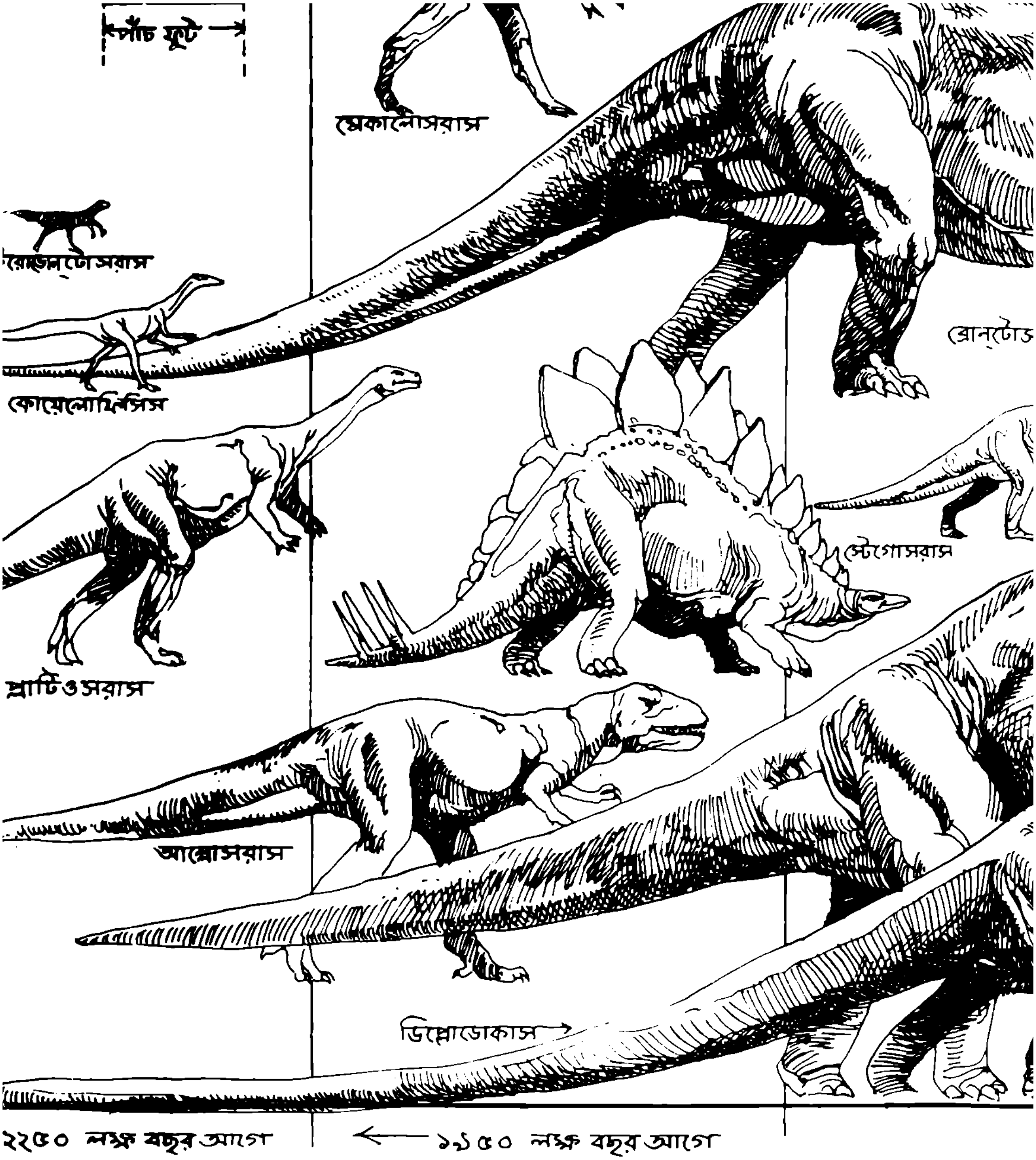


১৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর। পৃথিবী থেকে ওদের বিলুপ্তির সঠিক কারণ এখনো জানা যায় নি। টির্যানোসরাস, ডিপ্লোডোকাস, ব্রন্টোসরাস ইত্যাদি স্থলচর সরীসৃপ। জলচরদের মধ্যে রয়েছে প্লেসিওসর; ইকথাইওসর এবং টেরোড্যাক্টাইল, টেরোডন ইত্যাদি ছিল আকাশচারী।

ত. চ.

*লক্ষ লক্ষ বছর আগের সরীসৃপ-ডাইনোসর। ডিম, হাড়গোড় ও ফসিল থেকে পাওয়া প্রমাণাদি দিয়ে, গবেষণা করে তৈরি ডাইনোসরের বিভিন্ন আকার ও আকৃতি*



www.pathagar.com

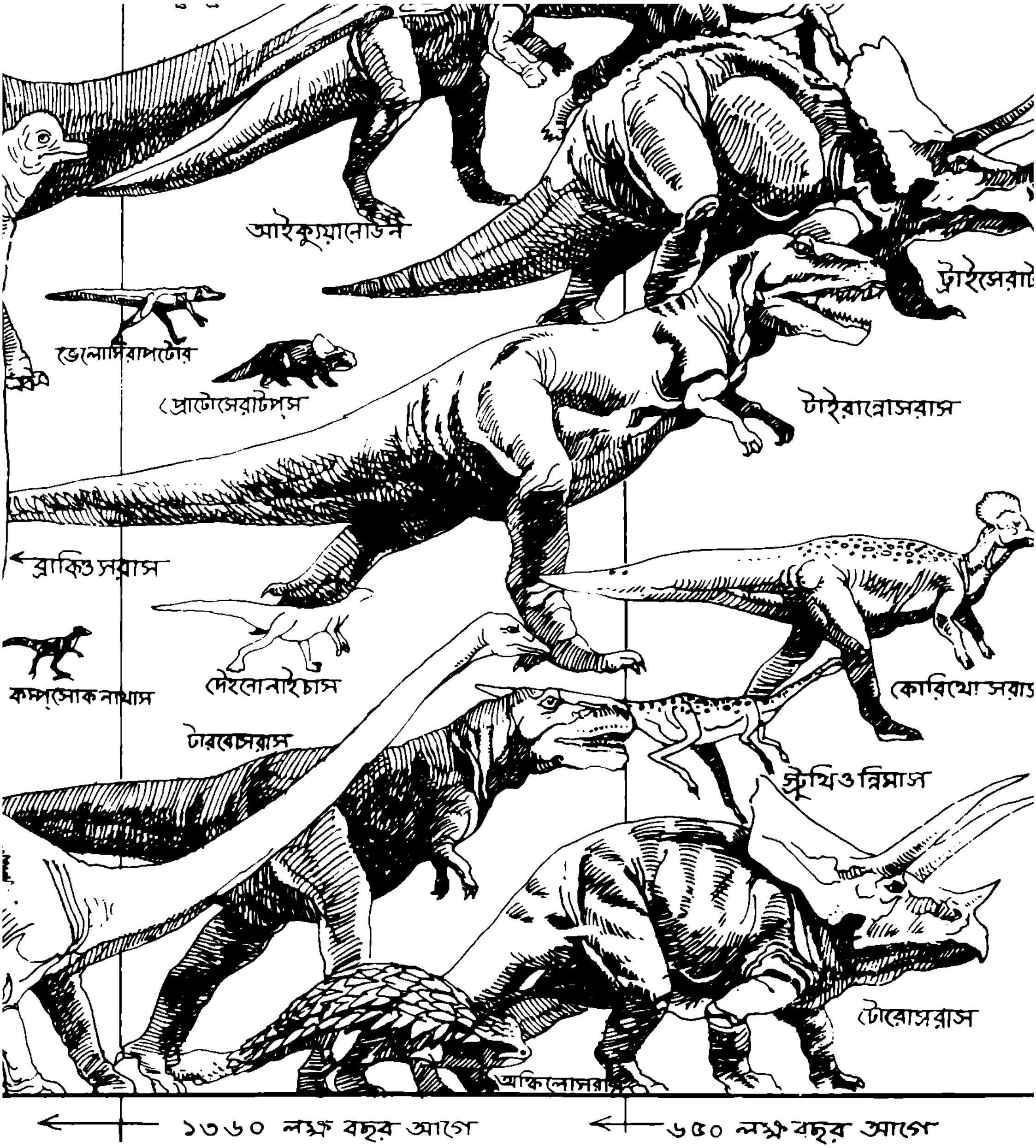


## ডাইভিং (diving)

মানব-ইতিহাসে সাঁতারের মতো ডাইভিংও এক অতি পুরানো খেলা। মানুষ মাথা নিচের দিকে দিয়ে কখন যে ডাইভিং আরম্ভ করেছিল তার কোনো হদিস মেলে না। ডাইভিংয়ে শারীরিক উপযুক্ততা, একাগ্রতা, সামঞ্জস্য, সৌষ্ঠব, সাহসিকতা, প্রচুর অনুশীলন ও বিভিন্নভাবে দেহকে ব্যবহার করার কলাকৌশল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট লুইস অলিম্পিকে ডাইভিং প্রথম সংযুক্ত হয়। ডাইভিং দু' প্রকারের অবস্থান থেকে দিতে হয়। হাইবোর্ড ডাইভিং যা ৫ মিটার বা ১০ মিটার জলাশয়ের উপর থেকে



www.pathagar.com

আর স্প্রিংবোর্ড ডাইভিং যা জলাশয় হতে তিন মিটার উপর থেকে দিতে হয়। ডাইভিংয়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একই নিয়মকানুন ও উচ্চতা নির্দিষ্ট থাকে। ডাইভিংয়ের বিচারকার্য ডাইভ অনুষ্ঠানের কঠিনতার মাত্রা, ডাইভের সৌন্দর্য এবং ডাইভ অনুষ্ঠানের নিখুঁত হওয়ার উপর নম্বর প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে ডাইভিং প্রতিযোগিতাও হয়। ডাইভিং প্রতিযোগিতা এককভাবে কখনই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় নি। বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে চীনারাই ডাইভিংয়ে পারদর্শী বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে (দ্র) ডাইভিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উপযোগী ৭/৮টি ডাইভিং পুল আছে।

কা. আ. আ.

## ডাংগুলি

বাংলাদেশে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে ডাংগুলি খেলাটি খুবই জনপ্রিয়। তবে কিশোর বয়সী ও ছোট ছোট ছেলেরাই এই খেলা খেলে থাকে। এই খেলার উপকরণ দু'টি। একটি মাঝারি গোছের সরু, দেড় থেকে দু' ফুট লম্বা লাঠি, যাকে ডাং বলে; আরেকটি তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ—ছোট লম্বাকৃতি ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা কাঠের টুকরা, তার নাম হল গুলি। এই দুই উপকরণের খেলা বলে এই খেলার নাম ডাংগুলি।

ডাংগুলি খেলার পদ্ধতি খুব সহজ। এই খেলা দুই বা ততোধিক লোকেও খেলতে পারে। প্রথমে একটি পরিষ্কার স্থান এই খেলার জন্য বেছে নেওয়া হয়। তার পর মাটিতে একটা ছোট অগভীর লম্বা গর্ত করে তার উপর গুলিটি বসানো হয়। এক জন তার ডাংয়ের সাহায্যে গুলিটি তুলে দূরে নিক্ষেপ করে। প্রতিপক্ষ গুলিটি ধরবার বা ছোঁয়ার চেষ্টা করে। যদি এই কাজে সে কৃতকার্য হয় তাহলে সে ডাং ও গুলির মালিক হবে ও খেলা আরম্ভ করবে। আর যদি অকৃতকার্য হয়, তবে প্রথম পক্ষ এই সুযোগ গ্রহণ করবে। স্থানবিশেষে খেলার নিয়মকানুন বিভিন্ন হতে পারে। এই খেলাতে পয়েন্ট সংগ্রহের বিধি আছে। গুলি দূরে নিক্ষেপ করলে প্রতিপক্ষ যদি তা ধরতে বা ছুঁতে না পারে তা হলে গুলি যেখানে পড়েছে সেখান হতে যেখান থেকে ডাংয়ের সাহায্যে গুলিটি মারা হয়েছিল সেই গর্ত পর্যন্ত দূরত্ব ডাংয়ের সাহায্যে মাপতে হবে। ডাং যতবার ব্যবহৃত হবে তত পয়েন্ট হবে। ডাংয়ে মাপ হয় এড়ি, দুরি, তেলওয়া, চৌরি, চম্পা, জেড, সুজে অর্থাৎ ৭ বার ডাংয়ের মাপের পরে এক লাল হয়। এমনিভাবে খেলা চলতে থাকে। যে পক্ষ পয়েন্ট বেশি করতে পারে তারই জিত হয়। এই খেলায় কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মীমাংসা না হয় ততক্ষণ খেলা চলতেই তাকে। ছেলেরা ছুটির দিনে এই খেলা নিয়ে মেতে থাকে।

কা. আ. আ.

## ডাকটিকিট

ডাক বিভাগের মাধ্যমে চিঠিপত্র প্রেরণের খরচ হিসাবে ডাকমাশুল পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সরকারি টিকিট। ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম ডাকটিকিট প্রবর্তিত হয়। রোল্যাণ্ড হিল (Sir Rowland Hill : ১৭৯৫—১৮৭৯) নামে এক স্কুলমাস্টারের প্রচেষ্টায় ১৮৪০ সালের মে মাসে ইংল্যাণ্ডে প্রথম আঠাযুক্ত ডাকটিকিট (adhesive stamp) প্রচলন শুরু হয়। রোল্যাণ্ড হিল-কে পরে ডাকবিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং স্যার উপাধি দেওয়া হয়। প্রথমে ব্রিটেনের অভ্যন্তরে চিঠি প্রেরণের জন্য ১ পেনি ও ২ পেনি মূল্যের ডাকটিকিট নির্ধারণ করা হয়েছিল। পৃথিবীর (দ্র) এই প্রথম ডাকটিকিট 'পেনিব্ল্যাক' ও 'টুপেনি ব্লু' নামে প্রসিদ্ধ।

১৮৫০ সালের দিকে পৃথিবীর সর্বত্র ডাকটিকিট ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) ১৮৪৭ সালে সরকারি ডাকটিকিটের প্রবর্তন হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে লর্ড ডাল্‌হৌসীর (দ্র) সময় ১৮৫৪ সালে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন ঘটে।

প্রথম দিকে ডাকটিকিট কাঁচি দিয়ে কেটে ব্যবহার করতে হত। ১৮৫৩ সালে পার্ফোরেশন (perforation) পদ্ধতি অর্থাৎ টিকিটের চারপাশে ছিদ্র করে তৈরির পদ্ধতি চালু হয়। ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রবিদ আর্চার পার্ফোরেশনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

ডাকটিকিটে ব্যবহৃত রঙ ও নকশা বহুবিচিত্র হয়ে থাকে। প্রত্যেক জাতি বা দেশের স্মরণীয় ঘটনা, বিশেষ বিশেষ উৎসব ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে এবং জাতীয় ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁদের প্রতিকৃতিসহ বিভিন্ন



www.pathagar.com

ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে ডাকটিকিটে কেবল দেশের রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিকৃতি ছাপা হত। পরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায় হিসাবে দেশের নৈসর্গিক দৃশ্য, ঐতিহাসিক স্থাপত্যের দৃশ্য, জীবজন্তু, ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদি ছবি সংবলিত ডাকটিকিটও ছাপা হয়। দেশের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও নেতাসহ স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু-বার্ষিকীতেও ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। টিকিট যাতে জাল করা না যায় সে জন্য প্রথম থেকেই এটি জলছাপ দেবার উপযোগী বিশেষ কাগজে মুদ্রিত হত।

ডাকটিকিট সংগ্রহ বর্তমানে একটি জনপ্রিয় শখ। ইংরেজিতে একে ফিলাটেলি (philately) বলা হয়। সংগ্রহকারীরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের পুরনো, নতুন, ব্যবহৃত, অব্যবহৃত ডাকটিকিট সংগ্রহ করে এর ইতিহাস এবং বিভিন্ন দেশের ডাকচিহ্ন (postmarks) খাম ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে থাকেন। কোনো দেশের একটি নতুন টিকিট বের হলে সে দেশের লোক চিঠিপত্রে তা ব্যবহার করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিকিট সংগ্রহকারীরা সেই টিকিট সংগ্রহ করতে উৎসাহী হয়। অনেকে বন্ধু-বান্ধব বা টিকিটের দোকান থেকে তা সংগ্রহ করে। পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট অনেক সময় উচ্চ মূল্যে সংগ্রহ করতে হয়। প্রত্যেক দেশের ডাক-ব্যবস্থায় একটি ফিলাটেলি বিভাগ থাকে। এই বিভাগের উদ্যোগে মাঝে মাঝে ডাকটিকিটের নিলাম হয়। নিলামে দেশের আগ্রহী ডাকটিকিট সংগ্রহকারীরা অংশগ্রহণ করেন।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হলে কতগুলো সরঞ্জাম দরকার হয়। এর জন্য সবচেয়ে জরুরি জিনিস হল একটি খাতা—যাকে বলা হয় স্ট্যাম্প অ্যালবাম (stamp album)। এই অ্যালবামের পাতায় টিকিট লাগিয়ে রাখতে হয়। পাতায় টিকিট লাগাবার জন্য ঘর কাটা থাকে। যত্নের সঙ্গে টিকিট সংরক্ষণ ও অ্যালবাম থেকে বার বার তুলে দেখবার সুবিধার জন্য হিঞ্জ (hinges) নামের বিশেষ এক ধরনের পাতলা কাগজে জড়িয়ে অ্যালবামে সাজিয়ে রাখতে হয়। অ্যালবামে টিকিট সাজাবার জন্য দেশ হিসাবে পাতা বরাদ্দ থাকে। তাতে দেশের নাম ও নমুনা হিসাবে দু'-একটি টিকিটের ফটোও ছাপানো থাকে।

অ্যালবাম ছাড়া একটি ট্রে (tray) দরকার হয়। ট্রের পানিতে ভিজিয়ে খামে আঁটা ডাকটিকিট তুলতে হয়। এর পর ডাকটিকিটের পিছনের আঠা ধুয়ে চোষকাগজ বা ব্লটিং পেপারের ওপর চেপে শুকিয়ে নিতে হয়। হাত দিয়ে টিকিট নাড়াচাড়া করলে ময়লা হয়ে যায় বলে টুইজার্স (tweezers) নামের এক ধরনের চিমটে দিয়ে টিকিট ধরার রীতি আছে। টিকিটের জলছাপ দেখবার জন্য ওয়াটার মার্ক ডিটেক্টর (water-mark detector) নামে বিশেষ এক রকম কালো ট্রে ব্যবহার করা যায়।

এভাবে ডাকটিকিট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ বলে এই শখকে 'খেয়ালের রাজা আর রাজা-রাজড়াদের খেয়াল' বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে ডাকটিকিট সংগ্রহ সারা দুনিয়ায় এক মজার খেয়াল হিসাবে স্বীকৃত। বয়স নির্বিশেষে ছোট-বড় অনেকেই ডাকটিকিট সংগ্রহ করে থাকে। ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ, রুমানিয়ার রাজা ক্যারল, স্পেনের রাজা আলফান্সো ও মিশরের রাজা ফুয়াদ ও তাঁর ছেলে ফারুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও নাৎসি (দ্র) জার্মানির শাসক হিটলার (দ্র) ডাকটিকিট সংগ্রাহক ছিলেন।

সুজ. ব.

**ডাকটিকিট সংগ্রহ** ডাকটিকিট দ্র

## ডাকব্যবস্থা

চিঠিপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন জিনিসের মোড়ক, টাকা ইত্যাদি ঠিকানা অনুযায়ী যথাস্থানে প্রেরণের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থাকে ডাকব্যবস্থা (postal system) বলা হয়। আর যে কার্যালয়ের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তার নাম ডাকঘর (post office)। পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশেই সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ডাকব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাচীন কালেও ডাকব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে জানা যায়। যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্মের ছয় শ' বছর আগেও প্রাচীন পারস্যে চিঠি বিলির ব্যবস্থা ছিল। সেখানে সরকারি কাজেও নিয়মিত বার্তা আদানপ্রদান চলত। ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে বাহকেরা ডাক আনা-নেওয়া করত। এদের বলা হত ডাকহরকরা (postman)। নির্দিষ্ট দূরত্বে তাদের দায়িত্ব বদল করারও



www.pathagar.com

ব্যবস্থা ছিল।

রোম সাম্রাজ্যের ডাকব্যবস্থাও বেশ উন্নত ছিল। রোমে ঘোড়সওয়ারেরা বড় বড় রাজপথ দিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে চিঠি বিলি করত। মাঝপথে কোথাও কোথাও ডাকঘর ছিল। ডাকঘরে সওয়ার বদল হত। ১২৮০ সালে মার্কো পোলো (দ্র) যখন চীনে (দ্র) যান, তখন সেখানে দশ হাজারেরও বেশি ডাকঘর ছিল বলে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে সাম্রাজ্যের সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য সরকারি ডাক-চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল বলে জানা যায়। আলাউদ্দীন খলজির (দ্র) শাসন আমলে (১২৯৬—১৩১৬ খ্রি.) সামরিক বার্তা বিনিময়ের প্রয়োজনে ডাক-চৌকির প্রচলন ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলেও (১৩২৫—৫১) ডাক-চলাচল ছিল। তখন অশ্বারোহী ডাকবাহক প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) অন্তর এবং ডাকহরকরা প্রায় ২ কিলোমিটারের (১ মাইল) মধ্যে তিন বার বদল হত।

শেরশাহের (দ্র) রাজত্বকালে (১৫৪০—৪৫) ডাক-ব্যবস্থার আরো উন্নতি হয়। তাঁর নির্মিত রাস্তা ও পান্থশালাগুলো ডাক-চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। মোগল আমলেও সরকারি ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা ছিল।

ইংল্যাণ্ডেও এরূপ ডাকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সেখানে ১৬৫৭ সালে ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন ও ১৮৪০ সালে পেনি মূল্যের ডাকটিকিটের (দ্র) প্রচলন হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রে ডাকটিকিটের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৪৭ সালে। ইউরোপীয় মূল ভূ-খণ্ডে ১৮৬০—৬১ সাল পর্যন্ত ডাকব্যবস্থা ছিল অশ্ববাহিত। ১৮৬২ সালে সেখানে রেলযোগে ডাক-চলাচল শুরু হয়।

ভারতবর্ষে ডাক-চলাচলের নানাবিধ উন্নতি সাধন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ওয়ারেন হেস্টিংসের (দ্র) সময়ে একটি চিঠির জন্য প্রতি এক শত মাইলে দুই আনা মাশুল ধার্য করা হয়। এদেশে তখনো ডাকটিকিটের প্রচলন হয় নি। নগদ পয়সায় মাশুল পরিশোধ করলে চিঠিতে তামার পাতের বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হত।

১৮৩৭ সালে ডাকের নতুন আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আওতাধীন সমস্ত জায়গায় ডাকবহনের কর্তৃত্ব এককভাবে সরকারের ওপর ন্যস্ত হয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাকবহন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ডাক-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় লর্ড ডাল্‌হৌসীর (দ্র) শাসন আমলে (১৮৪৮—৫৬)। ১৮৫০ সালে ডাকব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য তিন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫৪ সালে বর্তমানে প্রচলিত ডাক ব্যবস্থার কাঠামো স্থির হয়। এই বছরই এক জন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে একটি প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে সর্বভারতীয় ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রদেশের ডাকবিভাগের প্রধান হন পোস্ট মাস্টার জেনারেল। ১৮৫৪ সালের ১লা অক্টোবর প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট চালু হয়। এই সঙ্গে চিঠির ওজন অনুসারে ডাকমাশুল পরিশোধের নীতি নির্ধারিত হয় এবং ডাকে দেওয়ার আগে চিঠিপত্রে প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট লাগাবার আদেশ হয়। ডাকটিকিট ছাড়া চিঠি ডাকে দিলে প্রাপকের কাছ থেকে দ্বিগুণ মাশুল আদায় করা হত। ভারতীয় উপমহাদেশে পোস্টকার্ডের প্রথম প্রচলন হয় ১৮৭৯ সালে।

ডাকঘরের প্রধান কাজ প্রাপকের নিকট চিঠি বিলি করা হলেও পরে অনুরূপ আরো অনেক কাজ এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮৩ সালে টেলিগ্রাফের (দ্র) কাজও এর মাধ্যমে শুরু হয়। এ ছাড়া ভি. পি. পার্সেল, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার বিক্রয়, সেভিংস ব্যাংক, মেয়াদী সঞ্চয় সার্টিফিকেট বিক্রয়, জীবন বীমা ইত্যাদি কাজও ডাকবিভাগের আওতাভুক্ত।

ডাকবিভাগ প্রাপকের নিকট দ্রুত চিঠি পৌঁছে দেওয়ার কাজে সর্বদা তৎপর। যানবাহনের উন্নতি এই কাজকে দ্রুততর করেছে। যেমন এখন আকাশযান, রেলগাড়ি (দ্র), মোটরগাড়ি (দ্র) এবং জাহাজ (দ্র) প্রভৃতি এই কাজের সহায়ক। পৃথিবীতে ভারতেই (দ্র) প্রথম ১৯১১ সালে ডাক বহনের জন্য আকাশযান ব্যবহার করা হয়। এলাহাবাদ ও নৈনি জংশনের মধ্যে আকাশপথে এই ডাক চলাচল হয়। ১৯২০ সালে আকাশযানে প্রথম নিয়মিত ডাক-চলাচল আরম্ভ হয় বোম্বাই ও করাচির মধ্যে।



www.pathagar.com

বর্তমানে চিঠিপত্র বাছাইয়ের কাজ এবং বিলি করার কাজ সহজতর ও দ্রুততর করার জন্য সব উন্নত দেশে পোস্টাল কোড প্রণালী (postal code) উদ্ভাবিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি ডাকঘরের জন্য একটি কোড নম্বর নির্ধারিত হয়। খামের ওপর প্রাপকের নাম ঠিকানার সঙ্গে চিঠি বিলিকারী ডাকঘরের কোড নম্বরটি উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশেও এই পোস্টাল কোড প্রণালী চালু হয়েছে।

একেক দেশের ডাকহরকরাগণ চিঠিপত্র বা দ্রব্যসামগ্রী প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একেকভাবে বয়ে নিয়ে যান। ফ্রান্সের ডাকহরকরাগণ ছোট স্যুটকেসে করে চিঠিপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী বহন করেন। স্পেনের ডাকহরকরাগণ ডাক বিলির কাজ করেন বাইসাইকেলে চেপে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ডাকহরকরাগণ এক হাতে ঠেলে নেওয়া যায় চার চাকার এমন এক ধরনের ছোট গাড়ি ব্যবহার করেন। মরু অঞ্চলের ডাকহরকরাগণের বাহন হল উট।

সুজ. ব.

**ডাকসু** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্র

## ডাকিনী

শিব বা দুর্গার অনুচরী। পিশাচী অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ডাকিনী আসলে 'ডাক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে 'ডাইনী' শব্দটি। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে ডাকিনী শক্তিদেবীর এক বিশিষ্ট যোগিনী সহচরী। তাঁর সঙ্গে আছেন হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী ও লাকিনী। এখন ডাকিনী রূপান্তরিত হয়ে যেমন ডাইনী হয়েছে, তেমনি শাকিনী হয়েছে শাঁকচুন্নী। বাংলা লোকগল্প আর রূপকথায় ডাক ও ডাকিনী ভূত-প্রেত-পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, অপস্মার, যক্ষ-রাক্ষস ইত্যাদির প্রতীকরূপে বর্ণিত আছে।

সুজ. ব.

**ডাচ্ আর্ট** ওলন্দাজ শিল্পকলা দ্র

**ডাডাবাদ** দাদাবাদ দ্র

## ডায়রিয়া (diarrhoea)

ডায়রিয়া বা উদরাময়ে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। ফলে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি (দ্র) ও খনিজ লবণ (দ্র) বেরিয়ে গিয়ে শরীরে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটের অসমতা সৃষ্টি করে। গুরুতর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে চোখ বসে যাওয়া, জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, মূত্র নির্গমন হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি ঘটে, রক্তচাপ ও শরীরের ওজন কমে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ডায়রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। সাধারণত খাদ্যগ্রহণজনিত ত্রুটি, পরিপাক-নালির সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে স্বল্পস্থায়ী ডায়রিয়া ঘটে। দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার জন্য যে সকল কারণ দায়ী, সেগুলো হল— ভাইরাস (দ্র), জীবাণু (দ্র) এবং পরজীবী (দ্র) সংক্রমণ, ভারি ধাতবপদার্থের বিষক্রিয়া, এন্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধের প্রতিক্রিয়া, যকৃতের (দ্র) প্রদাহ, পিত্তনালির প্রতিবন্ধকতা, অপুষ্টিজনিত অসুখ, যেমন— ম্যারাস্মাস (marasmus), কোয়াশিওর্কর (kwashiorkor), খাদ্যের প্রতি এলার্জি (দ্র) ইত্যাদি।

শরীরে প্রয়োজনীয় পানি এবং খনিজ লবণ সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়াজনিত শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর মাধ্যমে ডায়রিয়াগ্রস্ত রোগীর শরীরে পানি ও খনিজ লবণের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি খাবার স্যালাইন পাওয়া যায়। অবশ্য তিন আঙুলের এক চিমটে লবণ এবং এক মুঠো গুড় আধা সের বিশুদ্ধ পানিতে মিশিয়েও ঘরে স্যালাইন তৈরি করে রোগীকে খাওয়ানো যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে শিরাপথে স্যালাইন পরিভরণের প্রয়োজন হয়।

সি. না. হ.

## ডায়াটম্ (diatom)

ডায়াটম্ এককোষী অ্যালজি (algae) বা শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ। মিঠা পানি ও লোনা পানিতে এদের সর্বত্র সচরাচর দেখা যায়। এর দেহপ্রাচীর সিলিকা (silica) বা বালিমিশ্রিত রসায়ন দ্বারা গঠিত। এই প্রাচীর দুই অর্ধে বিভক্ত এবং একটির উপর অপরটি যেন বাক্সের ঢাকনার মতো আটকে থাকে। আবার এই প্রাচীর সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকাজমণ্ডিত।

ডায়াটম্ বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য। ডায়াটমের দেহনিঃসৃত ক্ষরণ মাটিতে মিশে এক ধরনের খনিজ রূপ পায়। একে ডায়াটোমাইট বা ডায়াটোম্যাসিয়াস মাটি (diatomaceous earth) বলা হয়। এর অন্য নাম কিসেল্গুর (kieselguhr)। নাইট্রোগ্লিসারিন নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে



www.pathagar.com

কিসেল্‌গুরের সংমিশ্রণ ঘটালে ডিনামাইট (দ্র) তৈরি হয়।

ডায়াটম্‌কে ন্যাসা-প্লাঙ্কটনও বলা হয়। পানিতে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্লাঙ্কটন (দ্র) বলা হয়। প্লাঙ্কটনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বা ৬০ মাইক্রনের চেয়ে ক্ষুদ্র যারা তাদেরকে ন্যানোপ্লাঙ্কটন বলে। এক ইঞ্চির ছাব্বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ হল এক মাইক্রন।

ত. চ.

## ডায়াবেটিস (diabetes)

শরীরে ইনসুলিন (দ্র) নামক হরমোনের (দ্র) অভাবে কিংবা শরীরে ইনসুলিনের যথার্থ সদ্ব্যবহার না হলে রক্তে শর্করার মাত্রাবৃদ্ধিজনিত কারণে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়। ডায়াবেটিস রোগ বহুমূত্র বা মধুমেহ নামে পরিচিত। ইনসুলিন অগ্ন্যাশয়ের (দ্র) 'বিটাকোষ' থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস রোগে দৈহিক দুর্বলতা, মূত্রের সঙ্গে শর্করা নির্গমন, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা পাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ না করা হলে তা থেকে গুরুতর উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—শরীরে কোনো ঘা শুকোতে দেরি হওয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের বা দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ইত্যাদি।

ডায়াবেটিস নিরাময়যোগ্য নয়। তবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়; এবং তখন দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব। ডায়াবেটিসগ্রস্ত রোগীর জন্য দরকার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনবোধে ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসবিরোধী ঔষধ গ্রহণ। মাঝে মাঝে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। রোগীর দাঁত ও মুখের যত্নে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া, ডায়াবেটিসের নানান শারীরিক জটিলতার ব্যাপারে অবগত থাকা এবং নিজে নিজেই মূত্রে শর্করার মাত্রা নির্ণয় করতে জানা উচিত। তবে প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

সি. না. হ.

## ডায়েরি

এক জন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি বিষয় এবং সমকালের নানা ঘটনা, গল্প ও কাহিনীর আকার নিয়ে ডায়েরি গড়ে ওঠে। সাহিত্যের অঙ্গনে ডায়েরি ও জার্নাল প্রায়ই সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর রচনাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। এক. যেখানে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত বিষয় প্রাধান্য পায়; দুই. যেখানে বাস্তবভিত্তিক গল্প ও কাহিনীর পরিবেশন মুখ্য হয়ে ওঠে। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষার ব্যঙ্গরচয়িতা জোনাথন সুইফ্‌ট্‌ (দ্র), রুশ ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক লিয়েফ্‌ তল্‌স্তোয় (দ্র) এবং ফরাসি ভাষার নোবেল পুরস্কার (দ্র) বিজয়ী ঔপন্যাসিক-দার্শনিক অঁদ্রে জিদ্‌ (দ্র) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজ লেখক জন ইভ্‌লিন্‌ (John Evelyn : ১৬২০—১৭০৬) এবং স্যামুয়েল পেপিস (Samuel Pepys: ১৬৩৩—১৭০৩) তাঁদের জার্নাল ও ডায়েরি দ্বারা সাহিত্যের এই শাখাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'ছিন্নপত্র'কে আমরা ডায়েরি জাতীয় রচনা বলে অভিহিত করতে পারি।

ক. চৌ.

## ডায়োড (diode)

ডায়োড এমন ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা সংযুক্তি যাতে দু'টি ইলেক্ট্রোড (তড়িৎদ্বার) থাকে। দু'টি ইলেক্ট্রোড থাকে বলে এর নাম ডায়োড। দুই রকমের ডায়োড রয়েছে—ভ্যাকুয়াম ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োড। ভ্যাকুয়াম ডায়োডে ইলেক্ট্রোড দু'টিকে কোনো বায়ুশূন্য কাচপাত্র অথবা ধাতবপাত্র বা সিরামিক পাত্রে স্থাপন করা হয়। ১৯০৪ সালে ভ্যাকুয়াম ডায়োড আবিষ্কার করেন স্যার জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং (John Ambrose Fleming : ১৮৪৯—১৯৪৫)। ভ্যাকুয়াম ডায়োডের একটি ইলেক্ট্রোডকে উত্তপ্ত করলে তা ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে। একে বলা হয় ক্যাথোড (দ্র) বা ফিলামেন্ট। এটি নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ইলেক্ট্রোড। অপর ইলেক্ট্রোডটিকে বলা হয় অ্যানোড (দ্র) বা প্লেট। এটি পজিটিভ বা ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড। একে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অ্যানোডকে ক্যাথোডের সাপেক্ষে ধনাত্মক রাখা হলে ক্যাথোড যে ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে তা অ্যানোড আকর্ষণ করে। ফলে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে ইলেক্ট্রনের প্রবাহ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ



www.pathagar.com

চলে। কিন্তু অ্যানোডকে ঋণাত্মক রাখা হলে এটি ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেক্ট্রনকে বিকর্ষণ করে। ফলে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে কোনো তড়িৎপ্রবাহ চলে না। সুতরাং দেখা যায়, ইলেক্ট্রনের শুধু একমুখী প্রবাহ ঘটে। এই জন্যই একে বলা হয় ভাল্‌ভ্। প্লেট ও ফিলামেন্টকে যদি ব্যাটারি (দ্র) দ্বারা যুক্ত না করে কোনো এ.সি. ভোল্টেজে জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে এ.সি. থেকে ডি.সি. ভোল্টেজ পাওয়া যায়। অর্ধপরিবাহী ডায়োড একটিমাত্র p-n জংশন দ্বারা গঠিত।

শা. ত.

## ডার্‌উইন্, চার্ল্‌স্ [১৮০৯—১৮৮২]

চার্ল্‌স্ ডার্‌উইন্ (Charles Darwin) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) মতবাদের প্রবক্তা। ১৮৩১ সালে এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্ (H.M.S. Beagle) নামক জাহাজে চড়ে তিনি পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ-দ্বীপাঞ্চল ভ্রমণ করেন। এ

নিজের গবেষণাগারে ডার্‌উইন্

সময় তিনি অসংখ্য প্রাণী (দ্র) ও উদ্ভিদের (দ্র) নমুনা সংগ্রহ করেন এবং অভিনিবেশ সহকারে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা ও তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি এই পথ পরিভ্রমণ করেন। পরবর্তী কালে সংগৃহীত এসব নমুনার বৈশিষ্ট্য দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাংলায় একে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে' নামে অভিহিত করা যায়। সংক্ষেপে তাঁর এই তত্ত্বকে 'প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব' বলা হয়। বইটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জীবজগতের বিবর্তন এবং নতুন একটি প্রজাতির উদ্ভব কীভাবে ঘটে বা ঘটতে পারে সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন ও তার সপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ সময় থেকেই তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিবর্তনবাদের জনক হিসাবে তিনি পরিচিতি পান। চার্ল্‌স্ ডার্‌উইন্ ১৮০৯ সালে লণ্ডনের শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ সালে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।

ত. চ.

## ডাল

কৃষিজাত সব রকম ডাল শিম-গোত্রের অন্তর্গত। গোত্র লেগুমিনোসি (Leguminoseae)। সব রকম ডাল মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ডাল প্রোটিনপ্রধান খাদ্য। প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১৭ থেকে ২৮ ভাগ। এতে গমের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ও চালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ প্রোটিন আছে। এখানে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট (দ্র) ও স্নেহজাতীয় পদার্থের শতকরা পরিমাণ দেওয়া হল :

| | প্রোটিন | কার্বোহাইড্রেট | স্নেহজাতীয় পদার্থ | অজৈব লবণ |
|---|---|---|---|---|
| খেসারি | ২৮.২ | ৫৮.২ | ০.৬ | ৩.০ |
| ছোলা | ১৭.১ | ৬১.২ | ৫.৩ | ২.৭ |
| মটর | ১৮.৬ | ৫৮.৬ | ০.৫ | |
| অড়হর | ২২.৩ | ৫৭.২ | ১.৭ | ৩.৬ |
| কলাই | ২০.০ | ৫৮.৮ | ১.৬ | |
| মসুর | ২৫.১ | ৫৯.৭ | ০.৭ | ২.১ |
| মুগ | ২০.৮ | ৬০.৬ | ০.৫ | |

ডালের প্রোটিন শতকরা ৮০ ভাগ পাচনতন্ত্রে পরিপাকের পর রক্তে বিশোধিত হয়। কিন্তু খাদ্যমূল্যের দিক থেকে এই প্রোটিন মাছ (দ্র), মাংস, ডিম (দ্র) বা দুধের (দ্র) প্রোটিনের



www.pathagar.com

তুলনায় নিকৃষ্ট, কারণ ডালের বিভিন্ন প্রোটিনে কোনো কোনো অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব আছে। তবে ডালের সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করলে সে সকল খাদ্যের প্রোটিনের সঙ্গে ডালের প্রোটিনের ঐ অভাব পূরণ হয়। ডালে লোহার পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় বেশি। উল্লেখযোগ্য ভিটামিনের (দ্র) মধ্যে আছে বি ভিটামিন এবং ভিটামিন এ, সি, এবং ই। আবার অঙ্কুরিত ছোলা, মসুর ও কলাইতে প্রোটিনের খাদ্যমূল্য বেড়ে যায়, কিন্তু মুগ ও মটরে কমে যায়। মাছ, মাংস ইত্যাদি আমিষ খাদ্যের তুলনায় ডালের দাম কম। সে জন্য ডালকে গরিবের মাছ-মাংস বলে। এক কেজি ডালে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায় সে পরিমাণ ডাল থেকে যত কিলো ক্যালরি (দ্র) শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তার সমপরিমাণ শক্তি উৎপাদন করার মতো মাংস কিনতে ব্যয় হয় ডালের চার গুণ। সে জন্য সব দেশেই মধ্যবিত্ত পরিবারে উচ্চবিত্ত পরিবারের তুলনায় অনেক বেশি ডাল খাওয়া হয়। দৈনিক গড়ে ২৫–৩৫ গ্রাম ডাল জাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত।

ডাল এসেছে আর্যদের ভারতে আগমনের ফলে। প্রাচীন কালে বাংলায় ডালের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বাংলায় ডালের প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় ডাল উৎপাদন হয় অনেক কম। এ জন্য বিদেশ থেকে আমাদের দেশে প্রচুর ডাল আমদানি করতে হয়। ডালগাছের মূল নাইট্রোজেন (দ্র)-কে ধরে রাখতে পারে। এই কারণে মাটি উর্বরা করতে শিম-গোত্রের ফসল চাষ করা ভাল।

আমাদের দেশের প্রধান কয়েকটি ডালের বর্ণনা:

খেসারি : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *লাথিরাস সাতিভাস (Lathyrus sativas)*। ল্যাথারিজ্‌ম্ রোগে নিম্নাঙ্গ অবশ হওয়ার জন্য খেসারির ডালের দুর্নাম আছে। এখন জানা যায়, খেসারির সঙ্গে একত্রে আকটা *(ভিসিয়া সাতিভা—Vicia sativa)* নামক আগাছার বিষাক্ত উপক্ষার এই রোগের কারণ। আগাছাগুলো সময় মতো তুলে ফেললে এই রোগ আর হয় না। অথবা ডালকে ধানের মতো অল্প সেদ্ধ করে শুকিয়ে নিলে এই রোগ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ধান কাটার আগে ধান গাছের ফাঁকে বীজ বপন করতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই ফসল তোলা হয়।

মটর : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। মটর দু'রকম—ছোট বা পায়রা মটর, বড় বা কাবুলি মটর। ছোট মটরের ফুল নীলাভ-বেগুনি, বীজের রঙ প্রায় ধূসর। সবুজ অবস্থায় পুষ্ট দানা মটরশুঁটি (দ্র) বা কলাইশুঁটি হিসাবে খুব উপাদেয়। পৃথিবীর সব দেশে এই অবস্থায় সংরক্ষণ করে সারা বছর খাওয়ার প্রচলন আছে। রবিশস্য হিসাবে মটরের চাষ হয়। ফাল্গুন-চৈত্রে পাকা ফসল তোলা হয়। ডাল হিসাবে মটর অত্যন্ত উপাদেয়। মটর থেকে ঘুঘনি, আলু-কাবলি ও চটপটি হয়। মটর পশুখাদ্যও।

মসুর : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *লেন্স্ কুলিনারিস্ (Lens culinaris)*। বড় দানা ও ছোট দানা দু' রকম মসুর আছে। শীতকালে রবিশস্য হিসাবে সেচ ছাড়া এর চাষ হয়। সম্পূর্ণ পাকার আগে গাছ তুলে এক সপ্তাহ শুকিয়ে মাড়াই করা হয়। গুরুত্বের দিক থেকে মুগের পরে মসুরের স্থান। বাংলাদেশের (দ্র) সর্বত্র এটি জন্মে।

মাসকলাই : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *ফসেওলস্ মুঙ্গো ভার্ রাদিয়াতাস্ (Phaseolus mungo var radiatus)*। এর খোসার রঙ কালো, কখনো কখনো সবুজাভ। বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এর প্রকৃতি মুগের মতো। চাষের জন্য জমি তৈরি করা, ফসল তোলা একই রকম। তিন মাসে ফসল পাকে। এর বড়ি ও পাঁপড় খুব ভাল। গাছ সবুজ সার হিসাবে উপযোগী।

মুগ : বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *ফাসেওলস্ অরেয়াস্ (Phaseolus aureus)*। সবুজ খোসাওয়ালা কলাইকে মুগকলাই এবং যে জাতের খোসা সোনালি সবুজ হয় তাকে সোনামুগ বলা হয়। স্বাদে সোনামুগ উৎকৃষ্ট এবং ডালের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এই ডাল কাঁচা ভিজিয়ে নারকেল ও চিনিসহ খেতে উত্তম। বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। ৬০ দিনে ফুল আসে এবং তারপর ৩০ দিনের মধ্যেই পেকে যায়। ফসল কেটে এক সপ্তাহ শুকিয়ে মাড়াই করা হয়। এর দানা ও খড়ের উৎপাদন প্রায় সমান সমান। শিম-গোত্রের সব ডালের গাছ থেকে সবুজ সার হয়।

শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির শতকরা ৪ ভাগ ডাল থেকে গ্রহণ করা সম্ভব। ডালের মধ্যে মসুর ও মাসকলাই আমিষ বলে গণ্য। এ জন্য নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা তা ব্যবহার করেন না। দেবতার কাজেও এর ব্যবহার হয় না।



www.pathagar.com

হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুগ ও খেসারির ব্যবহার হয়। খেসারির ডাল সাধারণত শাক-সবজির সঙ্গে রান্না করার নিয়ম আছে।

ডাল থেকে নানা রকম মিষ্টি তৈরি হয়। শবে বরাতের (দ্র) দিন ডাল দিয়ে হালুয়া-মিষ্টি তৈরি করার রেওয়াজ আছে।

বি. ব.

**ডাল্‌হৌসী, লর্ড** [১৮১২—১৮৬০]

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গভর্নর জেনারেল। জন্ম ১৮১২ সালের ২২শে এপ্রিল। পুরো নাম জেম্‌স্ এণ্ড্রু ব্রাউন র‍্যামজি ডাল্‌হৌসী-এর ১ম মার্কুইস (James Andrew Broun Ramsay, Ist. Marquess of Dalhousie)।

ডাল্‌হৌসী ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি হাউস অব লর্ডসের সদস্য হন এবং ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নিয়ে এই উপমহাদেশে আসেন।

লর্ড ডাল্‌হৌসী ১৮৪৮–৪৯ সালে ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের মাধ্যমে রেঙ্গুন, পেগু ও প্রোম অঞ্চল দখল করেন। এর পর তাঁর উদ্যোগে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হলে সেখানে ব্রিটিশ-প্রভাব সুদৃঢ় হয়। দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা করার অজুহাতে তিনি অযোধ্যা ও সিকিম অধিকার করেন।

ইংরেজ আশ্রিত কোনো রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর রাজত্ব ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসবে এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করা যাবে না—এই মর্মে তিনি স্বত্ববিলোপনীতি নামে একটি আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন। এই আইন অনুসারে সাতরা, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈতপুর ও সম্বলপুর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এভাবে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্বে ইরাবতীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে ডাল্‌হৌসী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় আইন কাউন্সিল গঠন এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলায় বিভক্ত করেন। বিখ্যাত 'হিন্দু বিধবা বিবাহ' আইন প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ স্থাপন করেন। তাঁর শাসনামলে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ (দ্র) ও ডাকটিকিটের (দ্র) প্রচলনসহ অল্প মাশুলে ডাক-যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি ১৮৫৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (সিভিল সার্ভিস) মাধ্যমে ভারতে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের রীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশে এক জন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়।

তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি করা হলেও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ১৮৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন। ১৮৬০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

ডাল্‌হৌসীর প্রশাসনিক নীতিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত বিবেচনা করলেও ঐতিহাসিকগণ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের (দ্র) কারণ হিসাবে তাঁর পর-রাজ্য-অধিকারনীতি ও স্বত্ববিলোপনীতিকে অনেকাংশে দায়ী করে থাকেন।

সুজ. ব.

**ডাস্ কাপিটাল্**

জার্মান 'Das Kapital' এক যুগান্তকারী দার্শনিক-ইতিহাসতত্ত্ব-রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত মহাগ্রন্থ। ইংরেজি অনুবাদে এর সরল সাধারণ নামকরণ The Capital; বাংলায় বলা হয় 'পুঁজি'।

জার্মান দার্শনিক কার্ল্ মার্ক্স (দ্র) এগ্রন্থের রচয়িতা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও আজীবন সঙ্গী ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্ (দ্র) বইটির কিছু অংশ সম্পাদনা করেন। জার্মান ভাষায় মোট ৩ খণ্ডে যথাক্রমে ১৮৬৭, ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়, এবং ইংরেজি অনুবাদ বেরয় যথাক্রমে ১৮৮৬, ১৯০৭ ও ১৯০৯ সালে। পৃথিবীর (দ্র) খুব কম ভাষাই আছে যাতে 'ডাস্ কাপিটাল্' সম্পূর্ণ বা আংশিক অনূদিত হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তায় এই বইটির প্রভাব এত গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

হা. মা.

**ডি এন এ** জীন দ্র

**ডি এফ পি** চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর দ্র



www.pathagar.com

## ডি ভ্যালেরা, এয়মন্ [১৮৮২—১৯৭৫]

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) নিউইয়র্ক (দ্র) শহরে, ১৮৮২ সালের ১৪ই অক্টোবর।

স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত সঙ্গীতজ্ঞ পিতার মৃত্যুর পর ডি ভ্যালেরা (Eamon de Valera) মায়ের তরফের আত্মীয়স্বজনদের কাছে বসবাস করার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের লিমেরিক শহরে চলে আসেন। ১৯০৪ সালে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে স্নাতক হন।

১৯১৩ সালে তিনি আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে ব্যর্থ ডাবলিন ইস্টার অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে আইরিশ স্বেচ্ছাসেবীদের একটি ব্যাটেলিয়ানের নেতৃত্ব দেন এবং এতে অংশ গ্রহণের অভিযোগে ধরা পড়লে তাঁকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু পরে এই দণ্ড মওকুফ করে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯১৭ সালে সাধারণ ক্ষমাবলে তিনি ডার্টমুর কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯১৭থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ডি ভ্যালেরা সিন ফিন (Sinn Fein) আন্দোলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান আইরিশ রিপাবলিকান সরকারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ১৯২৬ সালে গঠন করেন 'ফিয়ানা ফাইল' (Fianna Fáil) বা আয়ার্ল্যাণ্ডের সৈনিক নামে একটি নতুন দল। এই দলের লক্ষ্য ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে বাকি অংশের সংযুক্তি সাধন এবং আইরিশ ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন।

১৯৩২ সালে তাঁর দল শ্রমিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট বেঁধে আয়ার্ল্যাণ্ডের নিম্ন পরিষদে (ডেইল) সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৩৭ সালে ভ্যালেরা আয়ার্ল্যাণ্ডের পূর্ণ সাবভৌমত্ব দাবি করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি পালন করেন আয়ার্ল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালের ২৯শে আগস্ট।

আ. হু.

## ডিকেন্স, চার্লস্ [১৮১২—১৮৭০]

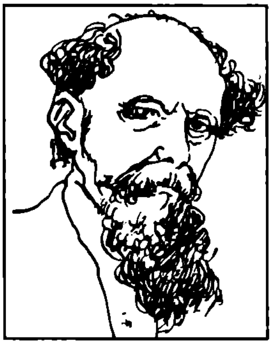

কালজয়ী ইংরেজ উপন্যাসিক। তিনি ১৮১২ সালে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল ছিল খুবই দুঃখময় ও দুর্দশায় ভরা।

ডিকেন্সের (Charles Dickens) বয়স যখন দশ, তখন তিনি লণ্ডনের ইঁদুরের উৎপাতে-ভরা একটি দোকানে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তাঁকে জুতো রঙ করার কালির পাত্রে লেবেল লাগাতে হত। ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় এই সময় তাঁর পিতা ছিলেন কারাগারে। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করে পিতা কারাগার থেকে মুক্ত হলে ডিকেন্স স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেন। দু' বছর পড়াশোনা করার পর ডিকেন্স এক জন আইনজীবীর আর্দালি হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ। উনিশ বছর বয়সে তিনি গ্রহণ করেন সাংবাদিকের পেশা।

ডিকেন্স যখন বিশ বছরের যুবক, তখন থেকেই তাঁর ধারাবাহিক লেখক-জীবনের শুরু। তাঁর শৈশব-কৈশোরকালের আনন্দ-বেদনা মেশানো ঘটনা এবং ওই সময় যাদের তিনি গভীরভাবে জেনেছিলেন, সেসব কিছুই তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে ওঠে।

শেষ জীবনে ডিকেন্স তাঁর গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রাচুর্যে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। সফর করেন প্রায় সমগ্র ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা (দ্র)। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। কৈশোরকালের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী লণ্ডনে তৈরি করেন মনের মতো একটি বাসগৃহ।



www.pathagar.com

তাঁর বিখ্যাত ও প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্ম (প্রধানত উপন্যাস) হচ্ছে 'পিকউইক পেপাস্'(Pickwick Papers), 'অলিভার টুইস্ট' (Oliver Twist) (দ্র), 'নিকোলাস নিকোলবি', 'এ ক্রিস্মাস ক্যারল' (A Chirstmas Carol), 'ডেভিড্ কপার্ফিল্ড্' (David Copperfield) (দ্র) এবং 'এ টেইল অব টু সিটিজ' (A Tale of Two Cities) (দ্র) ইত্যাদি।

চার্লস্ ডিকেন্স লণ্ডনে ১৮৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

## ডিজ্নি, ওয়াল্ট্ [১৯০১—১৯৬৬]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় কার্টুন চলচ্চিত্র-নির্মাতা। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) শিকাগো শহরে ১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর।

ওয়াল্ট্ ডিজ্নি (Walt Disney) প্রথম কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণ-কাজ শুরু করেন ১৯২৩ সালে। প্রাথমিকভাবে তিনি ছোট মজাদার কোনো গল্পের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেশ কয়েকটি কার্টুন চিত্র নির্মাণ করেন। এ কাজে সফল হলে এবং কিছুটা জনপ্রিয়তা পেলে তিনি 'মিকি' নামের একটি নেংটি ইঁদুরের চরিত্র সৃষ্টি করে তৈরি করেন বিখ্যাত কার্টুন চলচ্চিত্র 'মিকি মাউস'। এই ছবিটিই তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত ও বিত্তবান করে তোলে।

'মিকি'কে প্রধান চরিত্র করে তিনি তাঁর তৃতীয় কার্টুন চলচ্চিত্র 'স্টিমবোট উইলি' নির্মাণ করেন। এই ছবিতেই তিনি সর্বপ্রথম শব্দ ও চরিত্রগুলোর মুখে সংলাপ সংযোজন করেন।

ডিজ্নি চলচ্চিত্রজগতে পথিকৃৎ হয়ে আছেন বিশ্বে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কার্টুন ছবি নির্মাণ করে। ১৯৩০-এর দশক থেকে তাঁর কয়েকটি কার্টুন ছবির প্রধানতম চরিত্র নেংটি ইঁদুর 'মিকি' বিশ্বব্যাপী তারকার খ্যাতি অর্জন করে।

ওয়াল্ট্ ডিজ্নির বিখ্যাত কার্টুন ছবিগুলোর মধ্যে

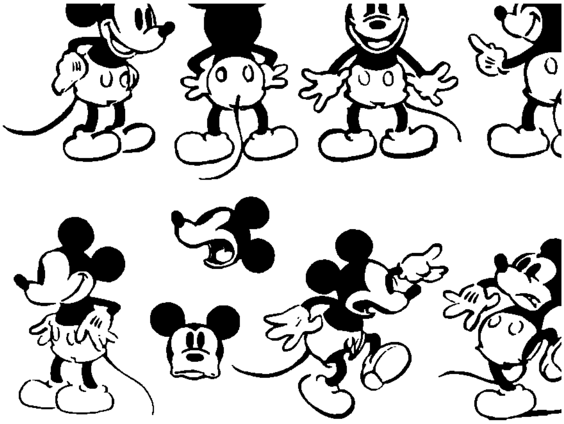

*ডিজ্নির সৃষ্টি 'মিকি মাউস' : নানা রকম ভঙ্গিমায় অসংখ্য ছবি আঁকতে হয়েছে এই ইঁদুর ছানার*

অন্যতম 'সিলি সিম্ফোনিজ', 'ডোনাল্ড ডাক অ্যাণ্ড প্লুটো', 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দ্য সেভেন ডর্ফস্', 'পিনোচ্চিও', 'ফ্যান্টাসিয়া', 'ডাম্বো', 'বাম্বি', 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড', 'পিটার প্যান' এবং 'দ্য জাঙ্গ্ল্ বুক'।

তিনি জীবন্ত চরিত্র নিয়েও বেশ কিছু পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' (দ্র), 'টোয়েন্টি থাউজাণ্ড লিগ্স্ আণ্ডার দ্য সি' এবং 'দ্য লিভিং ডেজার্ট' ইত্যাদি। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নতুন নতুন কারিগরি কলাকৌশল উদ্ভাবন ও তার

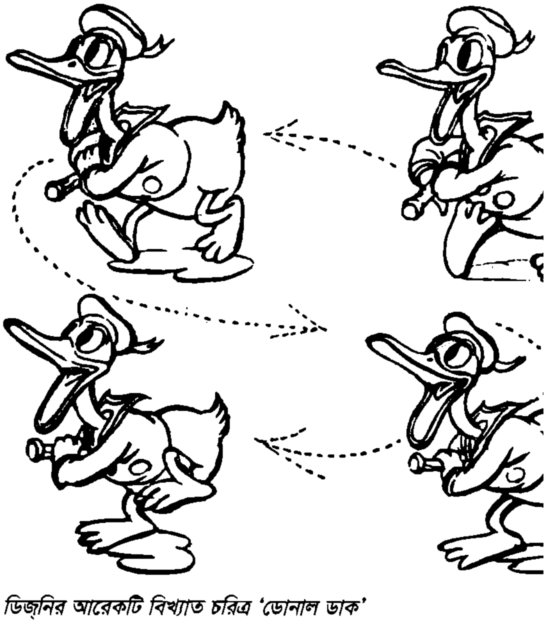

*ডিজ্নির আরেকটি বিখ্যাত চরিত্র 'ডোনাল ডাক'*



www.pathagar.com

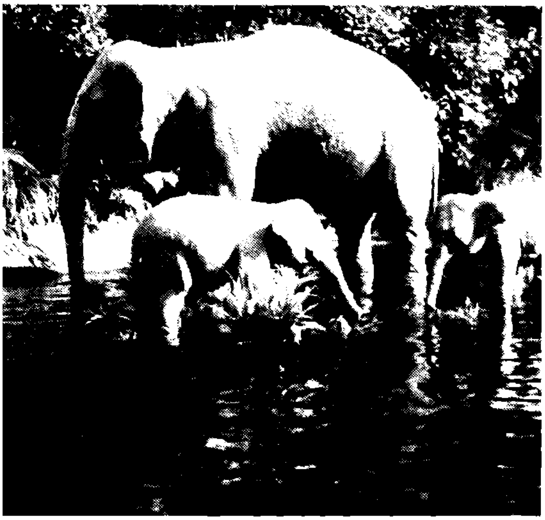

*উপরে : টোকিও ডিজ্‌নিল্যাণ্ডে ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড এবং মাঝের ছবিতে হাতি ও নিচের ছবিতে হা করা জলহস্তী*

প্রয়োগ-কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি ৩০ বার একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি একটি রেকর্ড। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য সব বয়সের চলচ্চিত্র দর্শকদের নির্মল আনন্দ দান। ভাষা নির্বিশেষে সারা বিশ্বের শিশু-কিশোরেরাই তাঁর চলচ্চিত্রের পয়লা নম্বরের ভক্ত।

তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন 'ডিজ্‌নিল্যাণ্ড' ও 'ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড' (দ্র) নামের দু'টি অপরিসীম আনন্দদায়ক উদ্যানের পরিকল্পক ও নির্মাতা হিসাবেও।

১৯৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আ. হ.

## ডিজ্‌নিল্যাণ্ড ও ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) দু'টি বিখ্যাত পার্ক বা উদ্যান। এর পরিচালক ও নির্মাতা বিখ্যাত মার্কিন কার্টুন চলচ্চিত্র-নির্মাতা ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি (দ্র)। প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ দর্শক এ দু'টি উদ্যান পরিদর্শন করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

'ডিজ্‌নিল্যাণ্ড' (Disneyland)-এর উদ্বোধন করা হয় ১৯৫৫ সালে। ডিজ্‌নিল্যাণ্ড অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আনাহাইমে। 'ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড'-এর উদ্বোধন করা হয় ওর্লাণ্ডোতে ১৯৭১ সালে।

উদ্যান দু'টি মোট ২৭ হাজার একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। ১৯৭৮ সাল নাগাদ ৭ কোটিরও বেশি দর্শক এই দু'টি উদ্যান পরিদর্শন করেন। এদের মধ্যে শিশু-কিশোরদের সংখ্যাই বেশি।

ওয়াল্ট্‌ ডিজ্‌নি যেসব বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং তাতে যেসব চরিত্র যে পরিবেশে অভিনয় করে, সেইসব চরিত্র কৃত্রিমভাবে তৈরি করে হুবহু একই ধরনের বাস্তব পরিবেশে এখানে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া এ দু'টি উদ্যানের প্রধানতম আকর্ষণের কেন্দ্রগুলো হচ্ছে 'ফ্যান্টাসিল্যাণ্ড', 'অ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ড', 'ফ্রন্টিয়ারল্যাণ্ড' এবং 'টুমরোল্যাণ্ড' ইত্যাদি।

আ. হ.



www.pathagar.com

## ডিজাইন

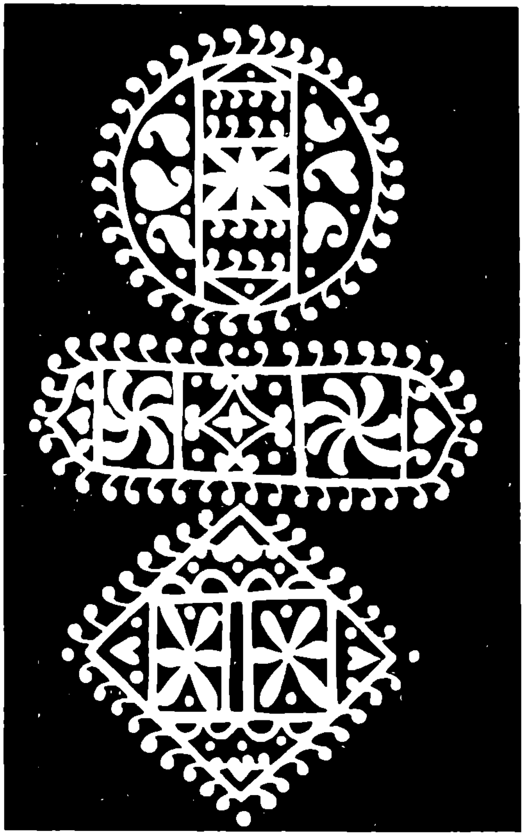

ডিজাইন (design) বা নকশা মূলত বিশেষ পদ্ধতির ড্রয়িংনির্ভর অলঙ্করণ-চিত্র। ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে যে কোনো আকৃতি ফুটিয়ে তুলে তা একাধিক বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করলে চিত্রপটে অর্থাৎ কাগজ, বোর্ড বা মোটা কাপড়ের (ক্যানভাস) উপরে তা আকর্ষণীয় একটি ছবির মতো লাগে—সাধারণভাবে তা-ই হচ্ছে নকশা বা ডিজাইন। নকশার জন্য চিকন রেখা সব সময় প্রয়োজন হয় না। মোটা তুলির ঘন পোঁচ দিয়েও আলপনার (দ্র) মতো নকশা আঁকা যায়। আলপনাও এক ধরনের নকশা।

সরলরেখার সাহায্যে চমৎকার নক্‌শা হতে পারে। তবে বক্ররেখার ব্যবহার নকশার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি। বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্ত, কোণ বা মোচাকার আকৃতি সবই ডিজাইন বা নকশায় বহুল ব্যবহৃত। বিভিন্ন বস্তু, প্রাণী (যেমন মাছ বা পাখি), গাছ, লতা-পাতা, ফুল প্রভৃতি সবই নকশাচিত্র রচনার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধরন হিসাবে শিল্পীদের প্রিয়।

নকশার নানা রকমফের রয়েছে। আবার নকশাধর্মী আকার-আকৃতির সফল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সৃজনশিল্পীরা অনেক সময় উন্নত মানের শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। নকশা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কিছুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে গৃহসজ্জা ও আহারাদির—বিশেষ করে বিস্কুট, মিষ্টি, পিঠাপুলি—সবকিছুতেই নকশা-রূপের ব্যবহার রয়েছে। সেলাই-ফোঁড়াই, মেহেদি বা আলতা পরানো অথবা বিভিন্ন আনন্দ-উৎসবে রঙিন কাগজে বাড়িঘর সাজানো কোনো কিছুই নকশা ছাড়া হয় না। আসল কথা, ব্যবহারিক কাজে নকশার প্রয়োজন খুব বেশি।

বাস্তব দৃশ্য থেকে অথবা কোনো বস্তুর গড়নের অনুকরণে তার প্রতীকী বা সংক্ষিপ্ত রূপাকৃতি নির্ধারিত ছক বা কাঠামোয় ফুটিয়ে তুললে তা নকশায় পর্যবসিত হয়। একেকটি নকশা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হলেও তা আসলে বৃহত্তর পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর অতি ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত রূপ।

আধুনিক যুগে নকশার নানান দিক উন্মোচিত হয়েছে। নকশা বলতে এখন চিত্রকর্মের খসড়া বা ধারণাও বোঝায়,



www.pathagar.com

যাকে 'প্রেস লে-আউট' বা 'লে-আউট' দুই-ই বলা চলে। নকশা সাদা-কালো থেকে শুরু করে বিচিত্র বর্ণে অঙ্কন করা সম্ভব। নকশি কাগজ কেটে আঠা সহযোগে অন্য কাগজে জুড়ে দিয়েও চমৎকার নকশা-কর্ম তৈরি করা যায়।

বাস্তবসম্মত কোনো বস্তু অথবা কোনো বাস্তব দৃশ্য সংক্ষিপ্তাকারে সুরুচিপূর্ণ কাঠামো-আদলে প্রকাশ করলে যথার্থ নকশা হিসাবে তা বিবেচিত হয়। গতিময় রেখা ও ছন্দ নকশার প্রাণ। নকশার পথ ধরেই অলঙ্কার, বুননশিল্প, সূচীশিল্প ও অন্যান্য প্রভৃত ব্যবহারিক শিল্প অথবা হস্তশিল্প গড়ে উঠেছে। এগুলি সবই মণ্ডন-শিল্প নামে আখ্যায়িত।

ম. আ.

**ডিজাইন সেন্টার** কামরুল হাসান দ্র

## ডিজেল

১৮৯২ সালে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার রুডোল্‌ফ্ ডিজেল (Rudolf Diesel) একটি অভিনব ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। এই ইঞ্জিনে স্পার্কপ্লাগ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। এটি একটি অন্তরিন্ধক ইঞ্জিন, যেখানে তেলকে ইন্ধন রূপে ফোঁটা ফোঁটা করে ছিটিয়ে দেওয়া হয় প্রচণ্ড চাপে উত্তপ্ত ও সিলিণ্ডারে আবদ্ধ বাতাসের মধ্যে। স্পার্কের পরিবর্তে এই উত্তপ্ত বাতাসই তেলকে দগ্ধ করে। এর ফলে সৃষ্ট চাপ পিস্টনকে চালনা করে। যে ধাপগুলো ডিজেল ইঞ্জিনে কাজ করে তা হল—

১. বাতাস ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে টেনে নেওয়া।

২. এই বাতাসকে সিলিণ্ডারে চেপে সঙ্কুচিত ও উত্তপ্ত করা এবং সেখানে তেল ছড়িয়ে দেওয়া।

৩. বিস্ফোরণ ঘটাবার ভিতর দিয়ে শক্তি প্রয়োগকারী ধাক্কা সৃষ্টি করা।

৪. দগ্ধ গ্যাসকে নিঃসরণ করা।

ডিজেল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ পাউণ্ড।

অনেক বাস, ট্রাক, লঞ্চ বা জাহাজ (দ্র) ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা হয়। অনেক সেমি ডিজেল ইঞ্জিনে উত্তপ্ত বাল্ব ব্যবহার করা হয় যাতে সিলিণ্ডারে এত বেশি চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

আ. আ.

**ডিটেকটিভ গল্প** গোয়েন্দা-গল্প দ্র

**ডিডিটি** কীটনাশক দ্র

**ডিনামাইট** গ্লিসারিন ও নোবেল দ্র

## ডিফথেরিয়া (diphtheria)

ডিফথেরিয়া রোগের কারণ 'করনিব্যাক্টেরিয়াম ডিফথেরি' (corynebacterium diphtheriae) নামক জীবাণুর সংক্রমণ। রোগীর গলা (ফ্যারিংস্), টনসিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গই প্রধানত ডিফথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। ফলে রোগীর শ্বাসকষ্ট, কাশি, স্বরবিকৃতি, মাঝে মাঝে বমি হওয়া ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দেয়। গুরুতর ক্ষেত্রে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা না করা হলে রোগীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে। গলা, টনসিল, স্বরযন্ত্র ছাড়াও রোগীর নাক (দ্র) এবং চোখ (দ্র) ডিফথেরিয়া জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

ডিফথেরিয়া সাধারণত শিশুদের হয়ে থাকে। তবে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের বেলায় ডিফথেরিয়ার প্রকোপ বিরল। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও ডিফথেরিয়া কদাচিৎ দেখা যায়।

ডিফথেরিয়ার চিকিৎসা হাসপাতালে করাই শ্রেয়। সাধারণত ডিফথেরিয়া-বিরোধী সেরাম (antitoxin serum) ও এণ্টিবায়োটিকের (দ্র) সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। ডিফথেরিয়া-প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। শিশুদের ডি পি টি টিকা দিলে এক সঙ্গে ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টঙ্কার (দ্র)—এই তিনটি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

সি. না. হ.

**ডিফো, ড্যানিয়েল্** রবিন্‌সন্ ক্রুসো দ্র

## ডিভাইন কমেডি, দ্য

'দ্য ডিভাইন কমেডি' ইতালীয় কবি দান্তে আলিগিয়েরি (দ্র) রচিত অমর মহাকাব্য (দ্র)। কাব্যটির মূল নাম 'দিভিনা কোমেদিয়া'; ইংরেজি-জানা জগতে ডিভাইন কমেডি নামেই পরিচিত।

একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং যোদ্ধা দান্তে ছিলেন মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। সমগ্র পৃথিবীতে ভালবাসার যেসব বাস্তব কাহিনী আছে তার



www.pathagar.com

মধ্যে দান্তের জীবনের কাহিনীটি যেমন মধুর তেমনি বিস্ময়কর। দান্তের বয়স যখন নয় বছর তখন তাঁর দেখা হয় বিয়াত্রিচে নামের একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির বয়সও নয় বছর। প্রথম দেখার সময় দু' জনের মধ্যে কোনো বাক্য-বিনিময় হয় নি। পরবর্তী সময়ে সারা জীবনে দু'-তিন বারের বেশি দান্তে ও বিয়াত্রিচের দেখাও হয় নি। কিন্তু দান্তে জানিয়েছেন যে প্রথম দেখার দিনই তিনি বিয়াত্রিচের প্রেমে পড়েন এবং ওই প্রেম তাঁর সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও মহান করেছে। বিয়াত্রিচে কিন্তু দান্তের এই একনিষ্ঠ ভালবাসার কথা কখনো জানতে পারেন নি। এক সময় দান্তে ও বিয়াত্রিচে দু' জনেরই বিয়ে হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। ১২৯০ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচে মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু দান্তে তাঁকে কখনো ভুলতে পারেন নি। বিশ বছর বয়সের সময় থেকে তিনি বিয়াত্রিচের উদ্দেশে কবিতা লিখতে শুরু করেন। 'দ্য ডিভাইন কমেডি'-র মধ্যেও বিয়াত্রিচের প্রসঙ্গ আছে।

কবি দান্তে

দান্তে ঠিক কখন 'দ্য ডিভাইন কমেডি' লিখতে শুরু করেন সুনিশ্চিতভাবে তা বলা যায় না। তবে ১৩২১ সালে মৃত্যুর কিছু কাল আগে তিনি এ মহাকাব্য সমাপ্ত করেন। দান্তের বেশ কিছু রচনা আছে লাতিন ভাষায়, কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দিভিনা কোমেদিয়া' নামক মহাকাব্যটি তিনি রচনা করেন তাঁর মাতৃভাষা ইতালীয়তে।

'দ্য ডিভাইন কমেডি'তে বিয়াত্রিচের প্রসঙ্গ থাকলেও এর বিষয়বস্তু কিন্তু প্রেম নয়। এখানে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির গভীর দার্শনিক চিন্তার অত্যন্ত সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। কাহিনীটি এই রকম।—এক বনের মধ্যে দান্তের দেখা হয় প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব যুগের মহাকবি ভার্জিলের (দ্র) সঙ্গে। স্বর্গে অবস্থানরতা বিয়াত্রিচে ঐ সময় ভার্জিলকে সেখানে পাঠিয়েছেন, ভার্জিল যেন দান্তেকে মৃত্যুপরবর্তী ভুবনে পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে আসেন। ঐ ভ্রমণের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই দান্তে তাঁর ডিভাইন কমেডিতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে স্বর্গ, নরক ও পার্গেটরির বিশদ বর্ণনা আছে। যেসব আত্মা শেষ পর্যন্ত ত্রাণ লাভ করে স্বর্গে যাবে পার্গেটরি বা প্রেতভূমিতে নানা কষ্ট ও পীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের পাপ ধুয়ে-মুছে তাদেরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে তোলা হয়। ভার্জিল দান্তেকে প্রথমে নরক, তার পর পার্গেটরি এবং সব শেষে স্বর্গের দোরগাড়ায় পৌঁছে দেন।

এক দিক থেকে 'দ্য ডিভাইন কমেডি' একটি রূপক কাহিনী। জীবনের পথ চলার জন্য আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষের আলোকিত হওয়া দরকার, পথনির্দেশ লাভ করা প্রয়োজন। তবে হৃদয়ের আবেগ, নিখুঁত বর্ণনা, দার্শনিক চিন্তা এবং ইতিহাস ও পুরাণের অসামান্য সুন্দর মিশ্রণের জন্যই দান্তের 'দ্য ডিভাইন কমেডি' বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহকাব্যগুলির একটি রূপে কালজয়ী হয়ে বিরাজ করছে।

ক. চৌ.

## ডিম

প্রাণিজগতের (দ্র) প্রায় সকল স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর দেহে ডিমের সঞ্চার হয়। এই ডিম পুরুষ জাতীয় প্রাণীর দেহে সৃষ্ট শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে পরবর্তী বংশধর জন্মায়। আমরা সচরাচর মুরগি ও হাঁসের ডিমের সঙ্গে পরিচিত। কীটপতঙ্গ (দ্র), মাছ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), টিকটিকি (দ্র), সাপ (দ্র), কচ্ছপ (দ্র) ইত্যাদির ডিমও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) সাধারণত ডিম পাড়ে না। ব্যতিক্রম কেবল প্ল্যাটিপাস নামক স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে। যারা ডিম পাড়ে তারা বাচ্চাও বাইরে ফোটায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের মধ্যেই বাচ্চা বড় হতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে বাচ্চা প্রসূত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) ছাড়া অন্য প্রাণীদের ডিমও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে। যেহেতু আমরা মুরগি-হাঁসের ডিম প্রায়ই নাড়াচাড়া করি, সেহেতু মনে কৌতূহল জাগে এগুলো সম্পর্কে। মুরগির ডিমের কথা বিবেচনা করা যাক। মুরগির দেহের ভিতরে মোরগের শুক্রকীট দ্বারা ডিম্ব নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিম্বের চার পাশে অর্থাৎ কুসুমের চার পাশে অ্যালবুমেন, খোলক-ঝিল্লি ও খোলক সৃষ্টি হয় দেহের ভিতরেই। ডিমের কুসুম ডিম্বাশয়ের মধ্যেই তৈরি হয়। কুসুমের চারপাশে একটি পাতলা আবরণ থাকে। এর নাম ভিটেলাইন ঝিল্লি।



www.pathagar.com

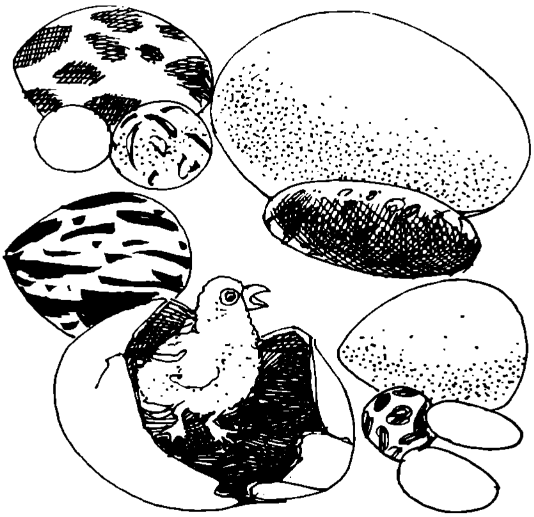

*বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ডিম*

ডিম্বাশয়ের ঠিক পরেই ডিম্বনালিতে অ্যালবুমেন বা ডিমের সাদা অংশ তৈরি হয়। অ্যালবুমেন আঁশের মতো। অ্যালবুমেন ভিটেলাইন ঝিল্লির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং কুসুমসহ গড়িয়ে ডিম্বনালির অবসারণীর (cloaca) দিকে এগুতে থাকে। এর পর অ্যালবুমেনের চার পাশে খোলক-ঝিল্লির আবরণ তৈরি হয়। আবরণ তৈরি হয় ডিম্বনালিতে। জৈব সূত্রসমূহ পরস্পর জোড়বদ্ধ হওয়ায় এই ঝিল্লির সৃষ্টি হয়। ডিম্বনালির খোলক-গ্রন্থি অঞ্চল দিয়ে ডিম গড়িয়ে যাবার সময় খোলক-গ্রন্থি খোলক-ঝিল্লির উপরে খোলক নিঃসরণ করে। সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ হতে ২৫/২৬ ঘণ্টা সময় লাগে। ডিম বাইরে এসে বাতাসের সংস্পর্শে এলে খোলক শক্ত হয়ে যায়।

ত. চ.

**ডিরোজিও, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান্‌** [১৮০৯—১৮৩১]

শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' (দ্র) দলের মূল চালিকা শক্তি। ডিরোজিও (Henry Louis Vivian Derozio) ধর্ম বিশ্বাসে খ্রিস্টান ছিলেন এবং জাতিতে ইউরেশীয় অর্থাৎ ফিরিঙ্গি (দ্র) সমাজের লোক। ডিরোজিও ছিলেন পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত। তাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে কলিকাতা (দ্র) শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ভারতের বাইরে অন্য কোথাও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ছিলেন না; তাঁরা ভারতীয় ছিলেন। ডিরোজিওর বাবার নাম ফ্রান্সিস ডিরোজিও এবং মায়ের নাম ছিল সোফিয়া জন্সন। এঁদের বংশে কেউই বড় একটা দীর্ঘ জীবন পান নি। ডিরোজিও অল্প বয়সেই মাতৃহারা হয়েছিলেন।

ডিরোজিও প্রতিভাবান বালক ছিলেন। ডেভিড ড্রামণ্ডের ন্যায় যোগ্য গুরুও পেয়েছিলেন—যাঁর প্রভাবে ডিরোজিওর যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক, সংস্কারমুক্ত মন তৈরি হয়েছিল।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পড়াশোনা শেষ করে ডিরোজিও পৈতৃক ও আত্মীয়স্বজনের ব্যবসায় ঢোকেন। কলিকাতার বাইরে বিহারের ভাগলপুরে থাকতে হয়, এবং সেখানেই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রথম উন্মেষ ঘটে। ইংরেজিতে কবিতা লিখে কলিকাতায় পাঠাতেন আর তা ছাপা হত। সেসব কবিতা নিয়ে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে এগুলো কোনো কারণই নয়, যে জন্য হেনরি ডিরোজিও যুগান্তকারী প্রতিভা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন। তিনি হিন্দু কলেজে (দ্র) শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৮২৬ সালে আর চাকুরি ছেড়ে দেন ১৮৩১ সালে। মাত্র পাঁচ বৎসরের শিক্ষকতায় তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মানসিকতা পরিবর্তন করে তাদের সত্যিকার অর্থে 'আধুনিক' করে তুলেছিলেন। এই সব শিক্ষার্থীরা পরিচিত ছিল 'ডিরোজিয়ান' হিসাবে বা 'ইয়ং বেঙ্গল' গ্রুপ হিসাবে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব কৃতী বাঙালি দেশ-জাতি-সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন হয় ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র, নয়তো তাঁর ভাবশিষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য হেনরি ডিরোজিওর শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ও সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর কলেরা রোগে তাঁর জীবনাবসান ঘটে কলিকাতাতেই।

হা. মা.

**ডিসেন্ট্রি** আমাশয় দ্র

**ডুবো জাহাজ** সাবমেরিন / ডুবো জাহাজ দ্র

**ডুয়েল** (duel)

'ডুয়েল' শব্দের বাংলা দ্বন্দ্বযুদ্ধ অর্থাৎ দু' জনের মধ্যে যুদ্ধ।



www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' শব্দটি কিন্তু সব সময়ে সত্যিকার যুদ্ধ বা লড়াই না বুঝিয়ে আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন—পত্রপত্রিকায় বা পুস্তিকাতে প্রকাশিত দুই লেখকের তর্কবিতর্ক অথবা জনসভায় দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ-বক্তৃতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বললে ক্ষতি নেই; কিন্তু ইংরেজিতে 'ডুয়েল' বললে অবশ্য দুই ব্যক্তির মধ্যে তরবারি বা পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ বোঝাবে।

ডুয়েলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ পূর্বঘোষিত কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সংঘটিত হতে হয় এবং দু'জনেরই পক্ষে নির্ধারিত সাক্ষীর উপস্থিতিতে সেই লড়াই সম্পন্ন হয়। কোনো লোক যদি কারো সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চায়, তবে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই তাতে রাজি হতে হয়, অন্যথায় তাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ হতে হয়। কেউ কারো দ্বারা কোনোভাবে অপমানিত বোধ করলেই তাকে ডুয়েলের আহ্বান জানাত। এখন পৃথিবীতে কোথাও ডুয়েল লড়ার রেওয়াজ নেই, কিন্তু সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পুরো উনিশ শতক ব্যাপী এর প্রচণ্ড প্রচলন ছিল এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ডুয়েলে প্রাণ দিয়েছেন বা আহত হয়েছেন; বিশ্ববিখ্যাত রুশ কবি পুশ্‌কিন্‌ (দ্র) ও লিয়ের্মন্তফ্‌ ডুয়েলে মৃত্যুবরণ করেন এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে কলিকাতায় ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ (দ্র) ও স্যার ফিলিপ্‌ ফ্যান্সিস্‌-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ডুয়েল বিখ্যাত হয়ে আছে।

হা. মা.

## ডেভি, স্যার হামফ্রি [১৭৭৮—১৮২৯]

প্রতিভাধর ইংরেজ রসায়নবিদ স্যার হামফ্রি ডেভির (Sir Humphry Davy) জন্ম ১৭৭৮ সালে ইংল্যাণ্ডের পেনজ্যান্সে (Penzance)। বালক হামফ্রি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। হামফ্রি এক সার্জেনের সঙ্গে শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। ঔষধ (দ্র) ও পিল তৈরির কাজের সময় হামফ্রি রসায়নবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একুশ বছর বয়সে হামফ্রি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস (যা লাফিং গ্যাস [দ্র] নামে পরিচিত) নিয়ে গবেষণা করেন। এটি পরবর্তী কালে দাঁত তোলার সময় মানুষকে ঘুম পাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হত। হামফ্রি ডেভি কাজের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করতেন না। লণ্ডনের (দ্র) রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড (Count Rumford) হামফ্রি ডেভির মেধা ও কাজের কথা শুনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। হামফ্রি সেখানে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বক্তা হিসাবে হামফ্রি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। জনগণ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে এসে ভিড় জমাত। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে চাকুরির মাত্র এক বছর পর চব্বিশ বছর বয়সে হামফ্রি রসায়নবিজ্ঞানের প্রফেসর পদ লাভ করেন।

হামফ্রি যৌগের ওপর বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে কাজ করেন। ১৮০৭ সালে তিনি গলিত পটাশ (molten potash)-এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করে একটি ধাতব পদার্থ আলাদা করেন এবং এর নাম দেন পটাসিয়াম (দ্র)। সোডা থেকে তিনি আরেকটি ধাতু উৎপন্ন করেন এবং তার নাম দেন সোডিয়াম। একই সময়ে তিনি একটি বিদ্যুৎ-রাসায়নিক তত্ত্বের (electro-chemical theory) ওপর কাজ করেন। এই তত্ত্বে তিনি যৌগের ওপর বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাসায়নিক মৌল আবিষ্কারের জন্য হামফ্রি বিজ্ঞানীদের কাছে স্মরণীয়। তবে তিনি খনিতে কাজের জন্য নিরাপদ বাতির (safety lamp) আবিষ্কারক হিসাবেই বেশি পরিচিত। ১৮১৩ সালে নিউক্যাস্‌লে এক ভয়াবহ গ্যাস-দুর্ঘটনায় ৯০ জন খনিশ্রমিক প্রাণ হারায়। তৎকালীন সরকারের অনুরোধক্রমে ১৮১৫ সালে ডেভি এই বাতি আবিষ্কার করেন, যা 'ডেভির নিরাপদ বাতি' নামে পরিচিত।

তাঁর বেশিরভাগ কাজের উন্নয়ন সাধন করেন তাঁর মেধাবী তরুণ প্রধান সহকর্মী মাইকেল ফ্যারাডে (দ্র)। তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্ত্বেও তিনি বলতেন, তাঁর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার তরুণ মাইকেল ফ্যারাডে। মাইকেল ফ্যারাডে পরবর্তী কালে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন।

ডেভি ১৮২৯ সালে ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হো. আ.



www.pathagar.com

**ডেভিড্** দাউদ (আ.), হযরত দ্র

**ডেভিড্ কপার্‌ফিল্ড্** (David Copperfield)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের (দ্র) একটি উপন্যাসের নাম। ডিকেন্স তাঁর নিজের জীবনের মালমশলা নিয়ে এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন; সে অর্থে এ কাহিনী অনেকটাই আত্মজৈবনিক।

'ডেভিড্ কপার্‌ফিল্ড্' কোনো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী নয়। বলা যায়, পরিবারিক গল্প; কিন্তু এর নায়ক একটি অভাগা ছোট্ট ছেলে, যার নাম ডেভিড্ কপার্‌ফিল্ড্। ডেভিডের মা তাকে ছোট রেখে মারা গেলে তার নিষ্ঠুর প্রকৃতির সৎবাপ তাকে লণ্ডনে (দ্র) পাঠিয়ে দেয় খেটে খাওয়ার জন্য। সেখানে সে দিনের বেলা তার বয়সের তুলনায় অমানুষিক পরিশ্রম করে, আর এক গরিব ভদ্রলোকের বাসায় রাত কাটায়। শেষ পর্যন্ত সে লণ্ডন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, যায় ডোভারে এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার কাছে। সেখানে বরং কিছুটা আদরযত্ন পায় সে। স্কুলে যায়, লেখাপড়া শেখে, চাকুরিও পায়। বিয়ে করে সংসারী হয়। প্রথম স্ত্রী গত হলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। অর্থাৎ গল্পটি এক দরিদ্র কিশোরের বেড়ে ওঠার কাহিনী।

এ সব বিচার করলে গল্পটি সরল। কিন্তু, ডিকেন্স ছিলেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট ফুটিয়ে তোলার অতুলনীয় রূপকার। দুঃখী মানুষের জন্য সমবেদনা বোধ, গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জ্বালাযন্ত্রণা, সমস্যা ইত্যাদি বোঝাবার শক্তি ছিল তাঁর অসামান্য। এর ফলে মানবতা ও হৃদয়বত্তায় তাঁর সকল কাহিনীই বিস্ময়কররূপে জীবন্ত।

এ কারণেই 'ডেভিড কপারফিল্ড' তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস।

হা. মা.

**ডেভিড্ হেয়ার** [১৭৭৫—১৮৪২]

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের অন্যতম প্রাণ-পুরুষ। তাঁকে 'স্বদেশী শিক্ষার জনক' ও 'প্রগতির অগ্রদূত' বলেও অভিহিত করা হয়।

তাঁর পিতামাতা মূলত স্কটল্যাণ্ডবাসী হলেও পিতার কর্মস্থল ছিল লণ্ডন (দ্র)। এখানেই ডেভিড্ হেয়ারের জন্ম হয় ১৭৭৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। মতান্তরে তাঁর জন্মস্থান স্কটল্যাণ্ড বলেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

*ডেভিড্ হেয়ার*

ডেভিড্ হেয়ারের পিতা পেশায় ছিলেন ঘড়ির ব্যবসায়ী ও মেরামতকারী। তিনি নিজেও এই পেশা বেছে নিয়ে ২৫ বছর বয়সে ১৮০১ সালের ৪ঠা মে কলিকাতায় (দ্র) আসেন। সেকালে তেমন প্রতিযোগিতা ছিল না বলে অত্যল্পকালের মধ্যেই ডেভিড্ হেয়ার এই ব্যবসাসূত্রে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন। পরে গ্রে নামক তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে এই ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে তিনি ১৮২০ সালের ১লা জানুয়ারি দীর্ঘ ১৮ বছরের ব্যবসায়িক জীবনের ইতি ঘটান।

ডেভিড্ হেয়ার নিজে বিশেষ শিক্ষিত না হলেও ছিলেন গভীর শিক্ষানুরাগী। ব্যবসাসূত্রে তিনি কলিকাতার বাঙালি সমাজের সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের জীবন শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার একাগ্র ব্রত গ্রহণ করেন।

বাঙালি সমাজে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মহান সমাজসংস্কারক ও বাংলার রেনেসাঁসের (দ্র) অগ্রদূত



www.pathagar.com

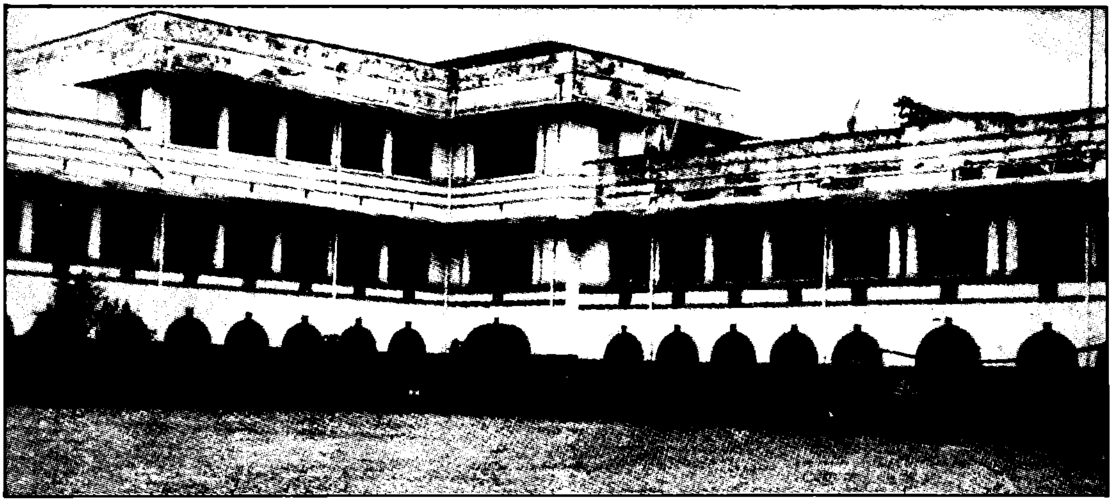

*ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ*

রাজা রামমোহন রায় (দ্র)। পাশ্চাত্যের কলেজগুলোর আদর্শে হিন্দু কলেজ (দ্র) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন রামমোহনের কাছে। ফলে অচিরকালের মধ্যেই বাংলার তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড ইস্ট, ডেভিড হেয়ার এবং তাঁর অন্য আর কিছু বাঙালি বন্ধুর উদ্যোগ ও সহযোগিতায় ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির তিনি শুধু অন্যতম সভ্যই ছিলেন না, এর উন্নতিতে প্রভূত পরিশ্রমও করেন। এ ছাড়া 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 'স্কুল সোসাইটির' কর্মোদ্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তিনি জড়িত ছিলেন।

ব্যবসালব্ধ অর্থ এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের কল্যাণে তিনি অকাতরে ব্যয় করতেন। ১৮২৫ সালে তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালক হন। স্কুল সোসাইটির পটলডাঙা ও আরপুলির শাখা দু'টি ব্যতীত আর সবগুলো স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৩৫ সালে এই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে ওঠে আজকের 'হেয়ার স্কুল'।

এই মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব প্রতিদিন সকালে পালকিতে চেপে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেগুলো পরিদর্শন করতেন, খোঁজখবর নিতেন গরিব ছাত্রদের। এবং নানাভাবে যথাসম্ভব সাহায্যও করতেন তাঁদের।

ডেভিড্ হেয়ারের শিক্ষাবিস্তারের নেপথ্য-দর্শন ছিল : ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও জ্ঞান বিস্তারে একমাত্র বাংলা ভাষাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে।

১৮৩৫ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর সম্পাদক হন। শবব্যবচ্ছেদ অনুষ্ঠানে নিজে সশরীরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতেন ছাত্রদের।

হেয়ার ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান হলেও ছাত্রদের ধর্মান্তরীকরণে মিশনারিদের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন এবং এ জন্য নিগৃহীতও হন। তাঁকে তাঁর সময়ে কেবল বাইবেল (দ্র) বিরোধী হিন্দু বলেই অভিহিত করা হয় নি, মৃত্যুর পর গোঁড়া খ্রিস্টানেরা তাঁর মরদেহ তাদের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করতে দেয় নি।

১৮৪২ সালে ১লা জুন তাঁর মৃত্যু হয় কলিকাতায়। তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীবৃন্দ তাঁর মরদেহ হিন্দু কলেজের সামনে (আধুনিক প্রেসিডেন্সি কলেজ) সমাহিত করেন এবং তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় তাঁর সমাধির ওপর স্থাপন করা হয় তাঁর মর্মরমূর্তি।

আ. হু.

**ডেমোক্রিটাস** [খ্রি.পূ. ৪৬০—৩৭০]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। পদার্থবিদ্যা (দ্র), গণিত (দ্র), মনোবিদ্যা, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা (দ্র), নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি



www.pathagar.com

বিষয়ে এই দার্শনিক-বিজ্ঞানী অন্তত ২৯০টি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর জন্ম ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

তাঁর উপস্থাপিত অণুতত্ত্বে সৃষ্টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্ভবত সেই প্রথম। তাঁর মতে, সৃষ্টির মূলশক্তি অণু (দ্র)। অণুর পারস্পরিক সংযোগ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি। বস্তুসৃষ্টির পিছনে অন্য কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুজগৎ কারণনির্ভর। মানুষের অজ্ঞানতার জন্য কারণহীনতার বিশ্বাস তৈরি হয়ে থাকে।

ডেমোক্রিটাসের (Democritus) মতে, আত্মাও বস্তুসদৃশ এবং অণুর সংযোজন থেকে উদ্ভূত। তাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস রাখা যায় না। বস্তুজগতের বাইরে দেবতা নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি মানবমনে ভীতির সঞ্চার করে দেবতার অস্তিত্ব তৈরি হতে সাহায্য করেছে।

ডেমোক্রিটাসের এই সব বস্তুবাদী তত্ত্ব পরবর্তী সময়ের একাধিক দার্শনিকের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁদের মধ্যে এপিকিউরাস (দ্র) অন্যতম। ডেমোক্রিটাসের মৃত্যু ৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আ. র.

## ডেমোক্রেটিক পার্টি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি। এটি প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২০-এর দশকে।

অবশ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যুদয় ঘটে ১৭৮৭ সালের দিকে ফেডারেলপন্থীদের বিরোধিতা এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা সীমিত করার দাবি তোলার ভেতর দিয়ে। এ সময় এটি পরিচিত ছিল রিপাবলিকান পার্টি (দ্র) নামে। এই দলের মনোনয়ন পেয়েই টমাস্ জেফার্সন্ (দ্র) ১৮০১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৮১৭ থেকে ১৮২৫ সাল সময়সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র এই পার্টির একটি গ্রুপ, যারা উচ্চ শুল্ককর ধার্যের পক্ষে ছিল, এর থেকে বেরিয়ে যায় এবং তাদের গঠিত দল পরিচিত হয় 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে। অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি পরিচিত হয় 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে। এর পর থেকে পার্টি দু'টি তাদের স্ব স্ব সাংগঠনিক ভিত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে জোরদার করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন মার্টিন ভ্যান বুয়েন, জেম্‌স্ পোল্‌ক্, গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড, উড্রো উইলসন, ফ্যাঙ্কলিন্ ডি. রুজভেল্ট (দ্র), হ্যারি এস. ট্রুম্যান, জন এফ. কেনেডি (দ্র) ও লিণ্ডন বি. জনসন প্রমুখ রাজনীতিবিদ।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতীক হচ্ছে 'গাধা'।

আ. হ.

## ডেমোস্থেনিস [আনু. খ্রি.পূ. ৩৮৪—৩২৩]

প্রাচীন গ্রিসের দেশপ্রেমিক বাগ্মী ও স্বাধীনতা-যোদ্ধা। এথেন্সের এক স্বচ্ছল ও খ্যাতনামা তরবারি নির্মাতার সন্তান ডেমোস্থেনিস (Demosthenes) খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হলে তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টের শিকার হন। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে তিনি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়েছিলেন তাঁর প্রতি সদয় এক শিক্ষকের সাহায্যে।

ডেমোস্থেনিস জন্মেছিলেন স্বরযন্ত্রের ত্রুটি অর্থাৎ জিভের জড়তা নিয়ে। কিন্তু কঠোর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত তুখোড় বাগ্মী ও এথেনীয় আদালতে নামকরা আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ম্যাসিডনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ্ গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলোকে জোরপূর্বক দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে গেলে ডেমোস্থেনিস স্বাধীনতা-প্রিয় এথেন্সবাসীকে ক্রমাগত ফিলিপ্-বিরোধী বক্তৃতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর 'রাজমুকুট' শীর্ষক বক্তৃতা আজও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

অবশেষে ক্ষিপ্ত সম্রাট ফিলিপ্ তাঁর পয়লা নম্বরের শত্রু ডেমোস্থেনিসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। ফলে প্রাণরক্ষার্থে এই দেশপ্রেমিক অবশেষে নিরাপদ জায়গা সমুদ্রদেব পসাইদনের মন্দিরে



www.pathagar.com

গিয়ে আত্মগোপন করেন। কিন্তু ফিলিপের অনুগত বাহিনী তাঁর পিছু ধাওয়া করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মন্দিরটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। নিরুপায় ডেমোস্থেনিস শত্রু বাহিনীর হাতে জীবন্ত ধরা দেওয়ার পরিবর্তে বিষপানে আত্মাহুতি দেন। তাঁর মৃত্যুসাল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ।

আ. হু.

## ডোমাগ্, গের্হার্ড্ [১৮৯৫—১৯৬৪]

জার্মান রসায়নবিদ ও জীবাণুবিদ। গের্হার্ডের (Gerhard Domagk) জন্ম ১৮৯৫ সালের ৩০শে অক্টোবর জার্মানির ব্রাণ্ডেন্‌বার্গের লাগোভ্ (Lagow) শহরে। গ্রাইফ্‌স্‌ভাল্ড্ (Greifswald) ও মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি 'আই. জি. ফারবেন ইণ্ডাস্ট্রি ফর এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজি অ্যাণ্ড ব্যাকটেরিওলজি' নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। এ প্রতিষ্ঠানে রঙ ও ঔষধ (দ্র) নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি 'প্রন্টোসিল রুব্রাম' (prontosil rubram) নামক রঞ্জক পদার্থের মধ্যে জীবাণু-প্রতিরোধী ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। এই উপাদানকে ভিত্তি করেই কেমোথেরাপিউটিক ঔষধের উদ্ভব। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

ডোমাগ ক্যান্সার (দ্র) ও যক্ষ্মা (দ্র) নিরাময়ের বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

সি. না. হ.

## ড্রয়িং

চিত্রশিল্পের একটি প্রধান স্তম্ভ হল ড্রইং। সাধারণত ড্রইং বা অঙ্কনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে একেকটি চিত্র। সরল অথবা বক্র যে কোনো রেখা পৃথকভাবে অথবা একত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে একেকটি ড্রইং সৃষ্টি হয়।

কাঠ-পেন্সিল, কাঠ-কয়লা, ক্রেয়ন, চক অথবা কালি-কলম ও কালি-তুলি প্রভৃতি নানা মাধ্যমে ড্রয়িং করা চলে। চিত্রশিল্পের শিক্ষানবিস অথবা যে কোনো সাধারণ শিক্ষার্থীকে ড্রয়িং শিখতেই হয়, কারণ চিত্রাঙ্কন শিক্ষার এটাই প্রাথমিক সোপান। পৃথিবীর (দ্র) শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টাদের বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁদের ড্রয়িং-কর্মও অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের (দ্র) প্রায় সব কাজই ড্রয়িংয়ের সরাসরি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের

*ড্রইং : জয়নুল আবেদিন*

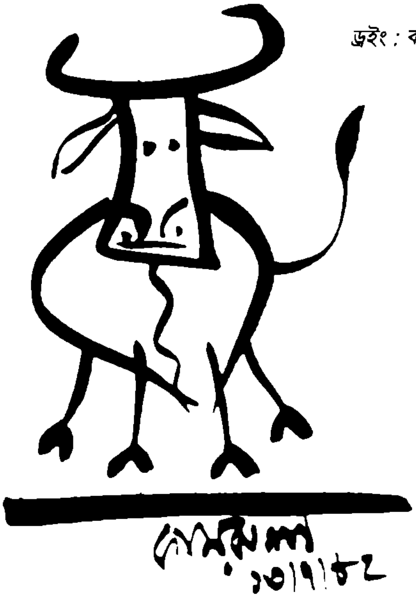

*ড্রইং : কামরুল হাসান*



www.pathagar.com

*ড্রইং : কাইয়ুম চৌধুরী*

*ড্রইং : হাশেম খান*

ছবিগুলি অর্থাৎ 'তেতাল্লিশের স্কেচমালা' সফল ড্রয়িংয়ের নিদর্শন।

ম. আ.

**ড্রাই আইস** (dry ice)

কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) গ্যাসের কঠিন রূপকে বলা হয় ড্রাই আইস। অত্যধিক চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে তা তরলে পরিণত হয়। এই তরলকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম ধারায় নির্গত করলে এর তাপ আরো কমে যায়। ফলে এটি তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ড্রাই আইস বলা হয়। ড্রাই আইসের বিশেষত্ব হল এটি কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তরল হয় না। কোল্ড স্টোরেজ, রিফ্রিজারেটর (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্রে ড্রাই আইস ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

**ড্রাই সেল** (dry cell)

ড্রাই সেল হল সেই সব বিদ্যুৎকোষ বা ব্যাটারি (দ্র), যার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো পেস্ট বা জেলির আকারে এমনভাবে থাকে যেন গড়াতে বা ছিটকে যেতে না পারে। তাই তরল মশলাযুক্ত অংশ থাকলেও কার্যত এরা শুষ্ক এবং আটপৌরে ব্যবহারের উপযুক্ত। আমাদের বহুল ব্যবহৃত টর্চের ব্যাটারি, খেলনা, ঘড়ি (দ্র), ক্যালকুলেটর (দ্র) ইত্যাদিতে ব্যবহৃত অধিকাংশ ব্যাটারি এই দলে পড়ে। সব ড্রাই সেলেই ক্যাথোড (দ্র) ও অ্যানোড (দ্র) নামে দু'টি ইলেক্ট্রোডের মাঝখানে ইলেক্ট্রোলাইট নামে পরিচিত বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। ইলেক্ট্রোলাইটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যানোড ঋণাত্মক বিদ্যুতে এবং ক্যাথোড ধনাত্মক বিদ্যুতে আহিত বা চার্জযুক্ত হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি ভোল্টেজ দেখা দেয় এবং কোনো পরিবাহকের মাধ্যমে উভয়ের সংযোগ ঘটানো হলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। অধিকাংশ ড্রাই সেলে এই ভোল্টেজের পরিমাণ দেড় ভোল্ট, অন্যগুলোতেও তার কাছাকাছি।

আমাদের সবচেয়ে অধিক পরিচিত ড্রাই সেল হল কার্বন-জিঙ্ক সেল। বড়, মাঝারি বা পেন্সিল সাইজের



www.pathagar.com

টর্চব্যাটারি হিসাবেই এদের প্রধানত দেখা যায়। পুরো ড্রাই সেলটি থাকে একটি দস্তার (দ্র) কৌটার মধ্যে, যা নিজে অ্যানোড হিসাবে কাজ করে। এর তলাতেই আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ সংযোগ দিই। ক্যাথোডের কেন্দ্রীয় অংশ হল একটি কার্বন-দণ্ড। কৌটার মাঝামাঝি খাড়া করা এই দণ্ডের প্রান্তে লাগানো তামার টুপির সঙ্গে আমরা ব্যাটারির পজিটিভ সংযোগ দিই। অবশ্য কার্বন-দণ্ডের চারিদিকে ঠাসা কার্বনগুঁড়ো আর ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণই হল আসল ক্যাথোড। দস্তার কৌটা আর এই ক্যাথোড মিশ্রণের মাঝখানে থাকে কাগজ (দ্র), কার্ডবোর্ড ইত্যাদি কোনো সছিদ্র শোষক-স্তর, যার ভেতরের দিকটায় ইলেক্ট্রোলাইট মাখানো থাকে। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোলাইট হল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড আর পানির একটি পেস্টরূপী মিশ্রণ। ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যাথোডে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের কার্যকারিতা ফুরিয়ে যায় বলে এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ আর পাওয়া যায় না। এমনিতে রেখে দিলেও কার্যকারিতা কমে আসে। কার্বন-জিঙ্ক সেলের একটি বিশেষ রূপ হল অ্যালক্যালাইন সেল। এর ইলেক্ট্রোলাইটে পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামে একটি কড়া অ্যালক্যালি থাকে। বেশি সময় ধরে অধিক কারেন্ট প্রয়োজন হলে এটি সুবিধাজনক—যেমন খেলনার মোটর চালাতে।

অন্যান্য ড্রাই সেলের মধ্যে মার্কারি সেল আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই সেলে জিঙ্কের অ্যানোড আর মার্কুরিক অক্সাইডের ক্যাথোডের মাঝখানে পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইলেক্ট্রোলাইট ব্যবহৃত হয়। এর একটি সুবিধা হল কার্বন-জিঙ্ক সেলের মতো এতে ভোল্টেজ ধীরে ধীরে হ্রাস পায় না, শেষ অবধি একই থাকে। এ জন্য ছোট বোতামের আকারের মার্কারি সেল হাতঘড়ি, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি সংবেদী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভোল্টেজ সমান থাকা জরুরি।

মু. ই.

## ড্রাইভিং (driving)

ক্রীড়াজগতে যে কয়টি দুঃসাহসিক ক্রীড়া আছে মোটরকার রেসিং অর্থাৎ ড্রাইভিং এদের মধ্যে অন্যতম। ড্রাইভিং প্রতিযোগিতা এক দিকে দেখতে যেমন সুখপ্রদ ও উত্তেজনাকর, তেমনি আবার বেগবান গাড়িতে স্টিয়ারিংয়ে হাত একটু এদিক-সেদিক হলে বা গাড়ির ইঞ্জিনে বা অন্য কোনো অসুবিধা হলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বে পেশাদার ও শৌখিন এই দুই ধরনের ড্রাইভিং প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে গ্রঁ প্রি (grand prix) রেইসিং, স্পোর্টস্‌কার রেইসিং, প্রোডাকশন কার (স্টক কার) রেইসিং সহিষ্ণুতার জন্য, সর্বাধিক বেগের জন্য, পাহাড়ে ওঠার বা ক্রস্‌কাণ্ট্রি (দেশ অতিক্রমের) রেস ইত্যাদি অনেক রকমের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। গাড়িশিল্পের উন্নতির জন্য ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকায় (দ্র) অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত করে গাড়ির নানা ধরনের চালনা-প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

১৮৮৪ সালে মোটর ড্রাইভিং ইউরোপে দেখা গেলেও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ হতে সমগ্র ইউরোপে মোটরকার ড্রাইভিং একটি আনন্দদায়ক খেলায় পরিণত হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় মোটর রেস ড্রাইভিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে (দ্র) এখন পর্যন্ত কোনো ড্রাইভিং ক্লাবের সন্ধান মেলে নি, তবে ১৯৭০ সালে কয়েক জন বাঙালি এশিয়ান হাইওয়েজে অনুষ্ঠিত নেপাল পর্যন্ত এক মোটর কার রেইসিং-এ অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

কা. আ. আ.

## ড্রাকুলা

পৃথিবীতে (দ্র) বীভৎস রস ও ভয়-পাওয়ানো সংক্রান্ত যত গল্প আছে ড্রাকুলার কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম। এক কথায় হরর্ স্টোরির (horror story) রাজা এই গল্প।

ড্রাকুলা (Dracula) শব্দের উদ্ভব হয়েছে ড্রাকুল্ শব্দ থেকে; dracul মানে শয়তান, devil. প্রেত ইত্যাদি। 'ড্রাকুলা' শব্দের অর্থ son of the Devil বা শয়তানের বাচ্চা। ইউরোপের (দ্র) ওয়ালেকিয়া (walachia) নামের অঞ্চলে (এখন রুমানিয়ার মধ্যে পড়েছে) ভ্লাড্ ড্রাকুল্ (অর্থাৎ শয়তান ভ্লাড্) নামে এক রাজা ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস চরিত্রের হওয়ায় জনগণ তাঁকে মূর্তিমান শয়তান মনে করত বলে এই নাম দিয়েছিল। এঁর সন্তানও পিতার নৃশংসতা পেয়েছিলেন। যদিও আসল নাম ছিল ভ্লাড্ দ্য ইম্পেলার (আনু. ১৪৩১–'৭৬), লোকে বলত 'ড্রাকুলা';



www.pathagar.com

অর্থাৎ বাবাও শয়তান ছিল, শয়তানের বাচ্চাও হয়েছে তেমনি শয়তান। পিতা-পুত্রের নৃশংসতার ভয়াবহ কাহিনী নিয়ে পরবর্তী কালে নানান কিংবদন্তি-উপকথা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে যায়।

প্রচলিত এই লৌকিক উপকথার ওপর ভিত্তি করে আইরিশ লেখক ব্রাম্ স্টোকার (Bram Stoker : ১৮৪৭–১৯১২) একটি উপন্যাস লেখেন Dracula নামে; প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। স্টোকার্ ভয়ের গল্প-উপন্যাসই লিখতেন। ইংরেজিতে এ জাতীয় কাহিনীকে বলে 'গথিক্' (gothic) গল্প (দ্র)। তবে স্টোকারের আর কোনো গথিক কাহিনীই এত জনপ্রিয়তা পায় নি; এই উপন্যাস থেকে নাটক হয়েছে, ফিল্ম হয়েছে, কিশোরদের উপযোগী করে রূপান্তর করা হয়েছে। 'ড্রাকুলা'র লেখক হিসাবেই স্টোকার্ এখন পরিচিত। 'ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইন্ (দ্র)-এর লেখক হিসাবে যেমন মেরি শেলি, তেমনই।

গল্পটি কাউন্ট ড্রাকুলা নামের এক মৃত মানুষকে নিয়ে। পৃথিবীর সবাই জানে কাউন্ট মরে গেছে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তার শব প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে রাত্রিবেলা। তার বেঁচে থাকার সময় শুধু রাতটুকু। এই সময়ে সে যে কোনো আকার ধারণ করতে পারে; উড়তে পারে পাখির মতো, দেওয়াল বেয়ে উঠতে পারে টিকটিকির মতো। সে কেবল মানুষের রক্ত পান করে বেড়ায়। মানুষকে কিন্তু সে মেরে ফেলে না। মশা যেমন হুল ফুটিয়ে রক্ত খায়, ড্রাকুলার মুখের দু' পাশের কুকুরে দাঁত দু'টি একটু বড় আর বেশি সুঁচালো—মানুষের গলার উপরে ঐ দু'টি দাঁত ফুটিয়ে সে রক্ত পান করে। মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে মরে না বটে, তবে কিছুকালের মধ্যে রক্তহীনতার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সবচেয়ে ভয়াবহ হল, মরে যাওয়ার পরে ঐ মানুষটিও আরেকটি রক্তশোষা শবে পরিণত হয়।

সত্যিকারের ভয় পাওয়ার মতোই কাহিনী। তবে, শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের শেষে ড্রাকুলাদের হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল।

হা. মা.

**ড্রিল** (drill)

কাঠ, ধাতু (দ্র), মাটি (দ্র) কিংবা পাথরে সিলিণ্ডার আকৃতির ছিদ্র করাকে বলা হয় ড্রিলিং। ড্রিলিং করার কাজে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা-ই ড্রিলিং মেশিন বা ড্রিল।

কাঠ ও ধাতু ড্রিলিংয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় টুইস্ট ড্রিল; তাতে দুটো বাঁকানো খাঁজ কাটা থাকে। বৃত্তাকারে ঘুরে খাঁজ দুটো ড্রিলের মাথায় গিয়ে চোখা প্রান্ত হিসাবে শেষ হয়েছে।

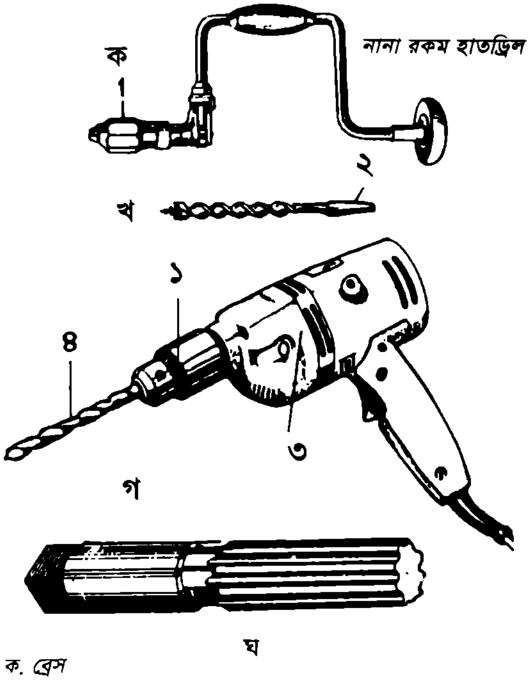


*ক. ব্রেস*
*খ. বিট*
*গ. বৈদ্যুতিক ড্রিল*
*ঘ. রীমার*

*১. চাক ২. ফ্যাঙ্গ*
*৩. মোটর ৪. টুইস্ট বিট*

চোখা প্রান্তদ্বয় ধাতু বা কাঠে ছিদ্র করে। এই ধরনের ড্রিল হাতে বা মেশিনের সাহায্যে চালানো যায়।

মাটি বা পাথর খোঁড়ার যে ড্রিল সেগুলো ধারের চাইতে ভারে কাজ করে বেশি। ড্রিলটিকে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে মাটি বা পাথরে চেপে ধরা হয়। ঘূর্ণায়মান ড্রিলটি মাটি বা পাথর কেটে কেটে ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করে। এই সময় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে খননকৃত মাটি ও পাথর ওপরে নিয়ে আসা হয়। এই ঘর্ষণে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। তাপে যাতে ড্রিলের কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য যন্ত্রটিতে লুব্রিক্যান্ট বা পিচ্ছিলক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

খনিতে এবং তেল-গ্যাস-কূপ খননে এই ধরনের ড্রিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

মু. হা.



www.pathagar.com

# ঢ

*পুরনো ঢাকা শহরে বড় কাটরার উত্তর ফটক ১৮১৬, শিল্পী চার্লস্ ড'য়লি*
*নিচে: বুড়িগঙ্গা থেকে ঢাকা শহর ১৮৪০*

### ঢপকীর্তন

পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে রাগসঙ্গীত, বিশেষ করে টপ্পার (দ্র) মিশ্রণে রচিত একটি সঙ্গীতরীতির নাম। মুর্শিদাবাদ জেলার এক জন বিখ্যাত কীর্তনগায়ক ছিলেন রূপচাঁদ অধিকারী (১৭২২–১৭৯২) তিনি প্রচলিত কীর্তনের ধারা পরিত্যাগ করে কীর্তনসঙ্গীতের সঙ্গে টপ্পার চাল মিশিয়ে বৈঠকি গানের মতো করে একটি সঙ্গীতরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এর নাম হয়েছিল 'ঢপকীর্তন'। যশোরের মধুকান বা মধুসূদন কিন্নর (১৮১৮–১৮৬৯) এই কীর্তনরীতিকে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি ঢপকীর্তনের আঙ্গিকে অনেক পালা ও বিপুল সংখ্যক গান রচনা করেন। মোহনদাস বৈরাগী, রূপদাস, অঘোরদাস, দ্বারিকদাস, শ্যামা বাউলের মতো গায়ক কবিরাও ঢপকীর্তনের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

ক. গো.

### ঢাক

চর্মাচ্ছাদিত বৃহদাকার তালবাদ্য। কালের দিক থেকে ঢাক বেশ প্রাচীন। একটি বৃহদাকার কাঠের খোলকে দুই মুখে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাক তৈরি করা হয়। দু'পাশের ছাউনি ডোরি দিয়ে শক্ত করে টানা থাকে। সাধারণত ঢাকের ডান দিকের মুখে কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজানো হয়। ঢাকে তালে তালে ঘা দিয়ে ছন্দ রক্ষা করা হয়। ঢাক পৃথকভাবে বাজানো হয় না। ঢোল, কাঁসি, সানাই বা নানা ধরনের বাঁশি বাজানোর সঙ্গে ঢাক বাজানো হয়। ঢাকের অপর নাম ডঙ্কা। অতি বৃহৎ আকারের ঢাককে জয়ঢাক বা জয়ডঙ্কা বলা হয়। জয়ঢাকের খোল লোহার পাতে নির্মিত হতে দেখা যায়। ঢাকবাদককে বলা হয় ঢাকী।

ক. গো.

### ঢাকা

বাংলাদেশের (দ্র) রাজধানী ও প্রধান নগরী। আয়তন ১৩৪৫ বর্গ কিমি ও জনসংখ্যা ৬৫,৩৭,৩০৮ (১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। অনুমান করা হয়, বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকার জনসংখ্যা ৮০ লক্ষের মতো। ধলেশ্বরী নদীর শাখা বুড়িগঙ্গার উত্তর-তীরে এ শহর অবস্থিত। উত্তর অক্ষাংশ ২৩° ৪৩´ ও পূর্ব দ্রাঘিমা ৯০° ২৫´। প্রাচীন কাল থেকেই ঢাকা নদীবন্দর।

প্রাচীন কালে ঢাকা মসলিন কাপড়ের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। বর্তমানে জামদানি কাপড়, শাঁখা, জরির কাজ, বোতাম, কাচের জিনিস, দিয়াশলাই, গেঞ্জি-মোজা, গার্মেন্টস শিল্প, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র, বরফ প্রভৃতি শিল্প-কারখানার জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়া পাট গাঁটবন্দিকরণ, চামড়া পাকা করা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, তেলের কল, আটা-ময়দার কল, সরকারি ও বেসরকারি ছাপাখানা, চীনামাটির তৈজসপত্র, রেল কারখানা এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় নানা জিনিস উৎপাদন প্রভৃতি



www.pathagar.com

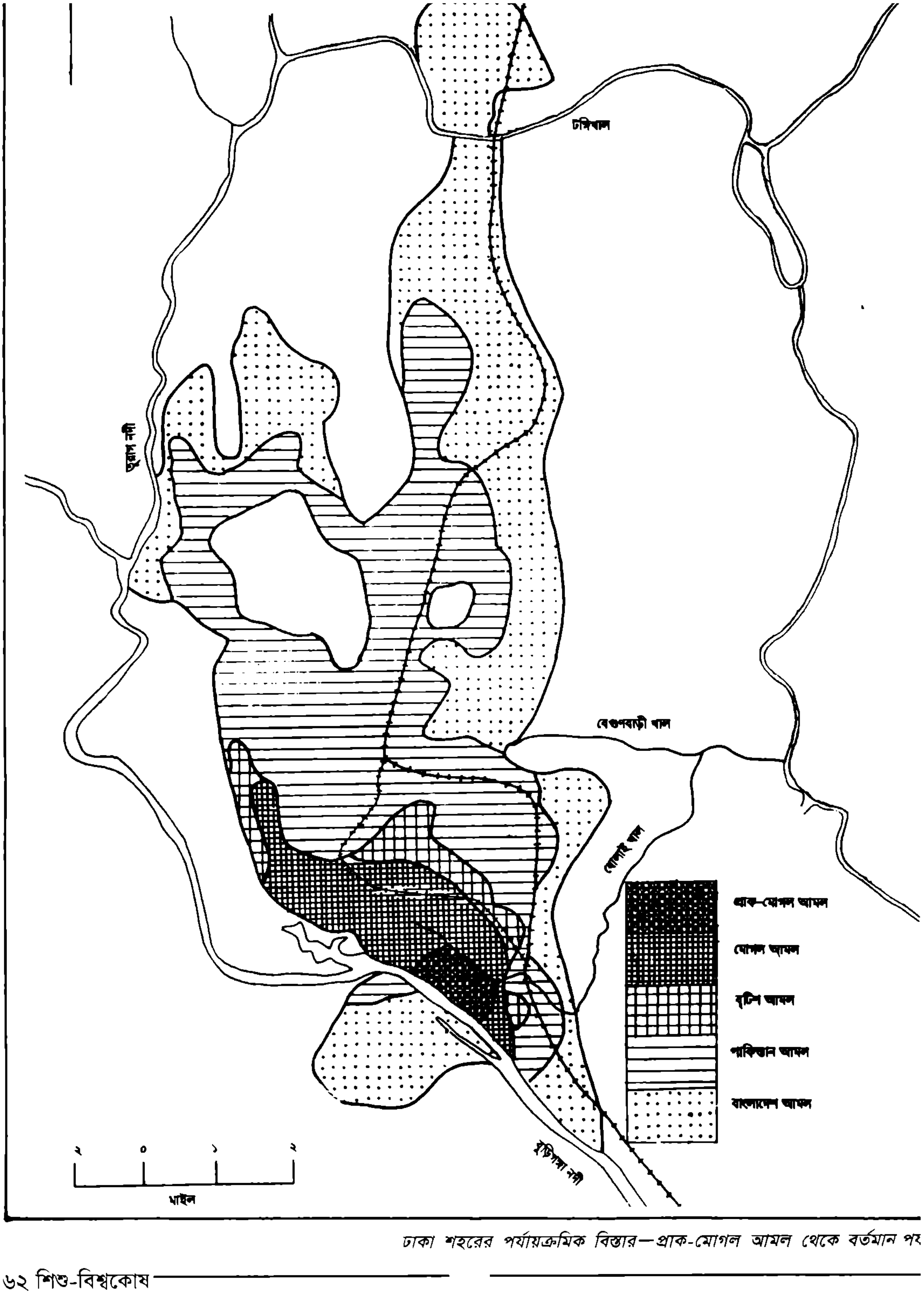


*ঢাকা শহরের পর্যায়ক্রমিক বিস্তার—প্রাক-মোগল আমল থেকে বর্তমান প*



www.pathagar.com

নানা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের রাজধানীতে পৃথিবীর প্রায় ১০০টি দেশের দূতাবাস রয়েছে। আর বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এখানে অবস্থিত এবং দেশের সব কর্মকাণ্ড ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। ঢাকায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার অবস্থিত এবং সড়ক ও নদী -পথে দেশের সব জেলার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে। এ ছাড়া দেশ ও বিদেশের সঙ্গে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা রয়েছে।

ঢাকা প্রথমে সম্ভবত সমতট, পরে বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এর পৃথক কোনো ইতিহাস জানা যায় না। খ্রিষ্ট্রীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষে মুসলমানেরা ঢাকা অধিকার করে। ১৬শ শতাব্দীতে এখানে কয়েক জন জমিদার প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। মোগল সম্রাট আকবর (দ্র) কর্তৃক ১৫৭৬ সালে পাঠান রাজ দাউদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটলে ঈসা খাঁ (দ্র.), চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রমুখ কয়েক জন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের (দ্র) আমলে ১৬০৮ সালে সুবাদার ইসলাম খান (দ্র) রাজমহল থেকে ঢাকায় তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী স্থানান্তরিত করলে এর নাম হয় জাহাঙ্গীরনগর। ১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খাঁ (দ্র) সুবাদার হয়ে এলে ঢাকার চরম উন্নতি হয়। ১৭১৭ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী চলে যায় মুর্শিদাবাদে। ইংরেজ আমলে ১৯০৫–১২ সাল পর্যন্ত নবগঠিত পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় থাকে। এ সময় ঢাকার নতুন এলাকা রমনা গড়ে ওঠে। তার পর ১৯২১ সালে এই নতুন অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) স্থাপিত হয়। তার পর আস্তে-আস্তে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকা সম্প্রসারিত হয়। তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু এভেনিউ, শাহবাগ এভেনিউ, ময়মনসিংহ রোড, পার্ক এভেনিউ, সার্কুলার রোড, মীরপুর রোড প্রভৃতি নতুন শহরের উল্লেখযোগ্য রাজপথগুলো গড়ে ওঠে। এ সময় রমনা পার্ক ও লেকসহ একটি ছোট চিড়িয়াখানা (পরে চিড়িয়াখানাটি মীরপুরে স্থানান্তরিত) তৈরি করা হয়। এ সময় ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, আজিমপুর কলোনি, মোহাম্মদপুর কলোনি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও মতিঝিল

*উপরে : কার্জন হলের ছবি*
*মাঝে: আধুনিক ঢাকা—শাপলা চত্বর*
*নিচে : বুড়িগঙ্গা*



www.pathagar.com

বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নবনির্মিত শেরে বাংলা নগরে গড়ে ওঠে সংসদ ভবন। এর স্থাপত্য অতি আধুনিক। আজিমপুরের নিউ মার্কেট এবং পুরানা পল্টন অঞ্চলে জাতীয় স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ (দ্র) ও এখানকার সুসজ্জিত দোকানপাটসমূহ নতুন সৃষ্টি। ১৯৬৫ সালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল তৈরি হয়, বর্তমানে তার শেরাটন নামকরণ হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাঁচতারা হোটেল সোনারগাঁও স্থাপিত হয়। এ সময় তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে গুলশান, বনানী হয়ে নতুন বিমান বন্দর পর্যন্ত ঢাকা নগরী সম্প্রসারিত হয়। গুলশান-বনানী-বারিধারায় এখন বিদেশী দূতাবাসসমূহের সুরম্য অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে।

ঢাকা প্রাচীন কাল থেকে মুসলিমপ্রধান শহর। সেই থেকে ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের (দ্র) শহর। ১৯৬১ সালে ঢাকায় ৫ লক্ষ মুসলমান, ৪০ হাজার হিন্দু ও ৩০০০ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল বলে জানা যায়। ঢাকায় খ্রিস্টানদের ৪টি প্রধান গির্জার (দ্র) মধ্যে রমনার আর্চ বিশপের ক্যাথিড্রাল, তেজগাঁর পর্তুগিজ গির্জা, গ্রিক ও আর্মেনীয় গির্জা বিখ্যাত। হিন্দুদের ঢাকেশ্বরী ও চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, জয়কালী মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রমনা কালীবাড়ি (১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন) বিখ্যাত। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিখদের গুরুদ্বার এবং কমলাপুর, বাড্ডা ও মীরপুরে বৌদ্ধ বিহার বিখ্যাত। ঢাকা শহর প্রাচীন ও নতুন মসজিদের জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন মসজিদের মধ্যে বিনত বিবির মসজিদ, নসওয়াল গনি মসজিদ, লালবাগ দুর্গের মসজিদ, ফররুখশিয়রের মসজিদ, খান মোহাম্মদ মৃধা, চক, আরমানিটোলা, তারা ও দারা বেগমের মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, খাজা শাহবাজ ও মুসা খাঁর মসজিদ প্রভৃতি বিখ্যাত। এ ছাড়া নবাব আমলের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে ঢাকার নবাববাড়ি আহসান মঞ্জিল, লালবাগ, বড় কাটরা, ছোট কাটরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ঢাকা বলধা গার্ডেন (দ্র), মীরপুরের চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন, কার্জন হল ও তার বোটানিক্যাল গার্ডেন, পুরনো হাইকোর্ট, শিশু পার্ক (দ্র), বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর (দ্র), শিশু একাডেমী (দ্র)

*আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন*
*নিচে : মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা*



www.pathagar.com

ও তার জাদুঘর, বাংলা একাডেমী (দ্র), জাতীয় সংসদ ভবন, সোহরাওয়ার্দি উদ্যান (দ্র), রমনা পার্ক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর(দ্র), বুড়িগঙ্গার ওপর চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু, শহীদ মিনার (দ্র), বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, অপরাজেয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলোর অন্যতম। আর ভাষা আন্দোলনের (দ্র) শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান ও ওই উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর বইমেলা, বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলো ঢাকার বৈশিষ্ট্যময় ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বি. ব.

## ঢাকা নগর জাদুঘর

ঢাকা নগরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং এই নগর বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্য থেকে ১৯৮৭ সালের ২০শে জুন এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ একই দিনে অনুমোদিত হয় এর গঠনতন্ত্র।

ঢাকা নগর জাদুঘরের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল : এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্নমুখী। যেমন—১. ঢাকা নগরীর ঘটনাবহুল ইতিহাস ও সামগ্রিক পরিচয় বস্তুনিদর্শনের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা; ২. নাগরিকদের মধ্যে ঐতিহ্যচেতনা সৃষ্টি করা; ৩. ঢাকা নগরীর বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করে নগরবাসীকে সচেতন করে তোলা; এবং ৪. ঢাকা নগর সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজের পাশাপাশি এই নগরীর প্রাচীনতম নিদর্শনাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

ঢাকা নগর জাদুঘর প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাথমিকভাবে গঠন করা হয়েছিল 'ঢাকা নগর জাদুঘর বাস্তবায়ন কমিটি'। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঢাকা নগরীর একদল উদ্যোগী শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পপতি। সংস্থাটির ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিল গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছিল 'ঢাকা নগর জাদুঘর ট্রাস্ট ফাণ্ড'। ১ জনকে সভাপতি, ৩ জনকে সহ-সভাপতি, ১ জনকে কোষাধ্যক্ষ, ১ জনকে ট্রাস্ট সম্পাদক ও ৯ জনকে সদস্য নির্বাচিত করে গঠিত হয়েছিল এই ট্রাস্টি বোর্ড।

সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যাগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের

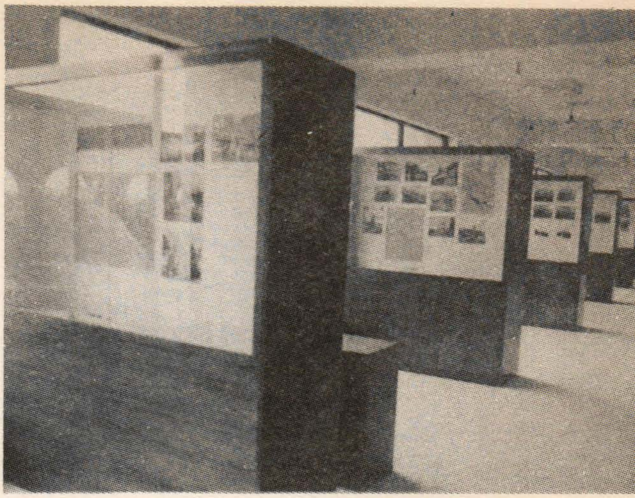

*ঢাকা নগর জাদুঘরের গ্যালারি কক্ষ এবং নিচে : উদ্বোধনী-স্মরণিকার প্রচ্ছদপট*

www.pathagar.com

অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ঢাকার ১৩৩ গ্রিন রোডস্থ জাহানারা গার্ডেন-এ।

ঢাকা নগর জাদুঘরের যাত্রারম্ভ বেসরকারি উদ্যোগে হলেও বর্তমানে তা সরকারি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। ৬ই শ্রাবণ ১৪০৩ সনে (২০.৭.১৯৯৬ খ্রি.) অত্যন্ত বিশাল ও গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগর জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং আপাতত ঢাকা পৌরসভার 'নগরভবনে' জাদুঘরটির সাময়িক স্থান-সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এর ঘোষিত সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে: ১. বুড়িগঙ্গা নদীর দুই তীর সংরক্ষণের জন্য একটি নদীতীর-সংরক্ষণ বোর্ড গঠন করা; ২. ঢাকার বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নির্দিষ্ট স্থানকে সুদৃশ্য পার্কে পরিণত করা এবং বিঘা দুই জমি ঢাকা নগর জাদুঘরের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা; ৩. ঢাকা শহরের স্থাপত্য-নিদর্শনগুলো রক্ষায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে আরো জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করা; এবং ৪. ঢাকা নগরীর ঐতিহাসিক ঘরবাড়ি সংরক্ষণ ও সেসবের পরিচয়জ্ঞাপক ফলক স্থাপনে পৌরসভার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ ও সেই উদ্যোগে এর পক্ষ থেকে সক্রিয় সহায়তার হাত প্রসারিত করা।

আ. হু.

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার রমনা এলাকার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯টি অনুষদ, ৩৭টি বিভাগ এবং ৭টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। আবাসিক হল রয়েছে ১৪টি, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস ১টি। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ছাত্রসংখ্যা ১৮,৫৮৫ জন, শিক্ষক ১,১৭৬ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ২,৯৭০ জন। একই বছরের হিসাব অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকী ছিল ৫,২৯,৯৬৪টি। ঐ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৩৫,৩৭১ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র

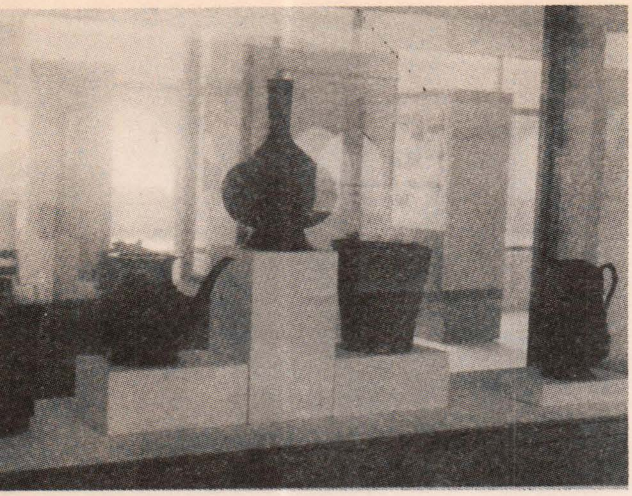

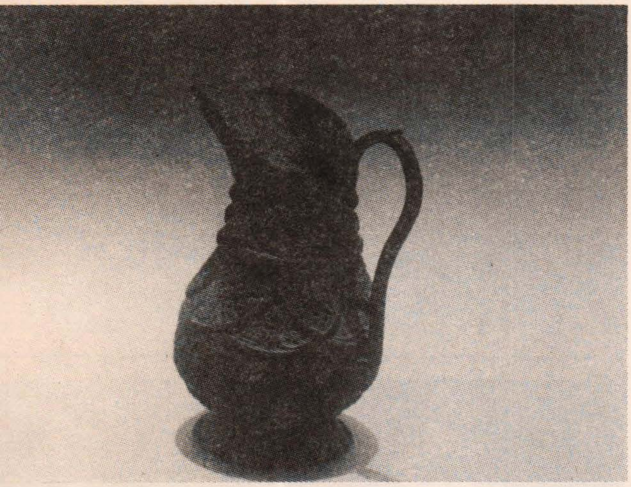

*ঢাকা নগর জাদুঘরে প্রদর্শিত কয়েকটি বস্তু*



www.pathagar.com

সংসদ 'ডাকসু' নামে পরিচিত।

মে. খা.

## ঢেঁকি

ধান ভানা বা শস্য কোটার কাজে ব্যবহৃত কাঠের যন্ত্রবিশেষ। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারত উপমহাদেশে ঢেঁকি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চীন (দ্র) এবং ইন্দোনেশিয়া (দ্র)-তেও এর প্রচলন আছে।

এক খণ্ড পাথরের চটান বা একটি কাষ্ঠখণ্ডে গড় বা গর্ত খুঁড়ে মুষলের সাহায্যে শস্য কোটা হয়। মুষলটির মাথায় লোহার গোল পাত জড়ানো থাকে। মুষলটি ৪/৫ হাত লম্বা একটি ভারি কাঠের আগায় জুড়ে দিয়ে পাথরের চটান বা কাষ্ঠখণ্ডের গড় বা গর্ত বরাবর মাপে দু'টি শক্ত খুঁটির ওপর পোঁতা হয়। এসব মিলিয়ে পুরো যন্ত্রটিকে বলা হয় ঢেঁকি।

ঢেঁকি ব্যবহারের বিশেষ পদ্ধতি আছে। ভানা বা

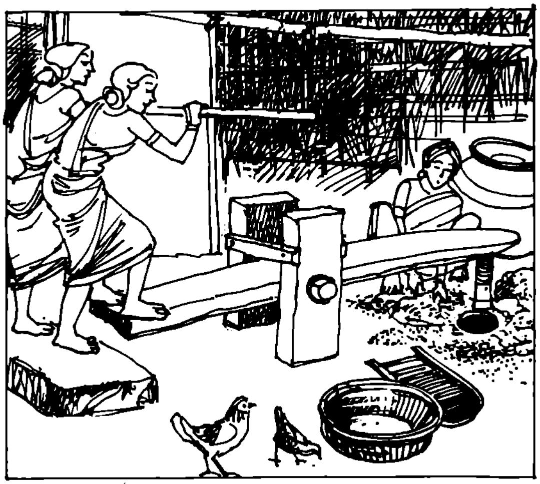

কোটার জন্য গর্তের মধ্যে ধান বা শস্য ঢেলে দিয়ে ঢেঁকির গোড়ায় এক জন বা দু' জন পায়ে চাপ দেয় এবং অন্যদিকে মুষলের আঘাতের ফাঁকে ফাঁকে গর্তের কাছে বসে আরেক জন ধান বা শস্যগুলো নাড়ায়। এভাবেই ঢেঁকিতে ধান ভানা বা শস্য কোটা হয়। সাধারণত মেয়েরাই ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করে।

ঢেঁকির মতো কাঠের তৈরি আরো একটি যন্ত্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। এই যন্ত্রটির নাম উদূখল। উদূখলে ধান ভানার প্রচলন এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে উন্নত মানের ধানভানার কল প্রচলিত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে ঢেঁকির ব্যবহার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ঢেঁকি নিয়ে এক সময়ে নানা বাগ্‌ধারাও বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রচলিত হয়েছিল। যেমন বোকা লোককে বলে 'বুদ্ধির ঢেঁকি', কিংবা 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'।

সুজ. ব.

## ঢোল

চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। একটি খোদাই করা কাঠের খোলের উভয় দিক চামড়ায় ছেয়ে ঢোল তৈরি করা হয়। ঢোলের অবয়ব বা লকড়ি বিশ-বাইশ ইঞ্চি লম্বা হয়, দুই মুখ বারো-চৌদ্দ ইঞ্চি প্রশস্ত হয়। বাম দিকের মুখ ডান দিকের মুখ অপেক্ষা একটু বড় হয়ে থাকে। রজ্জু বা চামড়ার দোয়ালি দিয়ে দুই মুখের গজরা টান টান করা হয়। রজ্জুর ভেতর দিয়ে পিতল (দ্র) বা লোহার (দ্র) রিং ঢোকানো থাকে। রিং টেনে বা ঢিলে করে দুই পাশের ছাউনির সুর ঠিক করা হয়। ঢোলের বাম দিকের মুখে খিরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

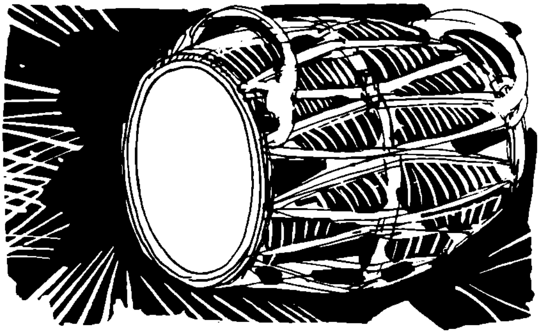

ডান দিকে খিরণ থাকে না। ঢোলের ডান দিক একটি মসৃণ কাঠির সাহায্যে আঘাত করে বাজানো হয়, বাম দিক বাজানো হয় হাতে চাঁটি দিয়ে। কবিগান (দ্র) সহ নানা প্রকার লোকসঙ্গীতানুষ্ঠানে ঢোল বাজাতে হয়। ঢোলের সঙ্গে বাজানো হয় কাঁসি। ঢোলবাদককে বলা হয় ঢোলি বা ঢুলি। ঢোলের ক্ষুদ্র সংস্করণকে বলা হয় ঢোলক। ঢোলক ঢোল থেকে চিকন হলেও লম্বায় একটু বড় হয়। এর দুই দিকই হাত দিয়ে বাজানো হয়। যাত্রা বা থিয়েটারের (দ্র) ঐকতান



www.pathagar.com

বাদনে ঢোলক বাজানো হয়। হোরি বা হোলিসহ কোনো কোনো লোকসঙ্গীতে (দ্র) ঢোলক বাজানোর রীতি আছে।

ক. গো.

# ত

**তড়িৎপ্রলেপন** ইলেক্ট্রোপ্লেটিং দ্র

**তড়িৎবিদ্যা** বিদ্যুৎ দ্র

## তত্ত্ববোধিনী সভা

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) উদ্যোগে ও উৎসাহে ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার অন্যতম সদস্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সভার নাম পরিবর্তন করে 'তত্ত্ববোধিনী' সভা করা হয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম (দ্র) প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন, তত্ত্ববোধিনী গ্রন্থাদি ও পত্রিকা প্রকাশ এবং তরুণ পণ্ডিতদের মাধ্যমে বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার বিভিন্ন সময়ের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র), রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ ছিলেন। ১৮৫৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা বিলুপ্ত হয়।

মে. খা.

**তথাগত** গৌতম বুদ্ধ দ্র

**তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)** [১৯১১—১৯৬৯]

জন্ম ১৯১১ সালে, বরিশালের ভাণ্ডারিয়ায়। এই স্বনামধন্য সাংবাদিক তথা সম্পাদক সংবাদপত্রজগৎ, রাজনৈতিক অঙ্গন ও পাঠক মহলে 'মানিক মিয়া' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিঙ্কশনসহ বি. এ. পাশ করেন।

পিরোজপুর সিভিল কোর্টে চাকুরিরত থাকার সময় তফাজ্জল হোসেনের পরিচয় হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির (দ্র) সঙ্গে। সোহরাওয়ার্দির সহায়তায় তিনি বরিশালে জেলা জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিতে সক্ষম হন। কিছু দিন এই চাকুরি করার পর সোহরাওয়ার্দিরই পরামর্শে পদত্যাগ করে কলিকাতায় (দ্র) অবস্থিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দফতর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তখন থেকেই তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় আবুল মনসুর আহমদ (দ্র) সম্পাদিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ'। তফাজ্জল হোসেন সেখানে যোগ দেন পত্রিকার পরিচালনা-বিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে। সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এখানেই। দৈনিক ইত্তেহাদে কাজ করেছেন তিনি বৎসরাধিককাল। সে সময়কার পাকিস্তান সরকার ইত্তেহাদ পছন্দ করে নি। তাই পূর্ব-পাকিস্তানে এই পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। দলীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'। সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (দ্র)। তফাজ্জল হোসেন ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট পত্রিকাটি চালাবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ১৯৫৩ সালে রূপান্তরিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। 'মুসাফির' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শীর্ষক একটি কলাম লিখতে শুরু করেন তিনি গোড়া থেকেই। এটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নিয়মিত রাজনৈতিক নিবন্ধ। ১৯৫৫ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর প্রথম বারের মতো আঘাত নেমে আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পত্রিকার প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। ঘটনাটি ঘটে একই বছর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ৯২(ক)-ধারা প্রবর্তনের পর।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হয় সমগ্র পাকিস্তানে। নির্ভীক সাংবাদিক মানিক মিয়াকে সামরিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর



www.pathagar.com

*দৈনিক ইত্তেফাকের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে জনাব ও বেগম তফাজ্জল হোসেন, তৎকালীন ম্যানেজার এম.এ. ওয়াদুদ ও সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন*

গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি অংশ নেন ঐতিহাসিক ৬-দফা (দ্র) আন্দোলনে। আর সেই ৬-দফা ইত্তেফাকে প্রকাশের দায়ে একই বছরের ১৬ই জুন তাঁকে আবার আটক করা হয়। তা ছাড়া দৈনিক ইত্তেফাক এবং ইত্তেফাক গ্রুফের সাংস্কৃতিক সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' ও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা টাইম্‌স্' বন্ধ করে দেয় সরকার। কেবল তাই নয়, ইত্তেফাকের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রেসও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২৯শে মার্চ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ঢাকার পুলিশ হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান।

তফাজ্জল হোসেন ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন। কিছু দিন ছিলেন পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার সংস্থার সেক্রেটারি। তা ছাড়া দু'বছর তিনি ছিলেন পি আই এ-র (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্‌স) ডিরেক্টর।

মানিক মিয়া এ দেশে সরল, বস্তুনিষ্ঠ ও আপসহীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ' বছর নামে তিনি একটি বইও লিখে গেছেন। ১৯৬৯ সালের ৩১শে মে পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আ. কা.

## তবলা

আনদ্ধ যন্ত্র। দুই অংশে বিভক্ত। ডান হাতে বাজাবার অংশটির নাম ডাহিনা বা ডাইনা। এটিকে তবলা বলতেও দেখা যায়। বাঁ হাতে বাজাবার অংশটির নাম বাঁয়া।

তবলার ডাহিনা অংশটি কাঠের তৈরি। উচ্চতা সাধারণত ৯ থেকে ১২ ইঞ্চি। এর ওপরের দিক নিচের দিক থেকে সরু হয়। নিচের দিকের ব্যাস সাধারণত ৮/১০ ইঞ্চি, ওপরের দিকের ব্যাস ৫/৬ ইঞ্চি। কাঠের তৈরি এই অংশকে লকড়ি বা কাঠ বলতে দেখা যায়। এর মুখসহ মধ্য ভাগ খোদাই করে ফাঁপা করে দেওয়া হয়। তারপর মুখের ওপর চামড়ার ছাউনি বা পুড়ী বসানো হয়। ছাউনির মাঝখানে গোলাকার কালো প্রলেপ থাকে। তার নাম গাব, স্যাহী বা খিরণ।

মাটি (দ্র), তামা (দ্র) বা পিতল (দ্র) দিয়ে বাঁয়ার অঙ্গটি

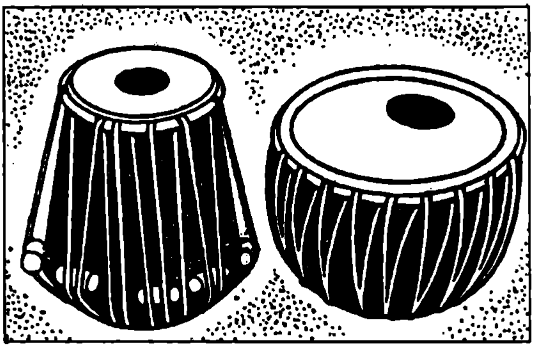

তৈরি হয়। একে হাঁড়ি বা কুড়ী বলা হয়। এর উচ্চতা ৮/১০ ইঞ্চি। নিচের দিক থেকে ওপরের দিকের আয়তন বেশি। ওপরের দিকের ব্যাস ১০/১২ ইঞ্চি হয়। বাঁয়ার হাঁড়িটি হয় ফাঁপা এবং তাতে ডাইনার মতোই ছাউনি দেওয়া থাকে।

বাজাবার সময় ডাইনা বাঁয়া দুটোকেই মাপ মতো কাপড়ের বেড়-এর ওপর বসানো হয় যাতে সেগুলো না নড়ে।

তবলার উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মত এই যে আমীর খসরু (দ্র) এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন।

তবলা বাজাবার পূর্বে তাকে উত্তমভাবে সুরে বেঁধে



www.pathagar.com

নিতে হয়। যথাযথভাবে সুরে বাঁধা না হলে তবলাবাদন শুনতে ভাল শোনায় না।

ক. গো.

**তরঙ্গ** (wave)

নদী বা সমুদ্রে যখন বাতাস (দ্র) বয়, তখন পানি (দ্র) ওপরে-নিচে ওঠানামা করার ফলে তরঙ্গ বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে এই তরঙ্গ নদী বা সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হয়। পুকুরের কোনো একটি স্থানে এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে দিলে সে স্থান থেকে বাইরের দিকে বৃত্তের মতো তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। দেখে মনে হয় যেন ছোট ছোট বৃত্তগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ধানগাছের ওপর দিয়ে যখন জোরে বাতাস বয়ে যায়, ধানগাছগুলো দোল খেয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

কম্পন থেকে শব্দের সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। একে শব্দতরঙ্গ বলে। কোনো কোনো তরঙ্গ তার সৃষ্টিকারী কম্পনের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে যায়। একে আড়তরঙ্গ বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি তরঙ্গের একটি করে শীর্ষ তৈরি হয়। এরূপ পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি আড়তরঙ্গের শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। পানির তরঙ্গ আড়তরঙ্গ। আবার কোনো কোনো তরঙ্গ উৎপত্তিস্থান থেকে কম্পনের বরাবর এগিয়ে চলে। একে দীঘলতরঙ্গ বলে। শব্দের তরঙ্গ দীঘলতরঙ্গ। শব্দের তরঙ্গ যথাক্রমে বাতাসকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে এগিয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে পাশাপাশি দু'টি সঙ্কোচনের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। যে তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান থাকে তাকে পিরিয়ডিক বা পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ (pereodic wave) বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিটারে মাপা হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে এক সেকেণ্ডে যতগুলো তরঙ্গ অতিক্রম করে তার সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক (দ্র) বা ফ্রিকোয়েন্সি বলে। উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম আর নিম্নকম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। শব্দের মতো আলো, বেতার এবং অন্যান্য শক্তিও তরঙ্গের আকারে চলে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগেরও কম। তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে আমরা রেডিও (দ্র) শুনতে পাই।

হো. আ.

**তর্কবাগীশ, মওলানা আবদুর রশীদ** [১৯০০—১৯৮৬]

রাজনীতিবিদ। মওলানা তর্কবাগীশ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে আশির দশকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সিরাজগঞ্জ জেলার তারনটিয়া গ্রামে ১৯০০ সালের ২৭শে নভেম্বর মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত মওলানা আবু ইসহাক। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পীর। মাতার নাম আজিজুন্নেসা।

অল্পবয়সে মওলানা তর্কবাগীশ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (দ্র) ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর (দ্র) সান্নিধ্যে আসেন। এই দুই মনীষীর দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

১৯২০-২১ সালে তিনি খিলাফত আন্দোলন (দ্র) ও অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি 'সালংগা' বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিরাজগঞ্জের সালংগা হাটে ইংরেজ সৈন্যরা প্রায় পাঁচ হাজার গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার দায়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি মুসলিম লীগে (দ্র) যোগদান করেন।

পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মওলানা তর্কবাগীশ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণকারী ছাত্রযুবজনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এক পর্যায়ে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ মাস কারাভোগের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি কৃষক সমিতি গঠন করেন এবং এর প্রথম



www.pathagar.com

সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তর্কবাগীশ ষাটের দশকে আইয়ুব খানের (দ্র) স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে দু'টি আসন থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আশির দশকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন।

*মওলানা তর্কবাগীশ (সর্ববামে), তারপর শেখ মুজিবুর রহমান—মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর, সর্বডানে মওলানা ভাসানী।*

ধর্মান্ধতা মওলানা তর্কবাগীশকে স্পর্শ করতে পারে নি। এ দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা।

মওলানা তর্কবাগীশ ১৯৮৬ সালের ২০শে আগস্ট ইন্তেকাল করেন।

খু. জা.

**তলোয়ার খেলা** অসিচালনা, তলোয়ার খেলা দ্র

**তল্‌স্তোয়, লিয়েফ্ নিকলাইয়েভিচ্** [১৮২৮—১৯১০]

বিশ্ববিখ্যাত প্রথম রুশ ঔপন্যাসিক, যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বলা হত, রাশিয়ার (দ্র) জার (অর্থাৎ সম্রাট) দু' জন : একজন যিনি রুশ সাম্রাজ্যের অধিকর্তা, আরেক জন হলেন লিয়েফ্ তল্‌স্তোয়, এঁদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী বলা কঠিন। এতেই বোঝা যায়, তল্‌স্তোয়ের খ্যাতি ও প্রভাব কত ব্যাপক ছিল। এখনো, বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে যদি পাঁচ জন ঔপন্যাসিককে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতে হয়, তা হলে তাঁদের মধ্যে এই মহান সাহিত্যিককে অন্তর্ভুক্ত না করে উপায় নেই।

বংশমর্যাদায় তল্‌স্তোয় অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকই ছিল প্রাচীন, বনেদী, জমিদার বংশ। বাবার নাম নিকলাই ইলিচ্ তল্‌স্তোয়, এবং মা মারিয়া নিকলায়েফ্‌না ভল্‌কোন্‌স্কায়া। মস্কো (দ্র) থেকে প্রায় দু' শ' কিলোমিটার দূরে কাউন্ট তল্‌স্তোয়দের পারিবারিক

www.pathagar.com

জমিদারি ইয়াস্নায়া পলিয়ানা গ্রামে জন্ম ১৮২৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে লিয়েফ্ ছিলেন চতুর্থ, তাঁর অগ্রজ ছিলেন তিন ভাই, আর পরে একটি মাত্র বোন। তিনি যখন দু' বছরের শিশু তখনই মাতৃহীন হন। পিতা আর বিবাহ করেন নি। তাঁদের সংসারে এক চিরকুমারী আত্মীয়া থাকতেন, তিনিই মাতৃস্নেহে এই পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছিলেন। ধনাঢ্য জমিদার পরিবারের সন্তান যেভাবে যত্নে ও আদরে মানুষ হয় লিয়েফ্‌ও সেভাবেই বেড়ে উঠেছিলেন। তবে, সংসারে বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না এবং সাধারণ লোকজন বা তাদের ছেলেপিলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেও কোনো বাধা ছিল না। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কোনো জবরদস্তি ছিল না। এর ফলে সমবয়সী আর দশটা 'সাধারণ' ছেলেমেয়ের মতোই সাধারণ ও স্বাভাবিক বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর। পাঁচ-ছ' বছর বয়সেই তিনটি ভাষা শিক্ষায় হাতেখড়ি হয় তাঁর—মাতৃভাষা রুশ, আর ফরাসি ও জার্মান ভাষায়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে ও পরিণত বয়সে নিজের চেষ্টায় আরো অনেক ভাষা শিখেছিলেন তিনি : লাতিন, ইংরেজি (দ্র), আরবি (দ্র), তুর্কো-তাতার, ইতালীয়, গ্রিক এবং হিব্রু। সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও মোটামুটি পারদর্শিতা ছিল। তাঁর একাগ্রতা ও পরিশ্রম করার শক্তি ছিল অসাধারণ এবং অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেন নি। বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের (দ্র) মতো ইনিও স্বশিক্ষিত ছিলেন।

তল্‌স্তোয়ের জীবনীশক্তি ও কর্মোদ্যম ছিল দানবীয় রকমের প্রচণ্ড। সেনাবাহিনীতেও কিছুকাল চাকুরি করেছেন; তখন সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াইয়ে অংশগ্রহণও করতে হয়েছিল। ভাল শিকারি ছিলেন এবং ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে স্বভাবের। এক বার ভালুক শিকারে গিয়েছিলেন, একটা ভালুক থাবা মেরে চোখের নিচে থেকে বাঁ দিকের গাল ছিঁড়ে নামিয়ে দেয়; দু' সপ্তাহ পরে ভাল হয়ে উঠে ফের তিনি শিকারে যান ঐ ভালুকটিকে মারার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বধ করেন। বন্ধুবান্ধব বা সমাজ কী বলবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজে যা উচিত ও ন্যায্য বলে ভেবেছেন তা-ই করেছেন সব সময়। শান্ত-সুবোধ প্রকৃতির ছিলেন না, যৌবনে প্রচুর ধারদেনা করেছেন, বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করেছেন। পাদ্রিপুরুতদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের সমালোচনা করেছেন, এবং তার শাস্তি স্বরূপ যাজক সম্প্রদায় ঘোষণা করেছে যে তল্‌স্তোয়কে খ্রিস্টধর্ম (দ্র) থেকে বহিষ্কার করা হল, তিনি আর খ্রিস্টান বলে গণ্য হবেন না। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে যারা ঈশ্বর ও যিশুকে নিয়ে ব্যবসা করে তাদের চেয়ে তিনি সহস্র গুণ বেশি ধার্মিক খ্রিস্টান। তিনি যখন মারা যান তখন পাদ্রিপুরুতের দল ভিড় করে এসেছিল, কিন্তু কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় নি; এবং দেশের ও বিদেশের হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই তাঁর শবযাত্রায় সামিল হয়ে তাঁকে সমাহিত করে। অন্য দিকে, সম্রাটের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই মুখর ছিলেন, স্বনামে ও বেনামে দেশের ভিতরে ও বাইরে জার-শাসনের সমালোচনা করে লেখা ছাপিয়েছেন; কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ভয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয় নি, পাছে তার ফলে তাদের আরো দুর্নাম ও কেলেঙ্কারির বোঝা বইতে হয়। নিজের জমিদারিতে দরিদ্র চাষাভুষোর ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছেন, তাতে নিজে পড়িয়েছেন। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে আক্রান্ত অঞ্চল সরজমিনে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়িয়েছেন। সরকারের বিরুদ্ধে ঔদাসীন্যের অভিযোগ এনেছেন। আদমশুমারিতে অংশ নিয়েছেন। আইনের নামে বিচারের প্রহসন কীভাবে হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য দিনের পর দিন আদালত আর জেলখানায় ঘুরেছেন। এমন সততা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বিস্ময়কর।

লেখক হিসাবে তল্‌স্তোয়ের আবির্ভাব পূর্বপরিকল্পিত নয়। সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন দ্বারা তিনি বাল্যে বা কৈশোরে তাড়িত হন নি। তাঁর মনের গড়ন ছিল ভাবুকের, দার্শনিকের। সে জন্যই তিনি যখন গল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করতে শুরু করলেন, সেখানে কোথাও অবাস্তব রোম্যান্টিক কল্পনা আমরা দেখতে পাই না। তিনি সেসব মানুষ, সামাজিক স্তর বা জীবনযাত্রার ছবিই তাঁর কাহিনীতে এঁকেছেন যা তিনি নিজে দেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিও ছিল বিশাল—সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষ থেকে শুরু করে রাজদরবারের লোকজনদের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন।

চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রেমে পড়ে আঠারো বৎসরের কুমারী সোফিয়া আন্দ্রেইয়েফ্‌না বের্স্‌-কে বিবাহ করলেন।



www.pathagar.com

ততদিনে তিনি নামকরা লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

লিয়েফ্ তল্‌স্তোয়ের রচনার পরিমাণ বিশাল : ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ডায়েরি, চিঠিপত্র সব মিলিয়ে তাঁর রচনাসমগ্র প্রায় ৯০ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্তর্গত : 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৮৬২–৬৮), 'আন্না কারেনিনা' (১৮৭৮), 'পুনরুত্থান' (১৮৯৯)। তাঁর বড়গল্পের মধ্যে 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' (১৮৮৬) ও 'ফাদার সিয়েগি' (১৮৯৮) বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর অন্যতম। তাঁর নাটক 'অন্ধকারের শক্তি' (১৮৮৭) ও 'জিন্দা লাশ' (১৯০০) পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

তল্‌স্তোয় দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং নানা কারণে তাঁর শিল্পী জীবনের সবটুকুই অশান্তির মধ্যে কেটেছে। এই অশান্তির একটি প্রধান কারণ ছিল—সমাজে বা সভ্যতায় প্রচলিত কোনো বিশ্বাস বা রীতিনীতি তিনি বিনা প্রশ্নে মেনে নেন নি। জীবন, জগৎ, মনুষ্যসমাজ, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর নিরন্তর জিজ্ঞাসা তাঁর অনেক শত্রুও তৈরি করেছিল। শেষ জীবনে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি কেউই তাঁর পক্ষে ছিলেন না। ধনীর দুলাল তল্‌স্তোয় শেষ বয়সে প্রায় সন্তের জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। নিজের কাজ নিজে হাতে করতেন, এমনকি জুতো নিজে তৈরি করে পরতেন; চাষাভুষোর মতো সাধারণ ও অল্প আহার করতেন, পরতেন ক্ষেতমজুরের পোশাক। এক সময়ে মনে হল—তাঁর কোনো অধিকার নেই তাঁদের পাকা বাড়িতে থাকার, স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের বিলাসবহুল জীবন থেকে দূরে যাওয়া তাঁর জন্য প্রয়োজন। কাউকে না বলে বাড়ি ছেড়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়া হয়। এতেই তিনি মারা গেলেন, বাড়ি থেকে দূরে, এক রেলস্টেশনে ২০শে নভেম্বর ১৯১০ তারিখে। পরে তাঁর মরদেহ তাঁর গ্রামে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়।

হা. মা.

## তাওরাত

তাওরাত নামক ধর্মগ্রন্থ হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ। এটি ইহুদিদের ধর্মপুস্তক। পবিত্র কুরআনে (দ্র) তাওরাত প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং এর বাণীরও উদ্ধৃতি রয়েছে। বস্তুত বনি ইসরায়েলীদের সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তাওরাতের বাণীসমূহ মুসার (আ.) নিকট অবতীর্ণ হয়। তাওরাত হিব্রু ভাষায় লিখিত।

মু. মা.

## তাওহীদ

আভিধানিক অর্থ এক করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়ত্বের ধারণা, একত্ববাদ।

তাওহীদ বা একত্ববাদ ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক বা সমকক্ষ নেই, একমাত্র তিনিই ইবাদতের (দ্র) যোগ্য—বস্তুত তাওহীদের এই অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন দর্শন সৃষ্টিকর্তাকে এক নিরঙ্কুশ মহাশক্তিমান সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সর্বশক্তিমান প্রভু হিসাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে এক সার্বভৌম ও অখণ্ড মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। তাওহীদ বা একত্ববাদী দর্শনে বহু-ঈশ্বরবাদের কোনো স্থান নেই।

তাওহীদের চেতনা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত বহু আয়াত (বাক্য) পবিত্র কুরআনে (দ্র) দৃষ্টিগোচর হয়।

মু. মা.

## তাজউদ্দিন আহমদ [১৯২৫—১৯৭৫]

রাজনীতিবিদ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের (দ্র) সময় গঠিত মুজিবনগর (দ্র) সরকারের প্রধানমন্ত্রী। জন্ম বর্তমান গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দরদিয়া গ্রামে, ১৯২৫ সালে।

তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ অর্থনীতিশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৮ সালে গঠিত পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাজউদ্দিন আহমদ মুসলিম লীগ (দ্র) সরকারের গণবিরোধী রাজনীতির



www.pathagar.com

*দুই শিশুকন্যার সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদ*

*নিচে : ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর, মুজিবনগর থেকে স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় ফিরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সরকারি কর্মচারীদের কাছে নতুন রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করছেন*

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উভয় কমিটিরই সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) মনোয়ন পেয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরেরই মে মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করলে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৯ সালে মুক্তি পান। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের (দ্র) সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে জেলে আটকাবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে আইন পাশ করেন।

তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৬৬ সালের ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) ঘোষণা করেন তাঁর ৬-দফা (দ্র)। তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) মুখে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ (১৯৬৯) মাসে তিনি জেনারেল আইয়ুব খান (দ্র) আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের মনোনয়নে সংসদসদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণের মুখে তিনি ভারতে (দ্র) চলে যান এবং এ বছরেরই ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) ন' মাসে তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং অর্থ, পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হন। পরে ঐ বছর ১৩ই এপ্রিল মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলে তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রীপদ লাভ করেন। তবে ১৯৭৪ সালে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে হয়।



www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাজউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার হন এবং ৩রা নভেম্বর তারিখে তিনি তাঁর অপর তিন রাজনৈতিক সহযোগীর সঙ্গে কুখ্যাত জেলহত্যায় (দ্র) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় নিহত হন।

আ. হু.

## তাজমহল

পৃথিবীর (দ্র) অন্যতম আশ্চর্য স্মৃতিসৌধ হল আগ্রার তাজমহল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগল সম্রাট শাহজাহান (দ্র) ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬১২ সালে তিনি আরজুমান্দ বানু বেগম নাম্নী এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণীকে বিয়ে করেন। সম্রাট পত্নীর নতুন নাম দেন মমতাজ মহল। শোনা যায়, একদা সম্রাজ্ঞী তাজমহলের অনুরূপ একটি ভবন স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নের কথা তিনি সম্রাটকে খুলে বলেন। তিনি সম্রাটকে অনুরোধ করেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন স্বপ্নে দেখা ঐ সৌধের অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

১৬৩১ সালে বারহানপুর শহরে সন্তান হওয়ার সময় মমতাজ মহল মৃত্যুবরণ করেন। পত্নীর মৃত্যুতে সম্রাট এতই ভেঙে পড়েন যে তিনি সিংহাসন ছেড়ে দিতে পর্যন্ত উদ্যত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি পত্নীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য এমন একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন যা কখনো কোথাও নির্মিত হয় নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতিদের ডেকে আনা হয় সম্রাটের দরবারে। আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও আসেন সেরা শিল্পী ও স্থপতিরা। ১৬৩২ সালে নির্বাচিত নকশা অনুযায়ী তাজমহলের নির্মাণ-কাজ শুরু হয়। অতুলনীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণে নিযুক্ত করা হয় বিশ হাজারেরও বেশি শ্রমিক। আর এর নির্মাণ-কাজ শেষ হতে সময় লাগে বিশ বছর। এতে ব্যয় হয় ৪ কোটি টাকা।

তাজমহলের চত্বরটি আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৬৩৪ ও ৩৩৪ গজ। বাইশ ফুট উঁচু মার্বেলের পীঠিকার ওপর স্মৃতিসৌধটির অবস্থান। তাজমহলের চার কোণে আছে ৪টি মিনার। সৌধের উচ্চতা ২০০ ফুট। পুরোটাই শ্বেত পাথরের তৈরি। মেঝে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে শ্বেত পাথর ছাড়াও ১২ রকম মূল্যবান পাথর ও মণি-

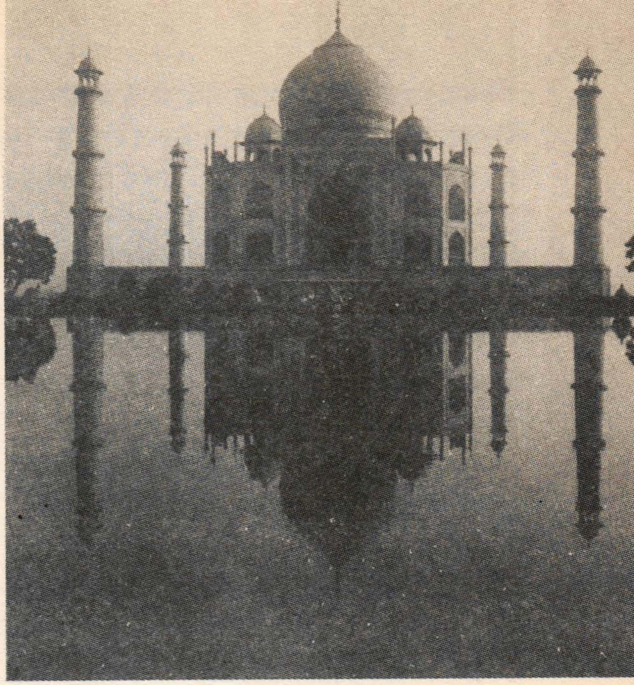

*যমুনার তীরে তাজমহল*

মাণিক্য। সৌধের দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে পবিত্র কুরআনের (দ্র) বাণী।

তাজমহল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনা হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও আরব, মিশর, তিব্বত ও আরো বহু দেশ থেকে। তাজমহলের নিচের অংশে রয়েছে বেগম মমতাজ মহল ও সম্রাট শাহজাহানের কবর। বহুমূল্য রত্নরাজিতে সে সমাধি অলঙ্কৃত।

সম্রাট শাহজাহান নিজের জন্য যমুনার অপর তীরে কালো মার্বেল পাথরে তাজমহলের অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি নিজের পুত্র আওরঙ্গজেবের (দ্র) হাতে বন্দি হন।

তাজমহল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থানের অন্যতম। ভারতের বিভিন্ন স্থান ও অন্যান্য দেশের হাজার হাজার পর্যটক এই অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্মৃতিসৌধ দেখতে যান। চাঁদের আলোয় তাজের সৌন্দর্য উপভোগ যে কোনো ভ্রমণকারীর কাছেই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আ. কা.

## তাজিয়া

তাজিয়া আরবি শব্দ। এর সাধারণ অর্থ শোক প্রকাশ। অন্য অর্থে শিয়া সম্প্রদায়ের (দ্র) এমন নাটক বা অভিনয়, যা



www.pathagar.com

শোকপ্রকাশ করে। শিয়াদের মধ্যে তাজিয়া শব্দ সাধারণভাবে শহীদ হয়েছেন এমন ইমামদের, বিশেষ করে ইমাম হুসাইন (দ্র) (রা.)-এর জন্য শোক প্রকাশকে বোঝায়। কারবালায় অবস্থিত ইমাম (রা.)-এর কবরের মতো দেখতে নকল কবরকে তাজিয়া বলা হয়। এই নকল কবর তাজিয়াখানায় রাখা হয় এবং শোভাযাত্রার সময় বের করা হয়। এই মিছিলে অংশ নেয় হযরত হুসাইন (রা.)-এর নকল দুলদুল ঘোড়া, মিছিলে আরো থাকে হযরত হুসাইন (দ্র) (রা.)-এর কন্যা ফাতিমার বিবাহ-মিছিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে (দ্র) সাধারণত বাঁশের বাতা দিয়ে তাজিয়া-কাঠামো তৈরি করা হয় অথবা সরু কাঠের ফ্রেম বানিয়ে তার ওপর নকশাদার কাগজ, নানা ধাতুর (দ্র) তৈরি ঝালর লাগানো হয়। কখনো কখনো তুলা (দ্র) বা কাপড় দিয়েও তাজিয়া বানানো হয়। তারপর তা আলো জ্বালিয়ে সাজানো হয়। উৎসব পালনকারীদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তাজিয়া ছোট-বড় হতে পারে।

তাজিয়ার ওপর একটি বড় গম্বুজ এবং এর চার কোণায় চারটি ছোট ছোট গম্বুজ থাকে। ভেতরে কাগজ দিয়ে মোড়ানো থাকে লাল ও সবুজ রঙের দু'টি নকল কবর। লাল কবরটির নাম 'তুরবৎ-ই-হুসাইন' এবং সবুজ কবরটির নাম 'তুরবৎ-ই হাসান'। 'তুরবৎ' ফার্সি শব্দ। অর্থ কবর। তাজিয়ার ওপরে একটি এবং চারপাশে চারটি 'অলম' লাগানো থাকে। দু'টি রূপার দু'ধারি তলোয়ার আড়াআড়িভাবে তাজিয়ায় বসানো থাকে। তাজিয়ার সামনের দিকে চারটি তলোয়ার (দু'টি পিতলের এবং দু'টি রূপার) দুই পাশে দু'টি করে সাজিয়ে রাখা হয়।

মুহর্‌রম (দ্র) মাসের প্রথম তারিখে তাজিয়া অলম, পাঞ্জা, লস্করি ইত্যাদি দিয়ে তাজিয়াকে ইমামবারাতে (দ্র) সাজানো হয়। আশুরার (১০ই মুহর্‌রম) দিন তাজিয়াকে মিছিল করে কারবালায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর গর্ত করে তার ভেতরে তা রেখে দেওয়া হয় এবং পানি ঢেলে ঢেলে ঠাণ্ডা রাখা হয়। কোনো কোনো স্থানে মাটি খুঁড়ে তাজিয়াকে কবর দেওয়ারও রীতি আছে। তাজিয়াকে সাজাবার জন্য পিতল, রূপা, তামা ইত্যাদির যেসব অলম ও পাঞ্জা ব্যবহার করা হয় সেগুলি তখন খুলে নেওয়া হয় এবং পরের এক বছরের জন্য সেগুলি ইমামবারাতে রেখে দেওয়া হয়। তবে বাঁশ, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি তাজিয়ার অংশগুলি দাফন করা হয়। কোথাও কোথাও তা পানিতে ডোবানোরও রীতি আছে।

তাজিয়ার সামনে বারো/তেরো ফুট লম্বা ও চার ফুট চওড়া কাঠের একখানি চৌকি রাখা হয়। এই চৌকির ওপর আগরবাতি, মোমবাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি থাকে। তাজিয়ার ওপরে কারুকাজ করা দু'খানি শামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ১০ই মুহর্‌রম তারিখের মিছিলে কিন্তু শামিয়ানা সঙ্গে নেওয়া হয় না। তাজিয়ার সামনে থাকে কাচের তৈরি দু'টি বেলোয়ারি ঝাড়, আর এর সঙ্গে থাকে বাতি দেওয়ার জন্য ছ'টি করে 'লালা'। তাজিয়া যাতে দেখা যায় সে জন্য এখানে মোম বা বিজলির বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়।

তাজিয়া কথাটি পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রচলিত। এমনকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ইরানে যেসব নাটক রচিত এবং অভিনীত হয়, সেগুলো সেখানে তাজিয়া নামে পরিচিত।

শা. হ.

**তাঞ্জুর** অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দ্র

## তাণ্ডব

উদ্ধত ভাব প্রকাশক নৃত্যকলা। তণ্ডুমুনি কর্তৃক উদ্ভাবিত বলে তাঁর নাম অনুসারে এই নৃত্যকলার নাম 'তাণ্ডব' হয়েছে বলে অনুমান। তাণ্ডব নৃত্যে পুরুষের অগ্রাধিকার। চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড—তাণ্ডবের এই তিন শ্রেণী।

ভাবপ্রকাশের বিবেচনায় নৃত্যকলা দুই প্রকার : লাস্য ও তাণ্ডব। মধুর ভাবে লাস্য ও উদ্ধত ভাবে তাণ্ডব। তাণ্ডব নৃত্যে উদ্দামভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করা হয়। সঙ্গীতে ও তালছন্দে এই ভাবের প্রতিফলন থাকে। তাণ্ডব ধ্বংসের দেবতা শিবের প্রিয় নৃত্য।

ক. গো.

## তান

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বিশেষত কণ্ঠসঙ্গীতের একটি বিশেষ অঙ্গের নাম। তান কথাটি দ্বারা বিস্তার বোঝায়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাগের (দ্র) রূপ বিস্তৃত করা হয় তারই নাম তান। তবে তানের প্রচলিত সংজ্ঞার্থ হচ্ছে : বিশেষ লয়ে স্বরবিস্তার। গানের লয়ের দ্বিগুণ বা ততোধিক লয়ে স্বরবিস্তারের নাম তান। এই বিস্তার স্বরধ্বনি অর্থাৎ আ, ই, উ, ও প্রভৃতির



www.pathagar.com

সাহায্যে হতে পারে বা স্বরের স্থাননাম অর্থাৎ সা রে গা মা প্রভৃতির সাহায্যেও হতে পারে। তান অনেক প্রকার। তার মধ্যে শুদ্ধ তান বা সপাট তান, ছুট তান, কূট তান, বক্র তান, মিশ্র তান, গমক তান, ফিরত তান, বোল তান, আলঙ্কারিক তান, মিশ্র তান, স্বরতান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রুত তানকে বলা হয় 'তান কর্তব'। তানক্রিয়ায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বলা হয় তানকারি।

ক. গো.

## তানপুরা

এক প্রকার তারযন্ত্র। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতে সহায়ক যন্ত্র হিসাবে এর মুখ্য ব্যবহার। শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতেও এর ব্যবহার হয়। একটি গোল আকৃতির অলাবু বা লাউ-এর সঙ্গে একটি ফাঁপা কাষ্ঠদণ্ড যুক্ত করে তানপুরা তৈরি করা হয়। কাষ্ঠদণ্ডের ওপরের প্রান্তে চারটি কাঠের চাবি বা কান যুক্ত থাকে। লাউ-এর মাঝখানে থাকে একটি ব্রিজ বা সেতু বা সওয়ারি। চারটি কানে জড়ানো তানপুরায় ব্যবহৃত চারটি তারকে সওয়ারির ওপর দিয়ে নিয়ে লাউ-এর নিম্ন প্রান্তে বা মেরুতে বাঁধা হয়। সওয়ারির নিচে চারটি তারেই চারটি মানকা বা ছোট গুলি ঢোকানো থাকে। কান মুচড়ে তারগুলো টান টান করে সুর বাঁধা হয়। মানকা উঠিয়ে নামিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে সুরকে সঠিক করা হয়। সওয়ারির ওপর তারের নিচে এক টুকরো রেশমের (দ্র) সুতো থাকে। সুতোটিকে ঠিক একটি জায়গায় নিতে পারলে ধ্বনির জোয়ারি বা রেশ পাওয়া যায়। তানপুরার চারটি তারের দু'টি পেতলের ও দু'টি ইস্পাতের। তানপুরায় ষড়জ ছাড়া রাগের (দ্র) বাদী ও সংবাদী স্বর মাত্র ধ্বনিত হয়ে থাকে। এর কোনো ধ্বনিবৈচিত্র্য নেই। বারে বারে দু-তিনটি স্বরই ধ্বনিত হয়। লাউ-এর দিকটা কোলে চাপিয়ে কাষ্ঠদণ্ডটি খাড়া ওপরের দিকে তুলে বা তানপুরাটি কোলে শুইয়ে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা তারে মৃদু টান দিয়ে এটি বাজানো হয়। একতারা থেকে তানপুরার উদ্ভব বলে বিশ্বাস। কেননা, ধারণা করা হয় যে একতন্ত্রী বীণা থেকে তানপুরার উৎপত্তি। একতারাই একতন্ত্রী বীণা। তম্বরু নামে এক জন মুনি বা গন্ধর্ব এটি তৈরি করেছিলেন বলে এর প্রাচীন নাম তম্বুরা। তাম্বুরা, তমুরা নাম দু'টিও পাওয়া যায়।

ক. গো.

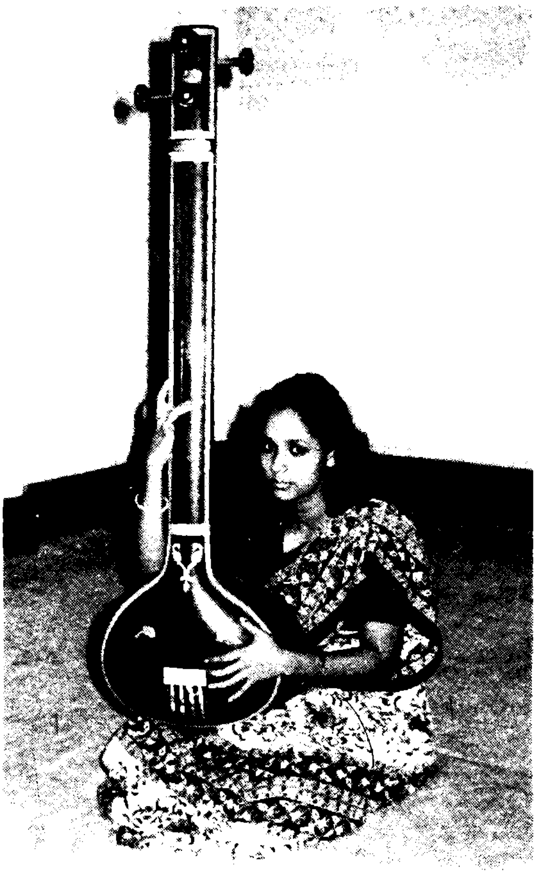

*তানপুরা হাতে শিল্পী*

## তানসেন

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার হিসাবে বিবেচিত। ১৫০৫ সালে বারাণসীতে জন্ম। পিতা মুকুন্দরাম পাঁড়ে। পিতার দেওয়া নাম রামতনু পাঁড়ে। শৈশবেই রামতনু বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য স্বামী হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল ধরে সঙ্গীতাভ্যাস করেন। এর পরে তিনি পিতার পরামর্শে গোয়ালিয়রের অধিবাসী মুসলিম ধর্মগুরু ও সঙ্গীতবিদ মুহম্মদ গাউসের কাছে যান ও তাঁর আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন। গাউসের কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করেন বলেও জানা যায়। গাউসের মাধ্যমেই গোয়ালিয়রের বিখ্যাত সঙ্গীতসভার সঙ্গে রামতনুর যোগাযোগ ঘটে। গোয়ালিয়রের সঙ্গীতজ্ঞ রাজা ও 'মানকুতূহল' গ্রন্থপ্রণেতা মানসিংহ তোমর তখন



www.pathagar.com

পরলোকে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞা রাণী মৃগনয়নী তখনো জীবিত। রামতনুর গান শুনে মৃগনয়নী মুগ্ধ হন। হোসেনী নামে মৃগনয়নীর এক জন মুসলিম সঙ্গীতশিষ্যা ছিলেন। রামতনু তাঁকে বিয়ে করেন এবং সে জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় আতা আলী খাঁ। বিবাহের পর আতা আলী পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে যান ও স্বামী হরিদাসের

*শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতম রূপকার মিঁয়া তানসেন*

নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতে শুরু করেন। এর কিছুদিন পরে গাউস গোয়ালিয়রে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমুদয় সম্পদ আতা আলীকে দান করে দেন। আতা আলী সেই থেকে গোয়ালিয়রে বসবাস করতে শুরু করেন এবং স্বামী হরিদাসের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকে। গোয়ালিয়রেই তানসেনের চার পুত্র সুরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাস খাঁ এবং এক কন্যা সরস্বতীর জন্ম হয়। রেওয়ার রাজা রামচাঁদ আতা আলীকে তাঁর সভাগায়কের পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন ও রেওয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। রেওয়ার দরবারে কয়েক বছর কাটানোর পর আতা আলীর জীবনে এক বিরাট সুযোগ উপস্থিত হয়। আকবর (দ্র) তখন দিল্লির সম্রাট। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সপ্তম বর্ষ উপলক্ষে তিনি আতা আলীকে তাঁর দিল্লির দরবারে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এবার রেওয়া থেকে আতা আলী আসেন দিল্লিতে সম্রাট আকবরের সঙ্গীতসভায় যোগ দিতে। আকবর খুবই ভালবাসতেন আতা আলীর গান শুনতে। তাঁকে আকবর নানা পুরস্কারে ভূষিত করতেন। জানা যায় যে তাঁকে আকবরই 'তানসেন' পদবী দান করেন। তানসেন কথার অর্থ হচ্ছে তান দ্বারা যিনি মুগ্ধ করেন। এ থেকে আতা আলী খাঁ 'তানসেন' নামে খ্যাত হন। তানসেনের বয়স যখন সত্তরের ওপর তখন তিনি তাঁর সুগায়ক পুত্রদের দিল্লির দরবারে অধিষ্ঠিত করে অবসর গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবর তাঁকে মাসিক দুই হাজার মুদ্রার বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৫৮৫ সালে তানসেনের মৃত্যু হয়। গোয়ালিয়রে গাউসের সমাধির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তানসেন আধুনিক উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের জনকতুল্য। তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর পুত্রবংশ ও কন্যাবংশ এবং তাঁদের শিষ্যাদিক্রমেই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তার ঘটে। তানসেন সঙ্গীতরচয়িতা ও সঙ্গীতগ্রন্থরচয়িতা ছিলেন। তিনি অনেক ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীতসার' নামে তিনি দু'খানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর হাতে কতিপয় রাগ নবরূপ লাভ করে, যেমন— মিয়াঁকি কানাড়া, মিয়াঁকি মল্লার, মিয়াঁকি ঢোড়ী, মিয়াঁকি সারঙ। তিনি দীপক রাগের সংস্কার করেন বলে জানা যায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও তানসেনের অবদান ছিল। তিনি রবাব যন্ত্র নতুন করে নির্মাণ করেছিলেন। আমীর খসরু (দ্র) ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে নবরূপ দানে নিয়োজিত হয়েছিলেন তানসেন তার পূর্ণতা বিধান করেন। নিজের পুত্র-কন্যা ব্যতিরেকে তানসেন এক বিরাট শিষ্যসমাজ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রামদাস, সুরদাস. মসনদ আলি খাঁ, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, রমজান, লাল খাঁ, শোভা খাঁ, চঞ্চল শশী, ভীমরাও, বাজবাহাদুর, ভগবান দাস, তানতরল, মানতরল, দেবীনাথ প্রমুখ। তানসেনের কীর্তিকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কিংবদন্তি হচ্ছে : তিনি গান গেয়ে আগুন জ্বালাতে পারতেন ও বৃষ্টি নামাতে পারতেন। তিনি মিঁয়া তানসেন নামেও খ্যাত।

ক. গো.



www.pathagar.com

## তাপ / তাপমাত্রা

তাপ এক ধরনের শক্তি, যা অণু-পরমাণুর এলোমেলো ছুটোছুটির ফলে সৃষ্টি হয়। মানুষ এক সময় পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষে বা কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষে তাপ উৎপন্ন করত। কাঠ (দ্র), কয়লা (দ্র), তেল বা গ্যাস (দ্র) পুড়িয়ে আমরা তাপ উৎপন্ন করতে পারি। একটি বৈদ্যুতিক রোধকের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলেও তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য (দ্র) থেকে প্রচুর তাপশক্তি আমরা পাই। এই তাপ উৎপন্ন হয় পারমাণবিক বিক্রিয়ার দ্বারা। এখানে হাইড্রোজেন- পরমাণু ফিউশানপ্রক্রিয়া বা গলনপ্রক্রিয়ায় হিলিয়াম- পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি নির্গত হয়।

বিভিন্ন রকম শক্তি, যেমন— যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, রাসায়নিক শক্তি, শব্দশক্তি, আলোকশক্তি, চুম্বকশক্তি বা পারমাণবিক শক্তি থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন করা যায়। আবার তাপ থেকে অন্য রকম শক্তিও উৎপন্ন হতে পারে। তাপচালিত নানা ইঞ্জিনে তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

তাপ তিন ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চারিত হতে পারে, যথা—পরিচলন, পরিবহণ ও বিকিরণ (দ্র)। একটি লোহার দণ্ডের ভিতর দিয়ে যখন তাপ উভয় এলাকা থেকে ঠাণ্ডা এলাকায় সঞ্চারিত হয়, সেটা পরিবহণ। কোনো তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর ভিতর দিয়ে তাপ যখন উত্তপ্ত অণুর স্থানবদলের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় সেটা হল পরিচলন। কোনো মাধ্যম ছাড়াই তাপ যখন সঞ্চারিত হয় সেটা হল বিকিরণ।

কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থাকে তাপমাত্রা বলা হয়। তাপ ও তাপমাত্রা এক নয়। থার্মোমিটারের (দ্র) সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয়।

আ. আ.

## তাপমান যন্ত্র / থার্মোমিটার

উত্তাপ নির্ণয় করতে পারে এমন যন্ত্র হল থার্মোমিটার (thermometer) বা তাপমান যন্ত্র। উত্তাপের সঙ্গে পরিমাপযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় পদার্থের এমন যে কোনো গুণের ভিত্তিতে তাপমান যন্ত্র তৈরি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত তরলভর্তি সরু কাচ-নলের থার্মোমিটার; এটি কাজ করে উত্তাপে তরলের আয়তন প্রসারণের ভিত্তিতে। তরল হিসাবে ব্যবহৃত পারদ (দ্র) বা অ্যালকোহল (দ্র) কম উত্তাপে জমে কঠিন না হওয়া পর্যন্ত বা বেশি উত্তাপে বাষ্পীভূত না হওয়া পর্যন্ত এরকম তাপমান যন্ত্র কার্যকর। সেটি গলন্ত বরফের (দ্র) উত্তাপের উপরে-নিচে কয়েক শ' ডিগ্রির বেশি যায় না।

ছোট, শক্তসমর্থ এক রকম তাপমান যন্ত্র তৈরি হয় দু'টি ধাতব পাত আগাগোড়া একে অপরের উপর সেঁটে দিয়ে। এদের একটির ধাতুর উত্তাপে প্রসারণক্ষমতা অন্যটির চেয়ে বেশি। ফলে উত্তাপে ভিন্ন রকম বাড়ার টানাপোড়েনে এটি বেঁকে যায়। বাঁকার পরিমাণটি কাঁটার সাহায্যে সহজে একটি ডায়ালের উপর দেখানো যায়।

খুব সূক্ষ্মভাবে এবং অনেক নিম্ন থেকে অনেক উচ্চে বিস্তৃত তাপমাত্রা মাপতে হলে বৈদ্যুতিক থার্মোমিটারের প্রয়োজন হয়। এর একটি বাড়তি সুবিধা হল, সরু তারের মাধ্যমে জটিল যন্ত্রপাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভিন্ন বিন্দুর নিজস্ব উত্তাপ এতে নির্ণয় করা সম্ভব। এক রকম বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা হল রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার। উত্তাপের ফলে উপযুক্ত বিদ্যুৎ-পরিবাহী বস্তুর বৈদ্যুতিক রোধকতায় যে পরিবর্তন ঘটে সেটি এতে পরিমাপ করা হয়। আর একটি ব্যবস্থা হল থার্মোকাপ্‌ল্‌ বা তাপযুগল। এতে দু'টি ভিন্ন ধাতুর (অথবা ধাতুসঙ্করের) তৈরি তারকে দুই প্রান্তে পরস্পর জুড়ে দু'টি জংশনের সৃষ্টি করা হয়। জংশন দু'টিকে যদি ভিন্ন উত্তাপে রাখা হয়, তবে দুইয়ের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজটি যদিও খুব কম, তবু একে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। একটি জংশনকে গলন্ত বরফের মতো সুনির্দিষ্ট উত্তাপে রাখা হলে সৃষ্ট ভোল্টেজ থেকে অন্য জংশনের উত্তাপ নির্ণয় সম্ভব। এসব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নিম্নতম সম্ভাব্য তাপমাত্রা (দ্র) পরম শূন্যের কিছু উপরে থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বে ২৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তাপ মাপা সম্ভব। এরও উপরের তাপমাত্রার জন্য, যেমন গলিত ধাতু, চুল্লি ইত্যাদিতে উত্তপ্ত বস্তু থেকে বিকীর্ণ আলোর রঙ, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি দূর থেকে পরিমাপ করে উত্তাপ জানা যায়। এরকম তাপমান যন্ত্রকে পাইরোমিটার (pyrometer) বলা হয়।

উল্লিখিত সব রকম থার্মোমিটারে নিশ্চিতভাবে জানা



www.pathagar.com

কয়েকটি উত্তাপে যন্ত্রের পাঠ নিয়ে তারই বর্ধিত হিসাবে অন্য পাঠ থেকে উত্তাপ উদ্ঘাটন করা হয়। অর্থাৎ জানা উত্তাপ থেকে এগুলোকে মানকৃত করে নিতে হয়। কিন্তু গ্যাস (দ্র) থার্মোমিটার নামে পরিচিত তাপমানযন্ত্র পদার্থবিদ্যার গ্যাসের নিয়ম অনুযায়ী উত্তাপ জানিয়ে দিতে সক্ষম। আধুনিক ডিজিট্যাল থার্মোমিটারে পরিমাপ করা তথ্য বৈদ্যুতিক সিগন্যাল রূপে ইলেক্ট্রনিক বর্তনীতে যায় এবং তার সাহায্যে সরাসরি সংখ্যার আকারে তাপমাত্রা প্রদর্শন-পর্দায় ফুটিয়ে তোলে।

মু. ই.

## তাফসীর

'তাফসীর' আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। ইসলামী পরিভাষায় পবিত্র কুরআনের (দ্র) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে তাফসীর বলা হয়।

পবিত্র কুরআন বহু ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব এবং প্রসঙ্গ সংবলিত এক ঐশীগ্রন্থ। এখানে বহু বিষয় ও প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যা সাধারণ্যে সব সময় সহজবোধ্য নয়। এ জন্য কুরআনকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজবোধ্য করার তাগিদেই তাফসীরশাস্ত্রের উদ্ভব, যার শুরু ইসলামের প্রারম্ভকাল থেকেই।

তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে জালালাইন প্রভৃতি বঙ্গানুবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত সুবিখ্যাত তাফসীর অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ।

মু. মা.

## তামা (copper)

হলুদাভ কমলা রঙের ধাতু। এর লাতিন নাম *কিউপ্রাম (Cuprum)*। রাসায়নিক সঙ্কেত-চিহ্ন Cu। পারমাণবিক ওজন ৬৩.৫৫। পারমাণবিক সংখ্যা ২৯। গলনাঙ্ক ১০৮৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্ফুটনাঙ্ক ২৫৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানবজাতি পাঁচ হাজার বছরেরও আগে থেকেই তামার ব্যবহার শুরু করেছিল। সম্ভবত ধাতুর মধ্যে তামার সঙ্গেই মানুষের পরিচয় ঘটেছিল সবার আগে। তামা বেশ নমনীয় ধাতু। হাতুড়ি বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে পিটিয়ে একে ইচ্ছেমতো আকার দেওয়া যায়। বিদ্যুৎ (দ্র) এবং তাপের (দ্র) জন্য এটি একটি সুপরিবাহী ধাতু। ব্যবহারের পরিমাণের দিক থেকে বর্তমানে লোহার (দ্র) পরেই তামার স্থান। অর্থাৎ ধাতু হিসাবে তামার ব্যবহারের স্থান দ্বিতীয়।

প্রকৃতিতে তামার দু'টি আইসোটোপ (দ্র) পাওয়া যায়— $63_{Cu}$ এবং $67_{Cu}$। এ ছাড়াও আছে সাতটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

তামা এবং টিনের মিশ্রণে সঙ্করধাতু ব্রোঞ্জ (দ্র)-এর ব্যবহার অনেক প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। ব্রোঞ্জ বা দস্তার ব্যাপক ব্যবহার ছিল বলেই ইতিহাসে মানবজাতির একটি যুগকে 'ব্রোঞ্জ-যুগ' বলা হয়। ব্রোঞ্জ ছাড়াও তামার আরেকটি সঙ্করধাতু হচ্ছে পিতল (দ্র)। তামার সঙ্গে দস্তার আকরিক গলিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয়, আসিরীয়, রোমান ও গ্রিকেরা তামা, দস্তা ও পিতলের ব্যবহার জানত। অস্ত্র তৈরির জন্য তামা ও ব্রোঞ্জ—এই দু'টি ধাতুই ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ তৈরি করা হত।

সু. ব.

## তামাক

সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *নিকোটিয়ানা রাস্টিকা,* এল *(Nicotiana rustica, L)* এবং *নিকোটিয়ানা ট্যাবাকাম,* এল *(Nicotiana tabacum, L)*। উচ্চতায় সাধারণত এক থেকে দুই মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। মেক্সিকো ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল তামাক গাছের আদি নিবাস। কলম্বাস (দ্র) -পূর্ব যুগে পাশ্চাত্য জগতে তামাকের ব্যবহার শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এর ব্যবহার পর্তুগাল ও স্পেনে সম্প্রসারিত হয়। তারপর ক্রমে ইউরোপ (দ্র), আফ্রিকা (দ্র) ও এশিয়ায় (দ্র) এর ব্যবহার শুরু হয়। যেসব এলাকার গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো সেসব অঞ্চলে এ গাছ ভাল জন্মে। তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চলের আদিবাসীরা প্রাচীন কালে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় উৎসব ছাড়া তামাক সেবন করত না। পরে ১৫৫৬ সালে স্পেনীয়রা আমেরিকা থেকে তামাক আমদানি করে। তারপর থেকে



www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে তামাকের চাষ ও এর ধূমপানের অভ্যাস বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তামাক পাতায় নিকোটিন নামক এক প্রকার উপক্ষার থাকে। ইংরেজিতে এ পদার্থকে অ্যালকালয়েড় (alkaloid) বলা হয়। তামাকের ধূমপান মানুষকে কিছুটা আনন্দ দিলেও প্রকৃতপক্ষে নিকোটিন বিষাক্ত পদার্থ। তাই তামাকের ধোঁয়া মোটেও ভাল নয়। এর প্রভাবে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার (দ্র) অন্যতম।

বাংলাদেশে (দ্র) পানের সঙ্গে অনেকেই জর্দা খেয়ে থাকেন। এ জর্দায় তামাক মেশানো থাকে। কেউ কেউ আবার নস্যি হিসাবে তামাকের গুঁড়ো নাকে দিয়ে থাকেন।

তামাকের চাষ প্রায় সব ধরনের জমিতেই করা চলে। তবে সিগারেটের (দ্র) জন্য যে তামাক ব্যবহার করা হয় তা সব জমিতে চাষ করা যায় না। বেলে জমি এ ধরনের তামাক চাষের উপযোগী। বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও রংপুর অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে তামাকের চাষ করা হয়। রংপুরে মতিহারি ও জাতি এ দুই ধরনের তামাক বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়। হুঁকায় সাধারণত মতিহারি তামাকের ব্যবহার করা হয়। চুরুট তৈরির কাজে জাতি তামাক বেশি উপযোগী।

মু. আ.

## তায়াম্মুম

তায়াম্মুম ওযুর (দ্র) বিকল্প। অর্থ : পানির পরিবর্তে পরিষ্কার মাটির সাহায্যে পবিত্রতা লাভ।

নামাযের পূর্বশর্ত হল ওযু অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোওয়া। এর উদ্দেশ্য হাত-পা ও মুখমণ্ডলের ময়লা ধুয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন। কিন্তু কোনো কারণে যদি কখনো কোথাও পানির অভাব হয়, তখন ইসলামী বিধানমতে পরিষ্কার মাটির সাহায্যে বিশেষ নিয়মে পবিত্রতা অর্জন করে অর্থাৎ বিকল্প ওযু সমাধা করে নামায সম্পন্ন করা হয়। ওযুর এই বিকল্প পদ্ধতির নামই তায়াম্মুম। মাটির অভাবে বালি, পাথর, ইট প্রভৃতির সাহায্যেও তায়াম্মুম সম্পন্ন হতে পারে। তায়াম্মুমের সাহায্যে সরাসরি ধৌতকরণের কাজ সমাধা হয় না; এটি অনেকটা আলঙ্কারিক বা প্রতীকী ওযু। এর সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পবিত্রতার অনুভূতি জাগ্রত হয়।

মু. মা.

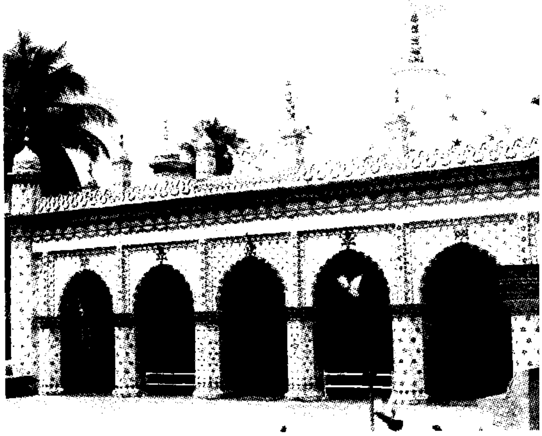

*তারা মসজিদ*

## তারা মসজিদ

তারা মসজিদ পুরনো ঢাকা শহরের আরমানিটোলা এলাকায় অবস্থিত। অলঙ্করণসমৃদ্ধ এই মসজিদটি ঢাকা শহরের সুন্দর স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নিদর্শন।

তারা মসজিদের সঠিক নির্মাণতারিখ জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি তৈরি।

পূর্বে এই মসজিদের নাম ছিল গোলাম পীরের মসজিদ। পরে ১৯২৬ সালে আলীজান বেপারী নামক ঢাকার এক জন ধনী ব্যবসায়ী বহু অর্থ ব্যয়ে মসজিদটিকে অলঙ্কৃত করেন, বিশেষ করে সমস্ত মসজিদটি তারকাখচিত করেন। এ কারণে এর বর্তমান নাম তারা মসজিদ।

মসজিদটির ভেতরের আয়তন ৩৩´ x ১২´। মিনারের সংখ্যা চার। দরজা মোট পাঁচটি। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মেহরাব।

মু. মা.

## তারামাছ (starfish)

তারামাছ সমুদ্রের বাসিন্দা। নাম তারামাছ হলেও মাছের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী, অর্থাৎ যাদের শিরদাঁড়া থাকে। তারামাছ অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী। এদের শিরদাঁড়া নেই। এটি একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) বা কণ্টকত্বকী পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী। এর নাম *এস্টেরিয়াস*, দেখতে তারার মতো। এর পাঁচটি বাহু রয়েছে। বাহু বলতে মানুষের বাহু মনে করা ঠিক নয়।



www.pathagar.com

আসলে এর পাঁচ কোণে তারার মতো পাঁচটি অঙ্গ বিস্তৃত থাকে। পাঁচ বাহুর মধ্যে পৌষ্টিক নালি বা খাদ্যনালি থাকে এবং বাহুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি গভীর লম্বা নলের মতো খাদ থাকে। খাদের দু'পাশে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউব পা। বাহুর পৃষ্ঠভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত আবরণ রয়েছে, যা ত্বক নামে পরিচিত। ত্বকের নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল অস্থির প্লেট থাকে। ফলে এর দেহ খুব মজবুত হয়।

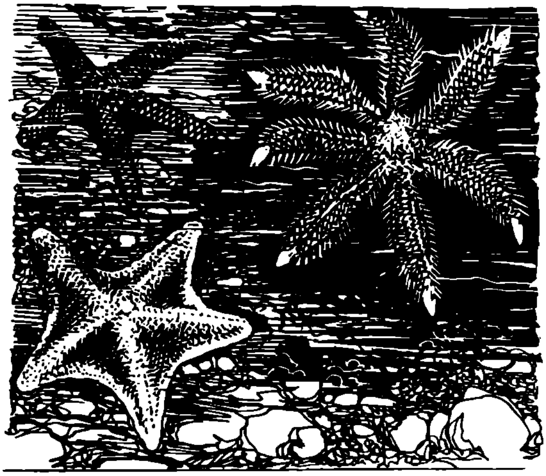

*তিন ধরনের তারামাছ*

খাদের দু'পাশেও হাড়ের মালা থাকে। পেশির সাহায্যে তারামাছ এই হাড় নাড়ায়। পাঁচটি বাহু যেখানে মেশে সেখানে কেন্দ্রে রয়েছে মুখ-গহ্বর। তারামাছ আকারে ৪-৬ সেমি হতে পারে। ওরা যে কোনো ধরনের ছোট প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। টিউব পায়ের সাহায্যে ওরা সমুদ্রের ভেজা বালুচরে সরাসরি মাটির নিচে ডুবে থাকতে পারে। ভাটা শেষে জোয়ারের শুরুতে তারামাছ পানির সঙ্গে সমুদ্রের কূলের দিকে উঠে আসতে থাকে। অনেকে একে পানির মধ্যে পাতা বলে ভুল করে। এ সময় তারামাছ সংগ্রহ করা সহজ। এরা খুবই ধীর গতির প্রাণী। তারামাছ মানুষ বা পশুর খাদ্য হিসাবে উপাদেয় নয়। তারামাছ রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। দেখতে সুন্দর বলে অনেকে এদেরকে ঘরে সাজিয়ে রাখে। গবেষণাগারে ফর্মালিনে ভিজিয়ে রেখেও এটি সংরক্ষণ করা হয়। তা করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য।

ত. চ.

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** [১৮৯৮—১৯৭১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (দ্র) বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক জমিদারবংশে ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মায়ের নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। এক বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তারাশঙ্কর সকলের বড়। তারাশঙ্করের বয়স যখন আট তখন তাঁর বাবা মারা যান। মা ও এক বিধবা পিসির স্নেহ-যত্নে তারাশঙ্কর বড় হন।

লাভপুরের যাদবলাল হাই স্কুল থেকে তিনি ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এ সময়ে তাঁর বিয়েও হয়ে যায়। তাঁর পত্নীর নাম উমাশশী দেবী। এর পর তিনি কলিকাতায়(দ্র) গিয়ে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে পড়াশোনা আর চালিয়ে নিতে পারেন নি। সে সময়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলছিল। মহাত্মা গান্ধী (দ্র) তখন কংগ্রেসের (দ্র) নেতা। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ, বিশেষ করে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন (দ্র) তারাশঙ্করকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তারাশঙ্কর কংগ্রেসের কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং এর জন্য তিনি কিছুদিন জেল খাটেন। এক বার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি লাভপুর থেকে কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের জন্য চলে আসেন। তখন থেকে লেখালেখি তাঁর প্রধান পেশা হয়। লেখার জন্য তিনি জীবনে অনেক মর্যাদা, সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। বরেণ্য লেখক হিসাবে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

তারাশঙ্করের লেখায় গান্ধীর আদর্শের প্রভাব আছে। সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা, তাদের অর্থকষ্ট, দুঃখ-দারিদ্র্য, মন্বন্তর ইত্যাদি তাঁর লেখায় এসেছে। বিশেষভাবে পাওয়া যায় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল,



www.pathagar.com

বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এইটি তাঁর লেখার বড় গুণ। তারাশঙ্কর জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু দেখেছেন কীভাবে আস্তে আস্তে জমিদারের শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। সমাজে তখন গজিয়ে উঠছে নতুন ধনিক শ্রেণী—ব্যবসায়ী, মিল-কারখানার মালিক। সমাজের এই পরিবর্তনের চিত্র তারাশঙ্করের অনেক গল্প ও উপন্যাসের বিষয়। আর আছে গ্রামজীবনের ভাঙনের কথা, নগরজীবনের বিকাশের কথা। এই পরিবর্তনগুলো দেশের মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তারাশঙ্কর কৌতূহলী ছিলেন।

তারাশঙ্কর প্রথম জীবনে কবিতা (দ্র) লিখেছিলেন। পরে কবিতা আর লেখেন নি, কিন্তু কিছু কিছু গান লিখেছেন। তারাশঙ্করের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা একটি ছোটগল্প, নাম 'রসকলি'। এ গল্পটি সেকালের সুবিখ্যাত পত্রিকা 'কল্লোলে'(দ্র) বেরিয়েছিল (১৯২৮)। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩২)। তারাশঙ্কর অনেক মহৎ উপন্যাস লিখেছেন আর লিখেছেন কিছু চমৎকার গল্প। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'রাইকমল' (১৯৩২), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪৩), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'কবি' (১৯৪৪), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬), 'অভিযান' (১৯৪৬), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২), 'আরোগ্যনিকেতন' (১৯৫৩), 'বিচারক' (১৯৫৭), 'সপ্তপদী' (১৯৫৮)।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে— গল্পগ্রন্থ : 'ছলনাময়ী' (১৯৩৭), 'জলসাঘর' (১৯৩৮), 'রসকলি' (১৯৩৯), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৪৩), 'বেদেনী' (১৯৪৩), 'হারানো সুর' (১৯৪৫), 'ইমারত' (১৯৪৭); নাটক : 'দুই পুরুষ' (১৯৪৩), 'পথের ডাক' (১৯৪৩), 'দ্বীপান্তর' (১৯৪৫) ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর আমৃত্যু লিখেছেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা দেড় শ / দু' শ হবে। লেখক হিসাবে তিনি অত্যন্ত সফল। শরৎচন্দ্রের(দ্র)পরে তিনিই বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হন। তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে সিনেমা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় (দ্র) তাঁর 'জলসাঘর' ও 'অভিযান'-এর চলচ্চিত্র রূপ দেন।

আ. ক.

## তাল

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের গতি বা লয়ের স্থিতিজ্ঞাপক মাত্রাবদ্ধ ছন্দ রচনার নাম তাল। গানে, বাজনায় বা নাচে স্থানে স্থানে ঝোঁক পড়ে। ঝোঁকগুলোকে সাজিয়ে নিয়েই তাল রচনা করা হয়। প্রতিটি ঝোঁক আবার কতকগুলো ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে। এগুলোর নাম মাত্রা। তাই মাত্রার সমষ্টিতে ঝোঁক ও ঝোঁকের সমষ্টিতে তাল রচিত হয় বলে ধরে নেওয়া হয় যে মাত্রার সমষ্টিই তাল। মাত্রা তালের একক। মাত্রাসমূহকে নানা ছকে সাজিয়ে নেবার ওপরই তালের গঠন নির্ভর করে। একটি তাল দুই বা ততোধিক অঙ্কে বিভক্ত হয়। যেমন ত্রিতাল ১৬ মাত্রার তাল। ১৬ মাত্রাকে ৪টি অঙ্কে বিভক্ত করা হয়। যেমন ১ ২ ৩ ৪ / ৫ ৬ ৭ ৮ / ৯ ১০ ১১ ১২ / ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৬টি মাত্রাকে প্রতি অঙ্কে ৪ মাত্রা করে সাজিয়ে ত্রিতাল গঠন করা হয়। কোনো গান ত্রিতালে রচনা করা হলে এই ৪-৪-৪-৪ মাত্রাবিন্যাস অনুযায়ী তাকে নিবদ্ধ করতে হয়। তেওরা তাল ৭ মাত্রার। মাত্রা বিভাগ : ১ ২ ৩/৪ ৫/ ৬ ৭। এই তালে রচিত গানে এই মাত্রাবিন্যাস অনুসরণ করতে হয়। যে তালে প্রতি অঙ্কে মাত্রাবিভাগ সমান, যেমন ত্রিতাল, তাকে সমপদী তাল বলা হয়। যে তালে প্রতি অঙ্কে মাত্রাবিভাগ সমান নয়, তাকে বলা হয় বিষমপদী তাল। যেমন তেওরা। তালের মাত্রাসমূহকে তবলা (দ্র), পাখোয়াজ (দ্র), খোল (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্রে টোকা দিয়ে বা আঘাত করে ধ্বনিত করা হয়। এর জন্য ধা, জ্ঞ, গ, তি, কেটে, তেরে, দেন, দেনে, খেনে, ঝি, ঝির প্রভৃতি বোলের সাহায্য নেওয়া হয়। ডান বা বাম হাতে কীভাবে টোকা দিলে বা আঘাত করলে কোন বোল ধ্বনিত হবে তার নিয়ম আছে। তালের প্রারম্ভস্থানকে বলা হয় সম। তালের প্রথম মাত্রা থেকে শেষ মাত্রা পর্যন্ত বাজানো সম্পূর্ণ হলে তাকে বলা হয় আবর্তন।



www.pathagar.com

তালকে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতির নাম তাললিপি। স্বরলিপির মতো তাললিপির একাধিক পদ্ধতি আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালকে বলা হয় টাইম। মিটর বলতে লয়প্রবাহকে বোঝালেও এর দ্বারা তালও বোঝানো হয়। মাত্রাকে বলা হয় বীট। পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে তালনির্দেশের ব্যবস্থা আছে। দাদরা, কাহারবা, তেওরা, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল, একতাল, যৎ, সুরফাক্তা, চৌতাল, ধামার, রূপক, দীপচন্দী, আদ্ধা, ঝুমরা, আড়া ঠেকা, মধ্যমান, খেমটা, গড়খেমটা প্রভৃতি আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত কয়েকটি তালের নাম।

হাতে তালি দেওয়া থেকে তাল কথাটি এসেছে। তালি দিয়ে ঝোঁক ও মাত্রাবিন্যাস স্থির করা হয়।

ক. গো.

## তালগাছ

পামি (Palmae) গোত্রভুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *বোরাসাস ফ্লাবেলিফার,* লিন (*Borassus flabellifer*, Linn)। সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে এ গাছ প্রচুর জন্মে। বাংলাদেশের(দ্র) প্রায় সব জায়গাতেই এ গাছ পাওয়া যায়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই তালগাছ জন্মে থাকে। অল্পকালীন পানিবদ্ধতা সহ্য করার ক্ষমতা এ গাছের আছে। তালগাছ খুব ধীরে বাড়ে অথচ খুব বড় হয়। এ গাছের কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এর কাণ্ড সোজা, গোলাকার এবং কালো রঙের হয়ে থাকে। তালগাছের কাণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ পাতা থাকে। ডাঁটাসহ এ পাতা দেখতে অনেকটা বড় হাতপাখার মতো। পাতাগুলো বেশির ভাগই উর্ধ্বমুখী অবস্থায় উৎক্ষিপ্ত থাকে।

তালগাছ পুরুষ-গাছ ও স্ত্রী-গাছ—এ দুই ভাগে বিভক্ত। গাছে ফুল আসার আগে অবশ্য এ পার্থক্য বোঝা যায় না। তালগাছ বেশ দীর্ঘজীবী। এ গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে। তালগাছের কাণ্ড থেকে ঘরের খুঁটি তৈরি করা যায়। এ ছাড়া তালকাঠ দিয়ে কড়ি-বরগা, লাঠি ও খেলনা তৈরি হয়। তালপাতা থেকে হাতপাখা তৈরি করা হয়। এ ছাড়া টুপি, ঝুড়ি, চাটাই, মাদুর ও ছাতা তৈরির কাজেও তালপাতা ব্যবহৃত হয়। তালপাতার বোঁটা থেকে যে আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে বিশেষ ধরনের ঝাড়ু তৈরি করা যায়।

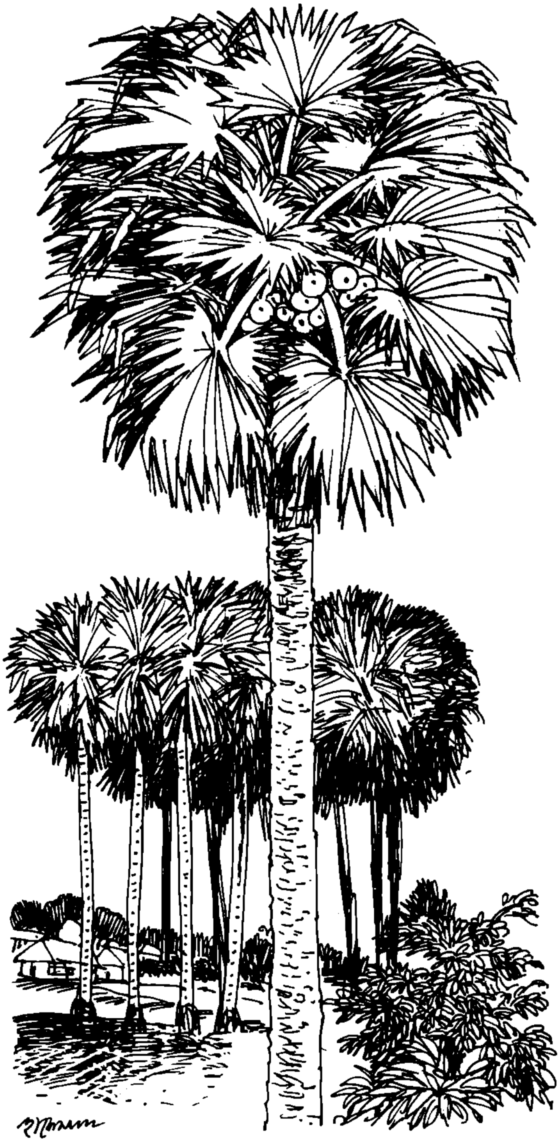

*তালফল, তালপাতা ও তালগাছ*

তালগাছের ফল গ্রীষ্মকালে পাকে। পাকা ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন আছে। এ ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা তালের রসের পিঠা গ্রামীণ বাংলাদেশের অনেকেরই প্রিয় খাদ্য। তালগাছের রস ঘন ও উন্নত পানীয়। এ রস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তালরস গাঁজিয়ে মদ তৈরি করা হয়। এ রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা যায়। এ ছাড়া তালের রসের চিনি থেকে তালমিছরি প্রস্তুত করা



www.pathagar.com

হয়। তালমিছরি কাশির জন্য উপকারী।

তালের আদি নিবাস সম্ভবত আফ্রিকায়(দ্র)। কেউ কেউ মনে করেন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র) থেকে এ গাছ আমাদের দেশে এসেছে।

বীজের সাহায্যে তালগাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপণ করা খুব সহজ কাজ নয়। তাই জায়গা ঠিক করে এক বারেই বীজ লাগানো হয়। তালগাছ বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এদের তেমন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। তবে চারাগাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখা দরকার। সার ও পানি সরবরাহ করা হলে তালগাছ অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে এবং ফল দেয়। বীজ বপনের পর থেকে ১০-১২ বছরের মধ্যে গাছে ফল আসে। প্রতি গাছে বছরে ২০০-২৫০ লিটার রস এবং গড়ে ২০০-৩০০ টি ফল পাওয়া যায়।

মু. আ.

**তাললিপি** তাল দ্র

## তালাক

ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের নাম 'তালাক'। নির্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে বিয়ে ভেঙে দেওয়াকে 'তালাক দেওয়া' বলা হয়। তালাক শব্দটির মূল অর্থ কোনো বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া বা ছাড়া পাওয়া। বর্জন করাও তালাকের আরেক অর্থ। তালাক তিন প্রকার—'তালাকে আহসান,' 'তালাকে হাসান' এবং 'তালাকে বিদয়ী'।

হযরত মুহম্মদ (সা.) (দ্র)-এর জন্মের বহু আগে থেকেই আরবদেশে তালাক প্রথার চল ছিল। সে সময় তালাক দেওয়ার অধিকার শুধু পুরুষেরই ছিল। পুরুষেরা তাদের এই অধিকারের অপব্যবহার করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর তালাক সম্পর্কে নানা আইন-কানুন তৈরি এবং এ বিষয়ে বিধিসঙ্গত আইন লিপিবদ্ধ হয়।

তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে অবশ্যই সাবালক এবং সুস্থমস্তিষ্ক হতে হবে। নাবালক, পাগল, বেহুঁশ, বে-আক্কেল ও নিদ্রিত লোকের তালাক শুদ্ধ হয় না। স্বামী যদি আইনত অযোগ্য সাব্যস্ত হয়, তবে অভিভাবক তার পক্ষে তালাক দিতে পারে। তালাক একটি ব্যক্তিগত অধিকার। স্বামী তা নিজেই উচ্চারণ করতে পারে, অথবা বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে পারে।

স্বামী কোনো কারণ না দেখিয়েই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া এ ধরনের তালাক মাক্‌রুহ্ (অপছন্দনীয়) বলে গণ্য। তালাকের পরমুহূর্ত থেকেই গণনীয় স্ত্রীলোকের ইদ্দত (তালাকপ্রাপ্তা নারীর পুনর্বিবাহের আগে শরিয়তনির্দিষ্ট সময়—সাধারণত তিন মাস তেরো দিন) শেষ হবার পর অন্য স্বামী গ্রহণ করা যায়। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালের জন্য স্বামীর নিকট বাসস্থান ও খোরপোষের দাবি করতে পারে।

বর্তমানে অবশ্য আমাদের দেশে বিয়ের সময় যে কাবিননামা (বিয়ের চুক্তিপত্র) করা হয়, তাতে তালাকের ব্যাপারে পাত্র ও কন্যা উভয়েরই সমান অধিকার উল্লেখ থাকে। এসব বিয়ে সাধারণত কাজী সাহেব পড়িয়ে থাকেন।

যদিও কুরআন (দ্র) শরীফে তালাককে আইনসম্মত বলে স্বীকার করা হয়েছে, তবু একে অনুমোদিত কাজের মধ্যে সব চাইতে ঘৃণ্য কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শা. হ.

## তাশখন্দ চুক্তি

১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে পাকিস্তান (দ্র) ও ভারতের (দ্র) মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিনটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ বাধে। ১৭ দিন পর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। জাতিসংঘ (দ্র) দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্টের অবস্থানে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। যুদ্ধবিরতির পরও সৈন্য অপসারণসহ বেশ কিছু প্রশ্নে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ থেকে যায়।

এই বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (দ্র) সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকলাই কোসিগিনের উদ্যোগে তাশখন্দ শহরে মিলিত হয়ে একটি



www.pathagar.com

চুক্তি সম্পাদন করেন।

দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি তাশখন্দ চুক্তির মূলকথা। দুই পক্ষ নিজেদের বিরোধ মীমাংসার জন্য পরস্পরের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ না করে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করবেন বলে একমত হন।

পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, কোনো বিরুদ্ধ প্ররোচনায় উৎসাহ না দেওয়া এবং ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার ব্যাপারে দুই পক্ষ একমত হন।

দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইতিপূর্বে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলো কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে বিবেচনা করবেন বলেও একমত হন তাঁরা।

যুদ্ধবন্দিদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই চুক্তিতে। যুদ্ধের সময় এক দেশ অন্য দেশের যে সম্পদ দখল করেছে তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারেও সম্মত হন দুই পক্ষ।

আ. মা.

## তাস (card)

অতি প্রাচীন কালে এই অবসরবিনোদনমূলক খেলাটি ভারতবর্ষে খেলা হত। এই খেলার উৎপত্তিস্থান নিয়ে মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। ভারতবর্ষে বহু পূর্বে গোল আকারের তাস ব্যবহৃত হত। চীনদেশে ১০২০ খ্রিস্টাব্দে রাজা সে উন হো তাস খেলা প্রবর্তন করেন। আরবদের কাছ থেকে এই খেলা ইতালির লোকেরা শিখে নেয় ১৪শ শতাব্দীতে। প্রথমে তাসে ঘণ্টা, পাতা, ওক গাছের ফল ইত্যাদি আঁকা থাকত। পরে জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের ছবি আসে। সাহেব তাসের ছবি রাজা অষ্টম হেনরির ছবি। ব্রিজ খেলা রাশিয়ার বিরিচ্ নামে কোনো লোকের নামে হয়েছে বলে শোনা যায়। ইংল্যাণ্ডে তাস খেলা আরম্ভ হয় ১৬০৭ সালে, স্পেনে ১৬শ শতাব্দীতে। বাংলাদেশে (দ্র) গ্রামে-গঞ্জে, ক্লাবে ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে খেলা হয়ে থাকে। এ দেশে তাস ফেডারেশন গঠিত হয়েছে ১৯৭৭ সালে। এটা এখনো আন্তর্জাতিক ফেডারেশন বা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতি লাভ করে নি। অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয় বলে তাস খেলাকে উৎসাহিত করা হয় না। বাংলাদেশে প্রবাদ আছে, 'তাসে নাশ' অর্থাৎ তাস বেশি খেললে ক্ষতি হয়।

কা. আ. আ.

## তিতুমীর [১৭৮২—১৮৩১]

চব্বিশ পরগনা জেলার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের জন্ম। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (দ্র) নমে খ্যাত। সে দুর্ভিক্ষে এ দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে সময়ে দেশে ছিল চরম অরাজক অবস্থা। সেই সঙ্গে চলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের অত্যাচার ও জবরদস্তি।

দেশের সাধারণ মানুষের নির্যাতিত অবস্থা তিতুমীরের সহ্য হয় নি। তিনি মুষ্টিযুদ্ধ, অসিচালনা (দ্র), লাঠিখেলা, তীরছোঁড়া শিক্ষা করেন। উদ্দেশ্য— অত্যাচারী জমিদার ও চোর-ডাকাতের হাত থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা।

১৮২১ সালে তিতুমীর হজ্ব (দ্র) উপলক্ষে মক্কা (দ্র) শরীফে যান। সেখানে ওয়াহাবী আদর্শের প্রবক্তা সৈয়দ আহমদের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মক্কা শরীফ থেকে ফিরে তিতুমীর নারিকেলবাড়িয়ার কাছাকাছি হায়দরপুরে বসবাস শুরু করে ধর্মসংস্কারক হিসাবে তাঁর কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর গুরুর ওয়াহাবী আন্দোলনের (দ্র) মতাদর্শ প্রচার শুরু করার স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তিন–চার শ' শিষ্য সংগ্রহ করেন। ক্রমেই তাঁর বিচক্ষণতা এবং পারদর্শিতা সবার দৃষ্টি কাড়ে। শুধু ধর্মসংস্কারই নয়, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে নিম্নবিত্ত মুসলমান জনসাধারণকে মুক্তি দেবার লক্ষ্যেও তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বীয় ধর্মের অত্যাচারিত মানুষ তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে হিন্দু জমিদারেরা ভয় পেয়ে যায়। তিতুমীরের কার্যকলাপে রুষ্ট



www.pathagar.com

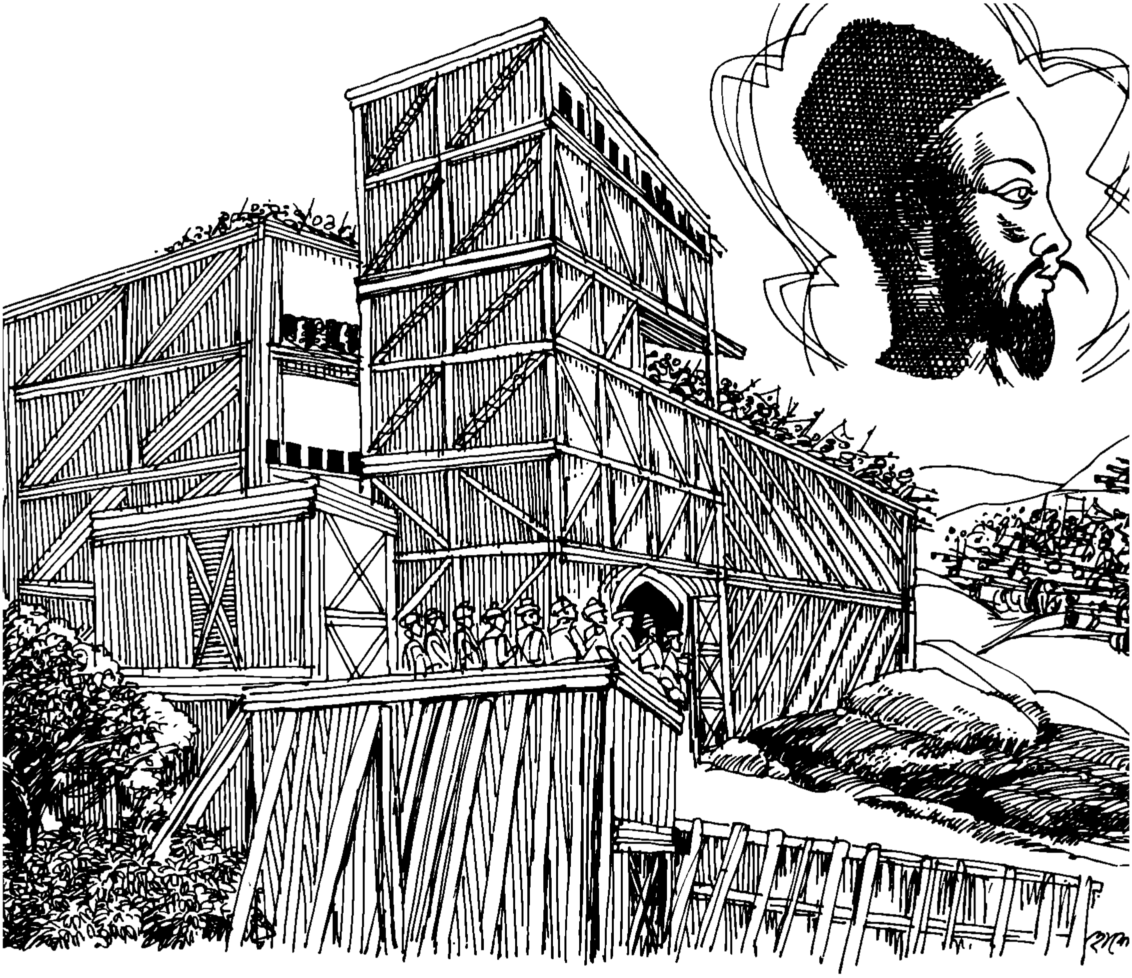

*তিতুমীর ও তাঁর বাঁশের কেল্লা*

হয়ে ওঠেন পুড়ার জমিদার ও নীলকরগণ।

এর আগে তিতুমীর চাঁদপুর-হৃদয়পুরের এক সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ইসলামে (দ্র) পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন, রসূলুল্লাহ্‌র (দ্র) নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন, হিন্দু-মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের একতাবদ্ধ হওয়া, নীলকরদের অত্যাচার দমন এবং দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন। এর ফলে বিভিন্ন জমিদার-নীলকর সবাই মিলে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শুরু হয় ওয়াহাবীদের উপর জমিদারের অত্যাচার, এমনকি তাঁদের দাড়ির উপর খাজনা আদায় শুরু হয়। ফলে তিতুমীর জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় ফকির মিশকিন শাহ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিতুর সঙ্গে যোগ দেন।

স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষে তিতুমীর জয়লাভ করেন। তাঁর দলে অনেকে এসে যোগ দেয়। তিতুর নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দেয়।

জমিদার ও নীলকরদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করার জন্য। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর সিপাহি-বাহিনী তিতুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তিতুমীর এর পর কয়েকটি নীলকুঠিও লুণ্ঠন করেন।



www.pathagar.com

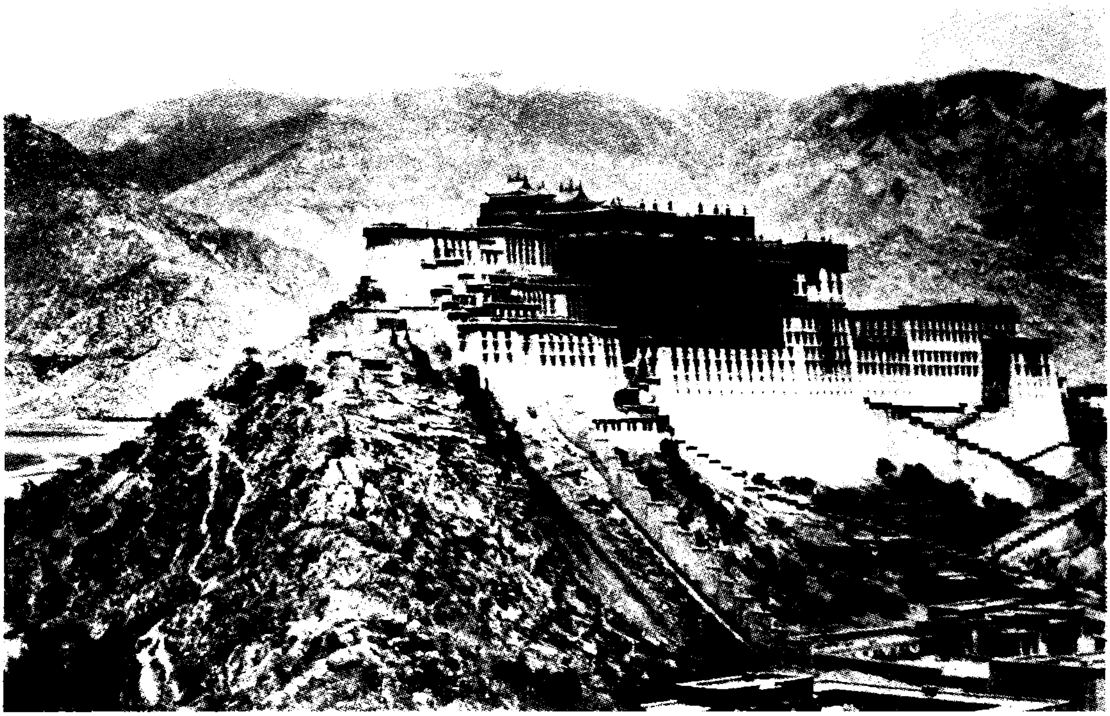

*তিব্বতে দালাই লামার প্রাসাদ*

ইতিমধ্যে তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবেলায় নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি সুদৃঢ় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। তিতুমীরের বাহিনী বাঘারেয়ার নীলকুঠির প্রাঙ্গণের এক যুদ্ধে নদীয়ার কালেক্টর এবং নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়।

অবশেষে বাঁশের কেল্লা আক্রমণের জন্য ইংরেজ সরকারের পাঠানো পদাতিক ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে তিতুমীরের তীর-বল্লমসজ্জিত বাহিনীর যুদ্ধ হয় ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর। এই অসম যুদ্ধে তিতুমীরসহ বহুসংখ্যক যোদ্ধা শহীদ হন। কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই বিদ্রোহ জমিদার, মহাজন, নীলকর ও ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও যুগের প্রভাবে ধর্মীয় ধ্বনিও তাতে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তার ফলে তা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে মিলিত করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও দেশীয় সামন্তশক্তি এবং বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে সম্প্রসারিত এই বিদ্রোহ ভবিষ্যতে সংগ্রামের ভিত তৈরি করেছিল।

সে. হো.

## তিব্বত

তিব্বত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়, মালভূমি ও তুষারাবৃত একটি দেশ। এই দেশ এশিয়ার (দ্র) প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এর বেশির ভাগই উঁচু ঠাণ্ডা মালভূমি। এ দেশ বহুদিন স্বাধীন থাকলেও বর্তমানে চীনের (দ্র) অংশবিশেষ। বৌদ্ধ ভিক্ষু (যাঁদের 'লামা' বলা হয়) তিব্বতের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। দালাই লামা তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা। ১৯৫৯ সালে চীনের সঙ্গে তিব্বতের সংঘর্ষ বাধলে দালাই লামা ভারতে (দ্র) পালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে চীন



www.pathagar.com

তিব্বতকে কিছু স্বায়ত্তশাসন দিলেও ১৯৬৭ সালে আবার তিব্বতকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

তিব্বতের আয়তন প্রায় ১২,০০,০০০ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা কয়েক লক্ষ। এর বেশির ভাগ মানুষ দেশের দক্ষিণ দিকে বাস করে। সেখানে কিছু কৃষিকাজ হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিব্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৫০০০ মিটার এবং অসংখ্য হ্রদ, অনুর্বর পাহাড়, নুড়ি পাথর ইত্যাদি দ্বারা এটি আবৃত। এশিয়ার অনেক নদী, যেমন— ব্রহ্মপুত্র (দ্র), সিন্ধু, মেকং, সালউইন, ইয়াংসি প্রভৃতি নদ-নদীর উৎপত্তি এখান থেকেই। ১৯৫৭ সালে ভূতত্ত্ববিদেরা তিব্বতে কয়লা (দ্র), জিপ্‌সাম (দ্র), লোহা (দ্র), ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সন্ধান লাভ করেন। তা ছাড়া এখানে সোনা (দ্র), সোহাগা (দ্র), লবণ (দ্র) ইত্যাদিও আছে। মাটি অনুর্বর ও ঠাণ্ডা বলে এখানে কৃষিকাজ ভাল হয় না। বৃষ্টিপাত ২৫ সেমি-এর কম। তাপমাত্রা শীত ও গ্রীষ্মে ৪° থেকে ১৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করে।

তিব্বতীদের ভাষা বর্মীদের মতো এবং তিব্বতীরা বেঁটে ও শক্তিশালী। এদের বেশির ভাগই যাযাবর জাতীয়। মেষপালক, কৃষক ও শ্রমিক সব ধরনের লোকই তিব্বতে দেখা যায়। বার্লি প্রধান খাদ্য এবং চীনা চা প্রধান পানীয়। ইয়াক্ প্রাণী তিব্বতীদের খুব কাজে লাগে। তা থেকে তারা দুধ, মাখন ও মাংস পায় এবং ইয়াক্‌কে তারা বোঝা বহনের কাজেও ব্যবহার করে।

লাসা তিব্বতের রাজধানী এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। দালাই লামার মঠ পতোলা দেখতে প্রাসাদের মতো এবং এতে প্রায় হাজারটি কক্ষ আছে।

মু. এ.

## তিমি (whale)

একটি অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণী। দেখতে মাছের মতো হলেও তিমি কিন্তু মাছ নয়। এরা ডিম পাড়ে না, স্তন্যপায়ী (দ্র) জীবদের মতোই বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা তিমি মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়।

পণ্ডিতদের মতে, তিমি সরীসৃপ (দ্র) যুগের ডাইনোসরদেরই (দ্র) বংশধর। এখন জলের বাসিন্দা হলেও এক সময় তিমি ডাঙায় বাস করত। এদের শরীরের অনেক অঙ্গই স্থলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো। তিমি উষ্ণ শোণিতের প্রাণী এবং এদের হৃৎপিণ্ড আছে। ডাঙার জীবদের মতোই তিমি ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। এদের কানকো নেই। মাথার সামনের দিকে নাক আছে। জলের নিচে গেলে এর নাক বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তিমি ৫ থেকে ১০ মিনিট পর পর মাথা জলের ওপর তোলে। শ্বাসগ্রহণ না করে তিমি একটানা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত জলের নিচে থাকতে পারে। এরা খুব ভাল সাঁতারুও বটে।

তিমি সিটেসিয়া (Cetacea) বর্গের প্রাণী। এদের এক শতেরও অধিক প্রজাতি আছে। তবে মোটামুটিভাবে তিমিকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়— দাঁতাল তিমি আর দন্তহীন বা ফোক্‌লা তিমি। দাঁতাল তিমি আকারে একটু ছোট হয়, কিন্তু স্বভাবে ভারি হিংস্র ও উগ্র। বিভিন্ন রকম মাছ, সীল (দ্র) ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে ওরা জীবন ধারণ করে। ওদের কারো কারো শুধু নিচের চোয়ালেই দাঁত থাকে। যেমন—স্পার্ম হোয়েল বা মোম তিমি। মোম তিমির মাথাভরা মোম থাকে বলে মাথাটা থ্যাবড়া ও বড় আকারের হয়।

ফোক্‌লা তিমিদের মধ্যে নীল তিমির নাম উল্লেখযোগ্য। এটি সবচেয়ে বড় জাতের তিমি। শুধু তাই নয়, জলে-স্থলে সকল প্রাণীর মধ্যেও নীল তিমি সবচেয়ে বড়। পূর্ণবয়স্ক একটি নীল তিমির দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট এবং ওজন ১২৫ টন পর্যন্ত হতে পারে। এই ওজন ২৩টি হাতির সমান। নীল তিমির জিহ্বার ওজনই কেবল আড়াই টন। দাঁত না থাকলেও এদের মুখে চিরুনির মতো নরম হাড়ের এক রকম ঝালর আছে। এরা গভীর সমুদ্রে বাস করে। নীল তিমিসহ দন্তহীন শ্রেণীর তিমিরা সমুদ্রের নানা জাতের ছোট ছোট প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে।

তিমি অত্যন্ত দীর্ঘায়ু প্রাণী। ২০০ থেকে ৩০০ বছর তো বাঁচেই, কারো কারো মতে ওদের পক্ষে হাজার বছর বেঁচে থাকাও অসম্ভব নয়।

তিমির তেল থেকে সাবান (দ্র) ও মার্জারিন নামের উন্নত মানের এক জাতীয় মাখন, হাড় থেকে সার, শিরা থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য শক্ত মজবুত সুতো তৈরি হয়। আর এর জিলেটিন (দ্র) লাগে ফটোগ্রাফি (দ্র) শিল্পের কাজে। তাই এসব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নির্দ্বিধায় তিমি শিকার করে আসছে। ফলে সমুদ্রের এই মূল্যবান প্রাণীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে



www.pathagar.com

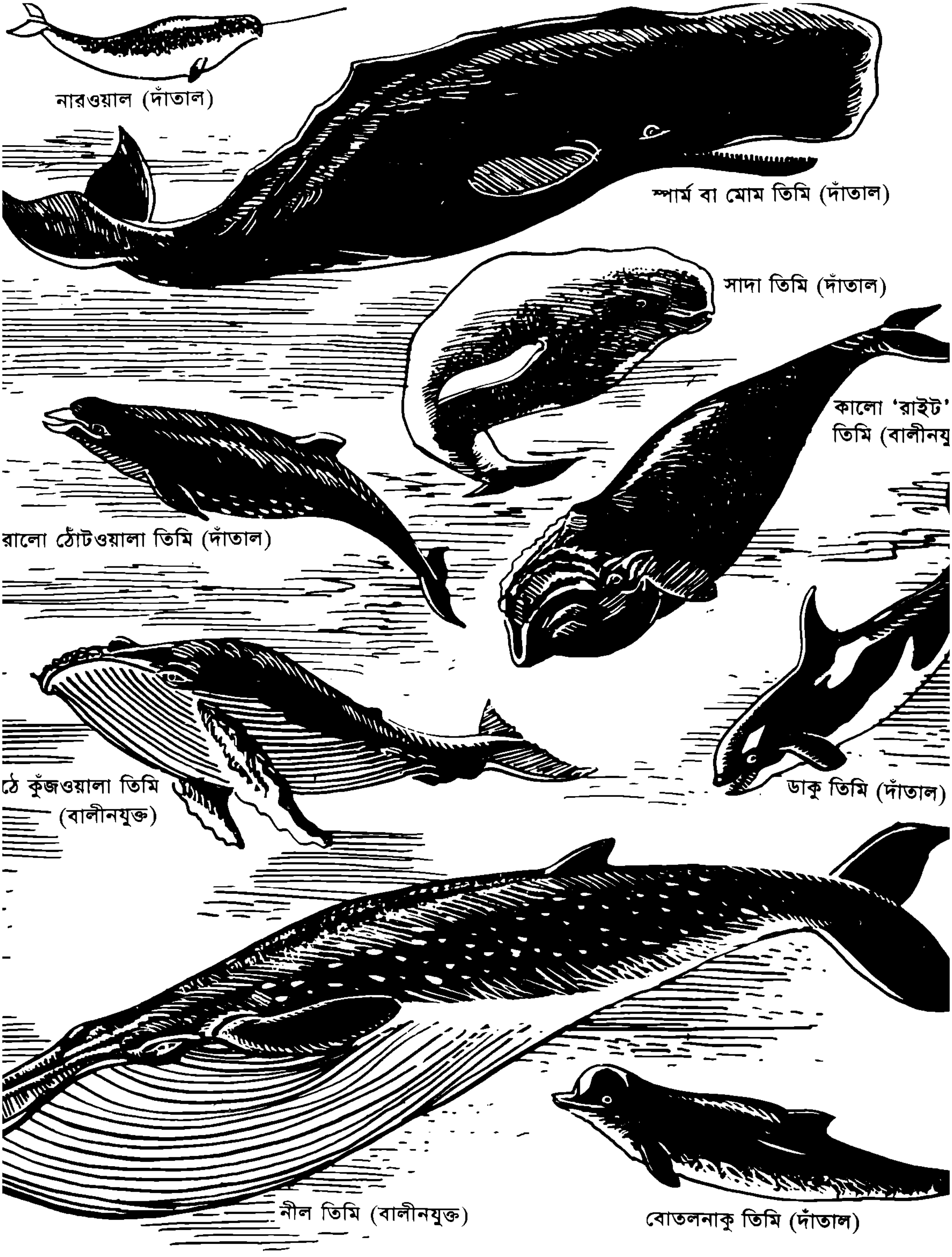




www.pathagar.com

হ্রাস পেয়েছে। তাই তিমি শিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেক দেশেই দানা বেঁধে উঠেছে।

**সুজ. ব.**

## তিলক

হিন্দুধর্মের (দ্র) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের ললাট-বাহুসহ শরীরের বারোটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঁকা চিহ্ন। চন্দন ও খড়ি জাতীয় জিনিসের গুঁড়ো, ভস্ম ইত্যাদির সাহায্যে এই চিহ্ন, ছাপ বা ফোঁটা আঁকা হয়। কখনো কখনো কাষ্ঠময় বা ধাতুময় মুদ্রাও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বৈষ্ণব (দ্র), শৈব, শাক্ত প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ে তিলকচিহ্ন ধারণ প্রথার প্রচলন থাকলেও বৈষ্ণবদের মধ্যেই এর বৈচিত্র্য ও আধিক্য দেখা যায়। প্রত্যহ স্নানশেষে তিলক ধারণকে বৈষ্ণব ভক্তরা সাধনার অংশ হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

**সুজ. ব.**

## তিলক, বালগঙ্গাধর [১৮৫৬—১৯২০]

ব্রিটিশ ভারতের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা। জন্ম মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে, ১৮৫৬ সালে।

দশ বছর বয়সে তিলক তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুনায় চলে আসেন এবং শিক্ষাজীবন শেষে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হন। ১৮৯০ সাল নাগাদ তিনি একটি ইংরেজি ও একটি মারাঠি সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক হন। এই পত্রিকা দু'টিতেই তিলক ইংরেজ সরকারবিরোধী জাতীয়তাবাদী, হিন্দুধর্মের (দ্র) পুনরুজ্জীবনবাদী ও ভারতের (দ্র) স্বাধীনতার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারকাজ চালান। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (দ্র) গঠিত হলে তিনি ঐ দলে যোগ দেন।

১৮৯৮ সালে ইংরেজ সরকারের প্লেগ নির্মূল আইনের নিন্দায় সোচ্চার হলে তিলককে গ্রেফতার করে ১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে কংগ্রেস (দ্র) নরম ও চরমপন্থী এই দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়।

১৯০৮ সালে তিলককে ৬ বছর দ্বীপান্তরের(দ্র) আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে দ্বীপান্তরের পরিবর্তে তিনি বিনাশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। জেল থেকে মুক্তির পর তিলক কংগ্রেসের দুই ভাগের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন এবং তাঁর সমর্থক গ্রুপটি কার্যত কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

তিলক ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট বোম্বাইয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গীতা-রহস্য' এবং 'দ্য আর্কটিক হোম ইন দ্য ভেদাস'।

**আ. হু.**

## তিলোত্তমা

বিশ্বকর্মার সৃষ্ট এক অতুলনীয় সুন্দরী নারী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের যাবতীয় সুন্দর ও উত্তম জিনিসের সাহায্যে তিল তিল করে এই সুন্দরী নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় তিলোত্তমা। দেবতা, ঋষি ও যক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মার (দ্র) নির্দেশে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন।

দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার নিকট ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তাদের অমরত্বের বরদানে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি সুন্দ ও উপসুন্দকে এটুকু আশ্বাস দেন যে যদি তারা এক জন আরেক জনকে হত্যা না করে, তবে কেউই তাদের হত্যা করতে পারবে না। এই বর পাওয়ার পর তারা দেবতাদের পীড়ন শুরু করে। তখন দেবতা, ঋষি, যক্ষ সবাই ব্রহ্মার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা সুন্দ ও উপসুন্দকে বধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। এভাবেই তিলোত্তমার সৃষ্টি। সৃষ্টির পরে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিলোত্তমা তাদের সামনে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে। তারা দু'জনই তিলোত্তমার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অধিকার করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এতে দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ওরা একে অপরকে হত্যা করে। তিলোত্তমার এই সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বরদান করেন।

**সুজ. ব.**

**তীরন্দাজি** আর্চারি দ্র

## তীর্থঙ্কর

তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ হল যিনি তীর্থ করেন। জৈনধর্মে (দ্র) এই 'তীর্থ' শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চার রকম সংঘ প্রতিষ্ঠাকেই জৈনরা তীর্থ বলে। যিনি সাধনার ফলে জ্ঞান লাভের পর এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা



www.pathagar.com

করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর। তাই কেউ সংসার ত্যাগ করে বন্ধনমুক্ত হলেই, তাঁকে তীর্থঙ্কর বলা যায় না। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে তীর্থঙ্করত্ব অর্জন করতে হয়। মুক্ত হওয়ার পর তাঁরা আর সংসারে ফিরে যেতে পারেন না। তাঁরা অবতার নন।

জৈনশাস্ত্রে কালকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন —উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। এই উৎসর্পিনী ও অবসর্পিনী আবার ছয় ভাগে বা 'অরে' বিভক্ত। জৈনমত অনুসারে, প্রত্যেক উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪জন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন এবং জৈনধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করেন। বর্তমান অবসর্পিণীর প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর (দ্র)।

সুজ. ব.

## তুঁত

ইংরেজিতে একে কপার সালফেট বা ব্লু ভিট্রিয়ল (Blue Vitriol) বলা হয়। এর আণবিক সঙ্কেত $CuSo_4, 5H_2O$। প্রস্তুতি : (১) গাঢ় $H_2SO_4$-এর সঙ্গে ধাতব কপারকে উত্তপ্ত করলে এটি উৎপন্ন হয়।

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$ ।

(২) লঘু $H_2SO_4$ এর সঙ্গে CuO, $Cu(OH)_2$ বা $CuCO_3$-কে উত্তপ্ত করলেও এটি উৎপন্ন হয়।

উৎপাদিত কপার সালফেটের দ্রবণকে গাঢ় করে ঠাণ্ডা করলে নীল রঙের সোদক কপার সালফেট কেলাসিত হয়। শিল্পোৎপাদন (Commercial Preparation)–

(১) তামার বর্জ্য থেকে: তামার বর্জ্যকে একটি চুল্লিতে উত্তপ্ত করে লোহিত তপ্ত ধাতুর ওপর গন্ধকের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে কপার সালফাইড তৈরি হয়। এরপর চুল্লিতে অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহ বা অক্সিজেন (দ্র) চালিত করলে কপার সালফাইড জারিত হয়ে কপার সালফেট তৈরি হয়।

$$Cu + S = CuS, \quad CuS + 2O_2 + CuSO_4$$ ।

উৎপাদিত $CuSO_4$ -কে ঠাণ্ডা করার পর পানিতে দ্রবীভূত করে ছেঁকে নেওয়ার পর যে পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া যায়, তাকে বাষ্পায়িত করে গাঢ় করার পর ঠাণ্ডা করলে স্ফটিকাকার কপার সালফেট $Cu\,SO_4.5H_20$ কেলাসিত হয়।

(২) কপার পিরাইট থেকে: প্রথমে কপার পিরাইটকে কম তাপমাত্রায় ও অতিরিক্ত বায়ুপ্রবাহে তাপজারিত (roasted) করলে কপার পিরাইটের কপার জারিত হয়ে কপার সালফেটে এবং আয়রন সালফাইড আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়। এরপর এগুলিকে পানিতে ফোটালে কপার সালফেট পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং অন্যান্য পদার্থগুলি অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এর পর অদ্রবীভূত অংশ ছেঁকে পৃথক করে পরিষ্কার পরিস্রুতকে গাঢ় করে ঠাণ্ডা করলে সোদক কপার সালফেট কেলাসিত হয়।

ধর্ম: কপার সালফেট একটি নীল রঙের নিয়তাকার কঠিন পদার্থ। এটি পানিতে দ্রবণীয় এবং এতে ৫ অণু কেলাস পানি থাকে।

$Cu\,SO_4.\,5H_2o$ কে ৩০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ২ অণু কেলাস পানি, ১০০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ৪ অণু কেলাস পানি এবং ২৭০° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বাকি পানিটুকুও চলে গিয়ে এটি অনার্দ্র হয়ে যায়, যার বর্ণটি হল সাদা। এই অনার্দ্র কপার সালফেটকে আরো বেশি তাপে উত্তপ্ত করলে এটি বিয়োজিত হয়ে কিউপ্রিক অক্সাইড, সালফার ট্রাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনে পরিণত হয়।

$$CuSO_4 = CuO + SO_3, \quad 2\,SO_3 = SO_2 + O_2$$

অনার্দ্র কপার সালফেটে পানি প্রয়োগ করলে এটি নীল রঙের সোদক কপার সালফেটে পরিণত হয়।

কপার সালফেটের দ্রবণে ক্ষার যোগ করলে নীলাভ সবুজ রঙের কিউপ্রিক হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$CuSO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + Cu\,(OH)_2$$

কপার সালফেটের দ্রবণে অ্যামোনিয়া (দ্র) চালনা করলে প্রথমে ক্ষারীয় কিউপ্রিক সালফেটের নীলাভ সবুজ অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ায় এই অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল রঙের টেট্রা-অ্যামাইনো কিউপ্রিক দ্রবণ সৃষ্টি করে।

ব্যবহার: ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ও ইলেক্ট্রোটাইপিং এবং কপারের ইলেক্ট্রোরিফাইনিং এবং কিছু কিছু তড়িৎ-কোষে এটি ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক শিল্পে এবং কালিকো প্রিন্টিং-এ এর



www.pathagar.com

ব্যবহার রয়েছে। জীবাণু (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) ঔষধ হিসাবে এর যথেষ্ট ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে গোল আলুর গাছের ফাঙ্গাস দমনের জন্য যে বোর্দো মিশ্রণ (Bordeaux mixture) ব্যবহার করা হয়, তাতে ১১ ভাগ চুন (দ্র) ১৬ ভাগ কপার সালফেট ও ১০০০ ভাগ পানি থাকে। জৈব তরলে সামান্যতম পানির অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য অনার্দ্র কপার সালফেট ব্যবহৃত হয়। কেননা অনার্দ্র কপার সালফেটে পানি পড়লেই তার সাদা রঙ নীল রঙে পরিণত হয়।

আ. হ. খ.

## তুরস্ক

তুরস্ক এশিয়ার(দ্র) সর্বপশ্চিমে অবস্থিত দেশ। মর্মর সাগর এবং দার্দেনালিস ও বস্ফরাস প্রণালী ইউরোপীয় তুরস্ক থেকে এশীয় তুরস্ককে পৃথক করেছে। তুরস্কের শতকরা ৯৭ ভাগই এশিয়া মাইনরে (দ্র)। তুরস্কের আয়তন ৭,৮০,২৪২ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭০ হাজার (১৯৯২)।

তুরস্কে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সরকার গঠিত। প্রেসিডেন্টই রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। প্রেসিডেন্ট সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন করেন।

তুরস্কের মধ্যভাগে আনাতোলিয়া (দ্র) মালভূমি এবং ভূমধ্যসাগর (দ্র), ঈজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে নিম্ন সমতল ভূমি অবস্থিত। মালভূমির উত্তর দিকে পন্টিক ও দক্ষিণভাগে টরস পর্বতমালা। পূর্ব-তুরস্কে আর্মেনিয়া এবং কুর্দিস্তান পর্বতভূমির অংশবিশেষ অবস্থিত। তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস, কিজিল, মেন্দেরেজ ও পেদিজ প্রধান নদী। তুরস্কের উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অনুভূত হয় এবং অভ্যন্তরের উঁচু ভূমির জলবায়ু প্রধানত মহাদেশীয়। মালভূমির বন ও স্তেপ্ ভূমিতে মেষ ও ছাগল পোষা হয়। মোহেয়ার নামক ছাগলের লোম উৎকৃষ্ট। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম (দ্র), বার্লি ও বীট প্রধান। কিছু তুলা (দ্র)ও উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ঈজিয়ান সাগরের উপকূলে প্রচুর জলপাই, নানারকম ফল ও আঙ্গুরের (দ্র) চাষ হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা (দ্র), তামা (দ্র), লোহা (দ্র), ক্রোমিয়াম (দ্র) ও খনিজ তেল প্রধান। বস্ত্র, লোহা, ইস্পাত (দ্র), চিনি (দ্র)ও কাগজ (দ্র) তুরস্কের প্রধান শিল্প।

আনাতোলিয়া মালভূমিতে অবস্থিত আঙ্কারা তুরস্কের রাজধানী। ইস্তাম্বুল (পূর্বনাম কন্স্ট্যান্টিনোপল) তুরস্কের সাবেক রাজধানী। ইজ্‌মির্ পশ্চিম তুরস্কের প্রধান বন্দর। এটি আতর ও কার্পেট তৈরির জন্য বিখ্যাত। মর্মর সাগরের তীরে বুর্সা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। উস্কুদার মর্মর সাগরের তীরে এবং ট্রাব্‌জান্ ও সাম্‌সুন্ কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত তুরস্কের তিনটি বৃহৎ বন্দর।

মু. এ.

## তুর্কি ভাষা

তুর্কি ভাষা এক সময়ে আরবি অক্ষরে লেখা হত। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক (দ্র) লিপিসংস্কার প্রবর্তন করে রোমান অক্ষর (অর্থাৎ a b c ইত্যাদি) চালু করেন।

তুর্কি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ভাষা। এতে ২৯টি বর্ণমালা আছে, তার ভিতরে স্বরবর্ণের সংখ্যা ৮টি এবং বাকি ২১টি হল ব্যঞ্জনবর্ণ। তুর্কি ভাষায় কোনো লিঙ্গও নেই। আর্টিক্‌ল্ (article) বা নির্দেশক অব্যয়ও নেই; বহুবচন আছে,তবে তার নিয়মও সোজা। অবশ্য বাংলার মতো কারক-বিভক্তি রয়েছে।

হা. মা.

## তুর্গিয়েনেফ্, ইভান্ সের্গিয়েইয়েভিচ্ [১৮১৮—১৮৮৩]

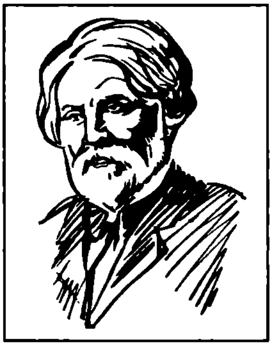

মহান রুশ ঔপন্যাসিক দস্তিয়েফ্স্কি (দ্র) ও তল্‌স্তোয়ের (দ্র) সমসাময়িক। বয়সে এঁদের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন তুর্গিয়েনেফ্ এবং একটা সময় ছিল যখন সারা ইউরোপে (দ্র) তাঁর খ্যাতি অন্য দু'জনকে ছাপিয়ে উঠেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, রুশ সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তুর্গিয়েনেফ্। এর অন্যতম কারণ



www.pathagar.com

হল, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল রাশিয়ার (দ্র) বাইরে পশ্চিম ইউরোপে এবং তাঁর সমসাময়িক জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ সমস্ত বিখ্যাত লেখক বা সামাজিক ব্যক্তিত্ব তাঁর বন্ধু ছিলেন। লোকে বলত, তুর্গিয়েনেফের সঙ্গে এক টেবিলে খানা খেতে বসলে সারা ইউরোপের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

ইভান্ জন্মেছিলেন অরিওল্ নামক একটি শহরের পাশের একটি জায়গায়। বাবা সের্গিয়েই গরিব হয়ে যাওয়া এক জমিদার বংশের সন্তান। মা ভার্ভারা প্রচণ্ড বিত্তশালী, বিশাল এক জমিদারির মালিক—নিঃসন্তান এক চাচার কাছ থেকে নিতান্ত আকস্মিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে এই জমিদারি তিনি পেয়েছিলেন। মা-বাবার বিবাহ হয়েছিল উভয় পক্ষের স্বার্থের হিসাব মেলাতে, বিয়ে তাই সুখের হয় নি। বাবা সের্গিয়েইয়ের ছিল দেবদূতের মতো সুন্দর চেহারা যা পুত্র ইভান্ও অনেকখানি পেয়েছিলেন। মা ভার্ভারা ছিলেন রোমহর্ষক রকমের অত্যাচারী, বদমেজাজি, অহঙ্কারী এবং বিলাসী মহিলা। ছোটবেলায় ইভান্ মারধোর-বকুনি ছাড়া মাতৃস্নেহের কিছুই পান নি। বাড়িভর্তি অসংখ্য দাস-দাসীর মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। মার সঙ্গে কথা বলতে হত ফরাসিতে, কেননা সেটাই তখন রুশী অভিজাত মহলের ভাষা। বাবা কিন্তু বলতেন, সপ্তাহে অন্তত দু' পৃষ্ঠা রুশী লেখা তাঁকে দেখানো চাই-ই চাই। আরেকটু বড় হলে স্কুলে শিখতে হয়েছিল জার্মান ভাষাও। আরো পরে শিখেছিলেন স্প্যানিশ। এইভাবে অদ্ভুত বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে তুর্গিয়েনেফের বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল। তবে, তাঁর আসল শিক্ষা হয়েছিল নিজের বাড়িতে : চাকরবাকরদের কাছ থেকে হাজার রকমের কেচ্ছা-কাহিনী শুনেছেন আর তাদের ওপর নিজের মায়ের ভয়াবহ অত্যাচার দেখে বুঝতে শিখেছেন গরিব-দুঃখীর বহু কষ্ট। এই মানুষেরাই পরে তাঁর লেখা গল্পকাহিনীতে ভিড় করে আসবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তুর্গিয়েনেফ্ ১৮৩৩ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য অনুষদে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরে তিনি রাজধানী শহর সাংক্ৎ পিতের্বুর্গ-এ চলে যান এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তিনি এখান থেকেই পেয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর শিল্পী জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। এ শহরেই দেখা হয়েছিল কবি পুশ্‌কিন্ (দ্র) ও সাহিত্যিক গোগল্ (দ্র)-এর সঙ্গে; বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ভিসারিওন্ বেলিন্‌স্কি (১৮১১-৪৮)কে। এরপর চলে গেলেন আরো লেখাপড়া করতে জার্মানিতে, বার্লিন শহরে। ঐ শহর তখন হেগেল্ (দ্র)-পন্থী ভাবুক ও আদর্শবাদীদের স্বর্গ। বন্ধু হিসাবে পেলেন বিশ্ববিখ্যত রুশ বিপ্লবী, নৈরাজ্যবাদের (দ্র) প্রবক্তা মিখাইল্ বাকুনিন্ (১৮১৪–৭৬)-কে। বার্লিনে তিনি তিন বছর ছিলেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করলেন। এরপর ফিরে গেলেন রাশিয়ায়। ভাবলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারি করবেন। কিন্তু তা হল না। তখন সরকারি চাকুরি নিলেন। কিন্তু দু'বছর চাকুরি করেই এমন ঘেন্না ধরে গেল যে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। আর জীবনে চাকুরি করেন নি। লেখালেখি থেকে উপার্জন আর জমিদারির আয় থেকে তাঁর মা যা পাঠাতেন তাতেই তাঁর চলে যেত। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেন নি।

১৮৪৩ সাল থেকে তুর্গিয়েনেফ্ সারা জীবনের জন্য বিদেশে বাসা বাঁধলেন, মুখ্যত ফ্রান্সে। এর কারণ ব্যক্তিগত, সাহিত্যিক নয়। বিদেশে থাকলেও লিখেছেন তিনি মাতৃভাষা, রুশীতে, এবং তাঁর মন পড়ে থাকত তাঁর মাতৃভূমি রাশিয়ায়। স্বেচ্ছানির্বাসনের বিদেশ আর জন্মভূমি স্বদেশের মধ্যে বারংবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু কখনোই নিজের দেশে থাকার কথা ভাবেন নি। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তল্‌স্তোয়ের। দস্তইয়েফ্‌স্কির সঙ্গেও সখ্য ছিল।

তুর্গিয়েনেফের প্রথম আত্মপ্রকাশ কবি হিসাবে। 'পারাশ' (১৮৪৩) নামে একটি গাথাকাব্য বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে কবিখ্যাতি এসেছিল। তবুও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কবিতা ছেড়ে গদ্য লিখবেন—গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। প্রথম বই বেরুল 'শিকারির রোজনামচা' (১৮৫২)। এত মর্মান্তিক বাস্তবতার সেইসব কাহিনী যে লোকে সে বই পাগলের মতো কিনে পড়তে লাগল, সরকার ভয় পেয়ে বই বাজেয়াপ্ত করল। এরপরে ক্রমান্বয়ে বেরিয়েছে 'রুদিন্' (১৮৫৬), 'বাবুদের বাসা' (১৮৫৯), 'পূর্বক্ষণ' (১৮৬০), 'জনকেরা ও সন্ততি' (১৮৬২), 'ধোঁয়া' (১৮৬৭), 'অনাবাদী জমি' (১৮৭৭) ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্প 'মুমু' (১৮৫৪) বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন আর বড়গল্প 'প্রথম প্রেম' (১৮৬০)-এর মতো বিষণ্ন ও মর্মান্তিক প্রেমের কাহিনীও খুব বেশি



www.pathagar.com

লেখা হয় নি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন, 'জনকেরা ও সন্ততি', যেখানে তাঁর সময়, সমাজ, রাজনীতি সবই বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনসায়াহ্নে তিনি আবার কবিতার কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। অন্য ধরনের কবিতা, যাকে তিনি বলেছেন 'গদ্যে রচিত কবিতা'। তবে, কবিতা তুর্গিয়েনেফ্‌কে কখনোই ছেড়ে যায় নি : রুশ সাহিত্যে সমস্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক কাব্যময় ভাষা তুর্গিয়েনেফের গদ্যের।

১৮৮৩ সালে দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগে ভুগে প্যারিসের অদূরে তাঁর বাড়িতে মৃত্যু হয়, ৩রা সেপ্টেম্বরে। তাঁর মরদেহ রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়।

হা. মা.

## তুলসী

ল্যাবিয়েটি (Labiatae) পরিবারভুক্ত বৃহৎ বীরুৎ বা ছোট গুল্ম জাতীয় সুগন্ধি উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম হলি বেসিল (Holy basil) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ওসিমাম স্যাংটাম,* লিন *(Ocimum sanctum,* Linn)। অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে বাবুই তুলসী— *সসিমাম ব্যাসিলিকাম,* লিন (*O. basilicum,* Linn), রাম তুলসী— *ওসিমাম গ্রাসিমাম,* লিন (*O. grassimum,* Linn), বন তুলসী— *ওসিমাম অ্যামেরিক্যানাম,* লিন (*O. americanum,* Linn) ও কর্পূর তুলসী— *ওসিমাম কিলম্যাণ্ডস্কারিকাম,* গুয়ের্ক (*O. kilmandscharicum,* Guerk) উল্লেখযোগ্য।

তুলসীর অন্যান্য প্রচলিত নাম—তুলসী ও সুরমা (সংস্কৃত), তুলসী (হিন্দি), তুলসী (তামিল), উলসী বদরুজ (আরবি)। এর উচ্চতা অর্ধ মিটার থেকে প্রায় দেড় মিটার পর্যন্ত। এর কাণ্ড শক্ত এবং চতুষ্কোণাকার। তুলসী গাছের পাতা সরল এবং এর কিনারা সাধারণত খাঁজকাটা। মঞ্জরি বড় ও অনিয়ত। ফুল প্রতি পর্বে আবর্ত আকারে সজ্জিত। শীতকালে এ গাছে ফুল ফোটে ও ফল হয়। সাধারণভাবে তুলসী সর্দি-কাশি,ও কৃমিনাশক, বায়ুনাশক, হজমকারক ও রুচিবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে এদেশে ছোট বালক-বালিকাদের সর্দি-কাশিতে কয়েকটি তাজা পাতার রস, আদার রস ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করানো হয়। ঘামাচি বা চুলকানি হলে তুলসী পাতা দূর্বা ঘাসের ডগার

সঙ্গে বেটে মাখলে ভাল হয়ে যায়। অজীর্ণজনিত পেটের ব্যথায় তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী।

হোমিওপ্যাথি (দ্র)-তেও তুলসী ব্যবহার করা হয়। এর হোমিও নাম *ওসিমাম স্যাংটাম*। বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সর্বত্রই তুলসী গাছ জন্মে। তাই এ গাছ অনেক বাড়িতেই লাগানো হয়। টবেও এ গাছ লাগানো যায়। কীটপতঙ্গ (দ্র) তুলসী গাছের কাছেও আসে না।

ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) মতে এক তোলা গোলমরিচের সঙ্গে দুই তোলা কাঁচা তুলসী পাতা বেটে মটর দানার পরিমাণ বড়ি তৈরি করা যায়। এ বড়ি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কুইনিনের (দ্র) মতো ফলদায়ক।

মু. আ.

## তুলসীদাস [আনু. ১৫৩১—আনু. ১৬২৪]

হিন্দি সাহিত্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় কবি। হিন্দিভাষী জগতে তিনি প্রায় সন্তের মর্যাদা পান, প্রায় ঘরে-ঘরে পূজিত হয়ে আসছেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাব আছে। তবে, পণ্ডিতবর্গ মোটামুটি একমত যে তাঁর জন্ম বাঁদা জেলার রাজপুর গ্রামে এক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতার নাম ছিল আত্মারাম দ্বিবেদী। তিনি সংসারী মানুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রত্নাবলী। তুলসীদাস পরে বৈরাগ্য গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন।

বৈরাগী জীবনেই তিনি কাব্যসাধনায় ব্রতী হন। ঈশ্বর-উপাসনার মাধ্যম ছিল তাঁর এই কাব্যপ্রয়াস। তিনি আওধী বা অবধী (অর্থাৎ পূর্বী হিন্দি) ভাষায় তাঁর 'রামচরিতমানস' কাব্য রচনা করেন। এই শব্দের অর্থ রামচরিত্রের মানস সরোবর (দ্র); এই সরোবরে অবগাহন করলে অর্থাৎ এ-



www.pathagar.com

কাব্য পড়লে পুণ্য হয়। হিন্দি ভাষাভাষী জগৎ 'রামচরিতমানস'-কে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দেয়। কবিত্ব, হৃদয়ের মমত্ব ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল মনের বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় এ গ্রন্থে এমনভাবে ঘটেছে যে কাব্যটি এখনো উত্তর-ভারতে ঘরে-ঘরে পঠিত হয়ে থাকে।

হা. মা.

## তুলা

বহু প্রাচীন কাল থেকেই চীন (দ্র), ভারত (দ্র) ও মিশরে তুলার ব্যবহার চলে আসছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ তুলা বস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি ২৫ শতাংশ তুলা কার্পেট, পর্দা, গৃহস্থালির রকমারি জিনিস তৈরির জন্য এবং অবশিষ্ট তুলা শিল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তুলার বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়।

তুলা সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। ৪০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত অঞ্চলে তুলার চাষ বেশি হয়। তুলা চাষের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত উভয়ই প্রয়োজন হয়। তুলার গুটি বের হলে শীতল ও শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন। সামুদ্রিক আবহাওয়া তুলা চাষের সহায়ক।

সমতল বা তরঙ্গায়িত ঢালু জমি তুলাচাষের উপযোগী। তবে সমতল কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তুলা চাষ করা সহজ হয়। তুলা চাষের জন্য চুন-মিশ্রিত উর্বর দোঁ-আশ মাটি প্রয়োজন। কালো মাটি তুলা চাষের পক্ষে খুবই উত্তম। ভারতের কালো মাটি তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। মাটির পানি ধারণের ক্ষমতা বেশি থাকা চাই। তুলার জমিতে সার (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) উভয়ই ব্যবহার করতে হয়।

তুলা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলায় মোটা ও কর্কশ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। চীন ও ভারতে এই জাতীয় তুলা বেশি উৎপন্ন হয়। মাঝারি আঁশযুক্ত তুলাকে আমেরিকান আপল্যাণ্ড তুলা বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ তুলা এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় ধরনের তুলা দীর্ঘ আঁশযুক্ত। সূক্ষ্ম পশমের মতো এই তুলা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং এর অধিকাংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও মিশরে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), রাশিয়া (দ্র), ভারত, পাকিস্তান (দ্র), ব্রাজিল ও মিশর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলা উৎপাদনে চীন পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী (৩৪.১৫%)। চীনের তুলা তেমন উঁচু মানের নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলা উৎপাদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ (১৬.২৬%)। যুক্তরাষ্ট্রের তুলা খুবই উঁচুমানের। তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়া তৃতীয় (১৩.৪৯%), ভারত চতুর্থ (৭.০৩%), পাকিস্তান পঞ্চম (৫.৫৬%) এবং ব্রাজিল ষষ্ঠ (৩.৪৭%) স্থান অধিকার করে আছে।

মিশরের নীল নদের অববাহিকায় প্রচুর দীর্ঘ আঁশযুক্ত উচ্চমানের তুলার চাষ হয়ে থাকে। অন্যান্য তুলা বা কার্পাস উৎপাদক দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক (দ্র) বলকান (দ্র) দেশসমূহ, উগাণ্ডা, সুদান, উত্তর নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইদানীং বাংলাদেশেও (দ্র) তুলার চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

মু. এ.

## তুষার

আকাশের (দ্র) মেঘ (দ্র) থেকে জলকণা বৃষ্টির আকারে না পড়ে বরফের আঁশ হয়ে যদি পড়তে থাকে, তাকে বলা হয় তুষার। অনেক উপরের মেঘে জলবিন্দুর সঙ্গে কিছু বরফ-বিন্দুও থাকে। কাছাকাছি জলবিন্দুর পানি এসব বরফ (দ্র)-বিন্দুর গায়ে জমে উঠে অনেক সময় একে অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারি বরফ কেলাসে পরিণত করে। নিজ ওজনে নিচের দিকে পড়ার এক পর্যায়ে গরম বাতাসের সংস্পর্শে গলে গিয়ে এগুলো বৃষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু আবহাওয়া (দ্র) যদি নিচে ভূমি পর্যন্ত শীতল থাকে তা হলে বরফ কেলাস আর গলবার অবকাশ পায় না, চিলতে বরফ রূপেই পড়ে তুষারপাতে। বরফ কেলাসে অণুর (দ্র) বিন্যাস ষড়ভুজ আকৃতির বলে তার প্রভাবে তুষারচিলতের মধ্যেও ষড়ভুজ প্রতিসাম্যের নানা ফুলেল আকৃতি দেখা যায়। তুষার যদি শুকনো থাকে, ভেজা ও আধগলা না হয়, তা হলে এই আকৃতিগুলো সুন্দর অবিকৃতভাবে দেখা যায়।

মেরু (দ্র) অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই তুষারপাত হয়। অন্যান্য বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় শীতকালে প্রচুর তুষার পড়ে। পর্বতের উপরকার তুষারগলা পানি অনেক নদীর প্রাথমিক উৎস। মজার ব্যাপার



www.pathagar.com

*তুষারধবল প্রকৃতি*

হল—শীত- প্রধান অঞ্চলে তুষারে ঢাকা বাড়িঘর মানুষকে এবং তুষারে ঢাকা গাছপালা ও গুহা জীবজন্তুকে অতিরিক্ত শীত থেকে রক্ষা করে। বরফ যেহেতু তাপের ভাল অন্তরক, তাই এর ভেতরে তাপ বজায় রাখার সুবিধা হয়। তবে তুষারপাতের বিড়ম্বনাও কম নয়। পর্বতের বৃক্ষহীন ঢালে অতিরিক্ত জমা তুষারের ধস নেমে অনেক সময় বিপজ্জনক আভালাঁশ (avalanche) বা হিমানী সম্প্রপাতের সৃষ্টি হয়। তুষারপাতে রাস্তাঘাট পিচ্ছিল হয়, হাঁটা ও যানবাহন চলাচলের জন্য অসুবিধা ও দুর্ঘটনা ঘটায়। রাস্তায় লবণ (দ্র) আর বালি ছিটিয়ে তুষার গলানো, তুষার সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি শীত-প্রধান অঞ্চলের কিছু বাড়তি কাজ। তুষারের উপর গাড়ি চালাতে বিশেষ ধরনের টায়ার বা টায়ারের ওপর বিশেষ চেইন লাগানো হয়।

তুষারপাত অবশ্য কখনো কখনো আনন্দ করার সুযোগ এনে দেয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য। পরস্পরের গায়ে পেঁজা বরফের বড় অথচ হালকা বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খেলা করে অথবা বরফ দিয়ে মজার মজার মূর্তি তৈরি করে ওরা খুব আনন্দ পায়।

মু. ই.

**তুষারমানব** ইয়েতি দ্র

**তৃপ্তি মিত্র** [১৯২৫—১৯৮৯]

বাংলা নাট্যমঞ্চের এক জন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এবং নাট্যনির্দেশক। অবিভক্ত ভারতে (দ্র) দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তৃপ্তি ভাদুড়ী। ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত বাঙালি অভিনেতা ও ভারতে আধুনিক নাট্যকলার জনক শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁর নাম হয় তৃপ্তি মিত্র।

ঠাকুরগাঁওয়ের মাইনর স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবনের শুরু। পরে কলিকাতায় গিয়ে প্যারীচরণ মিত্র স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নকালেই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন 'গার্লস্ স্টুডেন্ট ইউনিয়ন'-এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং এই সময় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সেবায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ বছরই তিনি ফ্যাসিবাদ (দ্র) বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের উদ্যোগে মঞ্চস্থ বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের

*তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্র : 'চার অধ্যায়' নাটকে*

(দ্র) 'আগুন' নাটকের একটি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে প্রথম অবতরণ করেন।

তৃপ্তি মিত্র একাধারে ছিলেন নাট্যাভিনেত্রী, নাট্যনির্দেশক, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী।



www.pathagar.com

*'চোপ আদালত চলছে' নাটকে তৃপ্তি মিত্র*

১৯৫০ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (IPTA = Indian Peoples Theatre Association) সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে স্বামী শম্ভু মিত্র ও অন্যান্যের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' নামের একটি নাট্যসংস্থা। এর জন্মলগ্ন থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে এই সংস্থার সভাপতিসহ কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

'বহুরূপী' নাট্যদলের সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র বাংলাদেশসহ ইউরোপের (দ্র) বেশ কিছু দেশ সফর করেন এবং অভিনেত্রী হিসাবে বিদেশের মাটিতে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন।

তিনি যেসব বিখ্যাত নাটকের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'মুক্তধারা', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'রক্তকরবী', 'সেতু', 'পুতুলখেলা' 'অপরাজিতা' ইত্যাদি। বাংলা নাট্যজগতে তৃপ্তি মিত্রই প্রথম অভিনেত্রী, যিনি যৌক্তিক ও বাস্তবানুগ অভিনয়রীতির পথ প্রদর্শন করেন।

তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। এগুলোর মধ্যে 'ধরতি কি লাল', 'গোপীনাথ', 'পথিক', 'মুন্না', 'হিন্দুস্থান হামারা', 'জাগো হুয়া সাবেরা' (পূর্ব-পাকিস্তানে নির্মিত) ও 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ইত্যাদি অন্যতম।

তৃপ্তি মিত্র রচিত নাটক 'বলি', 'কে বাঁচে কে বাঁচে?' ও 'শতেক বরষ পরে'। তাঁর নির্দেশিত নাটক 'ডাকঘর', 'কিংবদন্তী', 'অপরাজিতা', 'টেরোডাকটিল', 'গণ্ডার', 'দুরাশা', 'ঘরে-বাইরে' ও 'হাজার চুরাশির মা'।

তৃপ্তি মিত্র তাঁর অভিনয়কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব পুরস্কার, সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম 'সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি' পুরস্কার (১৯৬২), ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মান (১৯৭১), শান্তিনিকেতনের (দ্র)ভিজিটিং ফেলো নির্বাচিত (১৯৮০-৮১), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর 'দীনবন্ধু নাট্য পুরস্কার' (১৯৮৭) ও ভারতের মধ্যপ্রদেশ সরকারের কালিদাস সম্মান (১৯৮৯)।

তৃপ্তি মিত্র দুরারোগ্য ক্যান্সারে ১৯৮৯ সালের ২৪শে মে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

## তেঁতুল

সিসালপিনি (Caesalpinieae) পরিবারভুক্ত উষ্ণমণ্ডলীয় বৃহদায়কার চিরহরিৎ বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ট্যামারিণ্ডাস ইণ্ডিকা*, লিন (*Tamarindus indica*, Linn)। এই গাছ ২৩-২৭ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। এর কাণ্ড সরল ও বহু শাখাযুক্ত। বাকল অমসৃণ, স্থূল ও প্রায় গোলাকার। বাংলাদেশে (দ্র) তেঁতুল গাছ প্রচুর হয়। এর সংস্কৃত নাম 'তিন্তিড়ি'।

তেঁতুল গাছের কাঠ খুব শক্ত, ভারি এবং বেশ টেকসই। এতে সহজে পোকা ধরে না। গরুর গাড়ির চাকা, ঘানি, ঢেঁকি ও বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল কাঠ জ্বালানি হিসাবেও উত্তম। এ কাঠের কয়লা বারুদ তৈরিতে কাজে লাগে। তেঁতুল গাছের বাকলে ট্যানিন থাকায় তা দিয়ে মোটা কাপড় ট্যান করা চলে। এ ছাড়া তেঁতুল পাতা থেকে প্রাপ্ত হলুদ রঙ দিয়ে পশমি কাপড় রঙ করা যায়।

গ্রীষ্মকালে তেঁতুল গাছে ফুল ফোটে। ফুল হলুদ অথবা প্রায় সাদা রঙের হয়ে থাকে। প্রায় ১০-১৫টি ফুল গুচ্ছাকারে একত্রে থাকে। তেঁতুল ফল শাঁসাল। এ ফল প্রায় ৭-২০ সেমি লম্বা। চাটনি, ঔষধ এবং তরকারি হিসাবে তেঁতুলফলের টক শাঁস ব্যবহৃত হয়। শরবত তৈরিতেও এর ব্যবহার ব্যাপক। পেয়ারার জেলির স্বাদ বাড়ানোর কাজেও তেঁতুল



www.pathagar.com

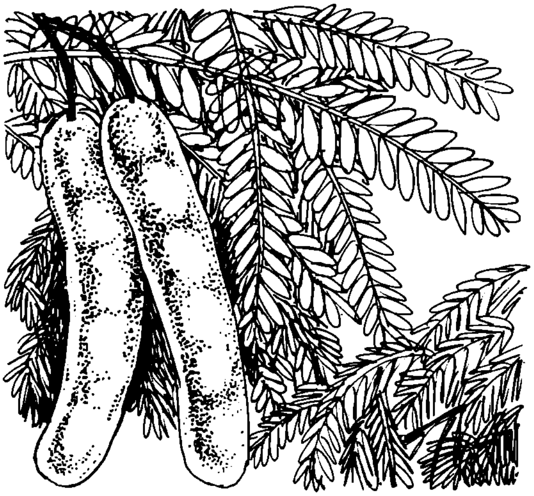

*তেঁতুল পাতা ও ফল*

ব্যবহার করা হয়। পাকা তেঁতুল দিয়ে রূপার পাত্রসহ অন্যান্য ধাতব পাত্র পরিষ্কার করা চলে। তেঁতুলের বীচিতে বিদ্যমান পেক্টিন জ্যাম ও জেলি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুলের বীচি পানিতে ভিজিয়ে রেখে খোসা ছড়ানোর পর তা ভেজে খাওয়া যায়।

মু. আ.

## তেজস্ক্রিয়া

বিকিরণ (দ্র) নিঃসরণের দরুণ কোনো কোনো অস্থায়ী পদার্থের নিউক্লিয়াসে ভাঙন দেখা দেয়; তাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। পরমাণুর (দ্র) নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রন (দ্র)। এদের বলা হয় নিউক্লিয়ন বা নিউক্লীয় কণা। নিউক্লিয়াসের ভিতর নিউক্লীয় কণাগুলি সব সময় নিরবচ্ছিন্ন গতিতে নড়াচড়া করতে থাকে। এই গতির জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যেসব নিউক্লিয়াসের নিউক্লীয় বল খুব দৃঢ় নয় বা যেসব নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল সেসব নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়নগুলি ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যায়। নিউক্লিয়াসটির ভাঙনের সময় তা থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বের হয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গমন প্রক্রিয়াকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়া। এসব তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হল আলফা (দ্র), বিটা ও গামা (দ্র) রশ্মি। আলফা রশ্মি হল হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের স্রোত যা ধনাত্মক চার্জযুক্ত। বিটা রশ্মি হল ইলেক্ট্রনের (দ্র) স্রোত এবং ঋণাত্মক চার্জযুক্ত। গামা রশ্মির কোনো চার্জ নেই। ফরাসি বিজ্ঞানী অঁতোয়ান্ অঁরি বেকেরেল্ (Antoine Henri Becquerel : ১৮৫২-১৯০৮) তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। দেখা যায় যেসব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ৮২-র বেশি সেগুলো সাধারণত তেজস্ক্রিয় হয়। তেজস্ক্রিয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত নিউক্লীয় ঘটনা। এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে এক মৌল অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয়। তেজস্ক্রিয়া, তাপ, চাপ, বিদ্যুৎ (দ্র) বা চৌম্বক ক্ষেত্রের (দ্র) মতো বাইরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জীবের জন্য ক্ষতিকর। এর কল্যাণকর দিকও রয়েছে। ক্যান্সার (দ্র)-সহ কিছু রোগের চিকিৎসায় এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কোনো বস্তুর বয়স নির্ণয়েও রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

## তেনজিং নোরগে [১৯১৪— ]

এভারেস্ট (দ্র) বিজয়ী প্রথম অভিযাত্রী। তেনজিংয়ের (Tenzing Norgay) সঙ্গে ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী স্যার এডমণ্ড পারসিভাল হিলারি(দ্র)। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে যুক্তভাবে পৃথিবীর (দ্র) সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। এর আগে এভারেস্ট জয় করার জন্য বহুবার অভিযান চালানো হয়। তাঁদের দু'জনের মধ্যে তেনজিং আগে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন। তেনজিং নেপালে শেরপা বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ। জন্ম ১৯১৪ সাল। শেরপারা উঁচু পর্বতে ওঠায় দক্ষ।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকার দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেইনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করে তেনজিং-কে ফিল্ড ট্রেইনিং ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। তিনি ১৯৩৫, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালের ব্রিটিশ দলের হিমালয় অভিযানে হাই অলটিচুড শেরপারূপে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে কারাকোরাম অভিযানে, ১৯৫১ সালে নন্দাদেবী শৃঙ্গ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নন্দাদেবী অভিযানে তিনি পূর্ব-শৃঙ্গে



www.pathagar.com

*দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেইনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং*

আরোহণ করতে সমর্থ হন। অভিযান দু'টি ছিল সুইসদের। এতে তিনি শেরপা সর্দার ও পূর্ণ সদস্য ছিলেন।

তেনজিং শেরপা বৌদ্ধ সমিতি ও পর্বতারোহীদের সমিতির সভাপতি। তিনি দেশে-বিদেশে বহু সম্মান ও পদক লাভ করেছেন।

**বি. ব.**

## তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন বঙ্গদেশের বর্গা বা ভাগ-চাষীদের একটি সংগ্রাম। বহু সংখ্যক ক্ষেতমজুর এতে অংশ নেয়। এই আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। সুসংগঠিত এই আন্দোলন ছিল যেমন ব্যাপক, তেমনই জঙ্গি। তখনকার পূর্ব-বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলা জুড়ে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক তেভাগা আন্দোলনে শরিক হন।



www.pathagar.com

নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করতে গিয়ে বৃহৎ ভূস্বামী ও জোতদারশ্রেণীর লোকজনদের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের আইন-শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বহু কৃষক এই আন্দোলন করতে গিয়ে হতাহত হন। কৃষকদের প্রতিরোধের মুখেও বহু এলাকায় হতাহত হয় জোতদার, ভূস্বামী এবং তাদের লোকজন।

এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল : জোতদারদের গোলায় নয়, নিজেদের গোলায় ধান তুলবে বর্গা বা ভাগ-চাষী। মোট উৎপন্ন ফসলের দুই ভাগ পাবে চাষী, এক ভাগ পাবে জমির মালিক। তিন ভাগ থেকেই 'তেভাগা' শব্দের সৃষ্টি। দীর্ঘ দিন থেকে এ দেশে ভূমিহীন কৃষক যে চুক্তিতে অন্যের জমি চাষ করত সে ব্যবস্থাকে বলা হত বর্গাপ্রথা এবং এসব ভূমিহীন কৃষককে বলা হত ভাগচাষী। এই প্রথা অনুযায়ী জমির সমস্ত ফসল উঠত মালিকের গোলায়। আর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো কম অংশ নির্ধারিত থাকত ভাগচাষীর জন্য। বাকি অংশ ছিল জমির মালিকের। অথচ জমিতে ফসল ফলাতে বীজ, হাল, শ্রম সবই দিতে হত কৃষককে।

অবিভক্ত ভারতে বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে অচিরকালের মধ্যে ভাগচাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

আ. হু.

## তেল-চর্বি

আমাদের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদানের অন্যতম হল স্নেহজাতীয় উপাদান তেল-চর্বি। সাধারণ উত্তাপে তরল অবস্থায় থাকলে একে তেল এবং অন্যথায় চর্বি বলে অভিহিত করা হয়। এটি শরীরে শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে ঘন ও দক্ষ উৎস। প্রতি গ্রাম চর্বি ৯ ক্যালোরি শক্তি উৎপাদন করতে পারে, অথচ প্রতি গ্রাম শর্করা অথবা আমিষ পারে ৪ ক্যালোরি। খাদ্যের উপাদান শর্করা, আমিষ বা তেল-চর্বি শরীরে অব্যবহৃত থেকে গেলে তা সবই শেষ পর্যন্ত চর্বি রূপে শরীরে জমা হয়। এরকম জমা চর্বির অধিকাংশ থাকে চামড়ার ঠিক নিচে। কখনো খাদ্যে যথেষ্ট শক্তি-উৎসের অভাব হলে তখন এই সঞ্চিত চর্বি ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া অন্তরক হিসাবে এই চর্বির আবরণ শরীরের তাপক্ষয় রোধ করে, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহকে চর্বির গদি আঘাত থেকে রক্ষা করে। তেল-চর্বির প্রধান উপাদান ফ্যাটি অ্যাসিড। কোনো কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরগঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ভাল পাওয়া যায় তেল-চর্বির কিছু উৎসের মধ্যে—যেমন দুধ (দ্র), ডিম (দ্র), মাছ (দ্র), বাদাম ইত্যাদি থেকে, তবে সেখানে তা স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকে না।

সাধারণত গ্লিসারিনের (দ্র) একটি অণু (দ্র) এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের তিনটি অণুর সমন্বয়ে তেল-চর্বির একটি অণু গঠিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুতে কার্বন (দ্র) পরমাণুর (দ্র) দীর্ঘ শৃঙ্খলে প্রত্যেকটি কার্বনের সঙ্গে যদি যতগুলো সম্ভব ততগুলো হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণু যুক্ত থাকে তবে তা গঠন করে সম্পৃক্ত চর্বি। পশু পাখি থেকে পাওয়া চর্বিগুলো সম্পৃক্তই হয়ে থাকে। এরকম চর্বি খাদ্যে বেশি থাকলে তা রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বাড়িয়ে রক্তনালি সঙ্কুচিত হবার ও হৃদ্‌রোগ (দ্র) ঘটাবার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনশৃঙ্খলে এক বা একাধিক যোজনী যদি হাইড্রোজেন-বিহীন হয় তা হলে তা যথাক্রমে অসম্পৃক্ত বা বহু-অসম্পৃক্ত চর্বি বলে পরিচিত হয়। তরল উদ্ভিদ (দ্র) ও মাছের তেল এই দলে পড়ে। কোলেস্টেরলের দিক থেকে এগুলো নিরাপদ। তবে সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত চর্বি গ্রহণ শরীরে মেদের সৃষ্টি করে। মেদবহুল শরীরে অনেক রোগের চিকিৎসা কঠিন হয় —যেমন ডায়াবেটিস (দ্র), লিভার সিরোসিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি।

যেসব তৈলবীজ থেকে উদ্ভিজ্জ তেল পাওয়া যায় তার মধ্যে আমাদের অধিক ব্যবহৃত সয়াবীন (দ্র), বাদাম, সরষে (দ্র) ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে সূর্যমুখী বীজ, ভুট্টা (দ্র), জলপাই, নারকেল (দ্র) ইত্যাদি তেল। নিম্নচাপে ঠাণ্ডা



www.pathagar.com

অবস্থায় নিষ্পেষণ করে (যেমন সাধারণ ঘানিতে), উচ্চ চাপে উত্তপ্ত অবস্থায় নিষ্পেষণ করে, অথবা তেলের কোনো দ্রাবক ব্যবহার করে তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। শেষের পদ্ধতি দু'টিতে উৎপন্ন তেলকে যথেষ্ট বিশোধন করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তেল-চর্বি পানিতে দ্রাব্য নয়, তবে অ্যালকোহল (দ্র), ক্লোরোফর্ম (দ্র), ইথার এবং পেট্রোলিয়ামে (দ্র) দ্রাব্য। উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন মিশিয়ে এর সম্পৃক্ততা এবং সেই সঙ্গে কাঠিন্য বাড়ানো যায়। এভাবে হাইড্রোজেন পদ্ধতিতে উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতি বা মার্জারিন্ তৈরি করা হয়। অন্য দিকে মাখন একটি সম্পৃক্ত প্রাণীজ চর্বি।

মু. ই.

**তেলাপোকা** আরসোলা দ্র

## তেলেঙ্গানা কৃষক-বিদ্রোহ

দক্ষিণভারতের হায়দ্রাবাদ (বর্তমান অন্ধ্র) রাজ্যের পূর্ব অংশের আটটি জেলা নিয়ে তেলেঙ্গানা। লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। এদের অধিকাংশই তেলুগু-ভাষী হিন্দু কৃষক। শাসনকর্তা মুসলমান, তার উপাধি নিজাম। ইংরেজ আমলের

দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদে নিজামশাহী বরাবর তাদের খুশিমতো স্বৈরশাসন চালিয়েছে। কৃষকশ্রেণী হয়েছে জমিদার-জোতদারদের সীমাহীন শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার। যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

চল্লিশের দশকে কৃষকদের সংগঠন অন্ধ্র মহাসভা রাজনৈতিকভাবে কৃষকদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চালায়। ১৯৪৪ সাল থেকে ভূস্বামীদের অত্যাচার-অনাচারের

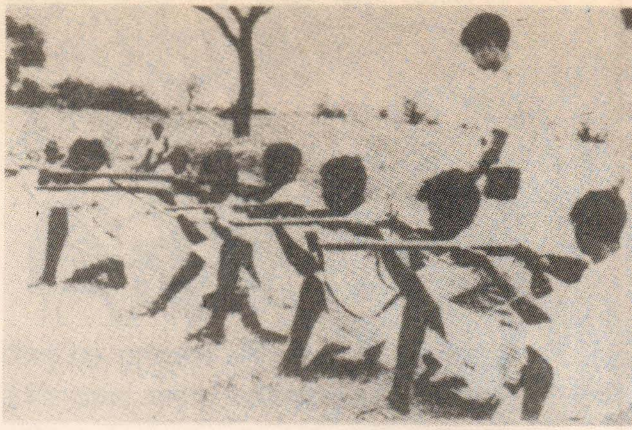

তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র বিদ্রোহ

বিরুদ্ধে কৃষকদের দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৪৬ সালে তা সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের রূপ নেয়। শুরুতে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়, টাউট-গুণ্ডাদের অত্যাচার, জমি থেকে ইচ্ছামতো উচ্ছেদ, বেআইনি কর আদায় ইত্যাদি বন্ধ করা। ক্রমে এই আন্দোলন ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব ও নিজামের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর সংগ্রামে পরিণত হয়। স্বভাবত লাঠি-তীর ধনুকের আন্দোলন সশস্ত্র লড়াইয়ের রূপ নেয়।

অন্ধ্র মহাসভার পরিচালনায় তখন গ্রামে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা-বাহিনী গড়ে ওঠে। যুবকদের নিয়ে তৈরি হয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। অন্যান্য কৃষকদের নিয়ে গ্রামরক্ষী-



www.pathagar.com

বাহিনীও গড়ে তোলা হয়। গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত হয় নির্বাচিত পঞ্চায়েতের ওপর। তারা কৃষকদের কাছ থেকে সকল বেআইনি আদায় বন্ধ করে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় জোরজুলুম করে জমি থেকে উচ্ছেদ এবং ইচ্ছামত বেগার খাটানোর প্রথা।

এমনি করে তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি হয়। ১৯৪৭ সাল নাগাদ সেখানে ৫ হাজার কৃষকের গেরিলা-বাহিনী গড়ে ওঠে। চলতে থাকে নিজামের সশস্ত্র পুলিশ, সেনা বাহিনী ও বেসরকারি রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ। নলগোণ্ডা, ওয়ারেঙ্গাল ও খাম্মাম জেলার প্রায় ৩ হাজার গ্রাম মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষকদের 'গ্রাম সরকার'। তারা গ্রাম থেকে জোতদারদের তাড়িয়ে দিয়ে দশ লক্ষ একর জমির দখল নেয় এবং তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। এই লড়াইয়ে ৪ হাজার কৃষককর্মী নিহত এবং সমর্থকসহ দশ হাজার কর্মী কারারুদ্ধ হয়।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সেনা বাহিনী হায়দ্রাবাদ দখল করে নেবার পর তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই শুরু হয়। দলীয় তাত্ত্বিকদের একাংশ স্বাধীন দেশের সেনা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ সঠিক নয় দাবি তোলা সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই লড়াই চলে। এবং বিশাল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে অসম যুদ্ধে ছোট্ট কৃষক গেরিলা-বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ধনী ও মাঝারি কৃষকশ্রেণীর উদ্যোগে এবং অন্ধ্র পার্টির একাংশের নির্দেশে আন্দোলন বন্ধ করে অস্ত্রসমর্পণ করার নীতি গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনা বাহিনীর আক্রমণ চলতে থাকে এবং তাদের হাতে বহু কৃষককর্মী ও নেতা নিহত হয়। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৯৫০ সালে হায়দ্রাবাদে এক জনসভায় বলেন, 'তেলেঙ্গানায় এক জন বিদ্রোহীও যেন জীবিত না থাকে।'

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের মূল শক্তি ছিল ক্ষেতমজুর ও দরিদ্রকৃষক। তাদের সঙ্গে ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক। প্রথম দিকে ধনী কৃষকও এতে অংশ নেয়। এই বিদ্রোহে ছাত্রসমাজ সাহসী ভূমিকা নিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। আর হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক এতে সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছে। এখানেই তেলেঙ্গানা কৃষক-বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য।

আ. র.

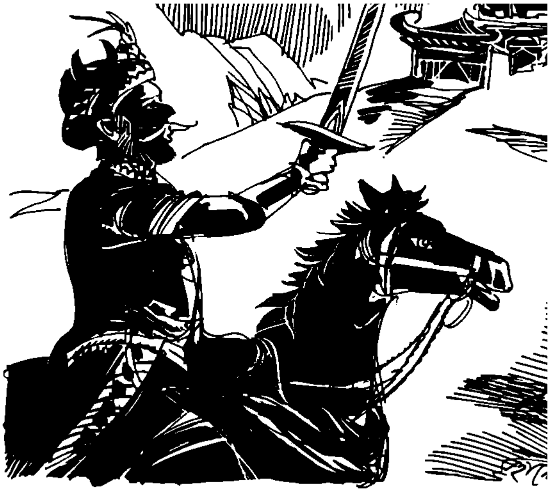

**তৈমুর লং** [১৩৩৬—১৪০৫]

দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং বিখ্যাত যোদ্ধা চেঙ্গিস খানের (দ্র) বংশধর। তৈমুরের জন্ম সমরখন্দে। সমরখন্দ্ বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্গত।

তৈমুর ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দারদের পরাজিত করে সমগ্র তুর্কিস্তানে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এর পর তিনি পারস্য, খুরাশান, আজারবাইজান, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত জয় করেন। তিনি রাশিয়া (দ্র) আক্রমণ করে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত উরাল-ভোলগা অঞ্চল জয় করেন। এক কথায় গোটা মধ্য-এশিয়া তাঁর পদানত হয়। তিনি দিল্লি (দ্র) আক্রমণ করে (১৩৯৮) সুলতান মুহম্মদ তুঘলককে (২য়) পরাজিত করেন। তাঁর হাতে দিল্লির আশি হাজার লোক নিহত হয়। তিনি ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য জয় করেন। এবং প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৈমুর তুরস্ক (দ্র) আক্রমণ করে তুরস্কের সুলতান ১ম বায়েজীদকে পরাজিত ও বন্দি করেন। এর পর তৈমুর চীন (দ্র) অভিযানে বের হন। কিন্তু চীন বিজয়ের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর সমাধি সমরখন্দে অবস্থিত।

তৈমুরের এক পা খোঁড়া ছিল বলে তিনি তৈমুর লং নামে পরিচিত। তৈমুর শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুরতারও তুলনা ছিল না।

খু. জা.



www.pathagar.com

## তোয়াহা, মোহাম্মদ [১৯২২—১৯৮৭]

বামপন্থী রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯২২ সালের ২রা জানুয়ারি বৃহত্তর নোয়াখালি জেলার তৎকালীন থানা (বর্তমানে জেলা) লক্ষ্মীপুরের কুশাখালি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি স্থানীয় ফরাশগঞ্জ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ এবং ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই মোহাম্মদ তোয়াহা মুসলিম লীগ (দ্র) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) ফজলুল হক হলের ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

মোহাম্মদ তোয়াহা ১৯৪৮ সালে ভাষা-আন্দোলন (দ্র), ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট সমর্থন ও সজ্ঘটন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫১ সালে তোয়াহা অসাম্প্রদায়িক যুবসংগঠন 'পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ' গঠনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালে তিনি এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগে (দ্র) যোগ দেন। কিন্তু দলটির তৎকালীন মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কারণে মওলানা ভাসানীর (দ্র) নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) (দ্র) যোগ দেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ষাটের দশকের সূচনা থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি দেখা দিলে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি, যা চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত ছিল। মধ্যষাটের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শ্রমিকসংগঠন পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনেরও তিনি ছিলেন সভাপতি।

১৯৭০ সালে তোয়াহা ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে নীতিগত মতভেদের কারণে দলটি বিভক্ত হয়। তিনি তাঁর নেতৃত্বাধীন উপদল নিয়ে স্বাধীনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হলে তাঁর নেতৃত্বাধীন উপদলের নাম হয় 'বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল' (এমএল)। এম এল অর্থ মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট। তোয়াহা আমৃত্যু এই দলের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে রামগতিতে তাঁর উদ্যোগে মেঘনা ক্রস বাঁধ নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মোহাম্মদ তোয়াহা ১৯৮৭ সালের ২৯শে নভেম্বর নোয়াখালিতে নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

## ত্বক / চর্ম (skin)

ত্বক দেহের রেচন অঙ্গের একটি অংশ, যা সমস্ত দেহকে আবৃত করে রাখে। এক জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ত্বকের ওজন গড়ে চার কেজি। ত্বক তিনটি স্তর দিয়ে তৈরি।

এপিডার্মিস (epidermis) ত্বকের প্রথম স্তর। এই স্তরে রক্তজালিকা ও স্নায়ু থাকে না। এখানে ঘাম নিঃসরণের উপযোগী অসংখ্য লোমকূপ থাকে। এই স্তরে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয়, যা দেহত্বকের রঙ নির্ধারণ করে। এর নিচের স্তর থেকে নতুন কোষ তৈরি হয় এবং উপরের কোষ খসে যায়।

ডার্মিস (dermis): এটি দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে রক্তনালি, লসিকানালি, স্নায়ু, ঘর্মগ্রন্থি ও তৈলগ্রন্থি থাকে।

হাইপোডার্মিস (hypodermis): এটি তৃতীয় স্তর। এই স্তরে চর্বি থাকে।

ত্বক দেহের কোমল অংশকে আঘাত এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য



www.pathagar.com

করে। ত্বকে স্নায়ুকোষ থাকায় আমরা ঠাণ্ডা, গরম, স্পর্শ, বেদনা ইত্যাদি অনুভব করি। ত্বকের নিচের চর্বি সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন-ডি তৈরি করে।

ত্বকে সচরাচর ছত্রাক (দ্র) সংক্রমণ হয়। দাদ, খোস-পাঁচড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দেখা যায়। স্বাস্থ্যবিধি পালন ও পরিচ্ছন্নতা চর্মরোগ প্রতিরোধের উপায়। অবশ্য রোগের ক্ষেত্রে দরকার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা। ত্বকের অসুখ অসংখ্য ধরনের, অবহেলা না করে সর্বদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

আ. আ. হা.

## ত্বরণ

ত্বরণ হচ্ছে গতির পরিবর্তনের হার। ধরা যাক, কোনো বস্তুর গতি কোনো বিশেষ সময় $T_1$-এ হচ্ছে $V_1$ এবং $T_2$ সময়ে এই গতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে $V_2$ । তা হলে গতির পরিবর্তন এখানে $V_2-V_1$ । এই পরিবর্তন ঘটেছে $T_2-T_1$ সময়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ত্বরণ হচ্ছে $(V_2-V_1) / (T_2-T_1)$। আমরা যদি দূরত্ব মিটারে মাপি এবং সময় সেকেণ্ডে, তা হলে গতির একক দাঁড়ায় মিটার/সেকেণ্ডে এবং ত্বরণের একক দাঁড়ায় মিটার/(সেকেণ্ড)$^২$। এই এককে গণনা করলে আমরা দেখি, যে কোনো বস্তু যখন পৃথিবীর (দ্র) টানে নিচে পড়তে থাকে তা ৯.৮ মিটার / (সেকেণ্ড)$^২$ ত্বরণ লাভ করে। কোনো বস্তুর উপরে বল কাজ করলেই মাত্র এর ত্বরণ ঘটে এবং সেই ত্বরণ প্রযুক্ত বলের আনুপাতিক গতির হার যখন সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তখন আমরা ধনাত্মক ত্বরণ পাই। যদি সময়ের সঙ্গে গতি কমতে থাকে, তা হলে ঋণাত্মক ত্বরণ পাই। ঋণাত্মক ত্বরণকে মন্দন বলে। কোনো ট্রেন যখন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে তখন তা কিছুক্ষণ ত্বরণ লাভ করে। যখন ট্রেনের গতি নির্দিষ্ট মান লাভ করে অর্থাৎ স্থির গতিতে উপনীত হয়, তখন ট্রেনের ত্বরণ হয় শূন্য। কোনো ট্রেন যখন স্টেশনে থামার আগে গতি মন্থর করতে থাকে, তখন এর ত্বরণ হয় ঋণাত্মক অর্থাৎ ট্রেনের গতির মন্দন ঘটে।

আমরা শুধু ত্বরণকেই দৈহিকভাবে অনুভব করতে পারি। কোনো যানবাহন যদি ত্বরণহীন গতিতে চলে, অর্থাৎ অপরিবর্তী গতিতে চলে, তা আমরা বাইরে না তাকিয়ে টের পাই না। এই জন্যই বলা হয় যে গতি পরমভাবে মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু ত্বরণ পরমভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

আ. আ.

## ত্রিপিটক

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। এত বিশালাকার ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে কমই আছে। এই মহাগ্রন্থে মহাকারুণিক বুদ্ধের ধর্ম, দর্শন, বাণী ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ তিনটি পেটিকা, অর্থাৎ তিনটি পেটিকায় এই মহাগ্রন্থ বিভক্ত এবং এই গ্রন্থের তিনটি খণ্ড—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক।

১. সুত্তপিটক : এই গ্রন্থে লোক-প্রচলিত উপদেশ সঙ্কলিত আছে। গদ্যে লিখিত এর কথোপকথন, বিবরণ ও বচন উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের গৌরব লাভ করেছে। সুত্তপিটকের পাঁচটি ভাগ—দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। খুদ্দকনিকায় আবার ১৫টি গ্রন্থের সমাবেশে রচিত। এদের নাম খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদামগগ্, অপদান, বুদ্ধবংস ও চারিয়াপিটক। এর মধ্যে জাতক ৬টি গ্রন্থে সঙ্কলিত বৃহৎগ্রন্থ। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে ৪২৩টি গাথা আছে, এবং ধর্মনীতি সম্পর্কিত এই পদাবলী আলাদাভাবে খুব জনপ্রিয়। বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। থেরগাথা ও থেরীগাথা গৌতম বুদ্ধের (দ্র) সময়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের রচিত গাথা বা কবিতাসঙ্কলন।

২. বিনয়পিটক : এই পিটকে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য নিয়ম-কানুন এবং তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্যপালনীয় আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ আছে। নির্বাণ (দ্র) লাভের জন্য এই নিয়ম-কানুন প্রথম সোপান। বিনয়পিটক তিন ভাগে বিভক্ত—সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার। সুত্তবিভঙ্গ ও খন্ধক প্রত্যেকে দুই ভাগে বিভক্ত।

৩. অভিধম্মপিটক : ত্রিপিটকের এই তৃতীয় অংশ ৭টি ভাগে বিভক্ত—ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক এবং পট্‌ঠান।

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছু দিন পরে রাজগৃহের (অধুনা রাজগীরের) সপ্তপর্ণী গুহায় রাজা অজাতশত্রুর



www.pathagar.com

সমর্থনে স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে প্রথম মহাসঙ্গীতি বা ধর্মসম্মেলন হয়। সপ্তপর্ণী গুহাটি এখনো সংরক্ষিত আছে। সপ্তপর্ণীর এই সভায় ৫০০ ভিক্ষু যোগদান করেন। এই সঙ্গীতিতে বুদ্ধবচন সংগৃহীত হয়। ভিক্ষু আনন্দ যেসব বুদ্ধবচন আবৃত্তি করতেন তা 'ধম্ম' (বা সুত্ত) নামে অভিহিত হয়। ভিক্ষু উপাধির বিনয়বিষয়ক রচনাবলি 'বিনয়' আখ্যা পায়।। অভিধম্মপিটক সংগৃহীত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের ১০০ বছর পরে বৈশালীতে রাজা কালাশোকের আনুকূল্যে এবং মহামতি যশ মহাস্থবির এই দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির নেতৃত্ব দেন। এই সম্মেলনে ৭০০ ভিক্ষু যোগ দেন।

ত্রিপিটকের শিক্ষা ও লক্ষ্য তিন প্রকার। সুত্তপিটকে সাধারণ ব্যবহার বা লৌকিক শিক্ষা, বিনয়পিটকে ভিক্ষুদের আজ্ঞাসূচক শিক্ষা, এবং অভিধম্মপিটকে পরমার্থ শিক্ষা আছে। সুত্তপিটকে যথানুরূপ উপদেশ, বিনয়পিটকে যথাপরাধ উপদেশ, অভিধম্মপিটকে যথাধর্ম ও যথাযথ উপদেশ আছে।

ত্রিপটকের যে-সমস্ত প্রাচীন সংস্করণ আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে পালি ভাষায় (দ্র) রচিত ত্রিপিটক যেমন প্রাচীনতম তেমনই ব্যাপকতম। পালি ছাড়া সংস্কৃত (দ্র), প্রাকৃত (দ্র) প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটক তৎকালে ছিল এবং পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সংস্কৃত ত্রিপিটকের খণ্ডিত অংশ মধ্যএশিয়া ও গিলগিটে (কাশ্মীরের পাকিস্তান-অংশ) পাওয়া গেছে। পালি সুত্তপিটক ৫ ভাগে, বিনয়পিটক ৬ ভাগে এবং অভিধম্মপিটক ৭ ভাগে বিভক্ত। এ ছাড়া প্রাচীন সিংহলী ভাষায় মূল ত্রিপিটক পাওয়া যায়।

বি. ব.

## ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি। এ ছাড়াও সিলেট (দ্র), কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের (দ্র) সীতাকুণ্ড পাহাড়েও এদের বসবাস। টিপারা বা তিপারা নামেও এরা পরিচিত। বান্দরবান জেলায় উসাই নামে ত্রিপুরাদের একটি শাখা আছে। ১৯৮১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী ত্রিপুরাদের লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫৭,৩৬৮ জন ও উসাইদের আনুমানিক ৪,২৩২ জন।

ত্রিপুরাদের আদি নিবাস ভারতের (দ্র) ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখান থেকে অতীতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল।

*ত্রিপুরাদের পরিবার ও ঘরবাড়ি*

রাজা রত্নমাণিক্যের সময় (১৪৬৩-৬৭) ত্রিপুরাদের রিয়াং দলের লোকেরা মাইয়ুনী উপত্যকায় বসবাস করছিল বলে ত্রিপুরাদের ইতিহাস-গ্রন্থ 'শ্রীরাজমালা' সূত্রে জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে কর্ণফুলি (দ্র) নদীর উত্তর-ভূখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিল।



www.pathagar.com

*ত্রিপুরা নৃত্য*

ত্রিপুরাদের মধ্যে বহু দল আছে। সাধারণভাবে তারা ৩৬টি দফা বা দলে বিভক্ত, যেমন—নাইতং, ফাতুং, দেঁইদক, গাবিং ইত্যাদি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাদের অন্যতম শাখা উসাইরা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরারা ১৪জন দেবদেবীর পূজা করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ত্রিপুরা সমাজে একজন ধর্ম-সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রত্নমণি। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা সমাজে মা ও পিতা উভয় ধারায় বংশগণনার প্রথা প্রচলিত। তাদের নিজস্ব ভাষার নাম 'কক্‌বরোক্‌'। এই ভাষা বৃহত্তর বোডো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের বাংলা বর্ষের শেষের দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে 'বিজু' (দ্র) উৎসব পালিত হয়। এ সময় তাঁদের 'গরয়া' নৃত্য উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁদের কোরপূজানৃত্যও চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর। ত্রিপুরাদের মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করা হয়।

**বি. ব.**

**ত্রিবেণী** গঙ্গা নদী দ্র

**ত্রিশঙ্কু**

মহাকাব্য রামায়ণ (দ্র)-এর বালকাণ্ডে বর্ণিত সূর্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে তিনি এই বাসনা জানান যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রভাবে তাঁকে যেন সশরীরে স্বর্গে যাবার সুযোগ তিনি করে দেন। কিন্তু বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্ররা তাঁকে প্রত্যাখান করেন। ত্রিশঙ্কু তখন অন্য কারো শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠের পুত্ররা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হবার অভিশাপ দেন। তখন চণ্ডালবেশে ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিজেই যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু সকল ঋষি যজ্ঞে যোগ দিলেও বশিষ্ঠের পুত্ররা যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে দেবতারাও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না। তখন বিশ্বামিত্র নিজ পুণ্যবলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণের চেষ্টা করলে দেবতারা তাঁকে স্বর্গে স্থান দিতে অস্বীকৃতি জানান। গুরুশাপগ্রস্ত বলে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে অধোমুখে মর্তে পাঠিয়ে দেন। ত্রিশঙ্কুর এই পতন দেখে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের তপোবলে তাঁকে শূন্যে স্থাপন করেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল (দ্র) ও নক্ষত্রলোকসহ দ্বিতীয় একটি স্বর্গ সৃষ্টি করেন। তাতে তিনি নতুন দেবতা ও নতুন ইন্দ্র সৃষ্টিতেও তৎপর হন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে স্বীকার করে নেন যে বিশ্বামিত্রের তৈরি স্বর্গলোকে নিম্নশির ত্রিশঙ্কু দেবতার সম্মানে অবস্থান করবেন। সেই থেকে ত্রিশঙ্কু আকাশলোকে অধোমুখী অবস্থায় আছেন। তাই গুরুতর অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত কোনো ব্যক্তির সঙ্কটময় অবস্থা বোঝাতে বলা হয় 'ত্রিশঙ্কু অবস্থা'।

**সুজ. ব.**

**ত্রিশরণ**

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধদেব (দ্র), বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় কামনা করা। বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে যতখানি গুরুত্ব দিতেন, ঠিক ততখানিই গুরুত্ব দিতেন সংঘকে। তাই বৌদ্ধরা প্রার্থনা শুরু করার আগে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে স্মরণ করে থাকেন :

*"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।*
*ধম্মং শরণং গচ্ছামি।*
*সংঘং শরণং গচ্ছামি।"*

অর্থাৎ "আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি। আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি। আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।"

এইভাবে তিনবার উচ্চারণ করতে হয়। বৌদ্ধধর্মে (দ্র)



www.pathagar.com

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় বলে। ত্রিশরণের আরেক নাম শরণগমন।

সুজ. ব.

**ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ** [ ১৮৮৯—১৯৭০ ]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী। তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি 'মহারাজ' ছদ্মনামে খ্যাত ছিলেন। ১৮৮৯ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলার কাপাসাটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ১৯০৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি মোট ৩০ বছর কারারুদ্ধ থাকেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ১৯০৬ সালে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'(দ্র) -তে যোগ দেন। ১৯০৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্বে বিপ্লবী তৎপরতা পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতার হলে সেখানেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ত্রৈলোক্যনাথ ১৯০৯ সালে আত্মগোপন করে আগরতলার উদয়পুর পাহাড়ে এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মালদহ, রাজশাহী ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত বিপ্লবী ঘাঁটি নির্মাণে অংশ নেন। ১৯২৮ সালে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগদান, দলের নির্দেশে ব্রহ্মদেশে অবস্থানকারী স্বদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সেখানে গমন, ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যোগদান, ১৯৩৮ সালে রামগড় কংগ্রেসে অংশগ্রহণসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটন প্রচেষ্টা এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' (দ্র) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ—এসবই ছিল তাঁর বৈপ্লবিক তৎপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ সরকার তাঁকে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করে যেসব জেলে আটক ও অন্তরীণ করে রাখেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দামান সেলুলার জেল (দ্র), ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেল, বক্সা বন্দিশিবির এবং হাতিয়া দ্বীপ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে তিনি সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ-গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান (দ্র) সামরিক শাসন জারি করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল এবং তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

১৯৭০ সালে চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে গেলে ওই বছরের ৯ই আগস্ট তারিখে দিল্লি শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'জেলে ত্রিশ বছর', 'পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' এবং 'গীতায় স্বরাজ'।

আ. হু.

**ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়** [১৮৪৭—১৯১৯]

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) বিস্মৃতপ্রায় অথচ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা স্যাটায়ারিস্ট। জন্ম ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার রাহুতায়, বাংলা ১২৫৪ (১৮৪৭ খ্রি.) সালের ৬ই শ্রাবণ।

চরম দারিদ্র্যের কারণে তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ হবার সুযোগ পায় নি। ১৮৬৮ সালে তিনি কটক জেলার পুলিশের সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন।

সরকারি চাকুরিতে ঢুকে ত্রৈলোক্যনাথ দু'জন উদার ইংরেজের সাথে পরিচিত হন। এঁদের এক জন স্যার উইলিয়াম হান্টার ও স্যার এডোয়ার্ড বক্। এঁদেরই সাহায্যে এবং নিজের কর্মযোগ্যতাবলে সরকারি পরিসংখ্যান ও কৃষিবাণিজ্য বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হন। এই সময় বড় বড় রেলস্টেশনে দেশীয় শিল্পবস্তু রেখে বিক্রি করার যে ব্যবস্থার প্রচলন হয়, তার প্রবর্তক তিনিই। ১৮৭৭-৭৮ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গাজর উৎপাদন করে তা দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকজনের জীবন রক্ষার্থ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন ত্রৈলোক্যনাথ। ফলে বহু লোকের প্রাণ রক্ষা পায়।



www.pathagar.com

ত্রৈলোক্যনাথ দেশীয় শিল্পের প্রসারে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'ভিজিট টু ইউরোপ' গ্রন্থে।

তিনি সরকারি চাকুরির শেষ কয়েক বছর কলিকাতা জাদুঘরে সহকারী কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮১৬ সালে তিনি অবসর জীবন বেছে নেন।

ত্রৈলোক্যনাথের যাবতীয় রচনাকর্ম দু'টি ভাষায় রচিত—ইংরেজিতে এবং বাংলায়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম : 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২), 'পাপের পরিণাম' (১৯০৮), 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১), 'বাঙাল নিধিরাম', 'ডমরু-চরিত' (১৯২৩), 'মজার গল্প' (১৯০৬) ও 'মুক্তামালা' (১৯০২)। ভারতের কৃষি ও শিল্প বিষয় নিয়েও ইংরেজিতে তাঁর কিছু রচনাকর্ম উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পুরীতে মারা যান।

আ. হ.

# থ

**থাইরয়েড্**  অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্র

## থাইল্যাণ্ড

*থাইল্যাণ্ড রাজপ্রাসাদের একটি অংশ*

থাইল্যাণ্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। বস্তুত এ দেশ কখনো পরাধীন ছিল না। থাইল্যাণ্ডের পূর্বনাম শ্যামদেশ। এ দেশের আয়তন ৫,১৪,০০২ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯ হাজার (১৯৯২)। আয়তনে বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় ৪ গুণ হলেও লোকসংখ্যা বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। থাইল্যাণ্ডের পশ্চিমে মায়ানমার (দ্র) এবং পূর্বে লাওস ও কম্বোডিয়া। অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। থাইল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র বহুদিন থেকেই প্রচলিত আছে। সেখানে রাজা রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী সংসদ-নীতিনির্ধারণ ও সরকার পরিচালনা করেন। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজা এবং সামরিক বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। থাইল্যাণ্ডে ৭২টি প্রদেশ আছে।

থাইল্যাণ্ডের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। মধ্যভাগে উর্বর পললময় মেনাম উপত্যকা দেশের প্রাণকেন্দ্র এবং ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। উত্তর ও পশ্চিম ভাগে পর্বত ও উচ্চভূমি; পূর্বে অনুর্বর খোরাত মালভূমি। মেনাম ও সাওব্রায়া প্রধান নদী। সালুইন ও মেকং নদী থাইল্যাণ্ডের যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত বরাবর কিছু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। থাইল্যাণ্ডে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অনুভূত হয়। নিরক্ষীয়



www.pathagar.com

*থাইল্যাণ্ডের কাছেই ফুকেত দ্বীপ প্রকৃতির অসাধারণ সৃষ্টি*

অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে প্রায় বারো মাসই বৃষ্টিপাত হয়। দেশের উত্তর অঞ্চলের পার্বত্যভূমি বনসম্পদে সমৃদ্ধ। সেগুন ও লাক্ষা প্রধান বৃক্ষ।

মধ্যভাগের সমভূমিতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চাল তারা রপ্তানিও করে। এ ছাড়া থাইল্যাণ্ডে তামাক (দ্র), রাবার (দ্র), তুলা (দ্র), ভুট্টা (দ্র) ও পাট (দ্র) জন্মে। খনিজ সম্পদের মধ্যে টিন, সীসা, উলফ্রাম, নীলকান্ত মণি ও পরাগ মণি উল্লেখযোগ্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সুতিবস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, ধাতব পদার্থ ও যন্ত্রপাতি প্রধান।

বাংলাদেশের (দ্র) মতো থাইল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থায় নদীপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরাঞ্চলের পার্বত্যভূমিতে অবস্থিত সেগুন কাঠের বিরাটাকারের গুঁড়িগুলো নদীপথে ভাসিয়ে রাজধানীশহর ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হয়। তা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্পানজাতীয় যন্ত্রচালিত নৌযান মেনাম-সাওব্রায়া নদীপথে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহন করে। আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থারূপে থাই ইণ্টারন্যাশনাল সুপরিচিত।

মেনাম নদীর মোহনায় অবস্থিত ব্যাংকক থাইল্যাণ্ডের রাজধানী এবং প্রধান শহর ও বন্দর। এই শহরে অনেক ছোট ছোট খাল আছে। এই জন্য ব্যাংকককে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হয়।

মু. এ.

**থার্মোমিটার** তাপমান যন্ত্র / থার্মোমিটার দ

**থার্মোস্ফিয়ার** ট্রপোস্ফিয়ার দ্র

## থিয়েটার

'থিয়েটার' শব্দের উৎপত্তি গ্রিক 'থিয়াস্থাই' (theasthai) শব্দ থেকে। এর অর্থ 'দেখা'। অন্যদিকে গ্রিক 'থিয়েত্রোন্' শব্দের অর্থ 'দেখার স্থান'। থিয়েটার বলতে কেবল এমন কোনো কাঠামোগত স্থানকে বোঝায় না, যেখানে দাঁড়িয়ে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা শুধু সংলাপ আউড়ে অভিনয় করে থাকেন। আসলে একটি নাটক মঞ্চায়নের অনুকূলে যা কিছু শৈল্পিক দিক বা কাঠামোগত সমর্থনের প্রয়োজন, তার সবই এর অন্তর্গত। যেমন— অভিনয়-কৌশল, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা, নির্দেশনা, দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চ-আলোক-উপকরণ, মঞ্চ-স্থাপত্যশৈলী ও অভিনীত নাটকের ঘটনা-সহায়ক আসবাবপত্র, প্রযুক্তিগত উপকরণ, নাটক ও নাট্যকার, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সৃষ্ট আবহসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত, দৈহিক অনুশীলনগত চর্চা, সর্বোপরি অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ।

উৎপত্তি : আদিম সমাজের সংস্কৃতি থেকেই থিয়েটারের উৎপত্তি। ঐ সমাজের সদস্যরা কোনো অলৌকিক শক্তি বা কল্পিত দেব-দেবীর আশীর্বাদ ও আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে অনুকরণমূলক অঙ্গভঙ্গি, বিশেষত নৃত্য প্রদর্শন করত। আদিম মানুষের ধারণা ছিল, এই অলৌকিক শক্তি বা তাদের কল্পিত দেব-দেবীই তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। যাজক বা



www.pathagar.com

পুরোহিতেরাই ছিলেন এসব অনুষ্ঠানের হোতা। তাঁদের নির্দেশেই পরিচালিত হত এই সব যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান। তাই যাজক বা পুরোহিতদেরকেই বলা হয়ে থাকে বিশ্বের প্রথম নাট্য-নির্দেশক বা পরিচালক। এ জাতীয় নৃত্যানুষ্ঠান বা অনুকরণমূলক মূক-অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীরা সাধারণত মুখোশ পরত। মুখোশগুলো তৈরি করা হত পশুর চামড়া দিয়ে। অভিনয় যখন চলত তখন বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজানোর রেওয়াজও চালু ছিল। থিয়েটারের ক্রমবিকাশে তাই আদিম সমাজের এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্ববহ। মিশরে এই ধরনের নাটক, বিশেষত দেবতা ওসিরিসকে উপলক্ষ করে, অভিনীত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকেও।

গ্রিক ও রোমান থিয়েটার : ইউরোপীয় থিয়েটারের সূচনা গ্রিকদের হাতে। দেবতা দিওনিসিয়ুসের সম্মানে তারা বার্ষিক অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। অভিনীত হত ট্র্যাজেডি (দ্র) ও কমেডি (দ্র) নাটক। কখনো প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেও এগুলো হত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত এরকম একটি প্রতিযোগিতায় থেস্‌পিস্‌ নিজের রচিত নাটকে অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। থেস্‌পিস্‌কে তাই বলা হয় বিশ্বের প্রথম নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি নাটকে মুখোশ প্রচলনেরও কৃতিত্বের অধিকারী। পরবর্তী কালে গ্রিক ও রোমান থিয়েটারে অভিনেতাদের মুখোশ পরার ব্যাপারটি একটি সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাথমিকভাবে গ্রিক ট্র্যাজেডি ও কমেডিতে অভিনেতাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হলেও কালক্রমে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ট্র্যাজেডিতে কমপক্ষে ১৫ ও কমেডিতে ২৫। এই সময়কার গ্রিক নাটকে মহিলারা অংশ নিতে পারতেন না।

গোড়ার দিকের গ্রিক নাটক্যকারেরা কেবল নাটকই লিখতেন না, তাঁরা একই সঙ্গে পরিচালক ও কোরিও-গ্রাফারের দায়িত্বও পালন করতেন, পরিচালনা করতেন সঙ্গীতও (গ্রিক নাটক মূলত সঙ্গীতবহুল ছিল)। সোফোক্লেস (দ্র) শুধু নাট্যকারই ছিলেন না, ছিলেন দৃশ্যসজ্জাকর। এবং এস্কুলোস্‌ (দ্র) করুণরসের নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জন্য উদ্ভাবন করেন পোশাক-পরিচ্ছদ। ধীরে ধীরে গ্রিক নাটকের অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে তাদের স্ব স্ব চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরার প্রচলন ঘটে।

এথেন্সের আদি গ্রিক থিয়েটার মঞ্চ ছিল একটা বৃহৎ বৃত্তাকার স্থান, যাকে বলা হত 'ওর্খেস্ত্রা' (নৃত্যানুষ্ঠানের জায়গা)। এখানে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হত দর্শকেরা তা উপভোগ করত আক্রোপলিসের দক্ষিণ পাশের ঢালের আসনগুলোতে বসে। নাটকের দৃশ্যপট বা সিন হিসাবে ব্যবহার করা হত সাধারণ জিনিসপত্র, যেমন—পাথরখণ্ড ও গম্বুজ বা খিলান ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চলে। এই সব মঞ্চগৃহ সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত।

আরো পরে গ্রিক থিয়েটার বা নাটকে চাকা-চালিত মেশিনপত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এইসব মেশিনের মধ্যে ক্রেনের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। ঈশ্বর বা কোনো দেবতার চরিত্রে অভিনয়কারী অভিনেতা ক্রেনের সাহায্যে ঊর্ধ্বমুখে উঠে গিয়ে একটা অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করত।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ একটি নাটকের প্রযোজনার সকল দিক আর কেবল নাট্যকারের নিয়ন্ত্রণে থাকল না। গ্রিক থিয়েটার পেশাধারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। থিয়েটার শিল্পের বিভিন্ন দিকের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল থিয়েটার সংক্রান্ত একেক জন বিশেষজ্ঞের ওপর। পরবর্তী দুই শতাব্দী থিয়েটার শিল্পের বিকাশ অব্যাহত গতিতে চলে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মাটি বা সমতলভূমি থেকে উঁচু অর্থাৎ বেদীসদৃশ মঞ্চের উদ্ভাবন ও প্রচলন, যাকে 'প্রসেনিয়াম' বলা হয়। রোমে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সাল পর্যন্ত কোনো স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না। তাদের নাটক মঞ্চস্থ হত জাঁকজমকপূর্ণ উঁচু মঞ্চে। অভিনীত এই সব নাটকে বাদ্যকারদের সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং তাদের মঞ্চগুলো ছিল অর্ধবৃত্তাকার। অবস্থিত ছিল পাহাড়ের পাদদেশে এবং ১৫ থেকে ৪০ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে মঞ্চস্থ নাটক উপভোগ করতে পারত।

রোমান থিয়েটারের প্রায় সব কিছুই গ্রিক থিয়েটার থেকে আহরণ করা হলেও, এ ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক



www.pathagar.com

অবদান একটা ছিল। তা হল শিল্পমাধ্যম হিসাবে প্যান্টোমাইমের বিকাশ সাধন ও এর প্রচলন। রোমের দাসেরা রোমান থিয়েটারের বিকাশে প্রভূত অবদান রাখে।

মধ্যযুগে থিয়েটার : মধ্যযুগে এসে থিয়েটার শিল্পের বিকাশ, বিশেষত রোমে গোঁড়া খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। থিয়েটারে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং নাটক মঞ্চায়নে যারা উদ্যোগী হবে, তাদের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে—গির্জার তরফ থেকে এই রকম ডিক্রি জারি করে থিয়েটারকে নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে সপ্তম খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পশ্চিম ও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য থেকে থিয়েটার শিল্প পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য এই গির্জাই আবার মধ্যযুগে থিয়েটারের পুনর্জন্ম ঘটায়। আর সেটা প্রধানত ঘটে ধর্ম-প্রচারের বাহন হিসাবে থিয়েটারকে ব্যবহার করার প্রয়োজন থেকে। গির্জার পাদ্রি ও পুরোহিতেরা এই সময় গঠন করেন ছোট ছোট থিয়েটার দল এবং বাইবেলের (দ্র) কাহিনীভিত্তিক নাটক রচনা করে তাঁরাই তাতে অভিনয় করতে থাকেন। তাঁদের এই সব নাটক মঞ্চস্থ হত শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে, কখনো শহরের বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চে, গির্জার বেদিমূলে কিংবা তার চত্বরে। ঠেলাগাড়ির ওপর মঞ্চ তৈরি করে তাতে নাটকের অভিনেতারা চেপে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েও নাটক মঞ্চস্থ করতেন। এই সময় নাটকে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে অলৌকিক আবহের অবতারণা করা হত। এর পাশাপাশি নাটকের ঘটনার অনুসরণে ব্যবহার করা হত নানা কৌশল, যেমন—অগ্নিকাণ্ড বোঝাতে আগুন ও ধোঁয়ার ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যা বোঝাতে পানি এবং হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য বোঝাতে রক্তের (দ্র) স্রোত ইত্যাদি দেখানো।

রেনেসাঁস যুগে থিয়েটার : থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই নবজীবন লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষ বা উদার মানবতাবাদী নাটক মঞ্চায়নের একটা জোয়ার আসে এই সময়। ১৫৭৬ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম আচ্ছাদিত নাটমঞ্চ প্যারিসের ওতেল্ দ্য বুর্গইঞন্ (Hotel de Bourgogne)। ১৫৪৮ সালে এই হোটেলের হলঘরটিকে নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত করে কঁফ্রেরি দ্য লা পাসিঅঁ (Confrérie de la Passion) কোম্পানি নাটক পরিবেশন করতে থাকে। ১৫৯৯ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত গ্লোব থিয়েটার ও ১৬০০ সালে ফর্চুন থিয়েটার। গ্লোব থিয়েটারেই শেক্সপীয়রের (দ্র) নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চের আলোকসজ্জায় এই সময় ব্যবহার করা হত মোমবাতি ও তেলের প্রদীপ। মঞ্চের সামনে পর্দা টাঙ্গানোর প্রচলন হয় এই আমলেই। ইউরোপের (দ্র) দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু স্থায়ী রঙ্গমঞ্চও।

রেনেসাঁস (দ্র) যুগের থিয়েটার-শিল্পের ধারা অনুসরণ করেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এসে এ ক্ষেত্রে ঘটতে থাকে একের পর এক বিপ্লব এবং সেটা ঘটে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল উদ্ভাবনের কল্যাণে। গ্যাস ও তেলের প্রদীপের আলোর জায়গা দখল করে বৈদ্যুতিক আলো। মঞ্চ বা থিয়েটারেও অচিরেই এর প্রয়োগ শুরু হয়। মঞ্চে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয় প্যারিসের এক অপেরায় ১৮৪৬ সালে। ফ্লাড ও স্পট লাইটও প্রথম ব্যবহার করা হয় ওই দেশেই, ১৮৬০ সালে।

প্রাচ্যের থিয়েটার : প্রাচ্য দেশীয় থিয়েটারের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। এখানেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকেই এর উৎপত্তি। নৃত্যনাট্যই ছিল প্রাচ্যদেশীয় থিয়েটারের আদিরূপ। মঞ্চস্থ নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রঙচঙে মুখোশ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হত অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাদি। চীনা থিয়েটারে ব্যবহার করা হত স্বল্পসংখ্যক আসবাবপত্র। মঞ্চে সাজানো এইসব আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র তুলে ধরত নাটকটির দৃশ্যগত ভাব ও ব্যঞ্জনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চীনে যে থিয়েটার-শিল্পের উদ্ভব ঘটে, তা 'পিকিং অপেরা' নামে খ্যাত।

জাপানের 'নো' নাটক, 'বুন্‌রাকু' এবং 'কাবুকি' থিয়েটার দেশটির লোকনাট্যের প্রাচীন ধারা বহন করে এখনো সজীব ও জীবন্ত। ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকাতে (দ্র) পর্যন্ত এই জাপানি নাট্যধারা বেশ জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, বিশ্ব-থিয়েটারে জাপানের বিশিষ্ট অবদান 'রিভল্‌ভিং স্টেজ' বা ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ। ওসাকার কাদোজা ডল থিয়েটারে ১৭৫৮ সালে এবং ১৭৯৩ সালে এ দেশেরই নাকামুরা জা থিয়েটারে এ ধরনের মঞ্চ প্রথম ব্যবহার করা হয়। ব্রিটেনে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার শুরু হয় এর এক শ' বছর পরে। ১৯০৪



www.pathagar.com

সালের ২৪শে ডিসেম্বর লণ্ডনের কলোসিয়াম থিয়েটার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রথম ব্যবহার করে।

প্রাচ্যে থিয়েটার-শিল্পের সব থেকে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতে (দ্র)। খ্রিস্টজন্মের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই উপমহাদেশের জনসমাজে সংস্কৃত নাটক অভিনীত হত মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও গৃহচত্বরে। অশ্বঘোষ (দ্র) কালিদাস (দ্র) ও ভবভূতি প্রমুখের নাটক থেকে উপমহাদেশীয় রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-আঙ্গিকের যে ছবি পাওয়া যায়, তা যে খুবই উন্নত মানের ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে (১৮৭২) কলিকাতা (দ্র) মহানগরীতে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের ভেতর দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক থিয়েটার শিল্পের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। কিন্তু তারও পূর্বে পশ্চিমী প্রসেনিয়াম থিয়েটার তৈরি করে এ দেশবাসীকে প্রথম দেখান এক রুশ সঙ্গীতশিল্পী গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্ (দ্র)।

যাঁদের চেষ্টায় আধুনিক বিশ্ব-থিয়েটার সমৃদ্ধ : আধুনিক বিশ্ব-থিয়েটার বর্তমানে তার বিকাশের যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার নেপথ্যে রয়েছে বহু প্রতিভাবান নাট্য-প্রয়োগকর্তা, তাত্ত্বিক, প্রকৌশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক-পরিচালক, নাট্যকার, স্থাপত্যশিল্পী, বিজ্ঞানী, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, কণ্ঠশিল্পী ও কোরিওগ্রাফারদের ধারাবাহিক অধ্যবসায়ী ও সৃজনশীল শ্রম এবং চেষ্টা। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যেসব দিকপাল নাট্য-ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত প্রয়াসে আজকের থিয়েটারের এই বিবর্তন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড বেলাস্কো, জার্মানির মাক্স রাইনহার্ড, ভাগ্নের্ ও অটো ব্রাম, সুইজারল্যাণ্ডের আডোল্ফ্ আপিয়া, ইংল্যাণ্ডের গর্ডন ক্রেগ, ফ্রান্সের জাক্ কপো ও লুই জুভে, জার্মানির বের্টোল্ট্ ব্রেশ্ট্ (দ্র) ও পিস্কাটোর, রাশিয়ার কন্স্তান্তিন্ স্তানিস্লাভ্স্কি, মায়ারহোল্ড, নেমিরোভিচ্-দানচেঙ্কো, তাইরফ্ ও ইভ্‌গিয়েনি ভাখ্‌তানগফ্ প্রমুখ।

এই উপমহাদেশে আধুনিক থিয়েটার শিল্পের বিকাশের যাঁরা অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গেরাসিম্ লিয়েবেদেফ্, শিশির কুমার ভাদুড়ী (দ্র), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (দ্র), সতু সেন, অহীন্দ্র চৌধুরী (দ্র), মধু বসু, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত (দ্র), তরুণ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস সেন ও পৃথ্বিরাজ কাপুর। পাশাপাশি, এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদানও কম নয়।

**আ. হু.**

## থেরবাদ

থেরবাদ (হীনযান) বলতে প্রবীণদের মতামতকে বোঝায়। 'থের' শব্দটি পালি। সংস্কৃত স্থবির অথবা স্থির থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। বৌদ্ধ সাহিত্য বা দর্শনে 'থের' বা 'স্থবির' একটি গুণবাচক শব্দ। স্থবির তিন প্রকার : জাতিস্থবির (অর্থাৎ যাঁরা বয়োবৃদ্ধ); ধর্মস্থবির (অর্থাৎ যাঁরা ধর্মজ্ঞানে উন্নত); সম্মতিস্থবির (অর্থাৎ যাঁরা ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লাভের দশ বছর পর স্থবির আখ্যা পান— যেমন মহাস্থবির, মহাথের)। সাধারণভাবে বুদ্ধের শিষ্যদের ক্ষেত্রেই থের বা স্থবির শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যিনি সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ইত্যাদি গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মনের মলিনতা দূর করেছেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকেই স্থবির বলা হয়।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের (দ্র) পর মগধের রাজধানী রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাসঙ্গীতিতে (মহাসম্মেলন) পাঁচ শত ভিক্ষুর অংশগ্রহণে বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগ্রহ করা হয় এবং তাকে ধর্মশাস্ত্রের রূপ দেওয়া হয়। এই ধর্মশাস্ত্রকে 'থের' আর প্রবীণ ভিক্ষুদের অংশগ্রহণে তা সংগৃহীত ও স্থিরীকৃত হয়েছিল বলে এটিকে থেরবাদ বা স্থবিরবাদ বলা হয়। স্থবিরবাদের অপর নাম আচার্যবাদ।

**সুজ. ব.**

## থ্যাঙ্কস্‌গিভিং ডে (Thanksgiving Day)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) জাতীয় ছুটির দিন। প্রতিবছর নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারে এই দিন পালিত হয়। ১৬২১ সালে আমেরিকায় প্লিমাউথ উপনিবেশকারীদের দ্বারা সর্বপ্রথম এই দিনটি পালিত হয়েছিল। সে বছর ম্যাসাচুসেট্‌সে তিন দিনের প্রচণ্ড শীত থেকে বেঁচে গিয়ে বছরের প্রথম শস্য ঘরে তোলার আনন্দে তারা এই দিনটি পালন করে। আমেরিকার



www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ১৭৮৯ সালের ২৬শে নভেম্বরকে সর্বপ্রথম জাতীয় থ্যাঙ্কস্‌গিভিং ডে হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (দ্র) ১৮৬৩ সালে নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারকে বাৎসরিক ছুটি হিসাবে নির্ধারণ করেন। প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট্ (দ্র) ১৯৩৯–৪১ সাল পর্যন্ত তিন বছর এই দিনটিকে উৎসব হিসাবে পালন করেন। মূলত এই দিনটির পর থেকে বড়দিনের কেনাকাটার সূত্রপাত ও বড়দিনের মরশুম চালু হয়। ১৯৪১ সালে আমেরিকা কংগ্রেসে এই দিনটি (নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার) উৎসব ও নিয়মিত ছুটি হিসাবে গণ্য হয়।

বি. ব.

**থ্রি মাস্কেটিয়ার্স** (The Three Musketeers)

ফরাসি ভাষায় লেখা 'লে ত্রোয়া মুস্কেত্যার্' (Les Trois Mousquetaires) নামে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রোমান্স্ কাহিনী বাংলাদেশে (দ্র) ইংরেজি অনুবাদ-শিরোনামেই পরিচিত। আলেক্সান্দ্র্ দ্যুমা (দ্র)-র লেখা এ বইটি ১৮৪৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষাতেও একাধিক অনুবাদ আছে। এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক রোমান্স্ পর্যায়ের রচনা। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র) এ ধরনের উপন্যাস লিখে গেছেন।

ফ্রান্সের সম্রাট ত্রয়োদশ লুই (Louis XIII : ১৬১০—৪৩)-এর রাজত্বকাল চলছে। তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসী রাজভক্ত তিন প্রজা রাজার শত্রু কার্ডিনাল রিচ্‌লুকে জব্দ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এদের সঙ্গে এসে হাত মেলায় আরেক সাহসী পুরুষ দার্তাইঞঁ (D' Artagnan)। মূলত এই শেষোক্ত ব্যক্তিই হল সমস্ত কিছুর পরিকল্পনাকারী এবং অন্য তিন জনের দলপতি। অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় ঘটনাবলির ভিতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে। উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই জনপ্রিয়তার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল কাহিনীনির্মাণ ও বর্ণনাকৌশল; আরো একটি বড় কারণ ছিল—এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক ছিল না, সত্যিকারের ঐতিহাসিক বিভিন্ন ব্যক্তির আদলে এদের তৈরি করা হয়েছিল।

হা. মা.

**থ্রেড্‌ওয়ার্ম** কৃমিরোগ দ্র

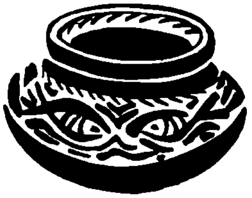

# দ

**দক্ষ মানব** হোমো হাবিলিস্ দ্র

**দক্ষযজ্ঞ**

প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এই যজ্ঞে শিবের স্ত্রী সতী পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনে মর্মপীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত না হওয়ায় শিব অনুপস্থিত ছিলেন। দূত মারফত স্ত্রীর অকালমৃত্যুসংবাদ শুনে অনুচরবর্গসহ শিব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ পণ্ড করে দেন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয়নাচ নাচেন।

মে. খা.

**দক্ষিণ আমেরিকা**

দক্ষিণ আমেরিকা একটি মহাদেশ (দ্র); উত্তর আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের নিম্নাংশের সঙ্গে যুক্ত ও দক্ষিণে অবস্থিত। মানচিত্রের (দ্র) দিকে তাকালেই মনে হয়, উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পা ধরে শূন্যে ঝুলে পড়েছে এই মহাদেশটি। শূন্যে বলার কারণ, আর কোনো দিকেই ভূভাগ নেই : পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর (দ্র), পূর্ব দিকে আটলান্টিক মহাসাগর (দ্র), আবার উত্তরের অনেকখানি ক্যারিবিয়ান সাগর। মহাদেশের আয়তনের হিসাবে এটি চতুর্থ স্থান দখল করে আছে।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে মোট ১২টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র : আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, গিয়ানা, সুরিনাম। এ ছাড়া রয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশ ফক্‌ল্যাণ্ড (Falkland) দ্বীপাবলি, এবং ফরাসিদের দখলে ফ্রেঞ্চ গিয়ানা (French Guiana)।

দক্ষিণ আমেরিকা সুপ্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি; বহু সংস্কৃতির মিশ্রণ এখানে ঘটেছে, বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ। এখানকার লোকজন প্রায় সকলেই স্পেনীয় ভাষায়



www.pathagar.com

কথা বলে। তা ছাড়া পর্তুগিজভাষী জনসংখ্যা রয়েছে ব্রাজিলে। এর বাইরে আদিবাসীও (দ্র) আছে অনেক, যারা নিজেদের গোত্রীয় ভাষায় কথা বলে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আমেরিকাকে লাতিন আমেরিকাও (দ্র) বলা হয়ে থাকে।

হা. মা.

## দক্ষিণা

ধর্মকর্মের পূর্ণতার জন্য পুরোহিতকে দেয় দ্রব্য বা অর্থ। দক্ষিণা না দিলে কর্মের কোনো ফল হয় না— এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে। তাই শ্রাদ্ধ, ব্রত, পূজা এবং দানসহ যাবতীয় ধর্মকর্মের সময় পুরোহিত, ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুকে দক্ষিণা দিতে হয়। সাধারণ কাজে সোনা এবং শ্রাদ্ধে রূপা দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম আছে। তবে এখন আর সরাসরি সোনা-রূপা দক্ষিণা দেওয়া হয় না, এর মূল্য বাবদ সামান্য অর্থ দিয়েই এই নিয়ম রক্ষা করা হয়। কোনো উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী, ভিক্ষু বা কাঙালি ভোজন করালেও ভোজনশেষে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে। বিয়েতে কন্যাদানের দক্ষিণা হিসাবে বরকে সোনার আংটি, চেনসহ বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হয়। আগের দিনে শিক্ষাশেষে গুরু বা গুরুপত্নীর ইচ্ছে অনুসারে শিষ্যকে অনেক দুর্লভ জিনিসও দিতে হত। এর নাম ছিল গুরুদক্ষিণা।

সুজ. ব.

## দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার [১৮৭৭—১৯৫৭]

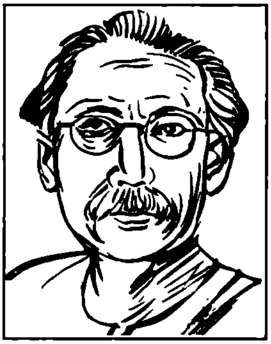

শিশুসাহিত্যিক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক। ১৮৭৭ সালে ঢাকার সাভারে উলাইলগ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা রমদারঞ্জন মিত্রমজুমদার ও মাতা কুসুমময়ী। পিতা ছিলেন কবি প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর ছিল এক সমৃদ্ধ গ্রন্থভাণ্ডার। এই সাহিত্যোপযোগী পারিবারিক পরিবেশ শৈশবে দক্ষিণারঞ্জনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। স্কুলের শিক্ষাশেষে ২১ বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু। ১৩১৫ সনে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এর পর 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রদীপ' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। পরে তিনি নিজেই 'সুধা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ছবিও আঁকতে পারতেন, কবিতাও লিখতেন।

মুর্শিদাবাদে পাঁচ বছর অবস্থানের পর পিতার জমিদারি পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন ময়মনসিংহে যান। সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে দশ বছরের অধিক কাল যাবৎ থেকে তিনি গ্রামবাংলার লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য সংগ্রহ ও তার ওপর গবেষণা করেন। এই দীর্ঘ গবেষণাকর্মের ভেতর দিয়ে তিনি প্রচলিত ছেলে-ভুলানো গল্পকে এর নিজস্ব রস অক্ষুণ্ন রেখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ অনুভব করতে থাকেন। দীনেশচন্দ্র সেনের (দ্র) পরামর্শে এই সব সংগৃহীত উপাদানকে পুনর্লিখনের মাধ্যমে 'রূপকথা', 'রসকথা', 'ব্রতকথা' ও 'গীতিকথা' এই চার ভাগে ভাগ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

অবশ্য তারও আগে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের (দ্র) আসরে দক্ষিণারঞ্জনের প্রবেশ ঘটে। ১৯০২ সালে যখন তাঁর বয়স পঁচিশ তখন 'উত্থান' নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : 'ঠাকুরমার ঝুলি' (দ্র), 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯১০), 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩), 'ঠানদিদির থলে', 'খোকাবাবুর খেলা', 'আমাল বই', 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে', 'পৃথিবীর রূপকথা', 'সবুজ লেখা', 'চারু ও হারু' (১৯১২) ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে প্রথম বই চারটি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এগুলোতে লেখকের আঁকা অনেক ছবি রয়েছে। এক সময় এই বইগুলোই ছিল বাংলার শিশু-কিশোরদের প্রাণের সম্পদ। এগুলোর আদর্শেই পরবর্তী কালের অনেক লেখক শিশুসাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের সাহিত্যকর্ম থেকেই বাংলা



www.pathagar.com

শিশুসাহিত্যে রূপকথাধর্মী একটি ধারার সূচনা হয়।

দক্ষিণারঞ্জন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। পরিষদের মুখপত্র 'পথ' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। ১৯৫৭ সালে প্রায় আশি বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় পরলোকগত হন।

সুজ. ব.

## দণ্ডী

অলঙ্কারশাস্ত্র 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বাল্মীকি (দ্র) ও ব্যাসের (দ্র) পর তৃতীয় প্রধান কবি হিসাবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়। 'দশকুমারচরিতম্'-এর রচয়িতা এক দণ্ডীর কথা জানা গেলেও 'কাব্যাদর্শের' রচনাকার দণ্ডী সেই ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে বির্তক রয়েছে।

মে. খা.

## দন্ত

মুখবিবরে উপর ও নিচের চোয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা অস্থিজাতীয় অঙ্গগুলোর নাম দন্ত বা দাঁত। প্রধানত খাদ্যদ্রব্য চিবানোর জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়।

দাঁতের মোট তিনটি অংশ : মুকুট (crown), মূল (root) ও গ্রীবা (neck)। মাঢ়ীর মধ্যে হাড়ের অভ্যন্তরে দাঁতের মূল অবিস্থত। দাঁতের উপরের অংশকে বলা হয় মুকুট।

দাঁতের কঠিন অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে এনামেল (enamel), সিমেণ্টাম (cementum) এবং ডেণ্টিন (dentin)। দাঁতের মুকুটে সবচেয়ে বাইরের আবরণের নাম এনামেল। এনামেলের জন্যই দাঁত সাদা ও উজ্জ্বল দেখায়।

দাঁতের নরম অংশগুলো হচ্ছে—পাল্প (pulp) বা মজ্জা, পেরিওডণ্টাল ঝিল্লি (periodontal membrane) এবং মাঢ়ী (gingiva বা gum) । রক্তবাহী কৌশিক নালি (capillaries), লসিকা নালি (lymph vessels), স্নায়ু (nerve) এবং যোজককলা (connective tissue) দিয়ে দাঁতের পাল্প গঠিত ।

স্থিতিকাল অনুসারে দাঁত দুই প্রকারের—অস্থায়ী বা দুধ-দাঁত (Milk teeth) এবং স্থায়ী দাঁত (Permanent teeth)। মানবশিশুর অস্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে ছ' থেকে সাত মাস বয়সে। দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে শিশুর অস্থায়ী দাঁত ওঠা শেষ হয়। ছ' থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে অস্থায়ী দাঁত পড়ে স্থায়ী দাঁত উঠতে থাকে। প্রায় পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে মানুষের স্থায়ী দাঁত ওঠা শেষ হয়ে যায়। মানুষের অস্থায়ী দাঁত বিশটি, স্থায়ী দাঁত বত্রিশটি।

সি. না. হ.

## দন্তরোগ

দাঁতের রোগ বিভিন্ন প্রকারের। দন্তরোগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দন্তক্ষয় (dental caries), মাঢ়ীপ্রদাহ (gingivitis) এবং পায়োরিয়া (pyorrhoea)। এ ছাড়াও দন্তরোগের মধ্যে রয়েছে দাঁতের অতি সংবেদনশীলতা (hypersensitivity), দাঁতের অসামঞ্জস্য (malocclusion), দাঁতের ভঙ্গুরতা (brittleness), দাঁতের বর্ণহীনতা (discolouration) ইত্যাদি।

দন্তক্ষয় : এ রোগের শুরুতে দাঁতে কালো রঙের ছোট গর্ত দেখা দেয়। এ গর্ত দাঁতের বাইরের আবরণ 'এনামেল' ক্ষয় করে ফেলে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করালে গর্ত বড় হতে থাকে এবং দাঁতের 'ডেণ্টিন' স্তরে বিস্তার লাভ করে। ফলে দাঁতে শিরশির করে ব্যথা শুরু হয়। দাঁতের গর্ত আরো বড় হলে দাঁতের ভেতরের মজ্জা (pulp) আক্রান্ত হয় এবং দাঁতে তীব্র ব্যথা শুরু হয়।

দন্তক্ষয় রোগকে প্রচলিত অর্থে কেউ কেউ 'দাঁতে পোকা লাগা' বলে থাকেন। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। দন্তক্ষয় রোগের জন্য দায়ী এক ধরনের জীবাণু (দ্র)। খাওয়ার পর দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার না করা হলে দাঁতের ফাঁকে ও মাঢ়ীর আশপাশে খাবার আটকে থাকে। ধীরে ধীরে ঐ খাবারে মুখবিবরে অবস্থিত জীবাণুর আবাস গড়ে ওঠে। জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত অ্যাসিডের প্রভাবে দন্তক্ষয় দেখা দেয়। দন্তক্ষয় রোগের প্রাথমিক অবস্থায় দাঁতে সৃষ্ট গর্ত ভরাট (ফিলিং) করিয়ে নেওয়া হলে সহজেই এ রোগের উপশম সম্ভব।

মাঢ়ীপ্রদাহ : এ রোগের ফলে দাঁতের মাঢ়ী ফুলে যায় এবং মাঢ়ী থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। খাওয়ার পর



www.pathagar.com

ভালভাবে দাঁত পরিষ্কার করা না হলে খাবারের কণা মুখের থুথু ও জীবাণুর সঙ্গে মিশে দাঁত ও মাঢ়ীর সংযোগস্থলে জমা হয় এবং ধীরে ধীরে শক্ত পাথরে পরিণত হয়। এতে মাঢ়ীর প্রদাহ দেখা দেয়। জীবাণু সংক্রমণই মাঢ়ীপ্রদাহের মূল কারণ।

পায়োরিয়া : যথাসময়ে মাঢ়ীপ্রদাহ রোগের চিকিৎসা না করানো হলে দাঁতের মূলের সঙ্গে যুক্ত পেরিওডন্টাল ঝিল্লিতে জীবাণুসংক্রমণজনিত প্রদাহ শুরু হয়। অবশেষে ঝিল্লি নষ্ট হয়ে দাঁতের মাঢ়ী থেকে পুঁজ বেরোতে থাকে। এ অবস্থাকে 'পায়োরিয়া' বলে।

সঠিক সময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে মাঢ়ীপ্রদাহ ও পায়োরিয়া রোগ নিরাময় সম্ভব।

সি. না. হ.

**দমকল** (fire-engine)

আগুন নেভানোর জন্য হস্ত ও অশ্বচালিত পানি ছিটানোর যান, খ্রিস্টজন্মের শ'দেড়েক বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়ায় (দ্র) চালু ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ ঘোড়াটানা এবং হস্ত পাম্পের এই গাড়িগুলোই ছিল দমকলকর্মীদের হাতিয়ার। ১৬৬৬ সালে লণ্ডন (দ্র) শহরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় এগুলোর সীমাবদ্ধতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। শিল্পবিপ্লবের পর দমকলকর্মীদের জন্য স্টিমচালিত দমকলের চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

১৮২৯ সালে লণ্ডনে জর্জ ব্রেইটওয়েট (George Braithwaite) প্রথম স্টিমের দমকল উদ্ভাবন করেন। এটির ক্ষমতা ছিল ১০ অশ্বশক্তি এবং এটি ২৭ মিটার উর্ধ্বে পানি ছিটাতে পারত। প্রথম দিককার এসব গাড়িতে ইঞ্জিন থাকত দুটো। একটি গাড়ি চালনার জন্য, অপরটি পাম্পকে সচল রাখার জন্য। এই শতকের শুরুতে একটি মাত্র ইঞ্জিন দ্বারাই দু'টি কাজ সমাধা করা সম্ভব হয়। বর্তমানে দমকলগুলোতে থাকে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প। গাড়ি অবশ্য আর স্টিম ইঞ্জিনে চলে না। সেই জায়গা দখল করেছে অন্তর্দহন ইঞ্জিন। আলেকজান্দ্রিয়ার দমকলে একটি কাঠের বড় পাত্রে পানি থাকত। তবে এখনকার জলাধার অনেক বড়

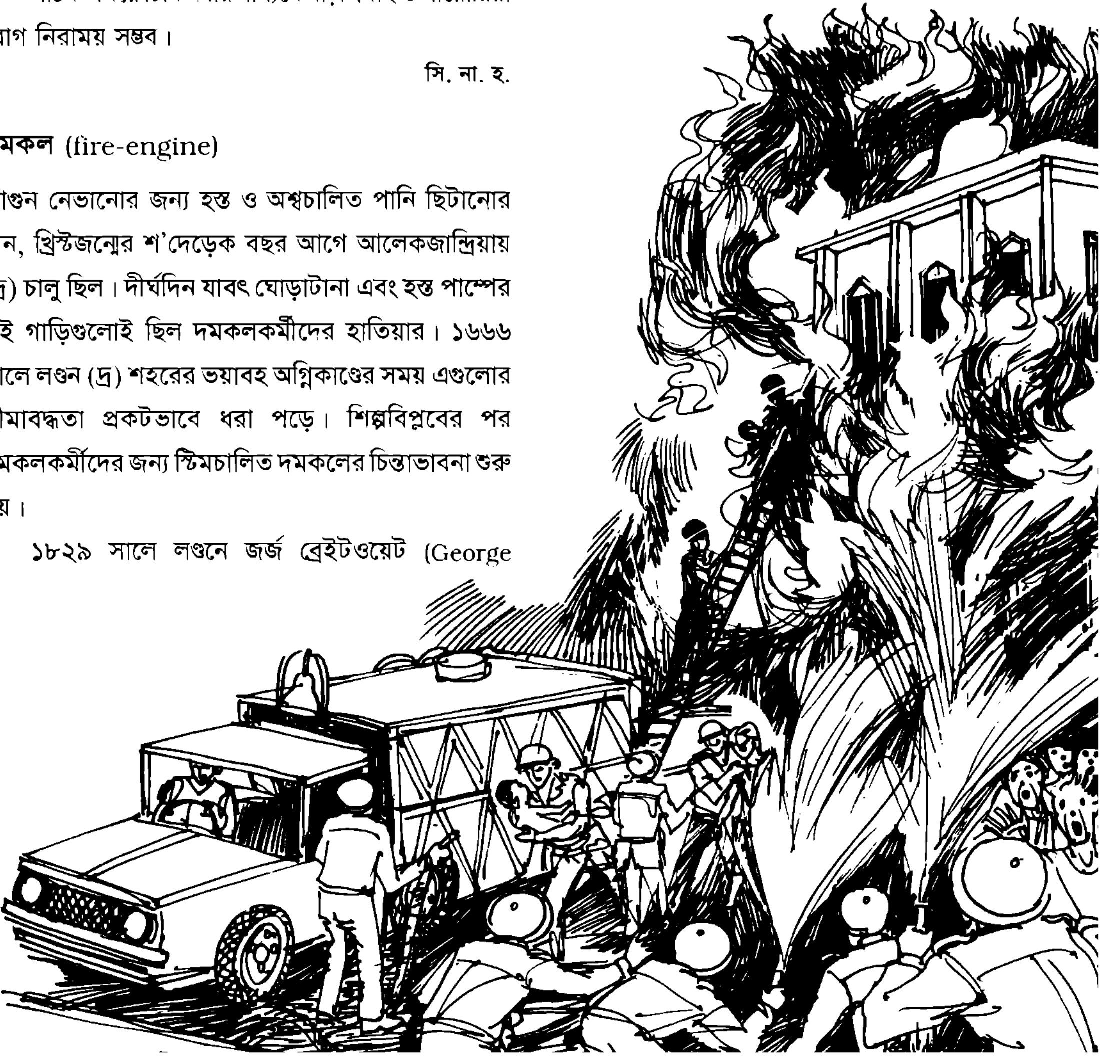

www.pathagar.com

এবং এগুলো ধাতুর তৈরি।

প্রথম দিকে উঁচু ইমারত থেকে আগুনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার জন্য সিঁড়ি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, সিঁড়ি দমকলকর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ১৮৩২ সালে সহজে বহনযোগ্য এবং জোড়া দিয়ে বড় করা যায় এমন সিঁড়ির উদ্ভব হয়। আধুনিক দমকলে কর্মীদের থাকে তিন খণ্ডবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি, যা ভাঁজ করে গাড়ির ছাদে রাখা হয়। এ ছাড়া থাকে এলিভেটিং প্ল্যাটফর্ম।

দমকল থেকে পানি ছিটানোর জন্য যে হোসপাইপগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলো সাধারণত মোটা কাপড়ের তৈরি বলে সহজে বহন করা যায়।

দমকলের অনেক আগেই দমকলবাহিনীর উদ্ভব। আগুন লাগাসহ যে কোনো দুর্যোগে দুর্যোগপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সালে চীনদেশে প্রথম প্রশিক্ষিত দমকলবাহিনী গড়ে তোলা হয়। মিশরে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আধুনিক দমকলবাহিনীর (fire-brigade) উদ্ভব হয় ব্রিটেনে, ১৬৮০ সালে। ফিনিক্স (Phoenix) নামের একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানি এই বাহিনী গড়ে তোলে। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ইন্সুরেন্স কোম্পানিও তাতে যোগ দেয়। ১৮৩৩ সালে সরকারি উদ্যোগে সব ক'টি কোম্পানি মিলে লণ্ডন ফায়ার বিগ্রেড গড়ে তোলে।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ নগরেই সুসজ্জিত দমকলবাহিনী রয়েছে।

মু. হা.

## দশকর্ম

দশ রকম সংস্কার। মূল অর্থ শিশু (দ্র) ও তরুণের মঙ্গলের জন্য দশ রকম শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। আবার অন্য অর্থে বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানও বোঝায়। এই অর্থে যে কোনো ধর্মানুষ্ঠান দশকর্মের অন্তর্গত। বেদে মূল দশ রকম সংস্কারের নাম : গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ।

বি. ব.

## দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি

সংখ্যাকে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য দশটি চিহ্ন, প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। দশটি চিহ্ন বা প্রতীক বা অঙ্ক ব্যবহৃত হয় বলে এই পদ্ধতিকে দশভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে। গণনার কাজে সুবিধার জন্য মানুষ অতীত কাল থেকেই দুই হাতের দশটি আঙুল ব্যবহার করত। হাতের দশটি আঙুল দিয়ে সংখ্যা বোঝাবার ধারণা থেকে সম্ভবত শুরু হয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনার জন্য একটি স্থান দরকার হয়। কিন্তু দশ (১০) লিখতে দু'টি অঙ্ক বা প্রতীক ১ ও ০ দরকার হয়। এর জন্য দু'টি স্থানের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ০ এককের ঘরের অঙ্ক এবং ১ দশকের ঘরের অঙ্ক। ৯৯-এর পরে কোনো সংখ্যাকে লেখার জন্য তিনটি অঙ্ক বা প্রতীক লাগে এবং দরকার হয় ৩টি স্থানের। যেমন—১০০ লেখার জন্য ৩টি সংখ্যা ১, ০, ০ দরকার। এখানে ১ শতকের ঘরের সংখ্যা এবং দু'টি শূন্য (০) যথাক্রমে দশক ও এককের ঘরের সংখ্যা। কোনো সংখ্যা একক, দশক বা শতক যে ঘরে থাকে সে ঘর অনুসারে তার মান নির্ধারিত হয়। যেমন—১২৫ (এক শ' পঁচিশ), ২১৫ (দু' শ' পনেরো), ৫২১ (পাঁচ শ' একুশ), ৫১২ (পাঁচ শ' বারো), ১৫২ (এক শ' বাহান্ন), ২৫১ ( দু' শ' একান্ন) ইত্যাদি সংখ্যাগুলো তিনটি সংখ্যা ১, ২, ও ৫ দ্বারা লেখা হলেও বিভিন্ন সংখ্যার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের কারণে এদের মান পৃথক। এই পদ্ধতিতে একক থেকে দশকের ঘরে এবং দশক থেকে শতকের ঘরে যেতে হলে ১০ দিয়ে গুণ করতে হয়। ১০-এর ঘাত শূন্য হলে অর্থাৎ $১০^{০}$-এর মান ১ ধরা হয়। কাজেই দশমিক পদ্ধতিতে ১০-এর ঘাত শূন্য ($১০^{০}$) হলে একক, ১০-এর ঘাত ১ হলে ($১০^{১}$) দশক, ২ হলে ($১০^{২}$) শতক, ৩ হলে ($১০^{৩}$) হাজার বা সহস্র হয়।

গাণিতিকভাবে,

$১০^{০}$ = ১ একক

$১০^{১}$ = ১০ বা দশক

$১০^{২}$ = ১০ x ১০ = ১০০ বা শতক



www.pathagar.com

$১০^৩ = ১০ x ১০ x ১০ = ১০০০$ বা সহস্র

এবং এভাবে চলতে থাকে।

৫২৫কে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে লিখলে হয়—

| | | | |
|---|---|---|---|
| $৫ x ১০^০$ | $= ৫ x ১$ | = | ৫ |
| $২ x ১০^১$ | $= ২ x ১০$ | = | ২০ |
| $৫ x ১০^২$ | $= ৫ x ১০ x ১০$ | = | ৫০০ |
| | মোট | = | ৫২৫ |

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি অঙ্ক বা প্রতীক দু'টি উৎপাদকের গুণফল। একটি উৎপাদক অঙ্কটির নিজস্ব মান এবং অপরটি এর স্থানীয় বা অবস্থান মান।

হো. আ.

**দশশীল** শীল দ্র

**দস্তইয়েফ্স্কি, ফিওদর্ মিখাইলভিচ্** [১৮২১—১৮৮১]

বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক। জন্ম ১৮২১ সালের ৩০শে অক্টোবর, মস্কোর (দ্র) মেরিন্স্কি হাসপাতালে। মাতা-পিতার দ্বিতীয় সন্তান। পুরো নাম ফিওদর্ মিখাইলভিচ্ দস্তইয়েফ্স্কি। অর্থাৎ দস্তইয়েফ্স্কি বংশে মিখাইল্-এর সন্তান ফিওদর্। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন মূর্ছা রোগে আক্রান্ত।

ফিওদরের বয়স যখন দশ, তখন তাঁর সমর বিভাগের চিকিৎসক পিতা তুলা প্রদেশের দারোভ্‌ই নামের ছোট্ট একটি জমিদারি তালুক কিনে নেন। পরে তিনি এই তালুকেরই এক জন আততায়ীর হাতে নিহত হন।

তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা শেষে ভর্তি হন পিটার্সবুর্গের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে। ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মী হিসাবে চাকুরিতে যোগ দেন। কিন্তু অচিরেই সমর বিভাগের ভবিষ্যৎ লোভনীয় পেশার মোহ ত্যাগ করে ব্রতী হন সাহিত্য রচনায়। প্রকাশ করেন জীবনের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'বেদ্নিয়ে লিউদি' (অভাজন) নামের উপন্যাস (১৮৪৫)। রুশ দেশের তখনকার দিক্পাল সমালোচক বেলিন্স্কির (১৮১১-৪৮) প্রভূত প্রশংসা লাভ করে উপন্যাসটি। ১৮৪৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা প্রকশিত হলেও সেগুলো সমালোচকদের তেমন প্রশংসা লাভ করে নি।

১৮৪৯ সালের ২৩শে এপ্রিল জারবিরোধী একটি

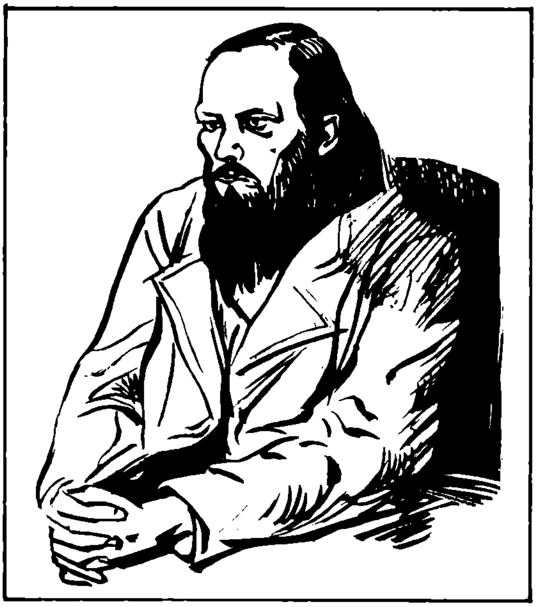

*দস্তইয়েফ্স্কি*

গুপ্তচক্রের সদস্য হওয়ার অপরাধে দস্তইয়েফ্স্কি সদলে গ্রেফতার হন। একই বছরের ২৯শে এপ্রিল থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত তাঁদের বিচার চলার পর দস্তইয়েফ্স্কিসহ প্রধান অভিযুক্তদের সকলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২২শে ডিসেম্বর (১৮৪৯) তাঁর মৃতুদণ্ডাজ্ঞা পড়ে শোনানো হয়। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর শেষ মুহূর্তে তাঁদের এই চরম দণ্ডাদেশ মওকুফ করে দেন জার (রুশ সম্রাট)। ২৪শে ডিসেম্বর (১৮৪৯) রাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফিওদর্‌কে নির্বাসনদণ্ড দিয়ে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়।

১৮৫০ সালের ২৩শে জানুয়ারি থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ওম্স্ক্ কারাগারে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন তিনি। এই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে কারাগার থেকে মুক্ত হলেও তাঁকে যোগ দিতে হয় সেনাবাহিনীর বাধ্যতামূলক চাকুরিতে। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এই চাকুরিজীবনে তিনি শেষ পর্যন্ত অফিসার পদে উন্নীত হন। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিওদর্ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর (১৮৬৪) পর দ্বিতীয় বার তিনি দারপরিগ্রহ করেন ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে তিনি সামরিক বাহিনীর চাকুরি থেকে অবসর লাভ করে সাহিত্য



www.pathagar.com

রচনার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

জীবনে নানা নেশা ছিল তাঁর। এসবের মধ্যে মুখ্য নেশা হয়ে দাঁড়ায় জুয়ো খেলা। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর আর্থিক অনটন তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়। ধার-দেনার হাত থেকে মুক্তি পেতে আকস্মিক আশাতীত অর্থ লাভের আশা ও তাড়না থেকেই এই অভ্যাসের জন্ম। জুয়োর দানের অর্থ জোগাড় করার তাগিদ থেকেই তাঁর বেশ কিছু প্রধান সাহিত্যকর্ম রচিত। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'জুয়াড়ি' উপন্যাসটি তিনি শেষ করেছিলেন মাত্র ২৬দিন সময়ের ভেতরে।

দীর্ঘ ৩৬ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি অনেক কিছু সৃষ্টি করেন, যার অধিকাংশই বিশ্বসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আবেদনে সেগুলো সর্বজনীন। তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে মূলত উপন্যাস 'অভাজন' (১৮৪৫), 'খুড়োর স্বপ্ন' (১৮৫৯), 'মৃত্যুপুরী' (১৮৬১), 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' (১৮৬৪), 'অপরাধ ও শাস্তি' (১৮৬৬), 'ইডিয়ট' (১৮৬৮), 'শয়তান' (১৮৭১) এবং 'কারামাজফ্ ভাইরা' (১৮৮০) ইত্যাদি।

মানুষের দুঃখ বেদনার ও সুগভীর মর্মযন্ত্রণার রূপকার হিসাবে ফিওদর্ দস্তইয়েফ্স্কি মহান ও অনন্য। ১৮৮১ সালের ২৮শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

## দস্তা

দস্তা একটি মৌলিক ধাতু। দস্তাকে ইংরেজিতে জিঙ্ক (Zinc) বলা হয়। এর পারমাণবিক ওজন ৬৫.৩৮, পারমাণবিক সংখ্যা ৩০, সাঙ্কেতিক চিহ্ন Zn, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭, গলনাঙ্ক ৪২০° সে.। বিশুদ্ধ দস্তা প্রধানত নিষ্কাশিত হয় ধাতুটির কার্বনেট খনিজ 'ক্যালামাইন' ($ZnCO_3$) ও সালফাইড খনিজ জিঙ্ক ব্লেণ্ড (ZnS) থেকে। দস্তার এ সমস্ত খনিজ বিভিন্ন দেশে বিশেষত অস্ট্রেলিয়া (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), কানাডা প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নিষ্কাশনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে অবিশুদ্ধ দস্তা প্রথমত পাওয়া যায় তাকে বলে 'স্পেল্টার' (spelter)। লোহার জিনিসের ওপরে দস্তার প্রলেপ ধরাতে (গ্যালভ্যানাইজিং) ও সাধারণ শিল্পক্ষেত্রে এই অবিশুদ্ধ দস্তা বা স্পেল্টারই ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ দস্তা একটি নীলাভ সাদা ধাতু, যথেষ্ট কঠিন পদার্থ। কঠিন হলেও ধাতুটির গলনাঙ্ক কম, ৪২০° সে. মাত্র। কাজেই একে সহজে গলিয়ে তার মধ্যে লোহার জিনিস ডুবিয়ে লোহাকে 'গ্যাল্ভ্যানাইজ' (দ্র) করা সম্ভব হয়। বস্তুত গ্যাল্ভ্যানাইজিংয়ের কাজেই দস্তার বিশেষ ব্যবহার। তা ছাড়া পিতলের (দস্তা ও তামার ধাতু-সঙ্কর) উৎপাদন শিল্পেও দস্তা প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। তড়িৎ উৎপাদক বিভিন্ন সেল ও ব্যাটারি (দ্র) তৈরি করতেও দস্তার চাহিদা প্রচুর। দস্তার অক্সাইড যৌগিক (জিঙ্ক-অক্সাইড) সাদা চূর্ণের আকারে নানা রকম মলম তৈরি করতে এবং তিসির তেলে মিশিয়ে সাদা রঙ হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে বলে জিঙ্ক হোয়াইট। আবার জিঙ্ক-সালফাইড ও বেরিয়াম সালফেট এক সঙ্গে মিশিয়ে যে তেলরঙ তৈরি করা হয়, তার ব্যবসায়িক নাম লিথোপোন। বিশেষ বিশেষ ঢালাইশিল্পে অতি বিশুদ্ধ দস্তার প্রযোজন হয়, যার শতকরা বিশুদ্ধতা ৯৯.৯৯ হতে হয়। এরূপ অতি বিশুদ্ধ দস্তাকে ধাতুবিদ্যার চলতি কথায় বলে 'চতুর্নয়' (Four nines) দস্তা।

আ. হ. খ.

## দা ভিঞ্চি, লেওনার্দো [১৪৫২—১৫১৯]

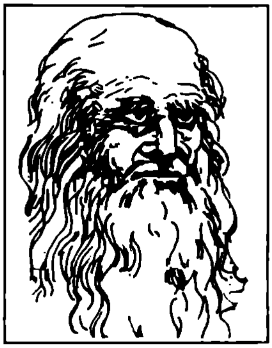

ইতালীয় রেনেসাঁসের কালজয়ী চিত্রশিল্পী। অবশ্য তাঁর অন্যান্য পরিচয়ও সুবিদিত—ভাস্কর, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ, সমরযন্ত্রশিল্পী এবং বিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্য জনক।

লেওনার্দো দা ভিঞ্চির (Leonardo da Vinci) জন্ম ফ্লোরেন্সের অদূরবর্তী ভিঞ্চি নগরের এক গ্রামে, ১৪৫২ সালের ২৫শে এপ্রিল। তাঁর শৈল্পিক মেধার বিকাশ ঘটে খুব অল্প বয়সেই। আনুমানিক ১৪৬৯ সালে রেনেসাঁসের (দ্র) অপর বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর আন্দ্রেয়া ভেরেক্কিয়োর কাছে ছবি আঁকায় ভিঞ্চির শিক্ষানবিস জীবনের সূচনা। এই শিক্ষাগুরুর অধীনেই তিনি ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৪৭২ সালে তিনি চিত্রশিল্পীদের গিল্ডে ভর্তি



www.pathagar.com

*লেওনার্দো দা ভিঞ্চি শারীরবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, এরোপ্লেন, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য ড্রইং করেছেন। ড্রইংয়ের পাশে পাশে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেও গিয়েছেন*

*দা ভিঞ্চির আঁকা সেন্ট অ্যান ও শিশুসহ মাদোনা*

হন এবং এই সময় থেকেই তাঁর চিত্রকর জীবনের সূচনা হয়।

১৪৭৮ সাল থেকে ১৫১৬-১৭ এবং ১৫১৯ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রসারিত ও বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত এক দীর্ঘ ও অক্লান্ত কর্মসাধনার জীবন তাঁর। গির্জা (দ্র) ও রাজপ্রাসাদের দেয়ালে চিত্রাঙ্কন এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য নির্মাণের পাশাপাশি বেসামরিক ও সামরিক প্রকৌশলী হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রয়োগ, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (anatomy), জীববিদ্যা, গণিত (দ্র) ও পদার্থবিদ্যার (দ্র) মতো বিচিত্র সব বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন এবং মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। পরবর্তী কালে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে তাঁর হাতে-কলমে অর্জিত জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ সুগম হয়।

তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলান শহরে এক গির্জার দেয়ালে অঙ্কিত শিষ্যপরিবেষ্টিত যিশুখ্রিষ্টের (দ্র) অন্তিম ভোজনের দৃশ্য 'শেষ ভোজ'। 'মোনালিসা' চিত্রকর্মও তাঁর প্রতিভার আরেক বিস্ময়কর নির্দশন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের অন্যতম হচ্ছে 'ম্যাজাই প্রশস্তি', 'পর্বতপরিবৃতা মাতৃমূর্তি', 'ব্যাপটিস্ট সন্ত জন' এবং অসমাপ্ত কর্ম 'সন্ত জেরোম' ইত্যাদি।

দা ভিঞ্চির আরেক কীর্তি তাঁর নোটবুক বা দিনলিপি। তাঁর জীবন ও কর্মের নানা খুঁটিনাটি লেখা আছে এসব নোট বইয়ে। খণ্ড খণ্ড এই নোটবুকের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় এক লক্ষের



www.pathagar.com

মতো। কালি-কলম, খড়িমাটি ও কাঠকয়লার সাহায্যে অঙ্কিত তাঁর বহু ছবি ও নকশা এবং উল্লিখিত নোটবুকের অনেকগুলো খণ্ডই সংরক্ষিত আছে লণ্ডনের উইণ্ডসর্ ক্যাস্‌ল্, ব্রিটিশ মিউজিয়াম (দ্র),ফ্রান্সের লুভ্‌র্ (দ্র) মিউজিয়াম এবং ইতালির ভেনিস একাডেমীতে।

১৫১৬-১৭ সালে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের আহ্বানে দা ভিঞ্চি তাঁর স্থাপত্য বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে. চিরকালের জন্য ইতালি ত্যাগ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন ১৫১৯ সালের ২রা মে।ফ্রান্সের অঁবোয়াজের নিকটবর্তী ক্লু(Cloux) -র রাজকীয় সমাধিস্থলে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আ. হু.

## দাউদ (আ.)

বাইবেলে (দ্র), বর্ণিত 'ডেভিড'ই কুরআন শরীফে (দ্র) বর্ণিত হযরত দাউদ (আ.)। তিনি ছিলেন ইসরায়েলি সম্প্রদায়ের বাদশাহ ও ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত রসূল (দ্র)। তাঁর নিকট ঐশী গ্রন্থ 'যবুর' অবতীর্ণ হয়।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, আল্লাহ্‌র (দ্র) একত্ববাদের প্রচারক। জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতার জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পুত্র সুলাইমান (আ.)(দ্র)-এর মতো হযরত দাউদও (আ.) অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রাজ্য শাসন এবং সত্য প্রচার—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান দক্ষ ও নিষ্ঠাবান। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে হযরত দাউদ (আ.) লোহার তৈরি বর্মের প্রচলন করেছিলেন। তিনি জেরুজালেমে (দ্র) এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন, যা ছিল সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ স্থাপত্য নিদর্শন।

মু. মা.

## দাক্ষিণাত্য (Deccan)

ভারত (দ্র) ভূখণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারিত একটি পর্বতমালা আছে, প্রায় সাত শ' মাইল লম্বা এবং ২ হাজার ফুটের বেশি উঁচু। বিন্ধ্য পর্বত নামে পরিচিত এই পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে যেন স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরের দিকে উত্তর-ভারতের সমভূমিকে বলা হয় 'উত্তরাপথ', আর দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্য পর্বতসহ কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে বলা হয় 'দক্ষিণাপথ' বা 'দাক্ষিণাত্য'।

হা. মা.

## দাজ্জাল

দাজ্জাল বলতে বোঝায় ভুয়া বা মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল পৌরাণিক কাহিনীর একটি চরিত্র। কেউ কেউ তাকে ইহুদিদের কোনো রাজার পুত্র বলে উল্লেখ করেন, কেউ তাকে দৈত্য হিসাবে এবং কেউ বা রূপকথার গণক 'শিক্'-এর বংশধররূপে বর্ণনা করেন। ইসলামী সাহিত্যে এক শ্রেণীর ধর্মীয় প্রতারককে 'দাজ্জাল' বলে অভিহিত করা হয়। হাদিসে (দ্র) উল্লেখ আছে যে কিয়ামতের (দ্র) পূর্বে এই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। ভাষ্যকারগণ বিভিন্নভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন।

দাজ্জাল সম্পর্কে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস এই যে সে ভুয়া মসীহ্‌রূপে আবির্ভূত হবে। সে বহু অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করবে এবং মক্কা ও মদিনা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস করবে। ফিরিশতারা মক্কা (দ্র) ও মদিনা (দ্র) রক্ষা করবেন। দাজ্জালের রাজত্বের শেষ দিকে হযরত ঈসা (আ.) (দ্র) পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

মো. ই.

## দাড়িয়াবান্ধা

বাংলাদেশের (দ্র) গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে দাড়িয়াবান্ধা একটি চমৎকার খেলা। এ দেশের সর্বত্র স্থানীয় নিয়মকানুন অনুযায়ী এ খেলা হয়ে থাকে। জাতীয় রিক্রিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের জন্য এ খেলার গ্রহণযোগ্য আইন-কানুন প্রণয়ন করেছেন। এ খেলার মাঠটি ৫০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট প্রস্থে, মাঝখানে সমান্তরাল ৫০ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া একটি লাইন থাকবে। ১ ফুট অন্তর আড়াআড়ি ৪টি লাইনে সমগ্র কোর্টটি ১০/১০টি খোপে ভাগ করা থাকবে। আড়াআড়ি ৬ টি লাইন ১ ফুট চওড়া হবে। প্রত্যেক দলে ৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে। টস্ করে আক্রমণকারী ও প্রতিরক্ষাকারী স্থির হয়। ২৫ মিনিট খেলা,



www.pathagar.com

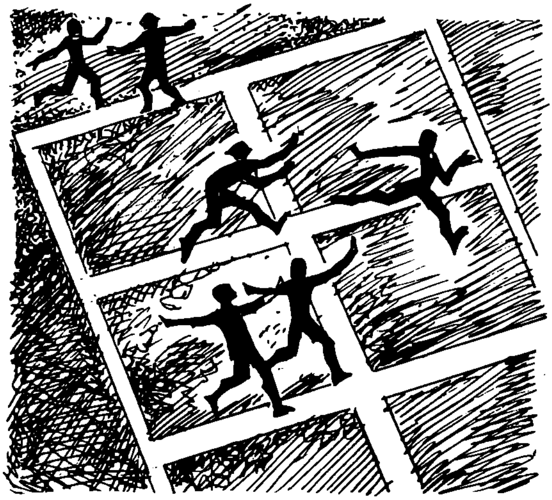

*দাড়িয়াবান্ধা খেলার মাঠ*

৫ মিনিট বিশ্রাম, পুনরায় ২৫ মিনিট খেলা—এই নিয়মে খেলা চলে। খেলার সময় এক জন 'মারা' পড়লে অন্য দলের অর্ধাংশ আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। খেলায় এক জন রেফারি ৬ বা ১২ জন দাড়িয়া জজ এবং দুই জন স্কোরার থাকে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকলে ১০-১-১০ মিনিট পুনরায় খেলে ফলাফল নির্ধারণ করা যায়। এই খেলায় কোনো খরচ লাগে না এবং বেগ, তেজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দরুন এটি দেশের বড়-ছোট সবার প্রিয় খেলা।

কা. আ. আ.

**দাদ** চর্মরোগ দ্র

**দাদাবাদ** (Dadaism)

চিত্রকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক আন্দোলনের নাম। এর শুরু সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে, ১৯১৬ সালে। দাদাবাদ যাঁরা শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিমূর্ত চিত্রশিল্পী হান্স্ আর্প (Hans Arp)। এই আন্দোলনের অনুসারীরা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। তাঁরা সকল নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে শিল্পসৃষ্টির উপর জোর দেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দাদাবাদ একসঙ্গে 'সব কিছু' এবং 'কিছুই নয়'। তাঁদের বিবেচনায় পরিচিত জীবনের অনুসরণ এক ধরনের মিথ্যাচার। বিমূর্ততাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন দাদাবাদীরা।

*দাদাবাদের চিত্র; শিল্পী হান্স আর্প*

*শিল্পী মাক্স আর্নস্ট-এর ছবি—ফিগর ১৯২৯*
*দাদাবাদ ও পরাবাস্তববাদ এক সঙ্গে এ সময় মিশে যায়.*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) অব্যবহিত পরেই দাদাবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় দাদাবাদ সাহিত্যের অঙ্গনে এজ্রা পাউণ্ড (দ্র) ও টি. এস. এলিয়টের (দ্র) কবিতায় এবং শিল্পকলার অঙ্গনে হান্স আর্প ও মাক্স আর্নস্ট (Max Ernst)-এর চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়। ১৯২২ সাল নাগাদ দাদাবাদ একটি আন্দোলন হিসাবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে পরাবাস্তববাদ তথা স্যুররিয়ালিজ্‌মের (দ্র) সঙ্গে মিশে যায়।

ক. চৌ.



www.pathagar.com

**দাদাভাই নওরোজি** [১৮২৩—১৯১৭]

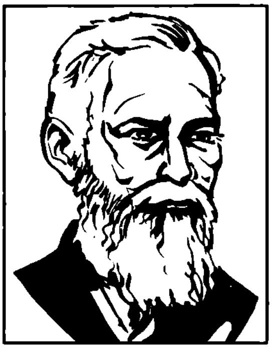

অবিভক্ত ভারতের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ। জন্ম বোম্বাই শহরের এক বিখ্যাত পুরোহিত পরিবারে, ১৮২৩ সালে।

১৮৫৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং পরবর্তী বছর ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লণ্ডনে গুজরাটি ভাষা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

লণ্ডনের প্রবাসজীবনেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে তিনি আন্দোলন শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের সমস্যাদি ইংরেজদের সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকে অন্যান্যের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'। ১৮৬৯ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

দাদাভাই নওরোজি ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সর্বপ্রথম অধিবেশনে যোগ দেন। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং ১৮৯২ সালের নির্বাচনে মধ্য-ফিন্সবেরি এলাকা থেকে উদারনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা (দ্র) অধিবেশনে দাদাভাই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই অধিবেশনেই তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'পভার্টি অ্যাণ্ড আন্-ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯১৭ সালে।

আ. হ.

**দান** আদ্যশ্রাদ্ধ দ্র

**দান্তে আলিগিয়েরি** [১২৬৫—১৩২১]

ইতালির আদি কবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্যতম মহৎ কাব্যের স্রষ্টা। পুরো নাম দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighieri) হলেও তিনি দান্তে নামেই সমধিক পরিচিত।

১২৬৫ সালের ৫ই জুন ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি লাতিন ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। এর পর ফরাসি রোমান্স সাহিত্য ও ইতালীয় লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চায় ব্রতী হন। প্রথম দিকে কাব্যই ছিল তাঁর নিয়মিত চর্চার বিষয়। পরে তিনি লাতিন ভাষায় রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ নিবন্ধ রচনা করেন। দেশীয় রাজনীতির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

সেকালে ইতালির রাজনীতি পোপের (খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় গুরু) সমর্থক ও পোপবিরোধী—এই দুই প্রধান ধারায় বিভক্ত ছিল। পোপের সমর্থকেরা ইতালির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে প্রধান বিরোধী শক্তি বলে পরিগণিত হত। তখনো ইউরোপে (দ্র) সাবেক রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে এক সাম্রাজ্য গড়ার চিন্তা বিরাজমান ছিল অর্থাৎ এ ধারণা ছিল যে সমগ্র ইউরোপ এক সাম্রাজ্য এবং তার সম্রাট থাকবে এক জন। পোপসমর্থকদের যুক্তি ছিল, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রোমের পোপই হবেন এই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক এবং ধর্মীয় ও জাগতিক সকল বিষয়ের নিয়ন্তা। কবি দান্তে এক সাম্রাজ্যের বিষয়টিকে সমর্থন করলেও তিনি ছিলেন রাজার অধীনে কেন্দ্রীয় জাতীয় শাসনের পক্ষে। পোপবিরোধী এই অভিমত প্রকাশের কারণে তাঁকে ১৩০২ সালে ফ্লোরেন্স থেকে বহিষ্কার করা হয়।

অন্যত্র নির্বাসিত হওয়ার পর দান্তে 'দিভিনা কোমেদিয়া' অর্থাৎ দিব্য নাট্য বা দিব্য প্রেমগাথা নামক এক মহাকাব্য রচনায় অসাধারণ কবিপ্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। এই কাব্যের জন্য তিনি বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 'বেয়াত্রিচে' নামে এক মেয়ের স্মরণেই তিনি মহাকাব্যটি রচনা করেন। মেয়েটি চব্বিশ বছর বয়সে মারা যায়। বাল্যকালে এই মেয়েটির অজ্ঞাতেই



www.pathagar.com

তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে দান্তে আজীবন তাঁকেই অপার্থিব কল্যাণ ও সুন্দরের মানসমূর্তিরূপে ভালবেসেছিলেন। ইংরেজিতে কাব্যটি 'ডিভাইন কমেডি' (দ্র) নামে পরিচিত।

দান্তের লাতিন রচনাবলির মধ্যে এক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপক্ষে কৈফিয়ৎসূচক গ্রন্থ 'দে মনার্কিয়া' বা 'রাজতন্ত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে এক সাম্রাজ্যের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিয়ে দান্তে বলেন, জাগতিক ক্ষেত্রে পোপ নয়, রাষ্ট্রের শাসক তথা রাজা হবেন সাম্রাজ্যের প্রধান। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আইনকানুন ও বিধিবিধানের প্রভাব সত্ত্বেও এই গ্রন্থে তাঁর অনেক আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূল হচ্ছে ব্যক্তির মঙ্গল এবং রাষ্ট্রের পরিচালনায় ব্যক্তিরও ভূমিকা থাকা আবশ্যক। তিনি ইতালীয় ভাষায় 'কন্‌ভিভিও' নামে একটি বিশ্বকোষও রচনা করেন।

রাভেন্নায় নির্বাসিত জীবন যাপনকালে দান্তে ১৩২১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

## দাবা

দাবার জন্ম কোন দেশে এ নিয়ে বহু মতবিরোধ রয়েছে। তবে পারস্য ও চীন দেশ থেকে দাবা খেলা ভারতবর্ষে এসেছে বলে অনেকের ধারণা। আবার অনেকে বলেন যে দাবা খেলা ও দাবা খেলার কোর্ট অর্থাৎ ছক আবিষ্কার করেন হান্‌সিং নামক এক জন চীন দেশীয় লোক। প্রবাদ আছে যে রাবণের আমোদের জন্য রানী মন্দোদরী এই খেলা উদ্ভাবন করেন। যুদ্ধের মতো চতুরঙ্গ (অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক) বল নিয়ে এই খেলা খেলতে হয়, তাই একে চতুরঙ্গ বলে। ফার্সি ভাষায় এই খেলাকে 'সতরঞ্জ' বলা হত। বিপক্ষের রাজা-ঘুটিকে বন্দি করতে পারলেই খেলা শেষ। মন্ত্রীর নাম দাবা, গজকে বলে পিল (আরবি শব্দ ফীল্ অর্থাৎ হাতি)। রাজা ধরবার উদ্যোগকে বলে কিস্তি দেওয়া। সেটা সফল হলেই বলে 'কিস্তিমাৎ'। নানা দেশে দাবার ঘুটিগুলির নাম আলাদা। বিলাতে কিং, কুইন, বিশপ, ক্যাস্‌ল্ ও পন। আমাদের দেশে রাজা, মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, নৌকা ও বোড়ে।

আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা ১৯৪৩ সালে হাওয়ার্ড স্টাউন্টন (Howard Staunton) নামে এক জন ইংরেজ সৃষ্টি করেন। আর আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা

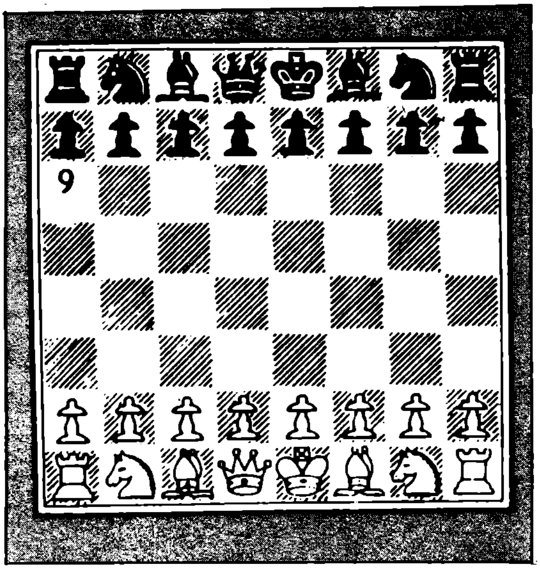

দাবার ছক ও দাবার ঘুটি

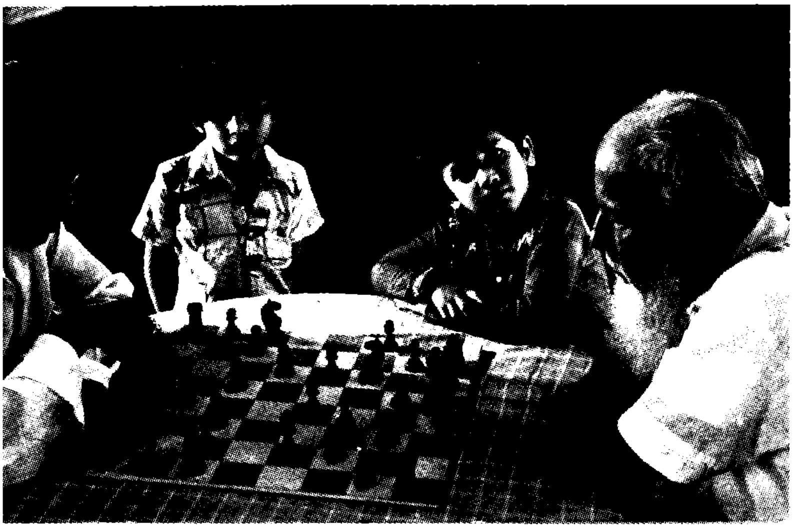

কাজী মোতাহার হোসেন দাবা খেলছেন কবি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে



www.pathagar.com

প্রথম শুরু হয় ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও রাশিয়ার (দ্র) মধ্যে। ১৯২৪ সালে বিশ্ব দাবা ফেডারেশন গঠিত হয়। আর বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশে দাবা খেলার প্রসার ঘটেছে স্বাধীনতার পর। প্রায়ই বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় প্রতিযোগিতা ১৯৭৪ সালের পর থেকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ থেকে নিয়াজ মোর্শেদ (দ্র) আন্তর্জাতিক গ্রাণ্ড মাস্টার হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এ ছাড়া দাবা খেলার অঙ্গনে রানী হামিদ বিদেশ থেকে কয়েক বার দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছেন। বিদেশের মাটিতেই শুধু নয়, আমাদের দেশেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই টুর্নামেন্টগুলিতে আমাদের স্থান খুবই আশাপ্রদ। এখন বাংলাদেশের বহু স্থানে দাবার টুর্নামেন্ট হয়ে থাকে। ক্ষুদে দাবাড়ুরা এতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে বিজ্ঞানী ড. কাজী মোতাহার হোসেন (দ্র) ও জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক দাবাড়ু হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কা. আ. আ.

## দারা শিকোহ্ [১৬১৫—১৬৫৯]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৬১৫ সালের ৩০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর তিনি নানাবিধ শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

প্রথম জীবনে দারা শিকোহ্ এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, গুজরাট, মুলতান ও কাবুল এবং বিহারের প্রদেশপালের দায়িত্ব পালন করেন। সম্রাট শাহজাহানের মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসাবে দিল্লিতে (দ্র) বসে তিনি নির্দিষ্ট কর্মচারীর মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর অন্য তিন পুত্র সুজা, আওরঙ্গজেব (দ্র) ও মুরাদ নিজেদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে থাকেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শিকোহ্‌র বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন।

দারার প্রেরিত সেনাবাহিনীর নিকট সুজা পরাজিত হলেও ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট ধর্মাটের যুদ্ধে দারার সৈন্যদল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এর পর আগ্রা দুর্গের ৮ মাইল পূর্ব দিকে সামুগড় নামক স্থানে দারা ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে আবার আওরঙ্গজেব ও মুরাদের বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং পরাস্ত হন। পরে তিনি শক্তি সঞ্চয় করে আজমীরের নিকটে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এবারও পরাজয় বরণ করে রাজপুতানা, সিন্ধু ও কচ্ছ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকেরা তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেন এবং এই অজুহাতে ১৬৫৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁকে হত্যা করা হয়।

দারা রাজমুকুটের অধিকারী না হলেও উন্নত চরিত্রমাধুর্যসম্পন্ন, উদার, সংস্কারমুক্ত ও শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি ফার্সি ভাষায় ভগবদ্‌গীতা (দ্র) ও উপনিষদ অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি ধর্মবিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সুজ. ব.

## দালি, সাল্‌ভাদোর্ [১৯০৪—১৯৮৯]

বিশ্ববিখ্যাত পরাবাস্তববাদী স্পেনীয় চিত্রকর। ১৯০৪ সালের ১১ই মে দালি (Salvador Dali) স্পেনের ফিগুয়েরাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে মাদ্রিদের বিখ্যাত চিত্রকলা বিষয়ক শিক্ষায়তন এস্কুয়েলা নাসিওনাল দে বেল্লাস আর্তেস্ দে সান ফের্নান্দো-তে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯২৬ সালে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন। এর পর তিনি মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী শুরু করেন। তাঁর এই সময়কার চিত্রকর্ম বাস্তববাদ, কিউবিজ্‌ম্ ও নব্যধ্রুপদরীতির সংমিশ্রণে আঁকা ছিল।

১৯২৮ সালে সালভাদোর দালি প্যারিসে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তাঁর স্বদেশী চিত্রকর হোয়ান মিরো (Joan Miró) ও অন্যান্যের। পরাবাস্তববাদী রীতির প্রতি অনুরক্তি সত্ত্বেও দালি এই সময় একান্ত নিজস্ব রীতি উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হন। জিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (দ্র) রচনাকর্মও এই সময় তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষের অবচেতন মনের ভয় ও আকাঙ্ক্ষাকে বহুমুখী ইমেজের মাধ্যমে তাঁর চিত্রকর্মে নিরন্তর প্রতিফলিত করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, এ ক্ষেত্রে তিনি রঙের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধাতব



www.pathagar.com

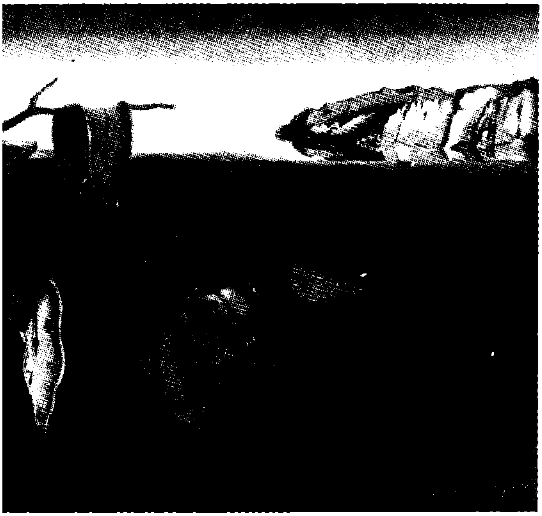

*সাল্‌ভাদোর্‌ দালির ছবি দুর্মর স্মৃতিলগ্নতা* (Persistence of Memory)

উপকরণ ব্যবহার করেও তাঁর চিত্রকর্মের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের বাহন করে তোলেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'পারসিস্‌টেন্স অব মেমোরি'তে (১৯৩১) তিনি অচল ঝুলন্ত ঘড়ি ইত্যাদি সংযুক্ত করে একে নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

দালির প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) নিউইয়র্ক শহরে ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের পর থেকে তিনি ধর্মীয় নানা বিষয়কে অবলম্বন করে ছবি আঁকায় মগ্ন হন। তাঁর এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হচ্ছে 'ম্যাডোনা অন পোর্ট ললিগাট', 'ক্রাইস্ট অব সেইন্ট জন অব দ্য ক্রস', ক্রুশবিদ্ধকরণ বিষয়ক বেশকিছু চিত্রকর্মসহ বিখ্যাত 'লাস্ট সাপার'।

সালভাদোর দালি বহু গহনা ও আসবাবপত্র এবং বস্ত্রের ওপরও নকশাঙ্কন করেছেন। পাশাপাশি থিয়েটারের সেট ও কস্টিউমও তৈরি করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার লুই বুনুয়েলের দু'টি পরাবাস্তববাদী চলচ্চিত্র Un chien andalou (অঁ শিয়েঁ অঁদালু) এবং L'age d'or (লাজ্‌ দ)-র চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁর দু'টি বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক রচনার নাম যথাক্রমে 'সালভাদোর দালির গোপন জীবন' এবং 'প্রতিভাবানের রোজনামচা'।

আ. হ.

## দিগম্বর সম্প্রদায়

জৈনধর্মের (দ্র) অনুসারী একটি সম্প্রদায়। জৈনরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। তবে মহাবীর (দ্র) (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) যখন জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন, তখন সম্প্রদায়ের এই বিভাজন ছিল না। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যাঁরা জৈনধর্ম প্রচার করেন, তাঁদের জীবনযাপন-প্রণালী, আচারব্যবহার, বেশভূষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। এ সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা কিছু মতবিধান চালু করেন। তাঁরা বলেন যে মহাবীরের নির্দেশ পালনের জন্য প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগ করতে হবে, এমনকি পরনের কাপড়ও। এই যুক্তিতে তাঁদের মধ্যে অনেক সাধুই উদোম বা নগ্ন গায়ে থাকতেন। পরবর্তী কালে এই উদোম গায়ের সাধু সম্প্রদায় 'দিগম্বর' বা বস্ত্রহীন নামে অভিহিত হন। এর ফলে মহাবীর প্রবর্তিত মূল জৈনধর্মের অনুসারীদের শ্বেতাম্বর বলা হতে থাকে।

সুজ. ব.

## দিব্বোক / দিব্য

একাদশ শতকের বরেন্দ্রভূমির (উত্তরবঙ্গ) বিদ্রোহীদের নায়ক ও কৈবর্ত (কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী শ্রেণীর হিন্দুজাতিবিশেষ) সর্দার। প্রথম জীবনে তিনি পালবংশীয় রাজা ২য় মহীপালের উচ্চ পদের রাজকর্মচারী ছিলেন। মহীপাল রাজ্যশাসনের নামে অন্যায় অবিচার-অত্যাচার শুরু করলে দিব্বোক প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। সামন্ত বিদ্রোহীদের হাতে মহীপাল পরাজিত হলে দিব্বোক তাঁকে হত্যা করে বরেন্দ্রের রাজা হন। তাঁর শাসনকালে বরেন্দ্ররাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে এখনো তাঁর স্মরণে দিব্যস্মৃতি-উৎসব পালিত হয়। কিন্তু দিব্বোকের সমকালের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী মহীপালের ভাই রামপালকে নিয়ে 'রামচরিত' শীর্ষক যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাতে দিব্বোককে দস্যু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুজ. ব.

## দিন-রাত্রি

পৃথিবী (দ্র) নিজ মেরুরেখায় বা অক্ষে অবিরাম পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এভাবে এক বার আবর্তন করতে



www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে (২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড)। পৃথিবীর এই গতিকে দৈনিক বা আহ্নিক গতি এবং সময়কে সৌরদিন বলে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত্রি আসে। পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোই পৃথিবীকে আলোকিত করে। তবে পৃথিবী একটি গোলক বলে সূর্যের আলো পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রেখে তার সামনে একটি ভূ-গোলক ঘোরালে দেখা যাবে, বাতির মুখোমুখি অংশ আলোকিত এবং বিপরীত অংশ অন্ধকার থাকে। এভাবে বর্তুলাকার ও আবর্তনশীল পৃথিবীর যে অর্ধাংশে সূর্যকিরণ পড়ে সে অংশে দিন হয়, আর তার উল্টো দিকে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেখানটা অন্ধকার বা রাত্রি। ভূপৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে ছায়াবৃত্ত বলে। গোলকটি একটু করে ঘোরালে দেখা যাবে, অন্ধকার স্থানে যেখানে আলোকিত হচ্ছে সেখানে ভোর বা প্রভাত হয়, আর যেখানটা আলো থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে অন্ধকারে ঢেকে যায় সেখানে সন্ধ্যা নামে।

প্রভাত ও সন্ধ্যার মাঝামাঝি অবস্থায় সূর্যের আলো যখন ঠিক মাথার উপর থাকে, তখন দুপুর বা মধ্যাহ্ন। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে, তাই পৃথিবীর পশ্চিমের দেশ থেকে পূর্বের দেশগুলোতে আগে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা হয়। সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের অব্যবহিত পূর্বের ও পরের সময়কে যথাক্রমে ঊষা ও গোধূলি বলে। এ সময় ধূলিকণাময় বায়ুমণ্ডলের (দ্র) নিম্নস্তরে ঈষৎ সূর্যকিরণের প্রতিফলনে আকাশের আলো ঝাপসা ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

মু. এ.

**দিলীপকুমার রায়** [১৮৯৬—১৯৮০]

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতালোচক, গীতরচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। সাহিত্যের নানা শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যও বিখ্যাত। পিতা বিখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্র)। পরিণত সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও অচ্ছন বাঈ-এর কাছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। সুর রচনা ও গায়ন উভয় ক্ষেত্রেই দিলীপকুমার একেবারে নিজস্ব ও পৃথক একটি ঢঙ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সবাই সেটিকে 'দিলীপী' ঢঙ বলে অভিহিত করতেন। সঙ্গীত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা সঙ্গীতালোচনা সাহিত্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর মতবিনিময় ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে। অতুলপ্রসাদ সেন (দ্র) ও কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের বিশেষ হৃদ্যতা

*দিলীপকুমার রায় ও নিশিকান্ত*



www.pathagar.com

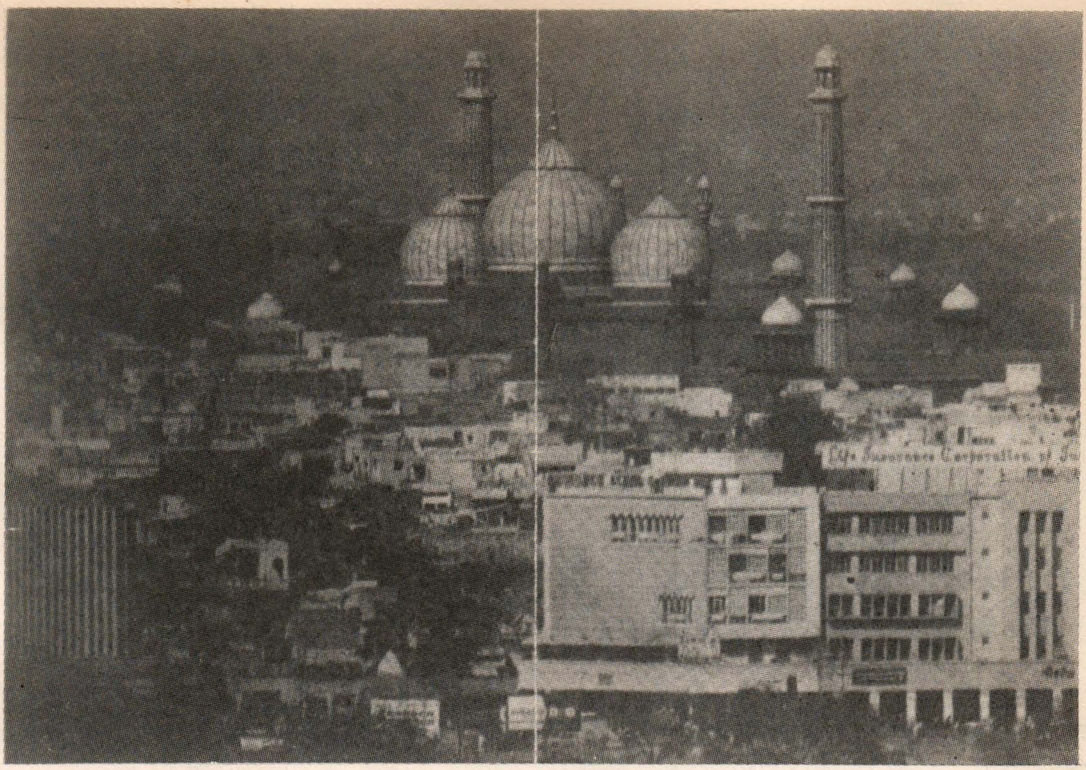

*পুরনো দিল্লি শহর*

ছিল। প্রথম দিকে নজরুলের সঙ্গীতরচনাকে কলিকাতার (দ্র) সুধীমহলে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নজরুল সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ নজরুল সঙ্গীতালোচনার ভিত্তি নির্মাণ করে। নজরুলের গানের স্বরলিপি প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯২৮ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন সন্ন্যাসী থেকে সঙ্গীত ও সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত থাকেন।

১৯৮০ সালের ৬ই জানুয়ারি তাঁর দেহাবসান ঘটে।

ক. গো.

## দিল্লি

ভারতের (দ্র) রাজধানী দিল্লি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। আয়তন ১,৪৮৫ বর্গকিলোমিটার। গরমের সময় এখানে তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়, আবার শীতকালে তাপমাত্রা ৪/৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও নেমে আসে। আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন।

প্রায় দেড় হাজার বছরেরও আগে এক জন গ্রিক ভূগোলবিদের রচিত মানচিত্রে 'দাইদালা' নামক স্থানকে দিল্লি বলে মনে করা হয়। আধুনিক দিল্লির গোড়াপত্তন হয় খ্রিস্টীয় ১১ শতকে। ১১৯২ সালে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। সে সময়ে দিল্লিকে রাজধানীতে পরিণত করা হয়। এর পর ইংরেজ শাসনামলে কলিকাতা (দ্র) ভারতের রাজধানীরূপে স্বীকৃতি পায়। ১৯১১ সালের শেষের দিক থেকে দিল্লি পুনরায় রাজধানীতে পরিণত হয়। দিল্লি নগরীর আয়তন বাড়ানোর জন্য ১৯১২ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে নয়াদিল্লি (New Delhi) নির্মাণ করা হয়। ১৯৩১ সালে নয়াদিল্লি উদ্বোধন করা হয় এবং রাজধানী দিল্লি থেকে নয়াদিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। নয়াদিল্লি মূলত ভারতের প্রশাসনিক কেন্দ্র। এটি বাণিজ্যকেন্দ্রও। এখানে ছোটখাটো শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কাপড়ের কল রয়েছে। দিল্লিতে রয়েছে বহু প্রাচীন কীর্তি, ঐতিহাসিক স্থান। এগুলির মধ্যে সম্রাট শাহজাহান (দ্র) নির্মিত লাল কেল্লা (Red Fort), কুতুবমিনার (দ্র), হুমায়ুনের (দ্র) মাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নয়াদিল্লিতে রয়েছে পার্লামেন্ট ভবন, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট





www.pathagar.com

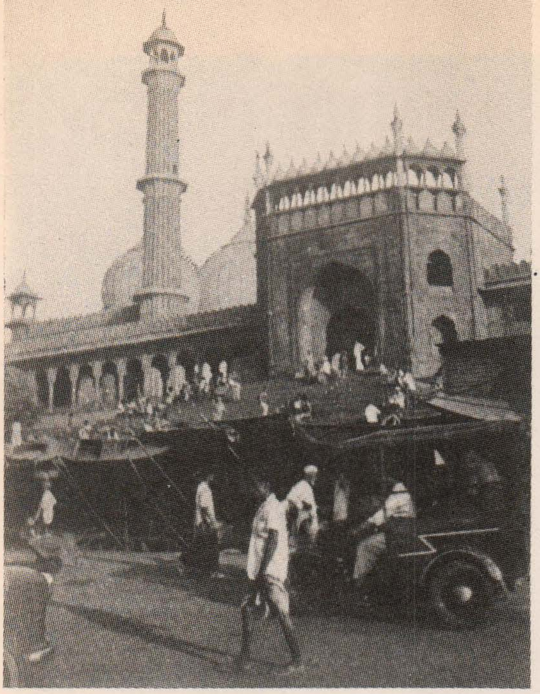

*পুরনো দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে জামে মসজিদ*

ভবন, দিল্লি গেট ইত্যাদি। ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান নগরী রেলপথ দ্বারা দিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত। দিল্লিতে তিনটি রেলস্টেশন ও একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। খেলাধুলার জন্য এখানে আছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, আর অতিথিসেবার জন্য আছে অতি উঁচুমানের একাধিক হোটেল

হো. আ.

**দীক্ষা**

সাধারণ অর্থে 'দীক্ষা' বলতে গুরুর নিকট থেকে মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করাকে বোঝায়। বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়। তবে শাস্ত্রে সবার সব মন্ত্রে দীক্ষিত হবার বিধান নেই। দীক্ষা গ্রহণ করার আগে গ্রহণীয় মন্ত্রের সঙ্গে গ্রহণকারীর নাম, জন্মনক্ষত্র, জন্মরাশি ইত্যাদি মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা আছে। যে দেবতার আরাধনা করার জন্য দীক্ষাগ্রহণ করা হয়, তাঁর নাম এবং গৃহীত মন্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না। আগে বংশপরম্পরায় কুলগুরুর বংশধরের নিকট থেকে দীক্ষাগ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন তা আর কেউ মানে না। যে কেউ যে কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বা গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে পারেন। আসলে ব্যাপক অর্থে কোনো উচ্চ আদর্শ বা সঙ্কল্প সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞাই হল দীক্ষা।

সুজ. ব.

**দীনবন্ধু মিত্র** [১৮৩০—১৮৭৩]

বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। জন্ম নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। হিন্দু কলেজের (দ্র) ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৬-৫৭ সালে ইন্সপেক্টিং পোস্টমাস্টার হিসাবে নদীয়া ও ঢাকা বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। এই সময় তিনি যশোর অঞ্চলে নীলচাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার দেখে আলোড়িত হন এবং 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' নাটক (দ্র) রচনা ও প্রকাশ করেন। 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, নীলকমিশন বসে, চাষীরা অনেকাংশে অত্যাচারমুক্ত হয়। তাঁর 'সধবার একাদশী' ইয়ং বেঙ্গল(দ্র)-দের নিয়ে লেখা একটি সার্থক প্রহসন (দ্র)। অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ইত্যাদি। কবি হিসাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেও নাট্যকার হিসাবেই তাঁর পরিচয় সমধিক। তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টি, লোকচরিত্রজ্ঞান, মানবিকতা তাঁর সৃষ্টিকে অমর করেছে।

মে. খা.

**দীনেশচন্দ্র গুপ্ত** [১৯১১—১৯৩১]

বিপ্লবী ও শহীদ। ঢাকার বিক্রমপুরের যশোলঙ গ্রামে তাঁর জন্ম, ৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। পিতার নাম সতীশচন্দ্র গুপ্ত।

দীনেশ বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) বাহিনীর সাধারণ সদস্য থেকে সাহসিকতাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় ক্যাপ্টেন হন। ঢাকা জেলায় ও পরে মেদিনীপুরে বিপ্লবী



www.pathagar.com

*বিনয় বাদল দীনেশ*

সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সংগঠনের মাধ্যমেই পরবর্তী কালে মেদিনীপুরে তিন জন ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়।

দীনেশ ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। দলের প্রয়োজনে মেদিনীপুরে তাঁর ডাক পড়লে তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বিনয়কৃষ্ণ বসু (দ্র) ও বাদল গুপ্তের (দ্র) সহযোগী হিসাবে তিনি কলিকাতা (দ্র) রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের অভিযানে যোগ দেন। তাঁদের আক্রমণে কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনসহ কয়েক জন ইংরেজ কর্মকর্তা নিহত ও আহত হন। কিন্তু এই সম্মুখযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গ্রেফতার এড়ানোর উদ্দেশ্যে অপর দুই বিপ্লবীর মতো আত্মহননের চেষ্টায় দীনেশ নিজের মাথায় গুলি ছোঁড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হয়। পরে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কারাগারে ফাঁসির প্রতীক্ষায় থাকাকালীন তিনি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহিমা ও বিবরণ সম্বলিত কয়েকটি পত্র রচনা করেন। পত্রগুলো সুধী সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়। ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আলিপুর জেলে তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ।

সুজ. ব.

**দীনেশচন্দ্র সেন** [১৮৬৬—১৯৩৯]

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, লোকসাহিত্যসংগ্রাহক ও গবেষক। ১৮৬৬ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন।

১৮৮২ সালে তিনি জগন্নাথ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৮৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এফ. এ. এবং ১৮৮৯ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এ সময় তিনি গ্রামবাংলার লুপ্তপ্রায় ও

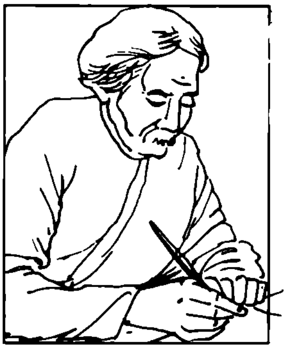

অপ্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুঁথির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পায়ে হেঁটে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ঐসব পুঁথি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। শ্রীকর নন্দীর 'ছুটিখানের মহাভারত' এবং মানিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এর মতো অমূল্য পুঁথি এ সময়েই সংগৃহীত হয়। পরে তিনি এসব সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

গ্রামবাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত লোকগীতি সংগ্রহ করে ১৯২০ সালে তিনি 'দ্য ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল' প্রকাশ করেন। এর পর ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে মোট আট খণ্ডে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (দ্র) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (দ্র) প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ইংরেজি আলোচনাসহ তাঁর অনুবাদ 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড্‌স্' প্রকাশিত হয়।

তিনিই প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের (দ্র) ব্যাপক গবেষণা ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফল হিসাবে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬), 'হিস্টরি অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড লিটারেচার' (১৯১১) 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়' ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯১৪) এবং 'দ্য বেঙ্গলি রামায়ণ্‌জ্' (১৯২০) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্রের প্রধান কীর্তি। প্রাচীন সাহিত্যের পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি 'রামায়ণী কথা' (১৯০৪), 'বেহুলা' (১৯০৭), 'সতী' (১৯০৭) 'ফুল্লরা' (১৯০৭) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) 'রীডার' ছিলেন। তিনিই প্রথম এই পদ অলঙ্কৃত করেন। এর পর তিনি 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ'-এর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ



www.pathagar.com

এবং সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি এবং ১৯৩১ সালে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (দ্র) প্রদান করেন।

দীনেশচন্দ্র ১৯২৯ সালে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং ১৯৩৬ সালে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল এবং সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালের ২০শে নভেম্বর কলিকাতার (দ্র) বেহালায় তাঁর বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

## দীপাবলি বা দেওয়ালি

দীপ প্রজ্বালনের উৎসব। এর অন্য নাম দেওয়ালি। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অর্থাৎ কালীপূজার (দ্র) দিন রাত্রে এই উৎসব হয়। তবে উৎসবের সূচনা কয়েক দিন আগে থেকেই হয়ে থাকে। এ সময় নানা রকম দীপ দিয়ে বাড়িঘর সাজানো হয়। দীপোৎসবই দীপাবলির একমাত্র অনুষ্ঠান নয়; অমাবস্যার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপূজার (দ্র) প্রথারও ব্যাপক প্রচলন আছে। কোথাও কোথাও এই উপলক্ষে অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠান করা হয়। দীপাবলির চেয়ে বঙ্গদেশে এই অনুষ্ঠান কালীপূজা নামে বেশি পরিচিত।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা দীপাবলি উৎসব পালন করে। বলা হয়, রাম রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসার আনন্দে প্রজাগণ যে উৎসবের আয়োজন করেছিল, তার স্মরণে ও অনুকরণে ভারতবাসীরা দীপাবলি উৎসব পালন করে আসছে। পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যমলোক থেকে আগত পিতৃপুরুষের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রদর্শনার্থে এই দিন উল্কা জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে। এই থেকে বর্তমানে বাজি পোড়াবার রীতি প্রচলিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বৌদ্ধরা এই সময় বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধশিষ্য মহামোগ্‌গলায়নের পরিনির্বাণ (দ্র) উপলক্ষে উৎসব করে থাকে। জৈন তীর্থঙ্কর (দ্র) মহাবীর (দ্র) অশ্বিনী কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রে নির্বাণ লাভ করেন বলে এ সময় জৈনদের মধ্যেও দীপমালা জ্বালিয়ে উৎসব করার রীতি আছে।

সুজ. ব.

## দুদুমিয়া [১৮১৯—১৮৬২]

ফরায়েজি আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম নেতা ও সমাজ-সংস্কারক। তাঁর পিতা হাজী শরীয়তউল্লাহ (দ্র) এ দেশে ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই ফরায়েজি সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত হন। বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার শামাইল (বাহাদুরপুর) গ্রামে ১৮১৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দুদুমিয়া নামে তিনি পরিচিতি অর্জন করলেও তাঁর প্রকৃত নাম মুহসিন উদ্দিন।

পারিবারিক পরিবেশে বাল্যশিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর হজ্ (দ্র) পালনের পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য মাত্র বারো বছর বয়সে দুদুমিয়াকে মক্কায় পাঠানো হয়। সেখানে পাঁচ বছর আরবি ও ফার্সি ভাষা শিখে উদার ধর্মদৃষ্টি নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে পিতার অনুমতিক্রমে দুর্বল, অসহায় কৃষক-প্রজাদের ওপর জমিদার-মহাজনদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য তিনি ফরায়েজি লাঠিবাহিনী গঠন করেন। তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতায় ফরায়েজি আন্দোলন ক্রমে ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়। তাঁর নেতৃত্বে এ দেশের কৃষক-শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জমিদার-মহাজন ও নীলকরেরা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক



www.pathagar.com

মিথ্যা মামলা দায়ের করে। যেমন ১৮৪১ সালে খুনের দায়ে, ১৮৪৪ সালে অনধিকার প্রবেশের দায়ে এবং ১৮৪৬ সালে নারী অপহরণের দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। কিন্তু আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি পান।

পিতার মৃত্যুর পর দুদুমিয়া ফরিদপুর, বরিশাল (দ্র), ঢাকা (দ্র), কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট (দ্র), ময়মনসিংহ, পাবনা, যশোর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কৃষক-মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা চালান। এই তৎপরতার জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের (দ্র) পরে সরকার তাঁকে আলিপুর জেলে নজরবন্দি করে রাখে। দীর্ঘ কারাভোগের পর ১৮৫৯ সালে মুক্তি পেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফরিদপুরে ফিরে এলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি আবার গ্রেফতার হন। কিন্তু এবার সহজেই তিনি ছাড়া পান।

এর পর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দুদুমিয়া ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। এখানেই ১৮৬২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

## দুধ

স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণীর মধ্যে শিশুর প্রাথমিক খাদ্য হিসাবেই মায়ের দুধের সৃষ্টি হয়। দুধ সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্যসমূহের অন্যতম। দুনিয়ার অধিকাংশ দুধ আসে গৃহে অথবা খামারে প্রতিপালিত গরু থেকে। তবে অঞ্চল-বিশেষে মোষ, ছাগল, উট (দ্র), ঘোড়া (দ্র), লামা (দক্ষিণ আমেরিকায়) এবং বল্‌গা হরিণের (মেরু অঞ্চলে) দুধের বহুল প্রচলন রয়েছে। গরুর দুধের শতকরা ৮৭ ভাগ পানি, ৩.৫ ভাগ চর্বি, ৫ ভাগ ল্যাক্টোজ নামে পরিচিত দুধের চিনি, ৩.৫ ভাগ আমিষ, ০.৭ ভাগ খনিজ এবং বাকি সামান্য ভিটামিন ইত্যাদি। গরুর জাত, প্রকৃতি, খাদ্য ইত্যাদির তারতম্যে এসব উপাদানের কিছুটা হেরফের হয়।

দুধের চর্বি খুব ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে পানির মধ্যে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। দুধের আমিষের বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সব ক'টা অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই আমিষের তিন চতুর্থাংশই হল কেসিন নামে পরিচিত দুধের বিশেষ আমিষ। ক্যালসিয়াম (দ্র) আর ফসফরাস (দ্র) শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়, এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের একটি প্রধান উৎস হল দুধ। ভিটামিন এ, বি-২, এবং বি-১-এর জন্যও দুধ ভাল উৎস; সি. ডি. ই. এবং কে.



www.pathagar.com

সহ আরো কয়েকটি ভিটামিনও রয়েছে এতে। বিভিন্ন প্রাণীর দুধে এসব উপাদান কিছু কম-বেশি হয়। যেমন— মোষের দুধে গরুর দুধের তুলনায় ৩ গুণ বেশি চর্বি ও দেড় গুণ বেশি আমিষ আছে, কিন্তু চিনি আছে মাত্র তিন-চতুর্থাংশ।

আজকাল আমাদের দেশেও কোনো কোনো খামারে দুধের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। এতে শুরুতে দুধে প্রয়োজনীয় চর্বি রেখে বাকিটুকু তুলে ফেলা হয়—যা ক্রিমরূপে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনে দুধে ক্রিম যোগও করা যেতে পারে। এর পর দুধকে পাস্তুরায়িত করা হয় ক্ষতিকর জীবাণু (দ্র) ধ্বংসের জন্য। দ্রুত ৭২° সেলসিয়াস উত্তাপে তুলে ১৫ সেকেণ্ড ঐ উত্তাপে রেখে তার পর চট করে একেবারে শীতল করে ফেলার নামই পাস্তুরায়ণ। এতে ক্ষতিকর জীবাণু নষ্ট হলেও স্বাদ-গন্ধ অবিকৃত থাকে। দুধের চর্বি ওপরে ভেসে উঠে আলাদা হবার প্রবণতা থাকে বলে হোমোজেনাইজার নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই চর্বিকে সারাটা দুধের মধ্যে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে দুধকে ভরা হয় নিশ্ছিদ্র প্যাকেটে। এরকম দুধকে ঠাণ্ডা অবস্থায় বেশ কিছু দিন রাখাও যায়, সরাসরি পান করাও যায়।

পূর্ণবয়স্ক অনেক মানুষ শরীরে ল্যাকটেজ নামের এনজাইমের অভাবে দুধ হজম করতে পারে না। তারা কিন্তু আবার দুগ্ধজাত অন্য খাদ্য খেতে পারে—যেমন দৈ। বিশেষ ধরনের জীবাণু দুধকে দৈ-য়ে পরিণত করে। তেমনি অন্যরকম বিশেষ ধরনের জীবাণু একে পনিরে পরিণত করে। দুধের চর্বি তুলে ফেলে চর্বির ভাগ দুই-শতাংশের কমে নিয়ে এলে আমরা স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ পাই। যারা চর্বি এড়িয়ে চলতে চায় তাদের জন্য এরকম দুধই ভাল। দুধকে দ্রুত যান্ত্রিকভাবে ঘুঁটলে এর চর্বি অংশ মাখনরূপে আলাদা হয়ে যায়। মাখন জ্বাল দিয়ে গলিয়ে ফেললে ঘি পাওয়া যায়। স্বল্প চর্বির দুধ জীবাণুর ক্রিয়ায় ঘোলে পরিণত হয়। দুধকে অম্লরসে টকিয়ে ফাটিয়ে ফেলে দুধের জমাটবাঁধা কেসিন আমিষ ছানা হিসাবে আলাদা করা হয়। আমাদের দেশীয় ছানার মিষ্টিগুলো এ থেকেই তৈরি। অতীতে দুধকে সংরক্ষণের প্রয়োজনে পনির তৈরি জনপ্রিয় হয়েছিল। আজকাল দুধ সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি রয়েছে। রাসায়নিক প্রিজার্ভেটিভ বা সংরক্ষক দ্রব্য মিশিয়ে সাধারণ প্যাকেটেই দুধকে মাসের পর মাস রেখে দেওয়া যায় ঘরের স্বাভাবিক উষ্ণতাতেই। বায়ুশূন্য পাত্রে ৬০° সে. উত্তাপে উত্তপ্ত করে প্রায় ৬০ শতাংশ জলীয় ভাগ শুকিয়ে ফেললে এভাপোরেটেড দুধ তৈরি হয়, যা বদ্ধ টিনে অনেক দিন ভাল থাকে। এর সঙ্গে চিনি মিশিয়ে রাখলে তাকে কণ্ডেন্সড্ দুধ বলা হয়। স্প্রে-ড্রাইং নামক পদ্ধতিতে জলীয় অংশ একেবারে বাদ দিয়ে তৈরি হয় গুঁড়ো দুধ।

মু. ই.

## দুন্দুভি

প্রাচীন সমরবাদ্য। যুদ্ধের সময় সামরিক যন্ত্রীদল দুন্দুভি বাজাত। দেখতে তবলার বাঁয়ার মতো, তবে বাঁয়ার চেয়ে এর উচ্চতা একটু কম ও আকারে অনেক বড়। দুন্দুভির

কাঠামো তামা, পেতল বা পুরা মাটির হাঁড়ি দিয়ে তৈরি হত। এর চামড়ার ছাউনি ডোরি বা চামড়ার ফিতে দিয়ে টানা থাকত। গলায় ঝুলিয়ে বা মাটিতে রেখে দু'টি বা একটি কাঠির সাহায্যে দুন্দুভি বাজানো হত। দুন্দুভির অপর নাম নাকাড়া। বৃহৎ দুন্দুভিকে মহাদুন্দুভি বা মহানাকাড়া বলা হত। আদিবাসী (দ্র)-দের মধ্যে এখনো এই ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে।

ক. গো.

**দুরন্ত** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র



www.pathagar.com

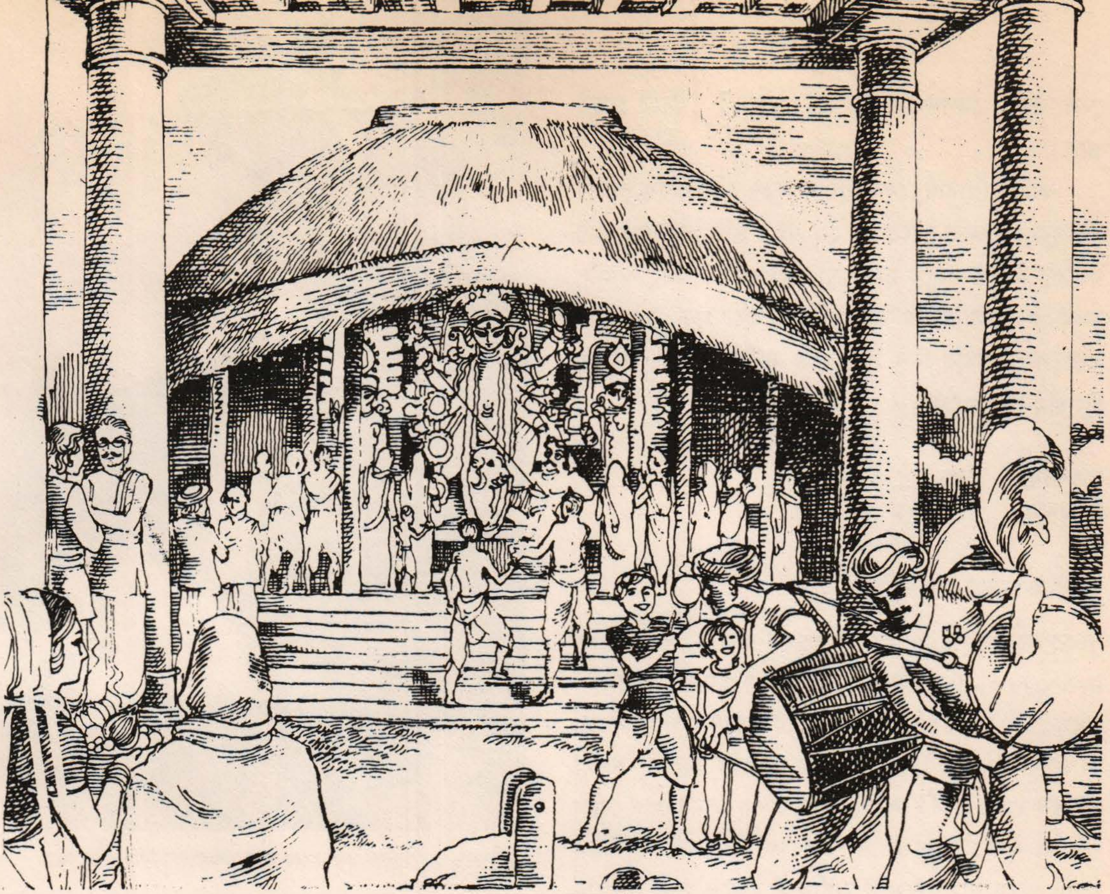

*দুর্গাপূজার পূজামণ্ডপ*

## দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ তাঁর গায়ের রং। তাঁর দশ হাত। এ জন্য তাঁর এক নাম দশভুজা। দুর্গার চোখও তিনটি। এ জন্য তাঁকে বলা হয় ত্রিনয়নী। দুর্গার বাহন সিংহ।

দুর্গার বহু রূপের কথা বর্ণিত হয়েছে। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি ও তেজ থেকে দুর্গার উৎপত্তি। দৈত্য মহিষাসুর এক বার দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করে সেখানকার রাজা হয়ে বসে। দুর্গা এই মহিষাসুরকে বধ করেন। তখন তাঁর নাম হয় মহিষমর্দিনী। দেবী পুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতিতে দুর্গা ও তাঁর পূজার উল্লেখ আছে। দুর্গা নামটির নানা ব্যাখ্যা আছে। দুর্গতি বা কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন বলে তিনি দুর্গা। দুর্গ নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন বলেও তিনি দুর্গা। পুরাণ মতে দুর্গা মহাদেব বা শিবের স্ত্রী।

নি. অ.

## দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় উৎসব। প্রস্তরনির্মিত দুর্গাপ্রতিমা অনেক পাওয়া গেছে। মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে তার পূজা করা বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মাটির প্রতিমা তৈরি করে তিন বছর দুর্গা পূজা করেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে। লঙ্কার রাজা রাবণ চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা করতেন। বসন্তকালে এই দেবীর পূজা হত বলে এ পূজার নাম বাসন্তী পূজা। রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গা দেবীর পূজা করেন। শরৎকালের পূজা বলে এ পূজার নাম শারদীয়া পূজা। বঙ্গদেশে বসন্তকালের চেয়ে শরৎকালের দুর্গাপূজাই বেশি আড়ম্বরপূর্ণ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে



www.pathagar.com

মেলা বসে। মেলাকে কেন্দ্র করে সকলেই উৎসবে মেতে ওঠে।

কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গাপূজা করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই ক'দিন বেশ ঘটা করে পূজা করা হয়। তার পর দশমীর দিন সাধারণত মাটির প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

নি. অ.

**দূতকাব্য** কাব্য দ্র
**দূরদর্শন** টেলিভিশন দ্র

## দূরবীক্ষণ যন্ত্র / দূরবীন

দূরের বস্তু দেখার আলোকীয় যন্ত্রকে বলা হয় টেলিস্কোপ (telescope) বা দূরবীক্ষণ। মনে করা হয় যে দূরবীক্ষণ প্রথম তৈরি হয় ১৬০৮ সালে, তৈরি করেন হল্যাণ্ডের হান্স লিপার্শে (Hans Lippershey)। তিনি ছিলেন চশমা প্রস্তুতকারক। একটি লেন্সের নিচে অপর একটি লেন্স রেখে পরীক্ষা করার সময় তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে দর্শনীয় বস্তুটি কাছে চলে এসেছে অর্থাৎ ঐ বস্তুকে তার অবস্থান থেকে কাছে বা নিকটে মনে হচ্ছে। ১৬১০ সালের মধ্যে গালিলেও (দ্র) নামে এক জন ইতালীয় বিজ্ঞানী একটি উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ তৈরি করেন। এর নাম গালিলীয় টেলিস্কোপ। এই টেলিস্কোপের বিবর্ধনক্ষমতা ছিল তেত্রিশ গুণ। এর পর টেলিস্কোপের অনেক উন্নতি হয়েছে। টেলিস্কোপে দর্পণের পরিবর্তে লেন্স ব্যবহার করা হয় বলে একে বলা হয় প্রতিসারক টেলিস্কোপ।

গালিলেও জ্যোতির্বিদ্যায় পর্যবেক্ষণের জন্য টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি বৃহস্পতি (দ্র) গ্রহের চাঁদ (দ্র) বা উপগ্রহ (দ্র) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। চাঁদের পাহাড় ও উপত্যকা তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দূরবীক্ষণের সম্মুখে একটি উত্তল লেন্স (convex lense) ব্যবহার করেন। এর নাম অবজেক্ট লেন্স বা অবজেক্টিভ। দূরবীক্ষণের অপর যে লেন্সটিতে চোখ রেখে দেখা হয় তার নাম আইপিস। গালিলেওর দূরবীক্ষণে এটি ছিল অবতল লেন্স (concave Iense)। এই বিন্যাসে বস্তু ও প্রতিবিম্ব একই দূরত্বে থাকে। পরবর্তী কালে দূরবীক্ষণে

*দূরবীক্ষণে অবলোকন করা হচ্ছে আকাশজগতের বিচিত্র সব চিত্র*

দু'টি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। অবজেক্ট লেন্সটি আলোকে আইপিস ও অবজেক্ট লেন্সের মাঝখানে ফোকাস করে।

আইপিস ঐ প্রতিবিম্বকে বিবর্ধিত করে এবং একটি বড় প্রতিবিম্ব তৈরি করে, যা চোখ দেখতে পায়। এ ধরনের দূরবীক্ষণে উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যায়। উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যায় বলে ভূতলের কোনো জিনিস দেখতে দূরবীক্ষণে অপর একটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের দূরবীক্ষণকে বলা হয় টেরিস্ট্রিয়াল্ টেলিস্কোপ।

শা. ত.

**দেওয়ালি** দীপাবলি/দেওয়ালি দ্র
**দেগা, এদ্গা** ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট দ্র

## দেবতা

এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাঁরা আপন ক্রীড়া বা দীপ্তি দ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন। পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে দেবতা শব্দ ও তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে দেবস্, লাতিন ভাষায় দেব্স্ বা দেইতাস, লিথুয়ানিয়ায়



www.pathagar.com

দেবস্‌, ফরাসিতে দেইতি, ইংরেজিতে ডেইটি, ইতালিতে দেইতা, স্পেনীয় দেইদাদ, প্রুশিয়ায় দেইতাত, ফার্সিতে দাবর্‌, জার্মানিতে দেইদাদি। ঋগ্বেদে (দ্র) অদিতি, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, প্রজাপতি, বিষ্ণু, সবিতা প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতার নাম আছে। চার বেদে প্রায় একই দেবতাদের নাম আছে। অথর্ববেদে শুধু যম, মৃত্যু, কাল ইত্যাদি কয়েক জন দেবতার নাম আছে। বেদের দেবতা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁদের মহিমা বর্ণনা করে স্তোত্র (বা স্তব) পাঠ করা হয়, তাঁদের বলা হয় 'স্তোত্রাঙ্গ দেবতা'। আর যাঁদের উদ্দেশ্যে ঘৃত আহুতি প্রদান করা হয়, তাঁরা 'যাগাঙ্গ দেবতা'। আগে দেবতাদের শরীরী মনে করা হত। যৈমিনি মুনির মতে, দেবতাগণ শরীরী জীব নন, মন্ত্রই দেবতা। তাঁর মতে দেবতা শরীরী হলে স্তুতিকারীর সামনে দেখা দিতেন। বর্তমান কালে নানা তথ্য সংগ্রহ করে গবেষকেরা বলছেন যে হিমালয় পর্বতমালার (দ্র) নির্দিষ্ট কোনো কোনো উঁচু ভূমিতে দেবতারা বাস করতেন। তাঁরা শরীরী। রাজ্যেশ্বর মিত্র এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থের কিছু কিছু তথ্যে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রণীত 'সিংহ সেনাপতি' গ্রন্থেও তার প্রমাণ মেলে। দেবতারা পরবর্তী কালে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পুরাণে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটি বলে সুবিদিত। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র), জাতক (দ্র), গ্রিক পুরাণ ও মহাকাব্যে (দ্র) দেবতার বহুল উল্লেখ রয়েছে।

গ্রিক দেবতাদের রাজা বজ্রধারী জিউস। এ ছাড়া পোসেইদোন, আপোলো, আফ্রোদিতি, আরেস, হেরা, আর্তেমিস, আথেনা, দেমেতের, দিওনিসুস উল্লেখযোগ্য। রোমানদের দেবতা স্যাটার্ন, ওপ্‌স্‌, জুপিটার, জুনো প্রভৃতি।

ভারতীয় মতে, দেবতার জন্ম কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে।

বি. ব.

## দেবদাসী

দেবতাসেবায় নিযুক্ত নর্তকী বা কিঙ্করী। বিন্ধ্য পর্বত ভারতের (দ্র) ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় এর উত্তর অংশকে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণের অংশকে বলে দাক্ষিণাত্য (দ্র)। এই দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো মন্দিরের দেবনর্তকীদের দেবদাসী বলে। মন্দিরের পূজার সময় দেবতার সামনে নৃত্যগীত করাই দেবদাসীর কাজ। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির (দ্র) হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ দিকের প্রায় সব প্রধান প্রধান দেবালয়েই দেবদাসী দেখা যায়। খুব অল্প বয়স থেকে দেবদাসী হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। দেবদাসীদের খুব ভোরে উঠে অন্ধকার থাকতে থাকতে দু' ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার সময় দু' ঘণ্টা নৃত্যগীত শিখতে হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে তারা নাচ-গানে পরিপক্ব হয়। তাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে স্বর্গে দেবসভায় যেমন অপ্সরাগণ দেবনর্তকী, মর্তে তারাও সেরূপ দেবালয়ে দেবনর্তকী। তাদের ভরণপোষণের জন্য মন্দির থেকে বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকে। রাজা ও কোনো ধনী লোকের বাড়ির উৎসবেও তারা যোগ দিয়ে রোজগার করতে পারে। তারা বাইরের কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

প্রাচীন কালে মিশর, গ্রিস, সিরিয়া, ফিনিসীয়া প্রভৃতি নানা স্থানে দেবালয়ে এরূপ অনেক দেবনর্তকী ছিল। গ্রিসের ভিনাস দেবীর মন্দিরে কিছুকাল আগেও এরূপ ছিল। আর্মেনিয়ায় এই নিয়ম ছিল। ভারতেও বহুকাল থেকে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এক সময় উত্তর ভারতেও এরূপ দেবনর্তকী ছিল। এখন আর নেই। প্রবাদ আছে যে আসামের কামাখ্যার (দ্র) মন্দিরে এক সময় পাঁচ হাজার দেবদাসী ছিল। এখন দক্ষিণ ভারতে ছাড়া আর কোথাও দেবনর্তকী নেই। সেখানে এখনো তাদের বেশ সম্মান আছে।

বি. ব.

## দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭—১৯০৫]

ব্রাহ্মধর্মের (দ্র) অন্যতম প্রবর্তক। জন্ম ১৮১৭ সালের ১৫ই মে, কলিকাতার (দ্র) জোড়াসাঁকোয়। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের (দ্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) পিতা। খুব অল্প বয়সেই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের (দ্র) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হন।

পিতার বিশাল ব্যবসায়ে মনোযোগী না হয়ে তিনি ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের (দ্র) প্রচার-কাজে ব্রতী হন। ১৮৪৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ২ খণ্ডে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরেন। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (দ্র)



www.pathagar.com

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ব্রিটিশ–ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। ১৮৪৬ সালে তিনি হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু কলেজের (দ্র) অধ্যক্ষসভার সদস্য ছিলেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি পুরোপুরি ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের তিনিই আদি প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মধর্ম চর্চা ও উপাসনার জন্য শান্তিনিকেতন (দ্র) স্থানটি তিনি নির্বাচিত করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮), 'পত্রাবলী'। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন মহৎপ্রাণ তেমনই উদারহৃদয় ব্যক্তি। এ কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে সম্মানিত করে। তিনি লোকান্তরিত হন ১৯০৫ সালে।

আ. ই.

## দেবোত্তর

দেবোত্তর শব্দটির অর্থ দেবসেবার জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি। অর্থাৎ প্রতিমা নির্মাণ ও পূজা-অর্চনা, ব্রাহ্মণ ও কাঙালি ভোজন, ধর্মীয় উৎসব পালন (যথা—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ) ইত্যাদি করার জন্য উৎসর্গীকৃত সম্পত্তিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলা হয়। ইংরেজি এণ্ডাওমেণ্ট (endowment) কথাটির সঙ্গে দেবোত্তর কথাটির মিল থাকলেও শুধু দেব-দেবী বা ধর্মীয় কাজে সম্পত্তি উৎসর্গের মধ্যে কথাটির পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। এর উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক। দেবোত্তর বা ধর্মীয় দান নিম্নলিখিত কাজের উদ্দেশ্যেও করা যেতে পারে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, জনস্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন, আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দানের জন্য অতিথিশালা নির্মাণ ও সংস্কার-সংরক্ষণ এবং এই প্রকার আরো অনেক কাজ দেবোত্তরের আওতায় পড়তে পারে।

যে কোনো মানসিকভাবে সুস্থ, সাবালক হিন্দু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় তাঁর নিজস্ব সম্পদ ও সম্পত্তি উপরি-উক্ত কাজে উৎসর্গ করতে পারেন। উৎসর্গীকৃত সম্পদে দাতার আর কোনো স্বত্ব থাকে না এবং একবার দেবোত্তর সম্পদ নির্ধারিত হলে পরবর্তী কালে তা আর নাকচ করা যায় না।

দেবোত্তর দু'রকম হতে পারে—সম্পূর্ণ দেবোত্তর এবং আংশিক দেবোত্তর। নিজের অধিকার, স্বার্থ ও ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সম্পদ দান করার নাম সম্পূর্ণ দেবোত্তর। দানপত্রে যদি দেবসেবা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা জনগণের মঙ্গলের জন্য সম্পদের আয়ের ওপর বিশেষ কোনো নির্দেশ থাকে, তবে ঐ দানের নাম আংশিক দেবোত্তর। আংশিক দেবোত্তর উত্তরাধিকার পরম্পরায় বর্তায় এবং তা হস্তান্তরযোগ্য। তবে যে অবস্থাই থাক না কেন, এই সম্পত্তিতে দাতার নির্দেশ বহাল থাকে।

দেবোত্তরে কতকগুলি শর্ত থাকে এবং সে শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হয় : (ক) দাতাকে দেবোত্তর সম্পত্তি অবশ্যই শর্তহীনভাবে এবং চিরতরে দান করতে হয়, এবং যে যে উদ্দেশ্যে তিনি সম্পদ দান করেছেন, সুস্পষ্টভাবে তার উল্লেখ থাকতে হয়, (খ) দানের উদ্দেশ্য ও দানকৃত সম্পত্তি



www.pathagar.com

অবশ্যই সুনির্দিষ্ট থাকতে হয়।

দেবোত্তর সম্পত্তির দানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ লিখিত দলিলের দরকার হয় না। তবে ইচ্ছাপত্রমূলে দলিল সম্পাদন করতে হলে তা সাবলীল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে লিখতে হয়, দ্ব্যর্থবোধক যেন না হয়। ঐ ইচ্ছাপত্র দুই বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা আইনত সত্যায়িত করা প্রয়োজন। ইচ্ছাপত্র স্বেচ্ছায় সম্পাদন ও সত্যায়ন করা প্রয়োজন। কেবল দলিল সম্পাদন করলেই কোনো সম্পদ দেবোত্তর গণ্য হয় না। উৎসর্গীকৃত সম্পদকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে হয়।

যখন কোনো দাতা ভোগদখল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিষয়সম্পদকে দেবোত্তরে পরিণত করেন, তখন দেবতার পক্ষে সেই সম্পদ দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেবাইত বা মোহান্ত নিযুক্ত করতে হয়। তিনি শুধু পূজারী বা অর্চক নন, তিনি সম্পদের যাবতীয় কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বও পালন করেন।

শা. হ.

**দেশবন্ধু** চিত্তরঞ্জন দাশ দ্র
**দেশান্তরী পাখি** পাখি, পরিযায়ী দ্র

## দৈত্য

দিতির পুত্র। কশ্যপ ছিলেন বিখ্যাত পৌরাণিক ঋষি। তিনি দক্ষ রাজার তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই তেরো জন কন্যার নাম অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। এই তেরো কন্যা থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তেরোটি জাতির উদ্ভব হয়। অদিতি থেকে দেবতারা, দিতি থেকে দৈত্যগণ, দনু থেকে দানবগণ ইত্যাদি। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের চিরন্তন বিরোধ। দৈত্যদের প্রধান কাজ দেবতাদের যজ্ঞ ও পূজা নষ্ট করা। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনী ও জয়-পরাজয়ের বিবরণ রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র) ও পুরাণে বর্ণিত আছে। শাহনামায় (দ্র) মজিন্দিয়ানের দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রুস্তম জয়ী হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরব্য রজনী (দ্র), পারস্য রজনী, লোকসাহিত্য (দ্র), লোকগল্প ও পৃথিবীর প্রায় সব দেশের রূপকথায় (দ্র) দৈত্যদের প্রচুর কাহিনী পাওয়া যায়।

বি. ব.

## দৈনিক জিন্দেগী

সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এর প্রথম আত্মপ্রকাশকাল ১৯৪৮ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে (প্রথম সংখ্যা পাওয়া যায় নি)।

এটি প্রথমে অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয় (১৯৪৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ২য় বর্ষ ১২০ সংখ্যা পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন এস. এম. বজলুল হক। ১২১তম সংখ্যা থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত 'জিন্দেগী'র সম্পাদক ছিলেন কথাসাহিত্যিক কাজি আফসারউদ্‌দিন আহমদ।

পত্রিকাটির প্রকাশকালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো সংবাদসংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। মুদ্রণ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাও ছিল সীমিত। এমনকি চুক্তির ভিত্তিতে কলিকাতা (দ্র) থেকে ব্লক মেকার পর্যন্ত আনতে হয়েছিল।

পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কার্যালয় ছিল ঢাকার নারিন্দা এলাকায় ৪৭/২ ভজহরি সাহা স্ট্রিটে। কম্পোজ ও মেক-আপের কাজও হত এখানেই। মুদ্রিত হত শামসুল ইসলাম কর্তৃক বলিয়াদী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৭ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে। ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে দৈনিক জিন্দেগী নিজস্ব প্রেসে ছাপা হতে শুরু করে। প্রেসটি অবস্থিত ছিল এক সময়ের দৈনিক সংবাদ কার্যালয় ২৬৩ বংশাল রোডে।

মাত্র দু' বছরের আয়ুষ্কাল এবং সেই সময়কার পাঠককুলের নানা রক্ষণশীল মনোভাব সত্ত্বেও সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদনার বৈশিষ্ট্যে পত্রিকাটি ছিল সমুজ্জ্বল। পূর্ব-পাকিস্তানের তখনকার প্রবল প্রতিকূল পরিবেশেও একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশ করা যে সম্ভব 'জিন্দেগী'র প্রকাশনা তা প্রমাণ করে।

পত্রিকাটির প্রকাশনা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

আ. হু.

**দোঁহা** কবীর দ্র

## দোজখ

আরবি 'জাহান্নাম' ও ফার্সি 'দোজখ' শব্দ দু'টি সমার্থক। বাংলায় এর অর্থ নরক। হিব্রু 'Gehinnom' শব্দটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে আরবিতে এসেছে। এর অর্থ অগ্নিকুণ্ড।



www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্বাস মতে, দুনিয়ায় যারা তাদের প্রতিপালক স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, পরকালে তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হবে। এই অগ্নিকুণ্ডের নামই দোজখ বা জাহান্নাম।

কুরআন শরীফের (দ্র) একাধিক সুরায় জাহান্নাম বা দোজখের উল্লেখ আছে। দোজখের সংখ্যা সাতটি বলে কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। এগুলো হল : হুতামা, হাবিয়া, জাহিম, সা'ইর, সাকার, জাহান্নাম ও লাজা'।

মু. মা.

## দোতারা

তার দ্বারা নির্মিত লোকসঙ্গীতযন্ত্র। নাম দোতারা হলেও সর্বাধিক প্রচলিত দোতারায় তার থাকে চারটি, কখনো এই ধরনের দোতারায় পাঁচটি তার থাকতেও দেখা যায়। দুই তারে নির্মিত যে বিরল প্রচলিত দোতারা, তা একতারারই দুই তারযুক্ত রূপ। একতারার একটি কানেই দ্বিতীয় তারটি বেঁধে বা ভিন্ন একটি কান লাগিয়ে তাতে দ্বিতীয় তারটি বেঁধে দোতারা তৈরি করা হয়। দু'টি তারই এক স্বরে বাঁধা হয়ে থাকে। প্রচলিত দোতারা দেখতে সরোদের মতো। প্রায় চার ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠখণ্ড খোদাই করে এর অবয়ব তৈরি করা হয়। নিচের দিকটা দেখতে খোলের মতো হয় এবং তা চামড়ায় ছাওয়া হয় এবং তার ওপর একটি সওয়ারি বা ব্রিজ বসানো থাকে। ওপরের দিকটা থাকে ফাঁপা দণ্ডের মতো। দণ্ডের ওপরের দিকে কান বা চাবি বেঁধে তাতে তার জড়িয়ে দেওয়া হয়। তারগুলোকে সওয়ারির ভেতর দিয়ে নিয়ে নিচের

*দোতারা বাদক খ্যাতিমান শিল্পী কানাইলাল শীল*

প্রান্তে বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে। আঙুল চেপে বাজাবার পটরী অংশটি প্রায়শই ধাতব পাতে মোড়ানো হয়। ডান হাতে জবা দিয়ে তারে টোকা দিয়ে বাঁ হাতে স্বরস্থান চেপে দোতারা বাজানো হয়ে থাকে। এই দোতারাকে স্বরাজ বা সুরসংগ্রহ বলতেও দেখা যায়। দোতারা বাংলা লোকসঙ্গীতে বহুল ব্যবহৃত যন্ত্র।

ক. গো.

## দোভাষী সাহিত্য

'দোভাষী' শব্দটির জন্ম হয়েছে 'দ্বিভাষী' থেকে। 'দ্বিভাষী' অর্থ দুই ভাষার মিশ্রণ। সুতরাং 'দোভাষী' বলতেও দুই ভাষার মিশ্রণ বোঝায়। এখানে দুই ভাষা অর্থ বাংলা ও হিন্দুস্থানি। হিন্দুস্থানি ভাষায় আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দের বাহুল্য আগে থেকেই আছে। এখন বাংলার সঙ্গে আরবি-



www.pathagar.com

ফার্সি শব্দের মিলনে এবং হিন্দি ভাষা বলার ভঙ্গি মিশে যে বিশেষ কাব্যিক ভাষারীতি গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় দোভাষী রীতি।

১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) পতন ঘটে। তার পরও কিছু দিন বাংলাদেশে নবাবী শাসন চলে। পরে ইংরেজেরা বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে দেশে ছিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। সাহিত্যেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভাল সাহিত্য রচনা করারও কোনো পরিবেশ ছিল না। এই সময়ে মুসলমানেরা দোভাষী রীতিতে সাহিত্য রচনা করেছে, আর হিন্দুরা লিখেছে কবিগান। এসব সাহিত্য উন্নত মানের না হলেও জনসাধারণের রুচি মিটিয়েছে।

আসলে দোভাষী রীতি হল খোট্টা বাংলা। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে হুগলি নদীর তীরবর্তী এলাকার এবং কলিকাতা (দ্র) অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এ ভাষারীতি গড়ে ওঠে। তাঁদের অনেকেই ছিল দো-আঁশলা মুসলমান। অর্থাৎ তারা বিদেশ থেকে এসে বাংলাদেশে বসবাস করেছে। তাদের ফার্সি-আরবি ভাষার সঙ্গে তারা বাংলা শব্দকে বিকৃতভাবে মিশিয়েছে। এই ভাষাই দোভাষী ভাষা। একে কেউ কেউ 'মিশ্র ভাষা' বলেন, কেউ একে 'ইসলামী বাংলা' বা 'মুসলমানী বাংলা'ও বলেন। বাংলাতে আরবি-ফার্সি শব্দ বহু ঢুকেছে এবং অনেক মুসলমান ও হিন্দু কবি বাংলার সঙ্গে আরবি-ফার্সি শব্দ মিশিয়েছে। কিন্তু এই ভাষাকে দোভাষী বলা হয় না। দোভাষী রীতির বাক্‌ভঙ্গির মধ্যেই আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভাষার নমুনা নিচে দেওয়া হল :

১. যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
ছের জুদা কৈল যদি এমামের ধড়ে।
আরস কোরস লোহ কলম সহিতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে।

২. রাত গোজারিয়া গেল হইল বেহান।
নেরালা মহলে থাকি খোশালিত মন।

৩. পাহাড়ের রাহে সবে চলে নেকালিয়া।
কত দূর গিয়া সবে রহে উতারিয়া।

৪. বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই।
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।

দোভাষী ভাষায় রচিত কবিতাকে বলা হয় 'দোভাষী পুঁথিসাহিত্য', সংক্ষেপে দোভাষী সাহিত্য। দোভাষী কবিদের বলা হয় 'শায়ের'। অসংখ্য মুসলমান শায়ের দোভাষী সাহিত্য রচনা করেছেন। রচনার বিষয় ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, মধু-মালতী ইত্যাদি প্রেমের কাহিনী; ইসলামের নেতা বা বীর নায়কদের বীরত্ব-কাহিনী; ইসলামের ইতিহাসের যুদ্ধবিগ্রহ, পীরের মহিমা, রূপকথার কাহিনী এবং বিশেষ করে জঙ্গনামা অর্থাৎ কারবালার কাহিনী। এতে আছে হাসান-হোসেন-এজিদ হানিফার বৃত্তান্ত। সব কাহিনীই অতিরঞ্জিত, অবাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনায় ভরা।

দোভাষী সাহিত্য রচয়িতার সংখ্যা অনেক। এঁদের মধ্যে দুই জন বিখ্যাত—ফকীর গরীবুল্লাহ (দ্র) ও সৈয়দ হামজা। গরীবুল্লাহর পুথিগুলোর নাম 'ইউসুফ-জোলায়খা', 'জঙ্গনামা', 'সোনাভানের পুথি', 'সত্যপীরের পুঁথি' এবং 'আমীর হামজা'। 'আমীর হামজা' তিনি শেষ করতে পারেন নি, সৈয়দ হামজাই এ কাব্য শেষ করেন। সৈয়দ হামজার পুঁথিগুলির নাম 'মধুমালতী', 'জৈগুনের পুথি', 'হাতেম তাই'। অন্যান্য শায়েরেরা হলেন এয়াকুব আলী, আবদুল মজিদ ভুঁইয়া, মালে মোহাম্মদ, আবদুল মজিদ খোন্দকার, মুহম্মদ দানেশ, জনাব আলী, মুহম্মদ খাতের, আরিফ, আবদুর রহিম, আয়েজউদ্দীন, রেজাউল্লাহ, আমীরুদ্দীন, মুহম্মদ মুন্সী এবং আরো অনেকে। এই কবিরা প্রায় শ' তিনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। সুতরাং দোভাষী সাহিত্য এক ব্যাপক বিরাট সাহিত্য। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পরে এবং আধুনিক যুগ আরম্ভ হওয়ার আগে এক বিশেষ সময়ে এই সাহিত্যের প্রসার হয়েছিল।

আ. ক.

## দোম আন্তোনিও

যশোর-ফরিদপুর এলাকাভুক্ত ভূষণার রাজকুমার। দোম আন্তোনিও দো রোজারিও বা সংক্ষেপে দোম আন্তোনিও ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে প্রথম খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রচারক। তরুণ বয়সে মগ বা পর্তুগিজ জলদস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে। কিন্তু পরে এক পর্তুগিজ ধর্মযাজক তাঁকে



www.pathagar.com

উদ্ধার করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ভূষণায় ফিরে তিনি তাঁর স্ত্রীসহ কয়েক জন আত্মীয়কে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য পৈতৃক জমিদারি কোষাভাঙ্গায় একটি মিশন স্থাপন করেন, যা পরে ভাওয়াল গাজীপুরের কাছে নাগরী গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই গির্জাটি আজো দোম আন্তোনিওর স্মৃতি বহন করছে। দোম আন্তোনিওর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত জানা যায় না। তবে তাঁর 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়।

মে. খা.

## দোয়েল

বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় পাখি। এটি *Muscicadae* পরিবারবর্গের ও *Urdinae* উপগোত্রের পাখি। বিশ্বে এর প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি ৩১০টি আছে। সুন্দর পাখি। মিষ্টি-মোলায়েম শিস দেয়। লেজের ডগা নাচায়। স্ত্রী-পুরুষের রঙ, আকার ও চেহারায় প্রভেদ আছে। লম্বাটে লেজ।

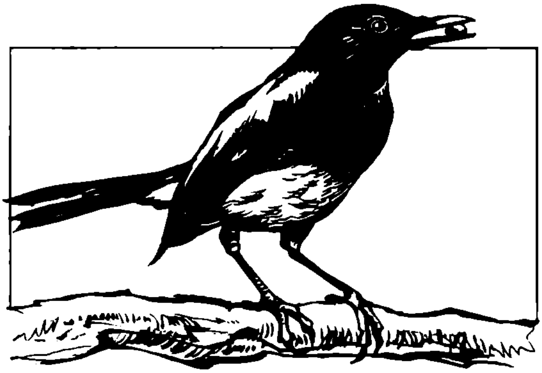

বন-বাগান-মাঠঘাট-বাড়িঘরের আশেপাশে থাকে। শহরেও আছে।

সুন্দর দোয়েলেরা হচ্ছে সাধারণ দোয়েল (ম্যাগপাই রবিন), কালো দোয়েল (ইণ্ডিয়ান রবিন), কালো পিঠ দোয়েল, থ্রাশ, হুইনচাট ইত্যাদি।

এরা পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ (দ্র) খায়। গলা মিষ্টি। ডাকে—টিই-ই-টিক, টুটু, হুইট, পিইপিইট। দরদালানের ফাঁক-ফোঁকরে ও গাছের প্রাকৃতিক খোঁড়লে, কেউ কেউ মাটিতে, কেউ-বা ঝোপঝাড়ে বাসা করে। ডিমের সংখ্যা ৩ থেকে ৭টি। ডিমের রঙ সাদা। কারো-বা নীলচে। সাহসী পাখি। সর্তক চোখ। চঞ্চল গতি। শক্ত ঠোঁট। বাসার কাছে বন্যজন্তু ও সাপ দেখলে তেড়ে যায়। জোড়ায় জোড়ায় থাকে। নিজের এলাকায় অন্য কাউকে ভিড়তে দেয় না। অনেকেই শীতে পরিযায়ী বা দেশান্তরী হয়। ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

বাংলাদেশে আছে দোয়েল, কালো দোয়েল, কালো থ্রাশ ইত্যাদি।

শ. খা.

## দোল

একটি বসন্তকালীন উৎসব। উত্তর-ভারতে এটি হোলি আর বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণের (দ্র) ঝুলনউৎসব বা দোলযাত্রা নামে পরিচিত। ফাল্গুনের শুক্লা একাদশী থেকে পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত এই উৎসব হয়ে থাকে। তবে সর্বত্র এটি এক নিয়মে পালিত হয় না। এর তিনটি অঙ্গ আছে। ফাল্গুন মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে 'বুড়ির ঘর' বা মেড়া পোড়ানো হয়। তার পরদিন রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে আবির কুঙ্কুমে রাঙানো হয়। সেদিন একে অপরের সঙ্গে রঙ মাখামাখি করে নানা খেলায় মেতে ওঠে। উৎসবের তৃতীয় অঙ্গটি কেবল মুর্শিদাবাদ, রংপুর অঞ্চলের দিকে দেখা যায়। দোলের ৩/৪ দিন পরে এক জনকে সঙ বা 'হোলির রাজা' সাজিয়ে গ্রামে ঘোরানো হয়। 'রাজা' চলতি পথে যাকে পান তার কাছ থেকে খাজনা আদায় করেন। সেই খাজনায় সকলের আমোদ-প্রমোদ চলে। বসন্তকালের কয়েকটি স্বতন্ত্র উৎসব একত্র হয়ে দোল বা হোলি উৎসবের প্রচলন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবে বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়।

সুজ. ব.

## দোহাকোষ

দুই লাইনের এক বিশেষ হিন্দি কবিতা বা গানকে বলা হয় 'দোহা'। এই রীতিতে সংক্ষিপ্ত ভাবমূলক কবিতাও দোহা নামে পরিচিত। 'দোহা' ছন্দমিলের কবিতা, অনেকটা ছড়ার মতো। জীবনের ও ধর্মের অনেক গূঢ় গভীর কথা দোহাতে বলা হয়েছে। অনেকগুলি দোহার সমষ্টিকে বলা হয়



www.pathagar.com

দোহাকোষ। নাসিক্য উচ্চারণে 'দোহা' হয় 'দোঁহা'। যেমন কবীরের দোঁহা। কবীর ছিলেন উত্তর ভারতের এক জন সাধক। আর কবীরের দোঁহাও খুব সুন্দর ভক্তিগান। অবশ্য কবীরের আগেও দোহা রচিত হয়েছে এবং তা হয়েছে অবহট্‌ঠ ভাষায়। বাংলা, আসামী, উড়িয়া ইত্যাদি আধুনিক ভাষাগুলোর আগে লোকসমাজে যে ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিল তার নাম 'অপভ্রংশ' বা 'অবহট্‌ঠ' ভাষা। ন' শতক থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত গুজরাট থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এলাকায় এই ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এই ভাষায় অনেক সুন্দর সুন্দর সাহিত্যও রচিত হয়েছে। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (দ্র) নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে 'চর্যাপদ' (দ্র) পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং এই পুঁথি বাংলা ভাষার (দ্র) আদি নিদর্শন বলে আমরা জানি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুঁথির সঙ্গে আরো পেয়েছিলেন কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং সরোজবজ্রের অর্থাৎ সরহের 'দোহাকোষ'। এগুলো অবহট্‌ঠ ভাষায় লেখা। দোহাকোষের জন্য সরহ বিখ্যাত। তিনি এক জন সিদ্ধাচার্য অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি ঠিক কোন সময়ের লোক তা স্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। কারো মতে তিনি আট শতকের লোক, কারো মতে তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। তবে, অনেকগুলি দোহার রচয়িতা তিনি। এই সব দোহায় জীবন সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে খুব সুন্দর সুন্দর বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে ধর্মের কথা সহজে বুঝতে পারে সে জন্য তিনি সহজ অবহট্‌ঠে লিখেছেন। বৌদ্ধরা ত্যাগধর্মে বিশ্বাসী। জীবনের লোভ-মোহ, আসক্তিকে বিনাশ করলেই পরম মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়—এই উপদেশ সরহের দোহাকোষে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, তিনি প্রশ্ন রেখেছেন—

কিং তো দীবে কিং তো নিবেজ্জেঁ।
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বেঁ ॥
কিং তো তিথ-তপোবন জাই।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পানী ন্‌হাই ॥

[দীপ জ্বালিয়ে কী হবে, নৈবেদ্য দিয়েও কী লাভ ? মন্ত্রের সেবা করে কী হবে ? তীর্থে তপোবনে গিয়েই-বা কী হবে? পানিতে গিয়ে কি মোক্ষ লাভ হবে ? ]

এইভাবে বৌদ্ধধর্মের অনেক মূল্যবান কথা সরহের দোহাকোষে আমরা পাই। সরহ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর জ্ঞানের গভীর পরিচয় রয়েছে তাঁর 'দোহাকোষে'।

আ. ক.

## দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান

দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিশিষ্ট কবি। তিনি 'লায়লী-মজনু' (দ্র) কাব্যের প্রণেতা। এই কাব্যে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (দ্র) রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) হামিদ খান নামে এক উজীর ছিলেন। তিনি সুলতানের অতি প্রিয়ভাজন ছিলেন। সুলতান তাঁকে চট্টগ্রামের (দ্র) দু'টি পরগনা জায়গীর দেন এবং তাঁকে চট্টগ্রামের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এতে হামিদ খান চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এর মধ্যে চট্টগ্রাম গৌড়ের শাসন থেকে আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে আসে। বহুদিন পর জনৈক নিজাম শাহ হন চট্টগ্রামের শাসক। তিনি আরাকানরাজের প্রতিনিধি হয়ে চট্টগ্রাম শাসন করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, এই নিজাম শাহের নামেই চট্টগ্রামের নিজামপুর পরগনার নাম হয়। নিজামপুর পরগনা হল একালের সীতাকুণ্ড থানার উত্তর অংশ এবং সমগ্র মীরসরাই থানা। নিজাম শাহের রাজধানী ছিল ফতেয়াবাদে। এই সূত্রে সমগ্র চট্টগ্রামের নামও হয় ফতেয়াবাদ। পূর্বোক্ত হামিদ খানের বংশের পরবর্তী এক বংশধর মুবারক খান সে সময় এক জন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। নিজাম শাহ তাঁকে 'দৌলত উজীর' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী বা দেওয়ানের পদে বরণ করেন। মুবারকের পুত্র হলেন বাহ্‌রাম খান। কী একটা কারণে মুবারক হঠাৎ মারা যান। তখন বাহ্‌রাম খানের বয়স কম, কিশোর মাত্র। নিজাম শাহ কিন্তু মুবারকের এই কিশোর ছেলেকেই দৌলত উজীরের পদটি দিয়ে দেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান। বাহ্‌রাম খান নিজাম শাহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। নিজাম শাহ ছোটখাটো রাজা বা জমিদার; কিন্তু বাহ্‌রাম খান তাঁর কাব্যে নিজাম শাহকে খুব বড় বাদশাহ বলতে চেয়েছেন। কবি জনৈক মীর আসাউদ্দীনের শিষ্য ছিলেন বলেও কাব্যে উল্লেখ আছে।

দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান ষোল শতকের কবি। ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি 'লায়লী-মজনু' কাব্যখানি রচনা করেন। 'লায়লী-মজনু' কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা এবং এটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। তাঁর প্রথম রচনা হল 'কারবালাকাহিনী' অর্থাৎ জঙ্গনামা বা মক্তুল হোসেন।



www.pathagar.com

মুসলিম জগতে লায়লী-মজনু একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান। কখন এ কাহিনী চালু হয়েছে তা বলা যায় না। লায়লী নামে একটি মেয়ে ও মজনু নামে একটি ছেলের কল্পিত প্রেমকাহিনী যুগে যুগে বহু ভাবুক ও কবিকে আনন্দ দিয়েছে। অনেকে এ কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব খুঁজে পেয়েছেন। লায়লী ও মজনু নাম দেখে মনে হয়, এই কাব্যের উৎস হচ্ছে আরব দেশ। কিন্তু আরবি সাহিত্যে 'লায়লী-মজনু' নামের কাব্য আছে বলে মনে হয় না। তবে ফার্সি ও হিন্দুস্থানি ভাষার বহু কবি লায়লী-মজনু কাহিনী লিখেছেন। আর বাংলা ভাষায় এ কাহিনী নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান। মধ্যযুগের অনেক মুসলমান কবি ফার্সি ও হিন্দুস্থানি ভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্যের অনুবাদ করেছেন। লায়লী-মজনুও এইভাবে রচিত হয়ে থাকবে। ফার্সি ভাষায় লায়লী-মজনু লিখেছেন বহু কবি। এঁদের মধ্যে নিজামী (বারো শতক), আমীর খসরু (তেরো শতক), জামী (পনের শতক) প্রমুখ বিখ্যাত।

দৌলত উজীর সম্বন্ধে বলা হয়, তাঁর 'লায়লী-মজনু' জামীর কাব্যের ভাবানুবাদ। কেউ নিজামীর কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু দৌলত উজীর কোথাও তাঁর অনুবাদের উৎসের কথা বলেন নি। মনে হয়, কবি ফার্সি 'লায়লী-মজনু' কাব্য ভালভাবে পড়ে নিয়েছিলেন এবং সেগুলোর অনুসরণে বাংলা ভাষায় স্বাধীন রচনা হিসাবে লায়লী-মজনু কাহিনী লেখেন। দৌলত উজির কাব্যটি লিখেছেন খুব চমৎকার করে। এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কাব্য। এই কাব্যে গূঢ় ভাব অপেক্ষা মানবিক আবেদন বেশি। দৌলত এক জন ভাল শিল্পী। তাঁর ভাষায়, অলঙ্কারে ও ছন্দে এর পরিচয় ভূরি ভূরি। জনপ্রিয় মুসলিম উপাখ্যান লায়লী-মজনুকে অত্যন্ত সার্থকভাবে বাংলা ভাষায় রূপদান দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের বড় কৃতিত্ব।

আ. ক.

## দ্য কুবের্ত্যাঁ, পিয়ের্ [১৮৬৩—১৯৩৭]

অলিম্পিক গেম্‌স্ (দ্র) পুনরায় চালু করার ব্যাপারে মুখ্য ব্যক্তি।

পিয়ের্ দ্য কুবের্ত্যাঁ (Pierre de Coubertin) ছিলেন

*পিয়ের্ দ্য কুবের্ত্যাঁ*

ফরাসি এবং জন্মেছিলেন অভিজাত বংশে, 'ব্যারন্' ছিল উপাধি। প্রথম যৌবনে বহু দেশ ঘুরে দেখার ফলে তাঁর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে অ্যামেচার বা শৌখিন শরীরচর্চার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ১৮৮৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ভ্রমণকালে রাগ্‌বি খেলা দেখে ও পড়াশোনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁর স্বদেশ ফ্রান্সে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনে তিনি এমন একটা কিছু চালু করবেন যাতে মনের বিকাশের সঙ্গে দেহের পুষ্টিসাধন হয়।

ওদিকে গ্রিসের অধিবাসীরা এথেন্স নগরীতে অলিম্পিক খেলাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যম নিয়েছিল। কিন্তু তারা ১৮৫৯, ১৮৭০, ১৮৭৫ ও ১৮৮৮ সালে ক্রীড়ানুষ্ঠান করলেও তা ঠিক সফল হচ্ছিল না। দ্য কুবের্ত্যাঁ এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে চালু করার আন্দোলন শুরু করে দেন। ১৮৯২ সালে সর্বন-এ (Sorbonne) তিনি এক প্রতিনিধি-সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুন এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কংগ্রেস আহূত হয়। তাতে বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রিক, ইতালি, রাশিয়া (দ্র), স্পেন, সুইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) থেকে ডেলিগেট এসেছিলেন এবং সেই কংগ্রেসেই দ্য কুবের্ত্যাঁ অলিম্পিক গেম্‌স্ চালু করার প্রস্তাব করেন ও তা সকলে সমর্থন করেন। অতঃপর ফ্রান্সেই অলিম্পিক গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা যখন তিনি গ্রহণ করেন তখন সকল সদস্যের পুনর্বিবেচনায় ঠিক হয় যে অলিম্পিক খেলার জন্মভূমি গ্রিসেই প্রথম অলিম্পিক গেম্‌স্



www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এবং অতঃপর ১৮৯৬ সালে এথেন্সে নতুন পর্যায়ে অলিম্পিক গেম্‌সের সূত্রপাত হল।

দ্য কুবের্ত্যাঁর প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে অলিম্পিক গেম্‌স্ শুরু হত কি না বা হলেও কবে হত তা বলা শক্ত।

হা. মা.

**দ্য গল্, শার্ল্** [১৮৯০—১৯৭০]

সমরনেতা, রাষ্ট্রনায়ক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের সাহসী যোদ্ধা। দ্য গলের (Charles de Gaulle) জন্ম ১৮৯০ সালের ২২শে নভেম্বর, ফ্রান্সে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের মে মাসে নাৎসি (দ্র) বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে নিলে তিনি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ ক'টি সফল ট্যাঙ্ক অভিযান চালান, লাভ করেন মার্শাল উপাধি। বিজয়ী নাৎসি বাহিনীর

*শার্ল্ দ্য গল্*

কাছে ক্ষমতাসীন ফরাসি সরকার আত্মসমর্পণ করলে দ্য গল্ লণ্ডনে পালিয়ে যান এবং বেতারযোগে স্বদেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধসংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাতে থাকেন। ফলে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে দ্য গল্ যখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন, তখন শুরু হয় আলজেরীয় যুদ্ধ এবং স্বদেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ। তাঁকে অবিলম্বে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এ বছরই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আলজেরীয় সঙ্কট নিরসন করেন।

রাষ্ট্রনেতা হিসাবে দ্য গলের কৃতিত্ব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ন্যাটো (দ্র) সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭০ সালের ৯ই নভেম্বর।

আ. হ.

**দ্যুমা, আলেক্সাঁদ্র্** [১৮০২—১৮৭০]

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক। নাট্যকার হিসাবেও সমধিক খ্যাত। দ্যুমা (Alexandre Dumas) ১৮০২ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন।

আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা এক জন সাধারণ কেরানি হিসাবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। এর পর তিনি ঘটনাবহুল নাটক রচনা করে এক দিকে যেমন খ্যাতির অধিকারী হন, তেমনি বিত্তেরও মুখ দেখেন। অবশ্য নাট্যকার হিসাবে তাঁর যে পরিচয় এবং খ্যাতি, কালক্রমে তা ঢাকা পড়ে যায় ঔপন্যাসিক দ্যুমার জনপ্রিয়তার কাছে। তিনি প্রায় শ'খানেক ছোট-বড় উপন্যাস রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে বিশ্বখ্যাতি ও কালজয়ী মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে 'কাউন্ট অব মণ্টি ক্রিস্টো' (দ্র), 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' (দ্র), 'টোয়েন্টি ইয়ার্স্ আফটার', 'ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক' ইত্যাদি।

১৮৭০ সালে আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা স্বদেশেই মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

**দ্বন্দ্বযুদ্ধ** ডুয়েল দ্র



www.pathagar.com

*দ্বারকানাথ ঠাকুর*

**দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স** [১৭৯৪—১৮৪৬]

সমাজহিতৈষী এবং শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ১৭৯৪ সালে কলিকাতায় (দ্র) তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রাসমণি ঠাকুর ও মাতার নাম মেনকা দেবী। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র ও কবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। দেশে-বিদেশে তিনি 'প্রিন্স' নামে খ্যাত।

বাল্যকালে শেরবোর্ন নামক এক ইংরেজ ফিরিঙ্গির স্কুলে ও পরে উইলিয়াম অ্যাডাম্‌সের নিকট ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। ব্যবহারশাস্ত্রও ক্রমে তাঁর আয়ত্তে এসে যায় এবং তিনি কিছুকাল আইন ব্যবসা করেন। সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারদের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হন তিনি। এর পর নতুন নতুন জমিদারি ক্রয় করেন। ১৮২৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের দেওয়ান হন এবং কর্মদক্ষতা ও সততাগুণে ছয় বছর পরে তিনি শুল্ক-লবণ ও অহিফেন বোর্ডের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেন।

দ্বারকানাথ বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক জন অগ্রণী পুরুষ। তাঁর উদ্যোগে ১৮২৯ সালে ইউনিয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি এর অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি বীমা কোম্পানিরও পরিচালক ছিলেন। তিনি ছিলেন সরকারি সেভিংস ব্যাংকের প্রথম আমানতকারী।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে যুগ্ম মালিকানায় দ্বারকানাথ ১৮৩৪ সালে 'কার অ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানি' নামে একটি বাণিজ্যসংস্থা স্থাপন করেন। এই সূত্রে রেশম ও নীল রপ্তানি, কয়লাখনি ক্রয়, চিনির কল স্থাপন এবং জাহাজ মেরামত ও নির্মাণ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর বাণিজ্যের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৮১৯ সালে রামমোহন রায়ের (দ্র) 'আত্মীয় সভা'র (দ্র) সদস্য হন। এ সময় তিনি অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮২৯ সালে রামমোহনের উৎসাহে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও 'বঙ্গদূত' নামক পত্রিকা দু'টি প্রকাশের দায়দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' নামক ইংরেজি পত্রিকারও অংশীদার হন। তিনি ১৮৩৩ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজের পরিচালক ছিলেন। এই কলেজের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা' স্থাপনের জন্য উদ্যোগগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৩৫ সালে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সমর্থক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্রদের তিনি পারিতোষিক দান করতেন।

দ্বারকানাথ ১৮৩৮ সালে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪২ সালে প্রথম বিলাত গিয়ে তিনি রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। দেশেও তিনি 'জাস্টিস অব দ্য পীস' রূপে সম্মানিত হন। ১৮৪৫ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যান এবং ১৮৪৬ সালে ১লা আগস্ট সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

**সুজ. ব.**



www.pathagar.com

**দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** [১৮৪০—১৯২৬]

কবি, দর্শনতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, বাংলা শর্টহ্যাণ্ড এবং স্বরলিপির উদ্ভাবক। ১৮৪০ সালের ১১ই মার্চ কলিকাতার (দ্র) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তার জন্ম। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) জ্যেষ্ঠ পুত্র।

গৃহে বাল্যশিক্ষা শেষ করে সেন্ট পল্‌স্ স্কুল ও হিন্দু কলেজে (দ্র) শিক্ষাগ্রহণ করেন, কিন্তু ১৮৫৫ সালে কলেজ ত্যাগ করেন। তবে আপন ইচ্ছানুযায়ী তিনি জ্ঞানচর্চা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে যান। ২০ বছর বয়সে তিনি 'মেঘদূতে'র (দ্র) পদ্যানুবাদ করেন এবং ১৮৬০ সালে তা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি স্বদেশী চেতনার প্রতীক 'হিন্দুমেলা'য় যোগ দেন। ১৮৭০-৭৩ সাল পর্যন্ত হিন্দুমেলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৪ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের (দ্র) সম্পাদক ছিলেন।

১৮৭৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৭ বছর তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৯১ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৮৯৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (দ্র)-এর 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন এবং ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বছর তিনি পরিষদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ন্যাশনাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক একটি সাহিত্য-সভার উদ্যোক্তা ছিলেন।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে তিনি শান্তিনিকেতনে (দ্র) চলে যান এবং ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি সেখানেই পরলোকগমন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : কাব্য—'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৩), 'কাব্যমালা' (১৯২২); প্রবন্ধপুস্তক—'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন' (১৯০০); 'আচার্যের উপদেশ' (২ খণ্ড : ১৯০০-১৯০২) 'গীতপাঠ' (১৯১৫), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০) ইত্যাদি।

সুজ. ব.

**দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** [১৮৬৩—১৯১৩]

বাংলা ভাষার (দ্র) এক জন শক্তিশালী নাট্যকার। কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা

শিখবার জন্য বিলেত যান। সেখানে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও অভিনয় সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থাতে ১৮৮২ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' প্রকাশিত হয়। বিলেত থেকে দেশে ফিরে তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন এবং ১৯১৩ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সে বছরই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু জীবদ্দশাতেই তিনি নাট্যকার, কবি ও গীতিকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক (দ্র) এবং প্রহসন (দ্র) রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। 'রাণা প্রতাপাদিত্য' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'শাজাহান' (১৯০৯) এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) তাঁর সুপরিচিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর সামাজিক নাটক 'পরপারে' (১৯১২) এবং পৌরাণিক নাটক



www.pathagar.com

'সোরাব-রুস্তম' (১৯১২) এক সময় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি 'সীতা' (১৯০৮) ও 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নামক দু'টি কাব্যনাটকও রচনা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বাংলা গানের ক্ষেত্রে। তাঁর গান বাংলা সঙ্গীতজগতে 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' নামে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। দেশপ্রেম, মানবিক ভালবাসা এবং ব্যঙ্গকৌতুক তাঁর গানের তিন প্রধান ধারা। দেশপ্রেমমূলক গানের মধ্যে 'ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এবং 'বঙ্গ আমার জননী আমার' ও হাসির গানের মধ্যে 'নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো/নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো/পাগুলো সব উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটো' প্রভৃতি বহুল পরিচিত।

ক. চৌ.

## দ্বীপান্তর / কালাপানি

কলিকাতা (দ্র) ও মাদ্রাজ থেকে যথাক্রমে ১২৫৫ ও ১২৯১ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের (দ্র) বুকে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেল (দ্র)। ইংরেজদের চোখে বিপজ্জনক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বন্দি করে আন্দামান দ্বীপে প্রেরণের ঘটনাই 'দ্বীপান্তর' বা 'কালাপানি' নামে অভিহিত। ১৯১০ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এই রকম প্রায় ৬শ জনকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। বাংলার কোনো অখ্যাত কবির লেখা গানের 'অভিরামের দ্বীপ চালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি'—এই পঙ্ক্তির ভেতর দিয়ে 'দ্বীপান্তর' শব্দটি আরো ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

কয়েদিদের জনমানবশূন্য প্রত্যন্ত দ্বীপে চালান দেওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। ইংরেজেরা ১৭৮৯ সালেরও বহু আগে থেকে তাদের নিজেদের দেশের কয়েদিদের অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে চালান করে দিত। এশিয়া মহাদেশেও (দ্র) তারা সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জ, পেনাং, মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন দ্বীপে একই রকম কয়েদি-উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে (দ্র) ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (দ্র) পরাজিত হলে ইংরেজেরা তাঁকে পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ১৮০০ কিলোমিটার দূরবর্তী নির্জন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দি করে রেখেছিল। এখানেই নেপোলিয়ন মৃত্যুবরণ করেন ১৮২১ সালের ৫ই মে।

আ. হ.

## দ্রবণ / দ্রাবক

বিশুদ্ধ পানির কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই। অল্প পরিমাণ পানি (দ্র) দেখতে বর্ণহীন, কিন্তু গভীর স্তরে পানির রঙ নীলাভ দেখায়। পানির ভিতর দিয়ে তাপ (দ্র) ও বিদ্যুৎ (দ্র) ভাল চলতে পারে না। তাই একে তাপ ও বিদ্যুতের কুপরিবাহী (bad conductor) বলা হয়। বাতাসের (দ্র) স্বাভাবিক তাপে পানি ০° সে. তাপাঙ্কে জমে বরফ হয় এবং ১০০° সে. তাপামাত্রায় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

এক গ্লাস পানিতে কিছু চিনি (দ্র) বা লবণ (দ্র) ফেললে তা অতি সহজেই গলে যায়। এভাবে যে তরল পদার্থে কোনো কিছু গলে যায় তাকে দ্রাব (solute) বলা হয়। দ্রাব ও দ্রাবক মিলে যে মিশ্রণের সৃষ্টি হয় তাকে বলে দ্রবণ বা দ্রব (solution)। লবণ (দ্রাব)+পানি (দ্রাবক)= লোনা পানি (দ্রবণ)। পানি অনেক জিনিসকে গলাতে পারে বলে একে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রাবক বা সার্বিক দ্রাবক বলা হয়। উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে যে রস বা পানি সংগ্রহ করে তাতে উদ্ভিদের নানা রকম খাদ্য দ্রবীভূত থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থাতেই খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন (দ্র) আমাদের দেহের মধ্যে নানা অংশে পৌঁছায়। জামাকাপড় ধুলে তার ময়লা পানিতে গলে যায় বলে সেগুলো পরিষ্কার হয়।

পরীক্ষা : একটি বাটিতে কিছু পানি নিয়ে অল্প অল্প লবণ দিয়ে নাড়তে থাকলে খানিকক্ষণ পরে দেখা যাবে, নাড়লেও লবণ আর গলে না। এ অবস্থাকে বলা হয় সম্পৃক্ত (saturated) দ্রবণ। এবার বাটিতে তাপ দাও। এখন আরো খানিকটা লবণ গলে যাবে। এতে বোঝা যায়, উষ্ণ পানির দ্রবণক্ষমতা ঠাণ্ডা পানির চেয়ে বেশি। যে দ্রবণে আরো দ্রাব দিলে গলে যায় তাকে অসম্পৃক্ত (unsaturated) দ্রবণ বলে। পানিতে শুধু নানা রকম কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হয় না, বাতাস ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থ এবং নানা রকম তরল পানিতে মিশে দ্রবণ সৃষ্টি করে।

পরীক্ষণ : একটি দাগকাটা সিলিণ্ডারে খানিকটা পানি এবং অন্য একটি দাগকাটা সিলিণ্ডারে কিছুটা অ্যালকোহল



www.pathagar.com

(স্পিরিট) নিয়ে দু'টিকে এক সঙ্গে মিশিয়ে নিলে দেখা যাবে মিলিত আয়তন উভয়ের নিজস্ব আয়তনের যোগফলের চেয়ে কম। কেন এমন হল ? এর কারণ, তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা আছে।

আ. হ. খ.

**দ্রাক্ষা** আঙুর দ্র

## দ্রাবিড়ভাষী জাতি

ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন ভাষার নাম দ্রাবিড়। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে থেকে এই ভাষাভাষী মানুষ এ দেশে বসবাস করে আসছে বলে অনুমান করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ হরপ্পা (দ্র) ও মহেনজোদারো (দ্র) নগর-সভ্যতার রূপকার সম্ভবত এরাই। সুন্দর পরিকল্পনায় শহর তৈরিতে এরা ছিল দক্ষ। খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শতকের দিকে বহিরাগত আর্যভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা এদের পরাস্ত করে এই সভ্যতার বিনাশ ঘটায়। আর্যগণ ভারতীয় উপমহাদেশের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করতে থাকে, ততই দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের দিকে সরে আসে। দক্ষিণ ভারতে এখনো এই ভাষাভাষীর লোকদের সংখ্যা প্রচুর। প্রায় বিশটি আধুনিক ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে তামিল, তেলুগু কানাড়ি এবং মালয়ালম্ সুপরিচিত। এসব ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের প্রাধান্যের কারণে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তাদের জন্য আলাদা আলাদা প্রদেশ বা রাজ্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে। আর্যভাষী জাতিদের (দ্র) বর্ণবাদ দ্বারা এরা যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমন দ্রাবিড়ভাষীদের আচার-সংস্কার ও পূজা-অর্চনার পদ্ধতি আর্যদেরও প্রভাবিত করেছে।

সৈ. আ. ই.

## দ্রৌপদী

মহাভারতের (দ্র) একটি বিশিষ্ট চরিত্র। পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা, তাই তাঁর নাম দ্রৌপদী। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে দ্রোণকে বধ করার জন্য পুত্রসন্তান লাভের ইচ্ছায় রাজা দ্রুপদ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে দ্রোণহন্তারক ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে দ্রৌপদীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের জন্মকালে আকাশবাণী হয় যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বধ করবেন ও যাজ্ঞসেনী ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদের মহৎ কর্ম সাধন করবেন এবং তাঁর দ্বারা কৌরবকুল বিনষ্ট হবে।

দ্রৌপদীকে চিরযুবতী, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপভূষিতা, রন্ধননিপুণা, সেবাপরায়ণা ইত্যাদি নানাবিধ রূপ ও গুণের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বয়ম্বর বা বরগ্রহণ সভায় পঞ্চবাণ দিয়ে আকাশযন্ত্র ও দুর্জয় ধনুর লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেন। এই বরগ্রহণ সভায় অর্জুনের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সবাই অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবও উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভের পর তাঁকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মাতা কুন্তীর নিকট আসেন। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা মাতাকে বলেন যে তাঁরা এক অপূর্ব সামগ্রী ভিক্ষা করে এনেছেন। মাতা সেই সামগ্রী না দেখেই ঘরের ভেতর থেকে সন্তানদের নির্দেশ দেন—'তোমরা সকলে মিলে সেই জিনিস ভাগ করে নাও।' তিনি তো আর জানতেন না যে ঐ সামগ্রীটি কোনো বস্তু নয়, মানুষ। যাই হোক, তখন ব্যাসদেবের বিধান মতে পঞ্চপাণ্ডব অর্থাৎ পাঁচ ভাইয়ের সকলের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হয়।

বিবাহের পর ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাসকালে এক বার নারদ পঞ্চপাণ্ডবের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর পরামর্শে ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির হয় যে দ্রৌপদী এক জন পাণ্ডবের গৃহে এক বছর করে বাস করবেন। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর যথাক্রমে 'প্রতিবিন্ধ্য', 'সুতসোম', 'শ্রুতকর্মা', 'শতানীক' ও 'শ্রুতসেন' নামে পাঁচ পুত্র হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে।

যুদ্ধজয়ের পর কিছুকাল রাজ্য ভোগ করে রাজ্যভার পরীক্ষিৎকে দিয়ে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। তখন দ্রৌপদীও তাঁদের সঙ্গিনী হন। হিমালয়, বালুকার্ণব মেরুপর্বত পার হয়ে চলার পথে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত দোষে দ্রৌপদীর পতন হয়। অর্জুনের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকলেও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ভীমসেনকেই তিনি স্মরণ করতেন।

সুজ. ব.



www.pathagar.com

# ধ

**ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়** [১৮৯০—১৯৩৬]

কবি, শিশুসাহিত্যিক, মার্কিন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারক। জন্ম কলিকাতায় (দ্র)। পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতসাধক ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিপ্লবী। আরেক ভাই ক্ষীরোদগোপালও ছিলেন তা-ই।

পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাবে ধনগোপাল অল্প বয়সেই সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় উদ্বুদ্ধ হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (১৯০৮) দিয়েই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার অছিলায় প্রথমে জাপানে (দ্র) যান, পরে সেখান থেকে আমেরিকায় (দ্র)। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে গুপ্ত সমিতি গঠন। দু' দেশেই তাঁকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু এত কষ্টের ভিতরেও তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে বি. এ. পাশ করেন। তার পর সাহিত্য রচনার দিকে মনোযোগী হন।

ধনগোপালের সমস্ত বই-ই ইংরেজি ভাষায় (দ্র) রচিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'Rajani' ছিল কাব্য, আর দ্বিতীয় বই 'Layla Maznu' ছিল নাটক। সাহিত্যিক হিসাবে ক্রমশ পশ্চিম জগতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর 'A Son of Mother India Answers' রাজনৈতিক বই হিসাবে খুব আলোড়ন তুলেছিল। ক্যাথরিন মেয়ো নামে এক মহিলার

*স্ত্রী প্যাট (এথেল্ রে ডুগান) ও ধনগোপাল*

*জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ধনগোপালের ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘদিনের। আমৃত্যু অসংখ্য পত্রালাপ ছিল দু'জনের। পত্রের বিষয় ছিল, বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও অর্থনীতি বিষয়ে। ছবিতে জওহরলাল, ধনগোপাল ও অন্যান্য*



www.pathagar.com

লেখা ভারতবিদ্বেষী বই 'Mother India'-র জবাব ছিল ঐ বই। 'My Brother's Face' এবং 'Caste and Outcaste' নামে আত্মজীবনীমূলক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি ইংরেজি ভাষায় গীতা (দ্র) ও উপনিষদের একটি সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন।

তবে, তাঁর খ্যাতির পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর লেখা একাধিক ছোটদের বই। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'জন নিউবেরি মেডেল' পদক লাভ করেন Gay-Neck নামে কিশোর-উপন্যাসের জন্য। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর অন্য বইগুলোর নাম : 'Kari the Elephant', 'Jungle Beasts and Men', 'Ghond the Hunter', 'Hari the Jungle Lad' এবং 'Chief of the Herd'।

'গে-নেক্' একটি পায়রার গল্প আর 'চীফ্ অব্ দ্য হার্ড' কাহিনীর নায়ক একটি হাতি। এ দু'টি বই পরে বাংলাতে অনূদিতও হয়েছে, যথাক্রমে 'যূথপতি' ও 'চিত্রগ্রীব' নামে।

ধনগোপাল স্থায়ীভাবে আমেরিকাতেই থেকে যান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চিত্রশিল্পী এথেল্ রে ডুগান্। ১৯৩৬ সালে মানসিক রোগের কারণে তিনি নিউইয়র্কে আত্মহত্যা করেন।

হা. মা.

**ধনতন্ত্রবাদ** পুঁজিবাদ দ্র

**ধনুষ্টঙ্কার** (tetanus)

'ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি' (clostridium tetani) নামক জীবাণু সংক্রমণে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি হয়। জীবাণুদুষ্ট ধুলাবালি, মাটি বা অন্যান্য বস্তুর সংস্পর্শে দেহের ক্ষতস্থান সংক্রমিত হয়ে এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের প্রধান লক্ষণ পেশির কাঠিন্য ও যন্ত্রণাদায়ক খিঁচুনি। শুরুতে চোয়ালের কাঠিন্য দেখা দেয়, কিছু খাওয়া কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। ক্রমে কাঠিন্য ও খিঁচুনি অন্যান্য পেশিতে বিস্তার লাভ করে। পেশির সঙ্কোচনের ফলে দেহের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে।

চিকিৎসার জন্য প্রধানত টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন (tetanus immunoglobulin), এন্টি-টিটেনাস সেরাম (anti-tetanus serum) এবং এন্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ (দ্র) ব্যবহৃত হয়। প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের মাধ্যমে টিটেনাস রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সি. না. হ.

**ধমনী** রক্তসংবহনতন্ত্র দ্র
**ধম্মপদ** ত্রিপিটক দ্র

**ধর্ম**

ধর্ম শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর উৎপত্তিগত অর্থ 'যা ধারণ বা পোষণ করে'। 'স্বাভাবিক গুণ' বা 'নৈতিক চরিত্র' অর্থেও ধর্ম শব্দটি প্রায়শ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে ইংরেজি 'রিলিজন' (religion) অর্থে ধর্ম শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিচারে ইসলাম (দ্র), হিন্দু (দ্র) ও খ্রিস্টধর্ম (দ্র)-সহ আরো কিছু ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এই ধর্মগুলোকে বলা হয় সম্প্রদায়গত ধর্ম।

ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রতিটি ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে তাদের উদ্ভবকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যের পটভূমি। আর সেই পটভূমি জুড়ে রয়েছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ, চরম অন্যায়-অবিচারের প্রাবল্য। তাই প্রতিটি ধর্মের প্রাথমিক লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের একেকটি ক্রান্তিলগ্নে প্রতিটি ধর্মের উৎপত্তি এবং তাদের প্রসারের চেষ্টা লক্ষণীয়।

প্রত্যেক ধর্মের মূলবাণী সর্বপ্রকারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পরমতসহিষ্ণুতা হলেও সম্প্রদায়গত ধর্মগুলো উৎপত্তির পর থেকে তাদের মধ্যে বাস্তবত নানা প্রশ্নে ও জাগতিক নানা স্বার্থ কায়েমে পারস্পরিক সংঘাত, ব্যাপক রক্তাক্ত সংঘর্ষ ও অপরিমেয় প্রাণহানির ঘটনার প্রভূত দৃষ্টান্ত বর্তমান। ধর্মের কঠোর ও রক্ষণশীল বিধিবিধান ও তার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তাই কালে কালে দেখা দিয়েছে সংগঠিত, সচেতন কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংস্কার-আন্দোলন।

আ. হু.

**ধর্মকীর্তি**

বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত ও ভিক্ষু (দ্র)। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে দাক্ষিণাত্যের (দ্র) চোলদেশে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ



www.pathagar.com

ছিলেন। কৈশোরেই বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। যৌবনের সূচনা-লগ্নে নিছক কৌতূহলবশত তিনি কখনো কখনো বৌদ্ধ শিক্ষকদের ধর্মীয় আলোচনা শ্রবণ করতেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আলোচনার সময় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেন। সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মগধে এলে আচার্য ধর্মপাল তাঁকে বৌদ্ধ সংঘভুক্ত করে নেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ত্রিপিটক (দ্র) ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি কলিঙ্গ দেশে একটি বিহার (দ্র) নির্মাণ করে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি ছিলেন দার্শনিক নাগার্জুন (দ্র), মৈত্রেয়নাথ ও চন্দ্রকীর্তির (দ্র) অনুসারী। তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (দ্র) ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎশিষ্য।

প্রাচ্যের বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান ও আলোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সুবর্ণদ্বীপেও এক আচার্য ধর্মকীর্তির কথা জানা যায়। তিনিও সেই যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচিত। অতীশ দীপঙ্কর তাঁর কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ধর্মকীর্তির পাঠশেষে তিনি শিক্ষার জন্য সুবর্ণদ্বীপে গুরু ধর্মকীর্তির কাছে গমন করেন।

সুজ. ব.

## ধর্মঘট

নিজেদের দাবিদাওয়া পূরণ, আদায় কিংবা নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীরা একযোগে কর্মবিরতির যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, তাকেই ধর্মঘট বলে। আধুনিক শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এটা একটা সুপরিচিত পন্থা।

ধর্মঘট হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে, যেমন— বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি প্রদান, বোনাসের দাবি, চিকিৎসাসুবিধা, ছাঁটাই বন্ধ, ছুটি ও কাজের সময়সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় মালিকপক্ষকে বাধ্য করা বা শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের নিয়োগকর্তাদের এ ব্যাপারে একটা দর কষাকষিতে আসার লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করা। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মঘট ছাড়াই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না তার পেছনেও কারণ থাকে। আসলে, শান্তিপূর্ণভাবে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে মীমাংসায় পৌঁছতে না পারার কারণগুলোই ধর্মঘটের উৎস।

ধর্মঘটের সময়সীমা অনেক ক্ষেত্রে প্রলম্বিত হয়ে থাকে শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ বা নিয়োগকর্তা উভয়ের অনমনীয় ও অনড় অবস্থানের কারণে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং হয়ও। এরকম ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ সাধারণত কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে থাকেন এবং দেনও। শ্রমিক ও মালিক পক্ষ তখন নিয়ে থাকেন শ্রম-আদালতের আশ্রয়। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে এই জাতীয় বিরোধের ফলে উৎপাদনব্যবস্থা সাধারণত নিদারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

ধর্মঘটের বিভিন্ন রূপের মধ্যে অবস্থাবিশেষে অবস্থান ধর্মঘট ও অনশন ধর্মঘটও (দ্র) অন্যতম।

আ. হু.

## ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

সংবিধানে গৃহীত ধারাবলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে অপরের ধর্মমতে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করা হয় না, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালন করার অধিকার ভোগ করে থাকেন, তেমন ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়। এ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনা বা সমাজব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে কোনো বিশেষ ধর্মের সম্পর্ক থাকে না।

ইংরেজি শব্দ secular থেকে secularism এবং সেখান থেকেই secular state কথার উৎপত্তি যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ: রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থাদি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত ও পৃথক।

এই রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর সূচনা প্রবল প্রতাপশালী ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে রোম-সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (শা. ১২১২-৫০) ক্ষমতার লড়াই থেকে, এবং সেই সূত্রে ধর্ম (দ্র) ও ধর্মগুরুদের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থাকে দূরে রাখার জন্য সম্রাটের আপ্রাণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে।



www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতিগত ধারণার উদ্ভব ১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত 'গৌরবময় বিপ্লব' (Glorious Revolution)-এর মধ্য দিয়ে। কেননা এই সময়ই পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের (শা. ১৬৮৫-৮৮ সাল) তীব্র বিরোধের সূচনা হয়। রাজা ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ক্যাথলিক। তাই তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের অধিক সুবিধা মঞ্জুর এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খর্ব করতে থাকলে জনগণের সমর্থনপুষ্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা এর প্রতিবাদে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। ফলে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইংল্যাণ্ডে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ঘটনারই প্রভাবে পরে ইউরোপের (দ্র) দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থানের যুগে গির্জা (দ্র) এবং জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গির্জার প্রভাব যে শুধু মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করত তাই নয়, সাধারণ জীবনাচারের ওপরও তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। ফলে এক দীর্ঘ ও ধারাবাহিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয় ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা। বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অধিকাংশ রাষ্ট্রই এক বা একাধিক ধর্মের প্রাধান্যমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি বা ধারা সংবলিত কাঠামোর অধীনে পরিচালিত।

১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের ৪টি মূলনীতির অন্যতম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে এই নীতির পরিবর্তন করা হয়।

ভারতের (দ্র) রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতেও ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র, নারী বা পুরুষ, জন্মস্থান বা এ জাতীয় কোনো একটি কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের তরফ থেকে বৈষম্য প্রদর্শন না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে।

**আ. হু.**

## ধর্মমঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি এলাকায় অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বা ধর্ম নামে পরিচিত এক দেবতাকে নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা এবং কোথাও কোথাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও পূজা করত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের কাহিনী অবলম্বন করে যেসব কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলোই ধর্মমঙ্গল হিসাবে পরিচিত। লাউসেন-রঞ্জাবতী আখ্যান অবলম্বনে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবর্ণিত অংশই প্রকৃত ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট। এ ছাড়াও পরবর্তী কালে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য ধর্মমঙ্গল-কাব্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হয়।

**মে. খা.**

**ধর্মযুদ্ধ** ক্রুসেড দ্র

## ধাতু / ধাতুবিদ্যা

ভূ-ত্বক যে বস্তুপুঞ্জে তৈরি তার একটি প্রধান অংশ হল বিভিন্ন ধাতু। সকল মৌলিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু হিসাবে চিহ্নিত। রসায়নবিদের কাছে ধাতু হল সেই সব মৌলিক পদার্থ, বিশুদ্ধ অবস্থায় দ্রবণে (দ্র) থাকাকালীন যার পরমাণুতে একটি ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ (দ্র) থাকে। অবশ্য হাইড্রোজেনই (দ্র) একমাত্র ব্যতিক্রম, যা এই সংজ্ঞা পূরণ করেও ধাতু নয়। ধাতুর চকচকে ধাতব চেহারা থাকে, যার রঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপালি। এদেরকে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়, ইচ্ছে মতো আকৃতি দেওয়া যায়। টেনে লম্বা তারে পরিণত করা যায়। এগুলো তাপ ও বিদ্যুতের আলো পরিবাহী (দ্র)। তবে এসব গুণের ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন ক্যালসিয়াম (দ্র)-কে পীড়ন করলে তা চট্ করে ভেঙে যায়; পারদ (দ্র) তো তরল পদার্থই; সোনা (দ্র), তামা (দ্র), স্ট্রন্‌শিয়াম্—এরকম কয়েকটি ধাতুর নিজস্ব অন্য রঙ রয়েছে। দুই বা ততোধিক ধাতুর মিশ্রণে তৈরি হয় সঙ্কর ধাতু, যেমন—পিতল (দ্র), ব্রোঞ্জ (দ্র), কাঁসা ইত্যাদি।

ধাতুর ব্যবহার সুপ্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে সোনার এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দ থেকে রূপার (দ্র) অলঙ্কার, পাত্র ইত্যাদি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। একেকটি ধাতু বা সঙ্কর ধাতুর ব্যাপক ব্যবহারের ভিত্তিতে অতীতের সভ্যতাগুলোকে তাম্র-যুগ (দ্র), ব্রোঞ্জ-যুগ লৌহ-যুগ ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে—মানুষের জীবনে



www.pathagar.com

ধাতুর কেন্দ্রীয় ভূমিকার জন্য। খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত লোহা (দ্র) ও ইস্পাত (দ্র) আমাদের নির্মাণবস্তুগুলোর মধ্যে তার প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এখন অবশ্য অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) ইত্যাদির ব্যবহারও কম নয়। নির্মাণবস্তু হিসাবে, শিল্পোৎপাদনে এবং নানা রকম বিশেষ ব্যবহারে ধাতুর প্রচলন খুবই ব্যাপক। ব্যতিক্রমী ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানি (দ্র) ইউরেনিয়ামও একটি ধাতু। লক্ষণীয় যে অধিকাংশ ধাতুর পৃথক বৈজ্ঞানিক নাম-ধাম রয়েছে।

খনিতে প্রাপ্ত আকরিক (দ্র) থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা এবং তাকে যথাযথভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে ধাতুবিদ্যা। ধাতু নিষ্কাশনের জন্য অধিকাংশ আকরিককে প্রাথমিকভাবে চূর্ণ করে, পানিতে ডুবিয়ে কিছু বর্জ্য অংশ বাদ দেওয়া হয়। রোস্টিং বা উত্তপ্ত করেও কিছু বর্জ্য অংশ বাদ দেওয়া যায়। অধিক উত্তাপে সিন্টারিং করলে আকরিকের মধ্যকার ধাতুকণিকাগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বড় দানায় পরিণত হতে পারে। এসব প্রাথমিক পদ্ধতির পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসল নিষ্কাশনটি হয় স্মেল্‌টিং প্রক্রিয়ায়। এতে আকরিককে উচ্চ উত্তাপে এমন পরিবেশে গলিয়ে ফেলা হয় যাতে বর্জ্য অংশগুলো সহজে আলাদা হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ লোহার ক্ষেত্রে আকরিককে কোক কয়লা (দ্র) ও চুণাপাথর (দ্র) সহযোগে ব্লাস্ট ফার্নেস নামক বিশাল চুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। কয়লার কার্বনের দহনে উৎপন্ন কার্বন মনক্সাইড (দ্র) আকরিকের অক্সিজেন (দ্র) দূর করে লোহাকে আলাদা হতে দেয়। অন্যান্য অনেক বর্জ্য চুণাপাথরের সঙ্গে মিশে তরল গাদ হিসাবে গলিত লোহার উপরে ভেসে ওঠে। খ্রিস্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে মিশরে ও আসিরিয়ায় মানুষ লোহার এ রকম স্মেল্‌টিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। কিছু ধাতু লিচিং নামক প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে নিষ্কাশিত করা হয়। কোনো কোনো ধাতু এরকম দ্রবণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে তড়িৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি বর্তমানে খনিজ থেকে তামা ও অ্যালুমিনিয়াম পৃথক করার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত।

ভৌত ধাতুবিদ্যা নামে পরিচিত ধাতুবিদ্যার অপর একটি শাখা ধাতুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ততর করার উপায় উদ্ভাবন করে। যেমন—তাপ প্রক্রিয়া, পীড়ন প্রক্রিয়া, সঙ্করায়ণ ইত্যাদি। এরই একটি প্রাচীন রূপ আমরা আজও দেখতে পাই কর্মকারের উত্তপ্ত লোহা পেটানো, লবণ-পানিতে লোহা ডোবানো কিংবা স্বর্ণকারের সোহাগায় (দ্র) সোনা গলানো, তাতে তামার খাদ মেশানো ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়। অবশ্য পদার্থবিদ্যার (দ্র) নানা আবিষ্কার এসব প্রক্রিয়ার পেছনের বিজ্ঞানকে উদ্ঘাটিত করে ধাতুবিদ্যাকে এখন অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী বিষয়ে পরিণত করেছে। আধুনিক রান্নাঘরের জন্য স্টেনলেস স্টিলে কিংবা আধুনিক মহাশূন্যযানের জন্য নির্মাণবস্তুতে তার প্রমাণ মেলে।

মু. ই.

## ধান

ধান একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ (দ্র)। বিরুৎ জাতীয় এই উদ্ভিদ বা ঘাসটি আকারে সাধারণত খুব বড় নয়। এর কাণ্ড নরম ও কাষ্ঠবিহীন। বারো মাসই ধানের চাষ হয়। উঁচু-নিচু সব জায়গাতে ধান জন্মাতে পারে। বাংলাদেশে (দ্র) আবাদি জমির শতকরা ৭৫ ভাগেই ধান চাষ করা হয়। ধানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়—আউশ, আমন ও বোরো। আউশ ধান মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে রোপণ করা হয় এবং জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে কাটা হয়। দুলার, কটকতারা, মরিচবাটী, কুসারী ইত্যাদি আউশধানের নাম। জুন-জুলাইতে রোপণ করে অক্টোবর-নভেম্বরে কাটা হয় আমনধান। মালিয়া ভাঙ্গর, হবিগঞ্জ, নাজিরশাইল, লতিশাইল, রাজাশাইল, পাটনাই, দুধসর, বাদশাভোগ, কালিজিরা, কাটারিভোগ ইত্যাদি আমনধান। বোরোধান অক্টোবর-নভেম্বরে রোপণ করে মার্চ-এপ্রিলে কাটা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (দ্র) প্রবর্তিত বামনাকৃতি আউশ, বিপ্লব, ইরি-৮, চান্দিনা, মালা, ইরিশাইল, ইরি-৫ ইত্যাদি বোরো ধানের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪,০০০ প্রকারের ধান আছে বলে জানা গেছে। পলিমাটিতে ধান ফলে বেশি। ধান ভানিয়ে চাল বের করা হয়। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। চালে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট (দ্র) ও নানা খনিজ পদার্থ আছে। ধানের খড়



www.pathagar.com

গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ খড় দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়। বর্তমানে খড় দিয়ে কাগজ উৎপাদন করা হচ্ছে। চালে ভিটামিন বি-ও রয়েছে। চাল দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। ধানের কুঁড়া গো-মহিষ ও অন্যান্য পশু-পাখির খাদ্য। কুঁড়া মাড়িয়ে তেলও পাওয়া যায়।

ত. চ.

**ধানশালিকের দেশ** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

**ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** [১৮৮৬—১৯৭১]

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। জন্ম বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রামরাইল গ্রামে, ১৮৮৬ সালের ২রা নভেম্বর।

নবীনগর এম. ই. (M.E.=Middle English) স্কুল থেকে ১৯০৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন কলিকাতার রিপন কলেজে। এখান থেকেই ১৯১০ সালে আইন পাশ করেন। ১৯১১ সাল থেকে নিয়োজিত হন আইন ব্যবসায়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকভুক্ত হন।

১৯০৭ সালে তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপুরবাসী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে গঠিত 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'র তিনি সম্পাদক হন। এ জাতীয় বহু সমাজকল্যাণমুখী সংগঠনের তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক।

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সর্বভারতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং সাময়িকভাবে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রিটিশ–ভারতে আইন অমান্য করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

*এ. কে. ফজলুল হকের কাছে মন্ত্রিত্বের শপথ পাঠ করছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৫৭*

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্র গঠিত হলে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তিনি গণপরিষদে ব্যবহার্য ভাষা হিসাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন, যা মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতায় বাতিল হয়ে যায়। এই উপলক্ষেই ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের(দ্র) সূচনা।

১৯৫৪ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি দু' বার আতাউর রহমান খানের (দ্র) মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এ সময় গঠিত ইকনমিক কাউন্সিলেরও তিনি সদস্য হন।

আইয়ুব খানের (দ্র) সামরিক সরকার ১৯৬০ সালে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে 'এবডো'র (EBDO=Election Bodies Disqualification Order) মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেন।

১৯৬৩–৬৪ সালে তিনি সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদলের এবং আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪



www.pathagar.com

সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৫ সালের ১০ই মার্চ মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে তাঁর কুমিল্লা শহরস্থ বাসভবন থেকে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি।

আ. হ.

## ধুতুরা

ধুতুরা গুল্মজাতীয় বিরুৎ। ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবেই এর কদর বেশি। বাংলাদেশে এটি প্রায়ই অযত্নে বেড়ে ওঠে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এর চাষে মনোযোগী হয়েছে। গাছটির কাণ্ড, পাতা ও ফল সবুজ। কেবল ফুলগুলো সাদা। গাছ ৪/৫ ফুট বা ১/২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এটি ৪/৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে। এর সাদা ফুল ঘন্টা আকৃতির। ফল নাড়ুর মতো গোল। ফলের চতুর্দিকে কাঁটা থাকে। ফল পাকলে ফেটে

*ধুতরা গাছ ও ফুল*

যায়। এতে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। বীজ বিষাক্ত। বেশি খেলে মৃত্যুও হতে পারে। গাছে যখন ফুল ও ফল আসে তখন এর নির্যাস থেকে ঔষধ তৈরিও হয়। এই ঔষধের নাম স্ট্র্যামোনিয়াম। জলাতঙ্ক (দ্র), জ্বর (দ্র), খিঁচুনি, প্রবল হাঁপানি, রোদে ঘুরে মাথা কামড়ানো, মূত্রাবরোধ, মানসিক ভারসাম্য নষ্ট, তোতলামো ইত্যাদি রোগে এটি ব্যবহৃত হয়। কুকুরের কামড়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার আছে বলে জানা যায়।

ত. চ.

## ধূমকেতু

মহাশূন্যের এক বিস্ময় ধূমকেতু। ইংরেজি 'কমেট' (comet)-

*হ্যালির ধূমকেতু*

এর বাংলা প্রতিশব্দ ধূমকেতু। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ 'দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট নক্ষত্র'। একে মহাশূন্যের ভূত বলা হয়। ধূমকেতু আসলে একটি বড় বরফের বল (snowball) মাত্র। এটি ধুলো, বরফ (দ্র) ও গ্যাস (দ্র) দিয়ে তৈরি। এর কিছু গ্যাস আমাদের বাতাসের (দ্র) গ্যাসের মতোই, যাতে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়; আর কিছু গ্যাস বিষাক্ত। গ্রহ (দ্র)-গুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের বাইরে ধূমকেতু অবস্থান করে। এরা নিজের কক্ষপথে ঘুরতে থাকে এবং গ্রহদের অতিক্রম করে সূর্যের (দ্র) কাছাকাছি হতে থাকে।



www.pathagar.com

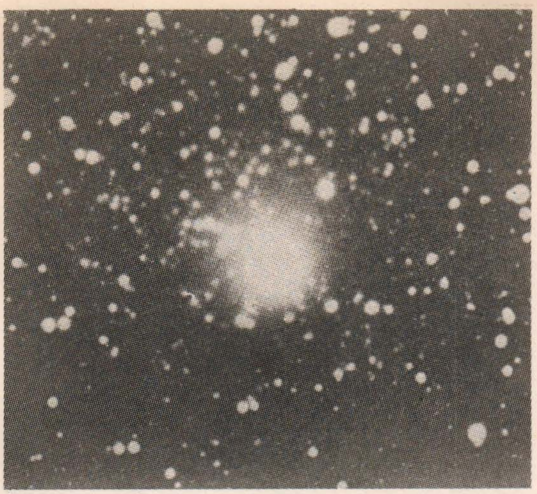

*ধূমকেতু 'হেল-বপ', ১৯৯৭ সালে এটিকে আকাশে দেখতে পাওয়া যাবে*

সৌরজগতের (দ্র) কিছুটা ভেতরে প্রবেশ করলেই আমরা ধূমকেতু দেখতে পাই। সূর্যের কাছাকাছি হলে তাপ ও আলোর প্রভাবে ধূমকেতুর পিছন দিক থেকে এর ধুলো আর গ্যাসের বাষ্প বেরোতে থাকে, যেমন বেরয় চলন্ত রেলগাড়ির ইঞ্জিন থেকে। এই অবস্থায় ধূমকেতুকে গোল মাথা ও লম্বা লেজবিশিষ্ট কোনো প্রাণীর মতো মনে হয়। বাষ্প বের হওয়া অংশটিকে বলে ধূমকেতুর লেজ। ধূমকেতুর এই লেজ লক্ষ লক্ষ মাইল লম্বা হয়। আর এত পাতলা হয় যে এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য নক্ষত্রদের (দ্র) ঝিকমিক করতে দেখা যায়। ধূমকেতু সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। সূর্যের অভিকর্ষী টানে ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি আসে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ

*হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে গবেষণা : 'জিয়াট্টো' মহাকাশযানকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন*



www.pathagar.com

করে চলে যায় বহু দূরে। কিছু ধূমকেতু সূর্যের অভিকর্ষী বলের ফাঁদে আটকা পড়ে। এরা দীর্ঘ ডিম্বাকার কক্ষপথে (oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তাই পৃথিবীর আকাশে এদের পুনরায় আগমন ঘটে। এরূপ একটি বিখ্যাত ধূমকেতু 'হ্যালির ধূমকেতু'। এই ধূমকেতুটির আগমন ঘটে প্রতি ৭৬ বছর পর। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এড্‌মণ্ড হ্যালি (Edmond Halley : ১৬৫৬—১৭৪২) ১৬৮২ সালে একে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনিই প্রথম এর নিয়মিত আবির্ভাব (প্রতি ৭৫-৭৬ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ) সম্পর্কে মন্তব্য করেন। সেই থেকে এর নাম হয় 'হ্যালির ধূমকেতু'। এটিকে খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ সালে চীনে প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল। এবং সেই থেকে প্রতি ৭৫-৭৬ বছর পর পর একে দেখা যায়। ধূমকেতু অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। প্রতিবার সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় ধূমকেতুর কিছু বরফ গলে যায়, গ্যাস বেরিয়ে যায়। এতে ধূমকেতু ক্ষয় পেতে পেতে এক সময় ভেঙে যায়। ভাঙা খণ্ডগুলো ধূমকেতুর মতোই সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এক সময় সূর্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে কিছু খণ্ড আলোর ঝরনার মতো পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে নেমে আসে।

সে. শা.

**ধূমপান** সিগারেট দ্র

**ধ্বনি** ছন্দ দ্র

*হকি স্টিক হাতে ধ্যানচাঁদ*

**ধ্যানচাঁদ** [১৯০৫—১৯৭৯]

ভারতের (দ্র) কালজয়ী হকিপ্রতিভা। হকির জাদুকর হিসাবে খ্যাত। বল এবং স্টিকের ওপর তাঁর অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ছিল।

ধ্যানচাঁদ ১৯০৫ সালের ২৮শে আগস্ট ভারতের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

বল নিয়ে তিনি বাইন মাছের (দ্র) মতো সর্পিল গতিতে ঢুকে যেতেন বিপক্ষের রক্ষণসীমানায়। এই ব্যাপারে তিনি এতই দক্ষ ছিলেন যে তাঁকে 'হিউম্যান ঈল' বা মানুষরূপী বাইন মাছ বলা হত। ধ্যানচাঁদের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে হিটলার (দ্র) তাঁকে জার্মানিতে বসবাসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জার্মান সেনাবাহিনীর কর্নেলের পদ অলঙ্কৃত করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন হিটলার।

১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালের পর পর তিনটি অলিম্পিকে (দ্র) ভারত হকিতে স্বর্ণপদক জয় করে। ভারতীয় হকি দলের এই গৌরবময় সাফল্যের পেছনে ধ্যানচাঁদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। এই তিনটি অলিম্পিকে তিনি ৪৬টি গোল করে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ধ্যানচাঁদ নিজে গোল দিতে যেমন দক্ষ ছিলেন, সঙ্গীদের দ্বারা গোল করাতেও ছিলেন সমান পারদর্শী। ১৯২৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ভারত সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হকি খেলায় অংশগ্রহণ করে। ধ্যানচাঁদ এসব খেলায় এক হাজারেরও বেশি গোল করেন। ক্রিকেটের বিস্ময় ব্র্যাডম্যান (দ্র) ধ্যানচাঁদ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'ক্রিকেটে ব্যাট্‌স্‌ম্যান যেমন রান নেয়, হকিতে ধ্যানচাঁদ সেভাবে গোল করেন।'

ধ্যানচাঁদের মতো খেলোয়াড়ের আবির্ভাবের কারণেই হকি খেলা বর্তমানে এত মহিমামণ্ডিত ও জনপ্রিয় এবং হকির আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের স্বর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল।



www.pathagar.com

তিনি ১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে হকি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে মর্যাদা দিয়েছে।

টি. কি.

**ধ্যানীবুদ্ধ** অমিতাভ ও আদিবুদ্ধ দ্র

**ধ্রুপদ**

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সর্বপ্রধান ধারা। বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চারটি প্রধান ধারা হচ্ছে : ধ্রুপদ, খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র), ঠুম্‌রি (দ্র)। এর মধ্যে ধ্রুপদ প্রাচীনতম ও প্রধানতম। ধ্রুপদ কথাটি ধ্রুবপদ-এর সংক্ষেপণ। প্রাচীন ধ্রুবপদ সঙ্গীত থেকে ধ্রুপদের বিকাশ। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (শা. ১৪৮৬-১৫১৭) ধ্রুবপদ ভেঙে ধ্রুপদ রীতির প্রচলনে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখেন। জানা যায় যে এই উদ্দেশ্যে তিনি এক সঙ্গীত মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এবং সঙ্গীতগুণীরা তাঁর উদ্ভাবনকে সমর্থন করেছিলেন। মানের সভাসঙ্গীতজ্ঞ নায়ক বখসু এ কাজে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেন। গোয়ালিয়রে উদ্ভব হলেও ধ্রুপদের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে দিল্লির (দ্র) মোগল রাজদরবারকে কেন্দ্র করে। সম্রাট আকবরের (দ্র) দরবারের প্রধান গায়ক তানসেন (দ্র) ধ্রুপদ সঙ্গীতকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যান। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুপদগায়ক। তাঁর পুত্রবংশ, কন্যাবংশ ও শিষ্যবংশ ক্রমেই ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিস্তার ঘটাতে থাকে। সেনী ঘরানা ছাড়া অন্য যেসব ঘরানায় ধ্রুপদের চর্চা ঘটে সেসব হচ্ছে : গোয়ালিয়র ঘরানা, তিলমণ্ডী ঘরানা, অত্রৌলি ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, উদয়পুর ঘরানা, বেতিয়া ঘরানা, বারাণসী ঘরানা ও ডাগর ঘরানা।

ঈশ্বরস্তুতি, দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, রাজাদের প্রশস্তি, প্রকৃতি বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ধ্রুপদ গান রচিত হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীতের চারটি স্তবক থাকে। এদের নাম : স্থায়ী (দ্র), অন্তরা (দ্র), সঞ্চারী, ও আভোগ (দ্র)। গুরুগম্ভীর রাগে ধ্রুপদ রচনা করা হয়। ধ্রুপদ গান গাইবার আগে আলাপ (দ্র) করা আবশ্যক। সুরের কোনো লঘু অলঙ্কার ধ্রুপদে ব্যবহার করা চলে না। চৌতাল, আড়া চৌতাল, ঢিমা ত্রিতাল, ঝাঁপ তাল প্রভৃতি ধ্রুপদের প্রধান তাল। ধ্রুপদের কয়েক প্রকার

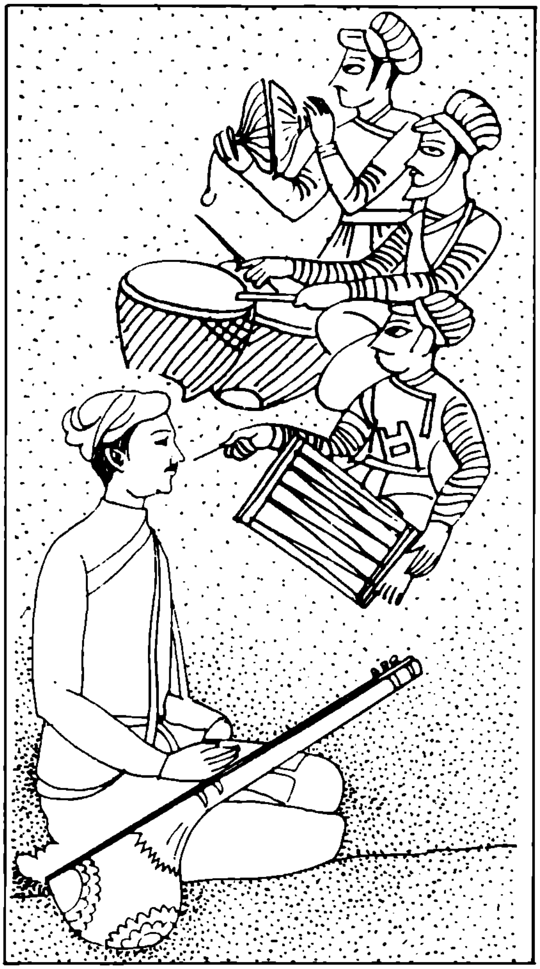

গায়নরীতি প্রচলিত। এদের বলা হয় বাণী। প্রধান ধ্রুপদবাণী চারটি : গৌড়হার বাণী, নওহার বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডাগর বাণী। ধ্রুপদের সঙ্গে তালবাদ্য হিসাবে পাখোয়াজ (দ্র) সঙ্গত করা হয়।

বাংলায় প্রথম ধ্রুপদ রচিত হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ ঘরানাই বাংলায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত ঘরানা। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মসঙ্গীতকে কেন্দ্র করেও বাংলায় ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিকাশ ঘটে। বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) ধ্রুপদী ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারাটি গড়ে তোলেন। এই ধারার সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) ব্রহ্ম-সঙ্গীতে।

ক. গো.



www.pathagar.com

## ধ্রুবতারা

উত্তর মেরুর সরাসরি উপরে পৃথিবীর (দ্র) অক্ষ বরাবর সহজে দৃশ্যমান তারাটিকেই বলা হয় ধ্রুবতারা। এই নামকরণের কারণ হল অক্ষ বরাবর অবস্থানের কারণে পৃথিবীর আহ্নিক গতি সত্ত্বেও একে আকাশের একই জায়গায় সব সময় দেখা যায়। অবশ্য এটি শুধু উত্তর গোলার্ধ থেকেই দৃশ্যমান। প্রাচীন কাল থেকে অকূল সমুদ্রে জাহাজ চালাবার সময় নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিকটি নির্ণয় করেছে। তা ছাড়া ভূমি-সমতলের সঙ্গে ধ্রুবতারার কৌণিক উন্নতি সরাসরি একটি স্থানের অক্ষাংশ নির্দেশ করে বলে এটি মেপে বোঝা যায় আমরা বিষুবরেখা (দ্র) থেকে কত উত্তরে আছি। নিজের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যও এটি নাবিকের কাছে অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশক।

রাতে উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল (দ্র) নামে তারকামণ্ডলীকে চেনা সহজ। সাতটি তারায় গড়া এই মণ্ডল নানা সময় নানা ভঙ্গিতে কাত বা চিৎ হয়ে থাকা একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। চিহ্নের মাথার শেষ দু'টি তারা কাল্পনিক রেখায় যুক্ত করে তা বর্ধিত করলে ঠিক উত্তরে ধ্রুবতারায় রেখাটি পৌঁছবে। আমাদের দেশে এটি জায়গাভেদে ভূমির সঙ্গে ২১° থেকে ২৭° ডিগ্রি কোণ করে থাকতে দেখা যায়, কারণ বাংলাদেশের অক্ষাংশ প্রায় ২১° থেকে ২৭° ডিগ্রির মধ্যে।

বহু বছর ধরে উরসা মাইনর বা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত কিন্তু তারকামণ্ডলীর সদস্য পোলারিস তারাটি আমাদের ধ্রুবতারা। কিন্তু চিরকাল এটি তা ছিল না এবং এক সময় আর থাকবে না। পৃথিবীর অক্ষ অতি ধীর গতিতে চক্রাকারে তার অভিমুখ পরিবর্তন করছে। ২৬,০০০ বছরে এই চক্র সম্পূর্ণ হয়ে অভিমুখ আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। অভিমুখটি আরো অনেক দিন মোটামুটি পোলারিসের দিকে থাকবে। তার পর ঐ চক্রের উপর অন্য কোনো তারা হবে ধ্রুবতারা, যেমন এখন থেকে ২২,০০০ বছর পর ড্রাকো মণ্ডলীর থুর্বান তারাটি এই সম্মান পাবে। পরে অবশ্য পোলারিস আবার ধ্রুবতারা হবে।

মু. ই.

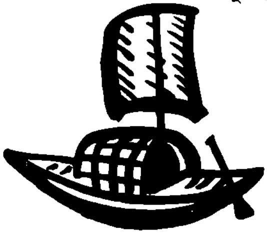

# ন

## নও-বেলাল

সাপ্তাহিক 'নও-বেলাল' ১৩৫৪ সনের ১৬ই পৌষ (১৯৪৮ সাল) আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। তৎকালীন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদ আলী এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। আত্মপ্রকাশের পর পরই 'নও-বেলাল' পাঠকসাধারণের মন জয় করে। কিন্তু এক বছর দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করার পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সুনামগঞ্জ কলেজের সহকারী অধ্যাপক হয়ে চলে যাওয়ায় প্রকাশক মাহমুদ আলী নিজেই সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। 'নও-বেলাল' সেকালের পূর্ব-পাকিস্তানে মর্যাদাপূর্ণ সাপ্তাহিকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সরকারি কর্তৃপক্ষের অন্যায় ভ্রূকুটি 'নও-বেলাল' কখনো গ্রাহ্য করে নি। ফলে বেশ কয়েক বার সরকারি মহলের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয় পত্রিকাটিকে। এমনকি মোহাম্মদ মাহমুদ আলীকে এ কারণে কারাবরণও করতে হয়। কিন্তু 'নও-বেলাল' তার আদর্শ ও কর্তব্য থেকে একটুও সরে যায় নি। নির্যাতিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা নওবেলাল অকপটে তুলে ধরত। প্রায় সাত বছর চলবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্স সূত্রে জানা যায়, 'নও-বেলাল'



www.pathagar.com

১৯৫৮ সালে বন্ধ হয়, আবার ১৯৬৯ সালে চালু হয়। পত্রিকার একবিংশ বর্ষের ৩৬তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালের ৭ই অক্টোবর। আর ৪৭ থেকে ৫১তম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৩৭৬ সনের ৬ই পৌষ (১৯৬৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর)। এ পর্যায়ে নও-বেলাল ছাপা হয় ৪৮/১ লিয়াকত এভিনিউ, ঢাকা-১-এর সাইনপুকুর আর্ট প্রেসে। ৫০ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ থেকে প্রকাশিত এ পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন মাহমুদ আলী। এ সময় ৮ পৃষ্ঠার নও-বেলালের দাম রাখা হয়েছিল ২৫ পয়সা। নব পর্যায়ে প্রকাশিত এ পত্রিকার শেষ সংখ্যাটি (২২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা) বের হয় ১৯৭০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি, রোববার।

আ. কা.

## নকশালবাড়ি আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত নকশালবাড়ি থানা অঞ্চলে প্রধানত সাঁওতাল (দ্র), ওরাঁও (দ্র), রাজবংশী (দ্র) নামে পরিচিত আদিবাসীদের (দ্র) বসবাস। এই অঞ্চলটি ছিল জোতদার-মহাজনদের শাসন-শোষণের স্বর্গরাজ্য। স্বভাবতই ভারতীয় কমিউনিস্টদের উদ্যোগে এখানে সামন্তশোষণবিরোধী সংগঠন গড়ে ওঠে।

কৃষকদের দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ১৮ই মার্চ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত কৃষকসম্মেলনের মূল দাবি ছিল জমিদার-জোতদারদের একচেটিয়া জমি-মালিকানার অবসান ঘটানো, কৃষক-কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ এবং স্থানীয় জোতদার, টাউট ও মহাজনদের অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য জঙ্গী কৃষকদের সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা। এই সম্মেলনের অন্যতম নেতা কানু সান্যাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হলেও অন্য প্রধান ব্যক্তি জঙ্গল সাঁওতাল ছিলেন আদিবাসী অঞ্চলের কৃষকনেতা।

উল্লিখিত লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যেই নকশালবাড়ি এবং আশপাশের গ্রামগুলোতে কৃষকসমিতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে ১৫ থেকে ২০ হাজার সদস্য-কর্মীদের সক্রিয় দল। প্রতি গ্রামে গড়ে ওঠে কৃষকসমিতির সংগঠন, তালিম দেওয়া হতে থাকে

সশস্ত্র সংগ্রামের।

অচিরেই ওরা চাষের জমি দখল করে নেয়, জমির ভুয়া দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলে, কুখ্যাত অত্যাচারী জোতদার-মহাজনদের নামে ফাঁসির হুকম জারি করে এবং তীরধনুকবর্শাবল্লমে সজ্জিত কৃষকবাহিনী নিয়ে অত্যাচারী জোতদার-মহাজন ও তাদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিয়ে গ্রামগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করে, কায়েম করে নিজদের পঞ্চায়েতী শাসনব্যবস্থা।

এমনি করে ধানকাটা, জমিদখল, জোতদার-মহাজনের ভাড়াটে বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ ও পাল্টা আঘাত হানার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মার্চ-এপ্রিল মাস পেরিয়ে ৮ই মে (১৯৬৭) শুরু হয়ে যায় খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং শিলিগুড়ি থানার কিছু অংশ জুড়ে নকশালবাড়ির কৃষক-অভ্যুত্থান। জোতদার-মহাজনেরা রাতের অন্ধকারে এলাকা ছেড়ে পালাতে থাকে। রাতারাতি নকশালবাড়ির কৃষক-অভ্যুত্থান প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায়, দ্রুত অর্জন করে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। এই কৃষক-বিপ্লবের রাজনৈতিক তত্ত্ব জুগিয়েছিলেন শিলিগুড়ির কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদার। সে সময়ে কমিউনিস্ট ও দলছুট কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন। আন্দোলনের বিস্তার ঘটতেই শুরু হয় পুলিশী



www.pathagar.com

হামলা। এর বিরুদ্ধে চলে পাল্টা হামলা। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাজপথ পোস্টারে (দ্র) ছেয়ে যায় : নকশালবাড়ির পথ কৃষকবিপ্লবের পথ।

পুলিশ ও বিদ্রোহী কৃষকদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকার নকশালবাড়ি আন্দোলন বন্ধ করতে তীব্র দমননীতির আশ্রয় নেয়। অন্য দিকে কলিকাতার জঙ্গী ছাত্রসমাজ গঠন করে 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সাহায্য কমিটি'। ১৯৬৭ সালের ২৮শে জুন পিকিং বেতার এই সশস্ত্র সংগ্রামকে অভিনন্দন জানায় এবং ৫ই জুলাই 'পিপল্‌স ডেইলি'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয় : 'ভারতের মাটিতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'।

ব্যাপক পুলিশী তৎপরতার মুখে নকশালবাড়ি আন্দোলন কয়েক মাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেলেও গোটা ভারতের কৃষক-অভ্যুত্থানে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'সত্তরের দশক মুক্তির দশক'—এই স্লোগান তরুণদের রক্তাক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের পথে টেনে এনেছে। 'নকশালবাড়ি' শব্দটি হয়ে উঠেছে সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক এবং এ জাতীয় চরমপন্থী আন্দোলন মাত্রই স্থান-নির্বিশেষে 'নকশাল আন্দোলন' নামে পরিচিত হতে থাকে।

আ. র.

**নক্রুমা, কোয়ামে** [১৯০৯—১৯৭২]

ঘানার জাতীয়তাবাদী নেতা, প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট, উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের কট্টর বিরোধী ব্যক্তিত্ব। 'প্যান-আফ্রিকান' ঐক্যের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা হিসাবেও তাঁর ভূমিকা সুবিদিত। জন্ম ১৯০৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর, বর্তমান ঘানার (সাবেক নাম 'গোল্ড কোস্ট') পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে।

কোয়ামে নক্রুমা (Kwame Nkrumah) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও লণ্ডনে (দ্র) উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালে তিনি পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে 'ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশন'-এর সেক্রেটারি হন। ১৯৪৯ সালে গড়ে তোলেন 'কনভেনশন পিপল্‌স্ পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল।

১৯৫১ সালে নক্রুমার দল ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে। ১৯৫২ সালে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তাঁর রাজনৈতিক দল নির্বাচনে বিজয়ী হলে গোল্ড কোস্ট স্বাধীনতা লাভ করে এবং দেশটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ঘানা।

*ঘানার জাতীয়তাবাদী নেতা, প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট কোয়ামে নক্রুমা*

১৯৬০ সাল পর্যন্ত নক্রুমা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একই বছরে তিনি প্রেসিডেন্ট হন।

১৯৬০-৬১ সালে কঙ্গোর রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় তিনি প্যাট্রিস লুমুম্বা (দ্র)-কে সমর্থন করেন। কট্টর উপনিবেশবাদবিরোধী নেতা হলেও দেশের ভেতরে তিনি ধীরে ধীরে সমর্থন হারাতে থাকেন। একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের কঠোর হাতে দমন করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে ঘানার শাসনক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। এই সময় নক্রুমা দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭২ সালের ২৭শে এপ্রিল, রোমানিয়ায়।

আ. হ.

**নক্ষত্র** (star)

মহাকাশের তেজোময় গ্যাসীয় পদার্থের গোলক। রাতের



www.pathagar.com

আকাশে এদেরই কয়েকটি আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়। আমাদের অতি পরিচিত সূর্যও (দ্র) একটি নক্ষত্র। নক্ষত্র কখনো একা, কখনো জোড় বেঁধে, কখনো কয়েকটি একত্রে, আবার কখনো কখনো ঝাঁক বেঁধে থাকে।

ভর (দ্র), ব্যাসার্ধ ও উজ্জ্বলতার দিক থেকে আমাদের সূর্য একটি গড়পড়তা নক্ষত্র। এ কারণে সূর্যের ভর ও পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে জ্যোতির্বিদ্যায় (দ্র) একক ধরা হয়।

পৃথিবী (দ্র) থেকে কোনো নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার জন্য ত্রিকোণমিতির প্যারালাক্স পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে ঐ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। দুই অবস্থানের প্যারালাক্স থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব পাওয়া যায়। এভাবে দূরত্বের একটি নতুন একক পাওয়া গেল। এটি হল পারসেক (parsec)। এক পারসেক হল এক সেকেণ্ড বৃত্তীয় চাপের জন্য প্যারালাক্স (parallax of one second of are)।

*রাতের আকাশে নক্ষত্র*

প্রোটোগ্যালাক্সিতে মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাস পুঞ্জীভূত হলে প্রোটোতারার জন্ম হয়। গ্যাস, ধূলিকণা মহাকর্ষের প্রভাবে নিকটবর্তী হতে থাকে। এতে ঘনত্ব ও মহাকর্ষের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সঙ্কুচিত হবার ফলে প্রোটোতারার ভিতরকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণুর কেন্দ্রিন বিক্রিয়া শুরু করে। কেন্দ্রিন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ (দ্র)ও মহাকর্ষবলের প্রভাব পরস্পরকে নাকচ করলে একটি স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং একটি তারার জন্ম হয়। এই ধরনের তারাকে বলা হয় প্রধান ধারার তারা। আমাদের সূর্য একটি প্রধান ধারার তারা।

জ্বালানি (দ্র) ফুরিয়ে এলে বিবর্তনের ধারায় তারার 'মৃত্যু' ঘটে। এই মৃত্যু মূলত তিন ধরনের। যদি কোনো তারার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ বা তার কম হয়, তা হলে সেগুলো শ্বেতবামন তারায় পরিণত হয়। এর চেয়ে বেশি ভরের তারা কখনো নিউট্রন নক্ষত্র বা পালসার অথবা কৃষ্ণবিবর (দ্র) বা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়।

মু. হা.

## নচিকেতা

বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে বর্ণিত ঋষিপুত্র। কঠোপনিষদে বর্ণিত উপাখ্যান মতে— রাজা বাজশ্রবা, যিনি গৌতম নামেও পরিচিত, স্বর্গযাত্রার উদ্দেশ্যে একদা এক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ব্রাহ্মণদের তাঁর যাবতীয় ধনরত্ন দান করতে মনস্থির করেন। এই যজ্ঞ যখন অনুষ্ঠিত হয়, নচিকেতা তখন সুবোধ বালক মাত্র। পিতার বিশাল যজ্ঞের আয়োজন ও দানসামগ্রীর বহর দেখে নচিকেতা জনকের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। কিন্তু তিনি যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে তাঁর পিতা অধিক বয়স্ক গাভী দান করছেন, তখন তিনি (নচিকেতা) তাঁকে কোনো পুরোহিতের হাতে দক্ষিণাস্বরূপ তুলে দেয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু পিতা বাজশ্রবা পুত্র নচিকেতার এই অনুরোধে কর্ণপাত না করলে নচিকেতা বার বার তিন বার জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে তিনি কার হাতে সমর্পণ করবেন বলে মনস্থির করেছেন। অনুরোধের এই পুনরুক্তিতে ক্রুদ্ধ পিতা তখন পুত্র নচিকেতাকে লক্ষ করে বললেন, যমের হাতে আমি তোমাকে তুলে দিলাম। নিজের উচ্চারিত বাক্যের অন্যথা না করে বাজশ্রবা পুত্রকে যমের কাছে পাঠালেন।

নচিকেতা যমের প্রাসাদে গিয়ে দেখলেন, যম সেখানে উপস্থিত নেই। যমের দেখা না পেয়ে তিনি উপবাস শুরু করলেন। এই উপবাস-অবস্থান চলল তিন রাত্রি ধরে।

এদিকে নচিকেতার যখন উপবাস চলছে, যম তখন



www.pathagar.com

ব্রহ্মলোকে। সেখান থেকে ফিরে তিনি যখন জানলেন যে নচিকেতা তিন রাত্রি ধরে উপবাসে, তখন তিনি তাঁকে বললেন, যেহেতু তিনি তিন দিন ধরে তাঁর ঘরে অনাহার-অবস্থানে আছেন, সেহেতু তিনি তাঁর (যমের) কাছ থেকে তিনটি বর প্রার্থনা করতে পারেন। নচিকেতা তখন তিনটি বর প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রথম যে বর চাইলেন, তা হল: যমালয়ে তাঁর অবস্থানের কারণে তাঁর পিতা অতিশয় চিন্তায় আছেন, তাঁর সেই চিন্তা দূর হোক এবং তাঁর ওপর তিনি (পিতা) আগের মতোই সন্তুষ্টচিত্ত হোন। দ্বিতীয় বর চাইলেন : স্বর্গলোকে আগমনকারী সবাই যেন ভূলোকবাসী জীবের মতো ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মৃত্যু ও শোকগ্রস্ত না হন, তাঁরা যেন সুখে বসবাস করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বর লাভ করার পর নচিকেতা সন্দেহ দূর করার লক্ষ্যে যমের কাছ থেকে সঠিক উত্তর জানার জন্য তৃতীয় বর প্রার্থনা করলেন মানুষের মৃত্যুর পর পর কেউ বলেন জীবাত্মা আছে, কেউ বলেন তা নেই, কোনটা সত্য। যম তখন নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করতে চাইলেন নচিকেতাকে। কিন্তু নচিকেতা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে যমের প্রলোভনে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হলেন না। ফলে যম সন্তুষ্ট হয়ে নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

মহাভারতের (দ্র) অনুশাসন পর্বে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানে নচিকেতা সংক্রান্ত কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য আছে।

আ. হু.

## নজরুল ইনস্টিটিউট

কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীত এবং তাঁর সার্বিক জীবন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি তাঁর স্মৃতি সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্য থেকে 'নজরুল ইনস্টিটিউট অধ্যাদেশ ১৯৮৪' বলে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এ বছরেই এপ্রিল-মে মাস থেকে পূর্ণোদ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। কবির শেষ জীবনের কয়েক বছর সময়কালে স্মৃতিবিজড়িত 'কবিভবন'কেই রূপান্তরিত করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে (ঠিকানা—ঢাকার ধানমণ্ডির ২৮ নম্বর [পুরাতন] সড়কের ৩৩০ বি নম্বর বাড়ি)। একটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে এটি পরিচালিত হয়। এই বোর্ডের এক জন চেয়ারম্যান রয়েছেন। এর সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা এক জন পরিচালক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এটি।

নজরুল ইনস্টিটিউটের ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে : কবির রচনাবলি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা ও অধ্যয়ন; দেশ-বিদেশ থেকে কবির সঙ্গীত ও অন্যান্য রচনাবলি সংগ্রহ, সম্পাদনা, সংরক্ষণ ও প্রকাশন; কবির সাহিত্যকর্ম, রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিষয়ে আলোচনাসভা, সম্মেলন, বিতর্ক, সেমিনার ও বক্তৃতামালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; নজরুলসাহিত্য, সঙ্গীত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত বইপত্রসহ তাঁর গানের রেকর্ড ও টেপ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা; যথাযথভাবে পরিবেশনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর গানের স্বরলিপি প্রণয়ন, গ্রামোফোন রেকর্ড, বাণিজ্যিক টেপ, ছায়াছবি ও স্বরলিপির বইয়ে যাতে গ্রহণযোগ্য মান রক্ষিত হয় তার তদারকি করা এবং ইনস্টিটিউটের অভিমত অনুযায়ী যাঁরা নজরুল বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে নজরুল ইনস্টিটিউট তার জন্মলগ্ন থেকে সক্রিয় রয়েছে। কবির স্মৃতিবিজড়িত বেশ কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংগ্রহশালায়। একইভাবে নজরুল কর্তৃক রচিত ও সুরারোপিত এবং পুরানো গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বহু রেকর্ডও (ডিস্ক) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা কার্যক্রমও বেশ গতিশীল। নজরুলের ওপর বেশ কিছু গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ছাড়াও ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে বেশ কয়েক খণ্ডে 'নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি' এবং 'নজরুল সঙ্গীত অভিধান'। এর নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে 'নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা'ও। প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রণে প্রদত্ত নজরুলবক্তৃতা গ্রন্থাকারে



www.pathagar.com

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটি নজরুল বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ। নজরুলের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও তাঁর অন্যান্য সৃজনশীল দিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মে নিয়োজিত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানটির তরফ থেকে পুরস্কৃত করার জন্য 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়েছে।

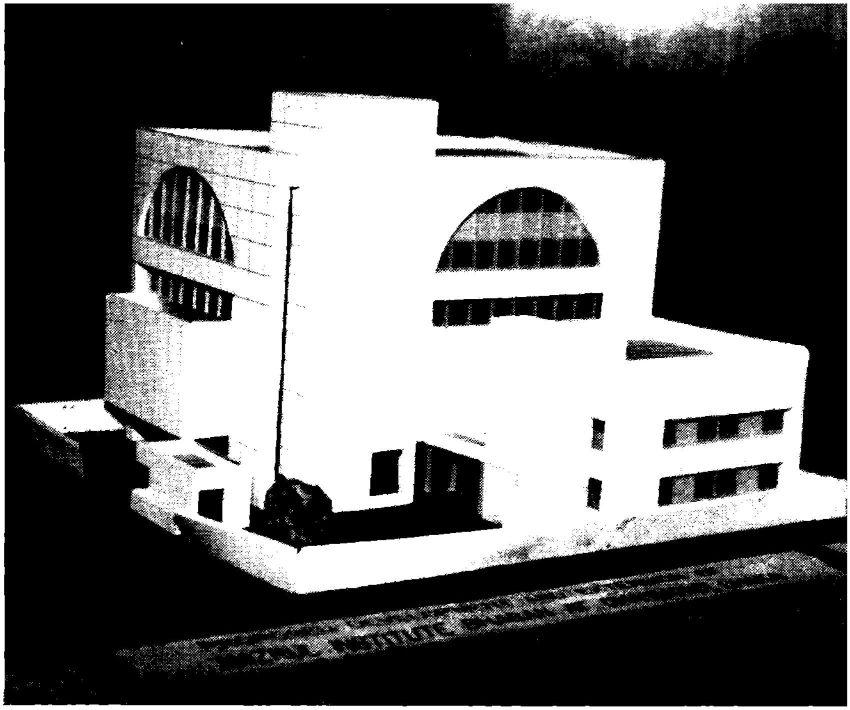

*নজরুল ইনস্টিটিউট*

কবির জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

আ. হ.

**নজরুল ইসলাম, কাজী** কাজী নজরুল ইসলাম দ্র

### নজরুল-সঙ্গীত

কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) গান। সকল গানের বাণী ও অধিকাংশ গানের সুর নজরুলরচিত। কতিপয় গানের সুর অন্যেরাও দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে নজরুলসঙ্গীতের সংখ্যা ৩০০০-এর ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। কৈশোরেই নজরুল গান রচনায় সাফল্য অর্জন করেন ও সে সময় বর্ধমান অঞ্চলের জনপ্রিয় লেটো গানের দলে যোগ দেন প্রধান কবি হিসাবে। তিনি লেটোর দলের জন্য গান ও কয়েকটি পালা রচনা করেন। সেসবের অধিকাংশই অবলুপ্ত। ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে নজরুল প্রথম নৌশেরা যান প্রশিক্ষণের জন্য ও পরে করাচিতে ব্যারাকে অবস্থান করেন। সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীত রচনার অভিপ্রায় তখনো তিনি অব্যাহত রাখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল কলিকাতা ফিরে আসেন এবং সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। গায়ক হিসাবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি হয়।

প্রথম দিকে নজরুল প্রধানত দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। ১৯২৬ সালের শেষের দিক থেকে তিনি গজল রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেন ও নানা ধরনের গান রচনা করতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে নজরুল কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নিরীক্ষামূলক রাগসঙ্গীত ও গীতিআলেখ্য রচনায় অসামান্য পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন। এই পর্বেই তাঁর সক্রিয় জীবনের আকস্মিক অবসান ঘটে।

নজরুলের সঙ্গীতজীবনকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্বটি ১৯২০ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত; এই পর্বে নজরুল প্রধানত দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বটি ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত



www.pathagar.com

বিস্তৃত; এই পর্বে নজরুল প্রধানত গজল রচনা করেন। তৃতীয় পর্বটি ১৯২৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত; প্রধানত গ্রামোফোন কোম্পানিসমূহকে কেন্দ্র করে নজরুলজীবনের এই পর্ব আবর্তিত। এই পর্বে কবি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই পর্যন্ত নজরুলের সঙ্গীতজীবনের চতুর্থ পর্ব বিস্তৃত। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

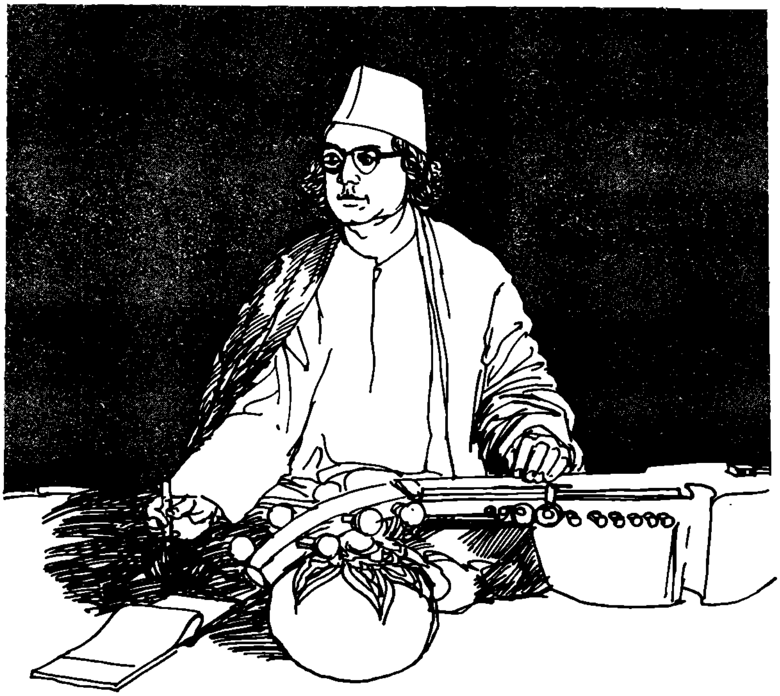

*গানে সুর তুলছেন কাজী নজরুল ইসলাম*

নজরুলের সঙ্গীত-রচনাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে : দেশাত্মবোধক গান, গজল (দ্র), রাগসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, আধুনিক গান, লোকসঙ্গীতানুগ গান, হাসির গান, হিন্দি গান প্রভৃতি। নজরুলের দেশাত্মবোধক গানকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন—দেশবন্দনামূলক গান, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান, নারীজাগরণমূলক গান, মুসলিম জাগরণমূলক গান, দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গান। নজরুলের প্রধান পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি। তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। তাঁর দেশাত্মবোধক গানে এই বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। নজরুলের বহু দেশাত্মবোধক গানের সুরে, বাণীতে ও তালের প্রয়োগে বীর রসের এমন প্রবল প্রকাশ ঘটেছে যে এমনটি বাংলা গানের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মুসলিম জাগরণমূলক গান এ বিষয়ে বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান রচনা করে তিনি 'গণসঙ্গীত' (দ্র) নামে বাংলা গানের একটি ধারার সূচনা করেন। বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গভীর প্রীতির আহ্বান জানিয়ে গান রচনার যে ধারা তারও সর্বোচ্চ রূপটি আমরা নজরুলের রচনায়ই দেখতে পাই। দেশাত্মবোধক গান রচনার পাশাপাশি গজল রচনায়ও অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন নজরুল।

নজরুল বাংলায় গজল রচনা করে বাংলা গানের ইতিহাসে গজল যুগের সূচনা করেন। তাঁর গজলকে বলা হয় নজরুলিয়া। এই সঙ্গীতধারার ভিতর দিয়েও নজরুলের প্রতিভার বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। দেশাত্মবোধক গানে যেমন তিনি বিদ্রোহী, গজল গানে তেমনি তিনি মাধুর্যে, বেদনায়, যন্ত্রণায় সংক্রমিত। রাগসঙ্গীত বলতে তাঁর নানা ধারার বিপুল সংখ্যক সঙ্গীতরচনাকে বোঝায়। নজরুলের সঙ্গীতপ্রতিভাকেই বলা হয়েছে রাগসঙ্গীত অনুগ। খেয়াল (দ্র), ঠুমরি (দ্র) ও গজল এই তিনটি রীতিতেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন। খেয়াল ও ঠুমরির রীতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রচুর গান রচনা করেছেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্র) ও অতুলপ্রসাদ সেন (দ্র)



www.pathagar.com

রাগসঙ্গীতের রীতিসমূহকে নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে খেয়াল ও ঠুম্‌রির অঙ্গ নিয়ে নজরুলই সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ গান রচনা করেছেন। রাগসঙ্গীত অবলম্বনে নজরুল কিছু উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষামূলক কাজও করেছিলেন। কলিকাতা বেতারে 'হারামণি' ও 'নবরাগমালিকা' নামে তিনি যে দু'টি অনুষ্ঠান প্রচার করতেন তাদের কেন্দ্র করেই তাঁর নিরীক্ষামূলক কাজগুলো সম্পাদিত হত। 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্য নজরুল বহু লুপ্তপ্রায় রাগে গান রচনা করে ও স্বয়ং গেয়ে তা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। 'নবরাগমালিকা'র জন্য তিনি নতুন রাগ সৃষ্টি করে তাতে গান যোজনা করে গেয়ে শোনাতেন। নজরুলের এই ধরনের প্রয়াস থেকে বাংলায় এক নতুন ধরনের রাগসঙ্গীতের সূচনা হয়। এর নাম 'রাগপ্রধান বাংলা গান'। রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই গীতরীতিকে বাঙালির দান রূপে উল্লেখ করা হয়। আমরা নজরুলরচিত ১৭টি রাগের সন্ধান পাই। তিনি ৬টি তালও রচনা করেছিলেন। বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল অতুলনীয় আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মসঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীতের অসাধারণ রূপকার। হিন্দু ধর্মসঙ্গীতের শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় ধারায় নজরুলের গান রচনাসংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বিপুল। অপর কোনো বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতা হিন্দুধর্ম-সম্পৃক্ত বিষয়সমূহকে এমন বিপুলভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন নি। আধুনিক কালের বাংলা গানের ধারায় ইসলামী সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও নজরুল পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। নজরুলপূর্ব যুগে হাম্‌দ্‌, নাত প্রভৃতি শ্রেণীর যেসব গান বাংলায় রচিত

*বাঁশি বাজাচ্ছেন নজরুল*
*নিচে : নজরুল গীত রচনায় মগ্ন*

www.pathagar.com

হয়েছিল, সেগুলো প্রায় সর্বাংশেই লোকসঙ্গীত(দ্র) পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। নজরুলই প্রথম আধুনিক মুসলিম সমাজের উপযোগী ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেন এবং এ বিষয়ে অসামান্য সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হন। পরবর্তী কালে বর্তমান বাংলা গানের ধারায় ইসলামী সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে যা যা কাজ হয়েছে সেসবেরই ভিত্তি রচনা করেছিলেন নজরুল।

তা ছাড়া আধুনিক বাংলা গানের গোড়ার দিককার উজ্জ্বলতম পর্বটি তিনিই রচনা করেছিলেন। বাংলা লোকসঙ্গীতের অনুসরণে নজরুল যে প্রচুর গান রচনা করেছিলেন এ ব্যাপারটি সহজে আমাদের চোখে পড়তে চায় না, কারণ রাগসঙ্গীতের আঙ্গিকে তাঁর কাজ ছিল অতি বিপুল। তবু দেখা যায় যে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে নাগরিক ধারায় বাংলা গান রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। নজরুলের পূর্বে যাঁরা এই ধারায় গান রচনা করেছিলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, তাঁদের প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল বাউল। কিন্তু নজরুল বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, ঝাপান, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর প্রভৃতি নানা রীতি অবলম্বনে গান রচনা করেছিলেন। তাঁর ঝুমুর গানের আড় দোলা লাগানো সুর-রূপের ব্যবহার নাগরিক ধারার বাংলা গানে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এক কালে হাসির গান রচনার জন্যও নজরুল বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রঙ্গে ও ব্যঙ্গে তিনি সমানভাবে ঝলসে উঠেছিলেন। হিন্দিতেও নজরুল অনেক গান রচনা করেছিলেন।

বাংলা গানের প্রচলিত ধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে এবং স্বয়ং নব নব ধারা সংযোজন করে নজরুল বাংলা গানকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতা। পূর্ববর্তীদের মধ্যেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তিনি তুলনীয়। নজরুল নাগরিক ধারার বাংলা গানে যৌবনের প্রতীক।

ক. গো.

**নটরাজ**

তাণ্ডব (দ্র) নৃত্যরত মহাদেব (দ্র) শিবের লীলামূর্তি। 'সভাপতি' নামেও পরিচিত। চার হাতবিশিষ্ট যে নটরাজমূর্তি ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত, তার উদ্ভব দক্ষিণ ভারতের

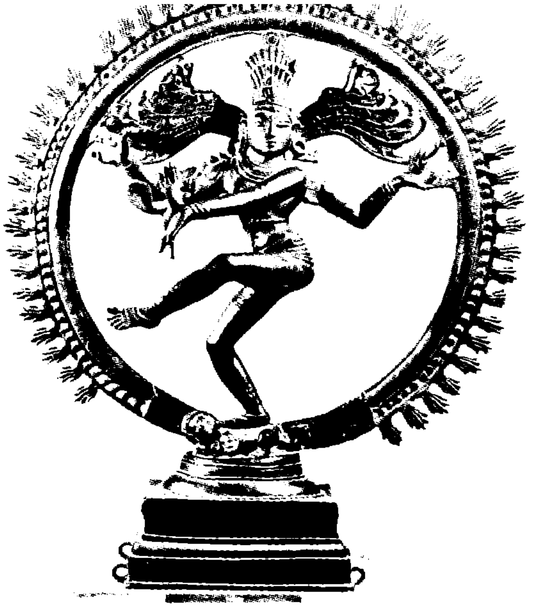

নটরাজ

চোল রাজাদের আমলে। চোল শিল্পকীর্তির অন্তর্গত ব্রোঞ্জের (দ্র) তৈরি এই সব মূর্তি মধ্যযুগের (দ্র) ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম হিসাবে নন্দিত। 'উনমইবিলক্কম' নামে একটি মধ্যযুগীয় তামিল গ্রন্থে এই মূর্তিরূপের শিল্প-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ডমরু (শিবের বাদ্য) থেকে সৃষ্টির শুরু, অভয়মুদ্রায় স্থিতির ইঙ্গিত, অগ্নিগোলক প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক, উত্থিত বাম পদে মুক্তির আভাস এবং প্রভাবলী তার তিরোভাবের পরিচয়বাহী। অর্থাৎ নটরাজমূর্তির ভেতর দিয়ে দেবতার পাঁচটি গুণের, যথা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাবের রূপটি পরিস্ফুট। আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত কাব্য ও নৃত্যকলার ক্ষেত্রে নটরাজের রূপকল্প বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

চার হাত ছাড়াও নৃত্যপর নটরাজের আরো বিভিন্ন ধরনের মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সব মূর্তির কোনো কোনোটিতে এই দেবতার হাতের সংখ্যা কখনো ৮, কখনো-বা ১০, আবার কোনো ক্ষেত্রে ১২ বা ১৬টি। এসব হাতের কোনো কোনোটি ধারণ করে আছে ত্রিশূল, দণ্ড, ডমরু ও পরশু (কুঠার) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের (দ্র) ঢাকা (দ্র) জেলার রামপাল ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে এ জাতীয় বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে।

আ. হু.



www.pathagar.com

পুরনো ঢাকার জীবন যাপনে বৈশিষ্ট্যময় ঐতিহ্য—গ্যাসবাতি, রাস্তা ভেজাতে ভিস্তিওয়ালা, ঘোড়ার গাড়ি, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি। ছবিটি শিল্পী হাশেম খানের, জলরঙ ছবি। নিচের ছবি : কমলাপুরে অবস্থিত ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন—আধুনিক স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন

www.pathagar.com

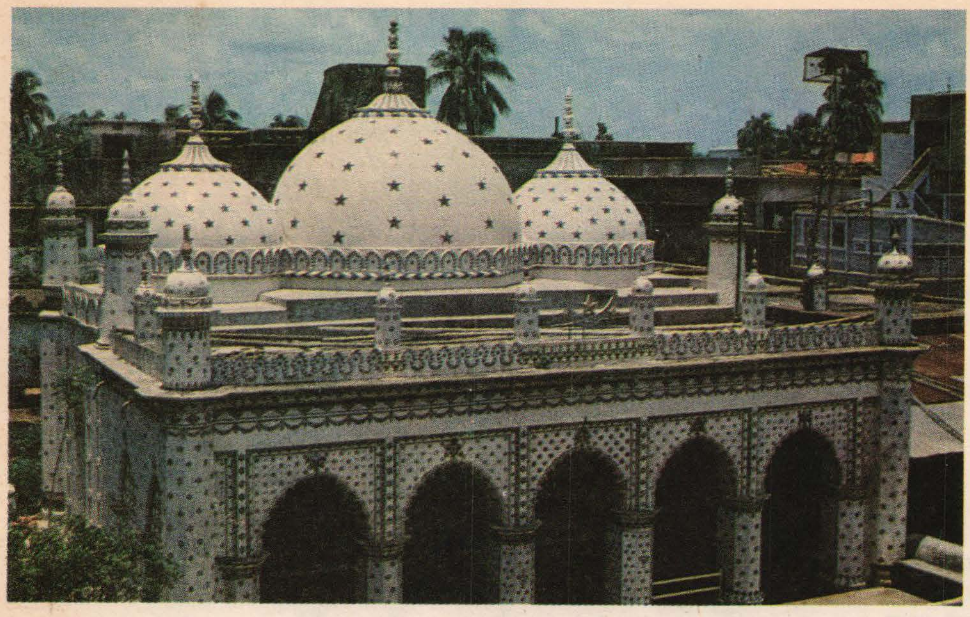

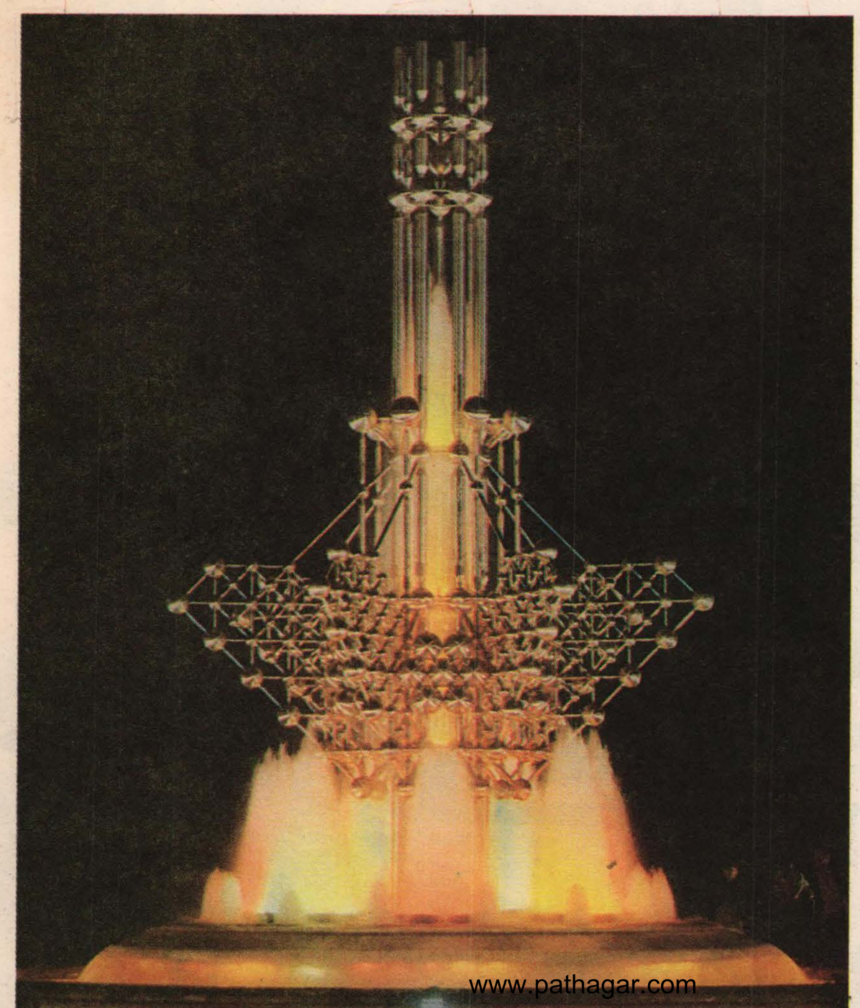

উপরে : পুরনো ঢাকার স্থাপত্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন—তারা মসজিদ। নিচে : নতুন ঢাকায় আধুনিক ভাস্কর্য সার্ক ফোয়ারা, ভাস্কর : নিতুন কুণ্ডু

www.pathagar.com

উঁচু ও বড় বড় স্থাপত্যে সাজানো ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢোল —লোকসংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র যার কদর এখনো আছে



www.pathagar.com

www.pathagar.com

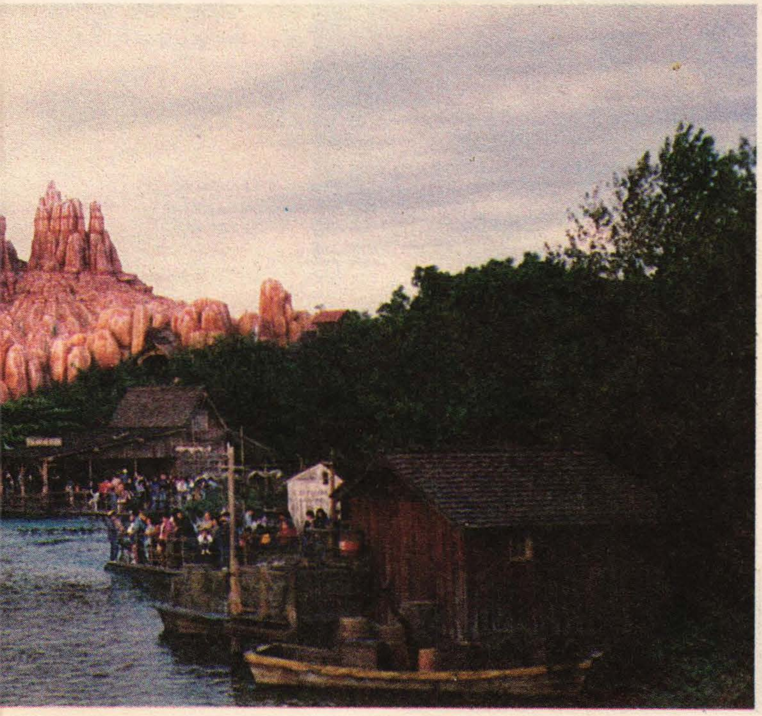

আমেরিকায় তৈরি প্রথম ডিজ্নিল্যাণ্ডের অনুকরণেই করা হয়েছে জাপানের টোকিও ডিজ্নিল্যাণ্ড। উপরে : বাঁ দিক থেকে ডিজ্নির তৈরি মিকি মাউস, ডোনাল ডাক ও অন্যান্য জীবজন্তুরা রাস্তায় নেচে গেয়ে চলেছে। পরের ছবিতে হাতির নাচ এবং সর্বডানে—হাতিরা নদীতে খেলছে—মানুষের তৈরি পুতুল হলেও সত্যিকারের হাতির মতোই ওরা সব কিছু করতে পারে। নিচে : 'মার্ক টোয়েন' জাহাজে করে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ



www.pathagar.com

তাল বাগান

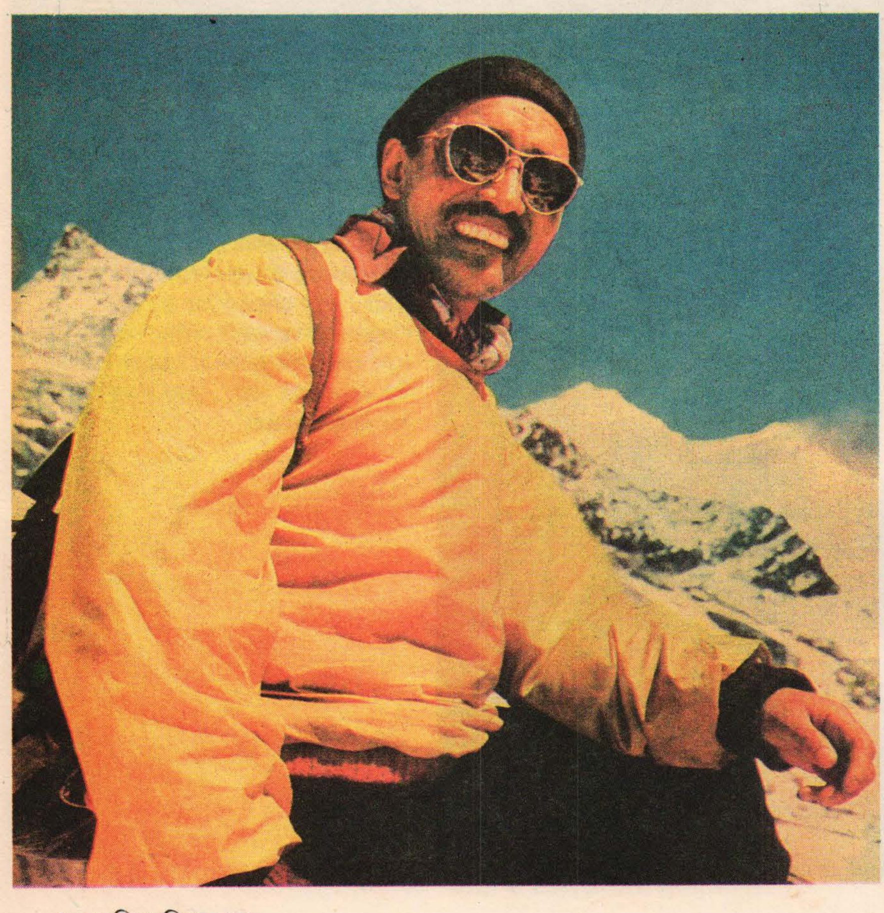

তেনজিং– নেপালি শেরপা। এডমণ্ড হিলারিকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে হিমালয়ের চূড়া এভারেস্ট বিজয় করেন

ডানের পৃষ্ঠায়– লেওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত ছবি মোনালিসা



www.pathagar.com

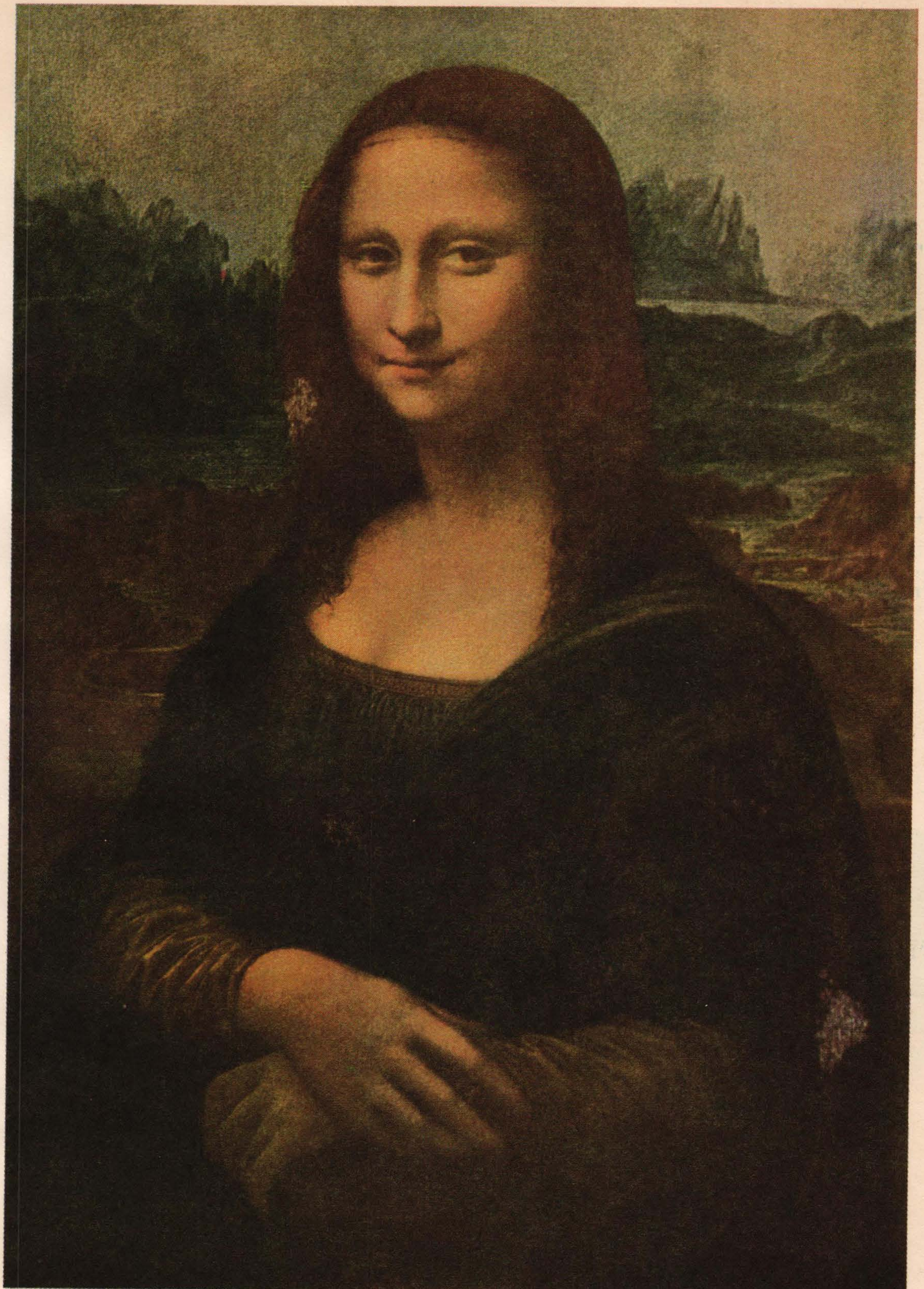



www.pathagar.com

# টেলিভিশনে 'ক্রোমা-কী' পদ্ধতিতে ছবির ওপর ছবি চাপানো

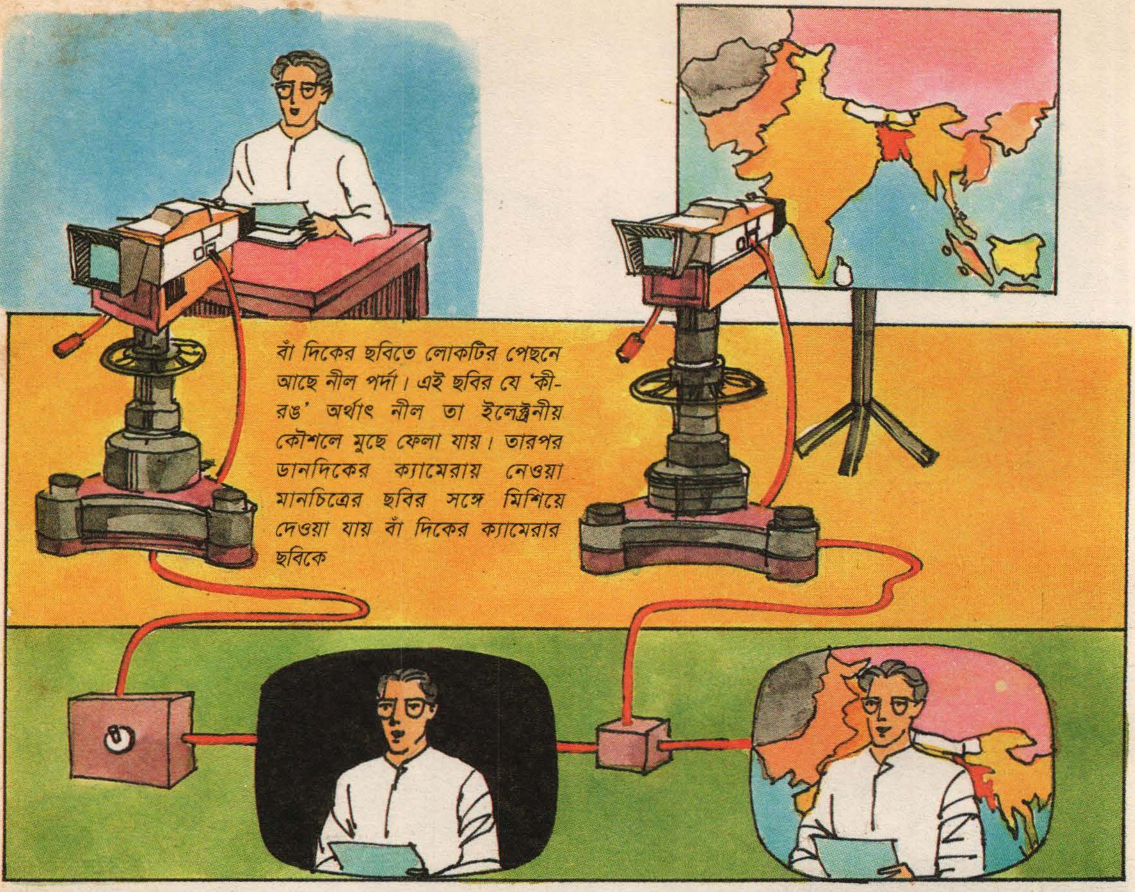

বাঁ দিকের ছবিতে লোকটির পেছনে আছে নীল পর্দা। এই ছবির যে 'কী-রঙ' অর্থাৎ নীল তা ইলেক্ট্রনীয় কৌশলে মুছে ফেলা যায়। তারপর ডানদিকের ক্যামেরায় নেওয়া মানচিত্রের ছবির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় বাঁ দিকের ক্যামেরার ছবিকে

নীল পটভূমিতে পাগড়ি পরা এক জাদুকর বসে আছে জাদুর গালিচার ওপর। এই ছবি এক ক্যামেরায় নিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য ক্যামেরায় তোলা মেঘের ছবির সঙ্গে। তার ফলে দর্শকেরা দেখবে জাদুর গালিচায় চেপে জাদুকর যেন আকাশে ভেসে যাচ্ছে



www.pathagar.com

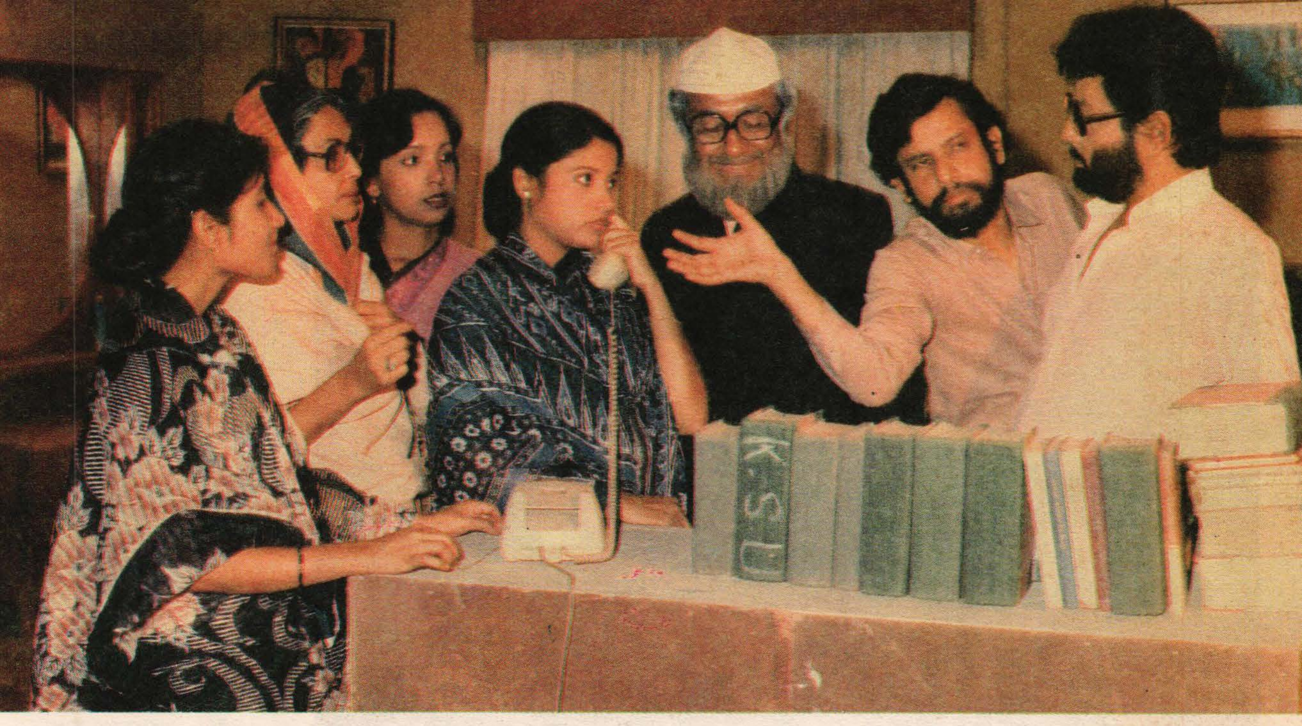

নাটক— 'এই সব দিনরাত্রি'র একটি দৃশ্যে বুলবুল আহমেদ, আসাদুজ্জামান নূর, মেহফুজ, ডলি জহুর, লুৎফুন নাহার লতা, দিলারা জামান ও অপু। রচনা— হুমায়ুন আহমেদ, নিচে : নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরীর নাটকে হুমায়ুন ফরিদী, ফেরদৌসী মজুমদার ও ডালিয়া

www.pathagar.com

নদী ও নৌকা—বাংলাদেশে আছে অসংখ্য নদী—যার মধ্যে বিচরণ করে হাজার হাজার নৌকা—এগুলোর আকার আকৃতিও নানা রকম

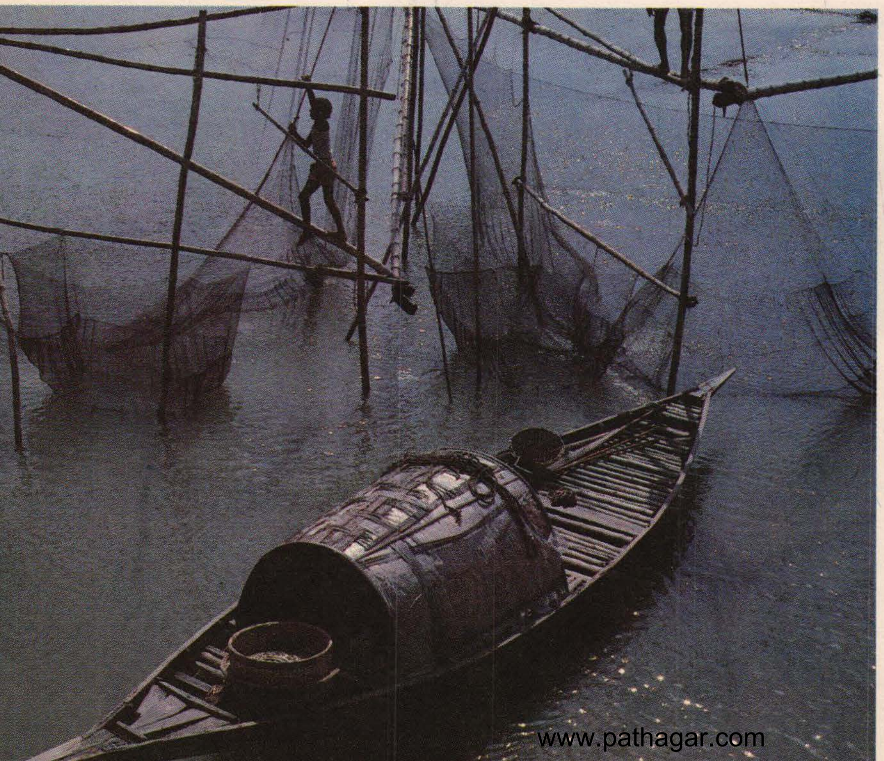

নদীতে ভেসাল, জেলে ও নৌকা

ডান পাশের পৃষ্ঠায়
উপরে : নদীর ঘাটে বেদে নাওয়ের বহর, নিচে : ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে রিকশা নাওয়ের (নদী পারাপারের নাও) বিশ্রাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা হরিপুরা পোস্টার



www.pathagar.com

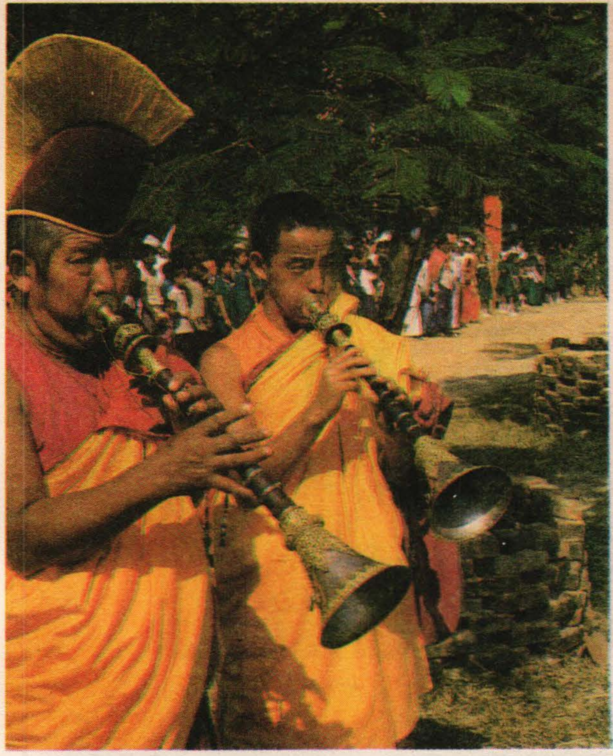

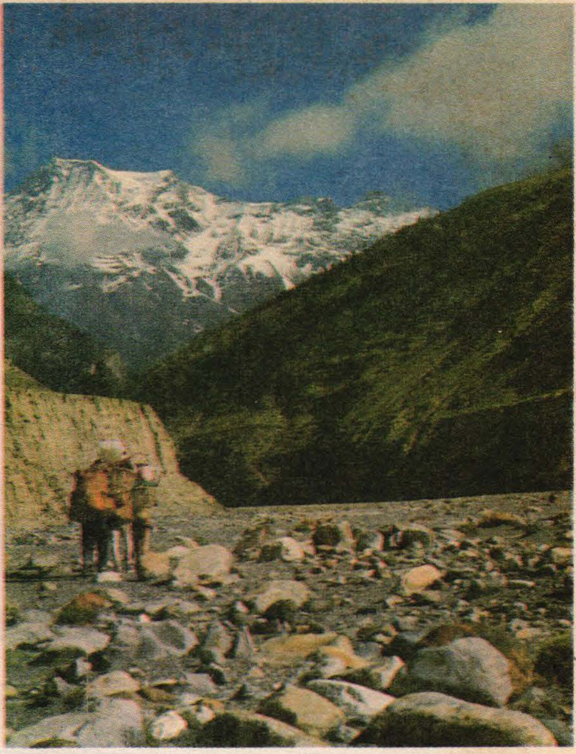

নেপালের দু'জন লামা বাঁশিওয়ালা. 'কালী গন্ধকী' উপত্যকা

নেপাল– ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার

www.pathagar.com

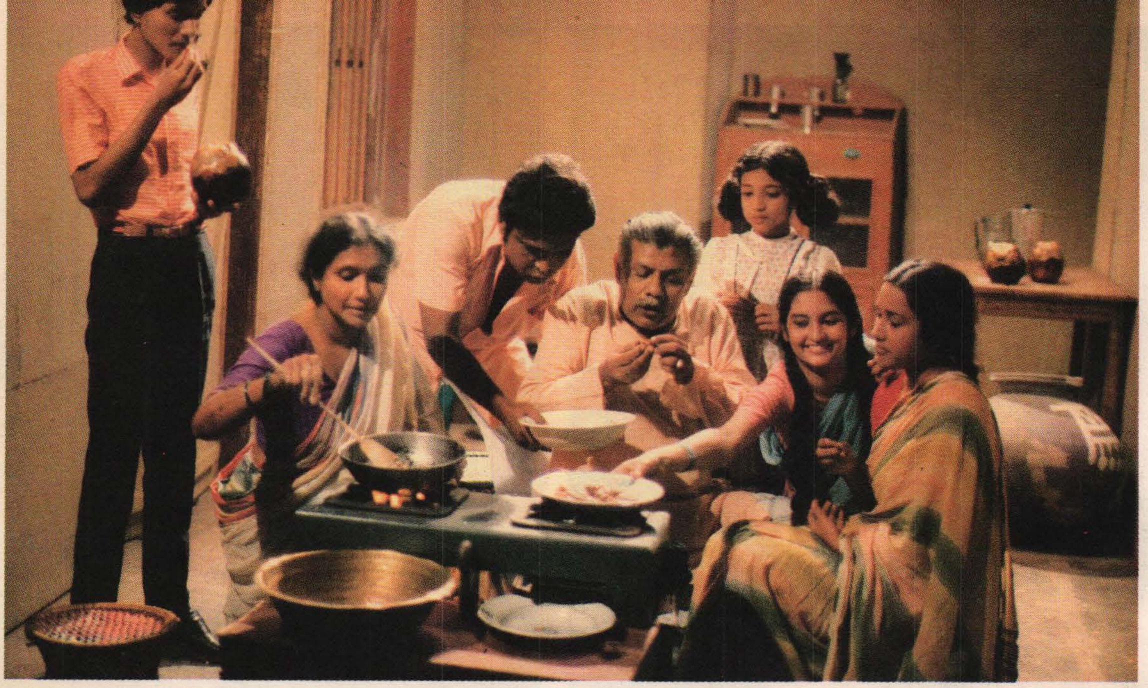

'ঢাকায় থাকি' নাটকের দৃশ্যে জনাব সিরাজুল ইসলাম, ব্ল্যাক আনোয়ার, মিনতি হোসেন, শাকিল, ফাল্গুনী হামিদ, লুনা ও শিশুশিল্পী শাওন, নিচে : একটি নৃত্যনাট্যে নৃত্যশিল্পী শিবলী মোহাম্মদ ও শামীম আরা নিপা

www.pathagar.com

দোয়েল— বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। ভোরবেলায় দোয়েলের শিস সুমধুর শোনায়

পলাশ ফুল ও টিয়া পাখি



www.pathagar.com

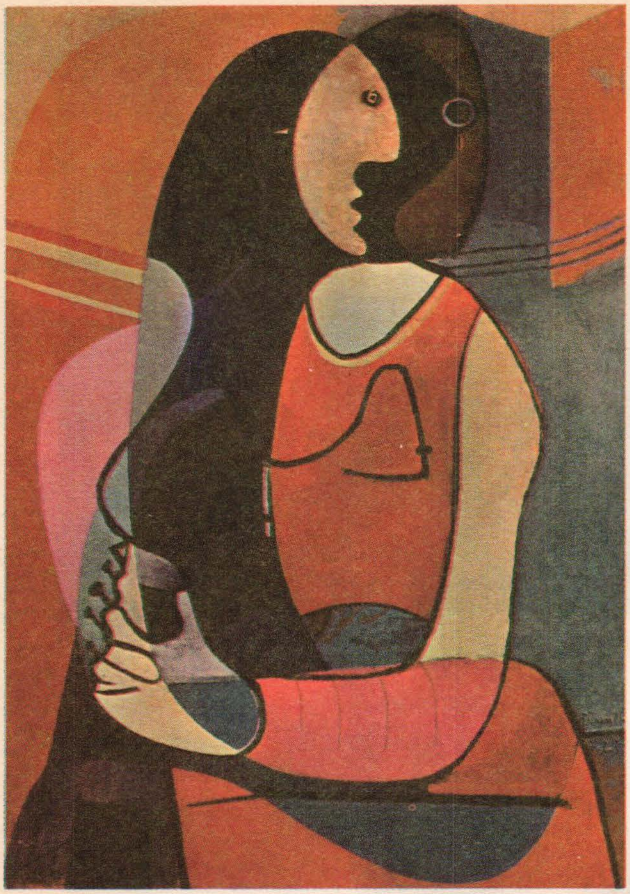

পাবলো পিকাসোর ছবি
রমণী— ১৯২৭, নিচে :
খাওয়ার টেবিলে—১৯৫৯

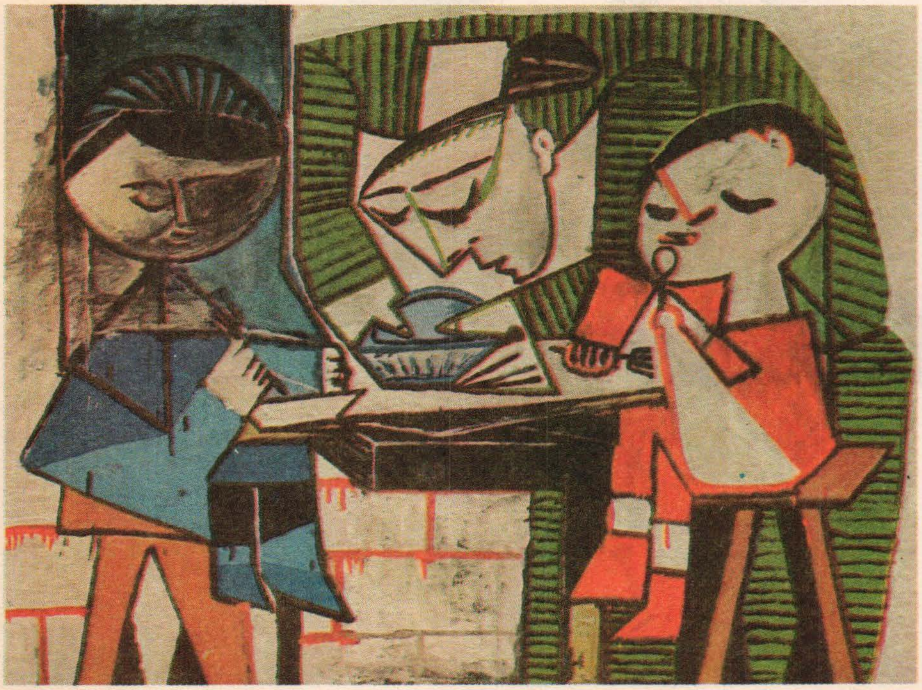



www.pathagar.com

## নদী

সাগর (দ্র) বা হ্রদের (দ্র) দিকে জলের প্রাকৃতিক প্রবাহই নদী। প্রস্রবণ, জলাভূমি এবং হিমবাহের (দ্র) প্রান্তসীমা থেকে পানির স্রোত বেরিয়ে ভূমির ঢাল বা নিম্নগামিতা অনুসারে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে ছোট-বড় অসংখ্য নদীর সৃষ্টি করে। এ ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি পড়ে ও তুষারগলা পানি জমে ভূপৃষ্ঠ দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে নদীর সৃষ্টি করে। নদী যেখান থেকে সৃষ্ট হয় তাকে নদীর 'উৎস' বলে। নদী যেখানে সাগর, মহাসাগর বা হ্রদের সাথে মিলিত হয় তাকে 'মোহনা' বলে। যে ক্ষুদ্র জলধারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয় তাকে 'উপনদী' বলে। কোনো নদী থেকে কোনো জলধারা বেরিয়ে অপর কোনো নদী বা সাগরের সঙ্গে মিলিত হলে তাকে বলে 'শাখানদী'। নদী মানুষ, গাছপালা ও প্রাণীর (দ্র) বাসযোগ্য জায়গা গড়ে তোলে। সাগর, নদী, হ্রদ ইত্যাদি পানির উৎস। তাই আদিকাল থেকে মানুষ যেখানে পানির সন্ধান পেয়েছে সেখানেই বসতি স্থাপন করেছে। প্রাণীদের কিছু নদীর ধারে আর কিছু নদীর পানিতে বাস করে। নদীর পানি বয়ে যাওয়ার সময় মৃত গাছ, প্রাণী, পাতা, বীজ তার সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এসকল ভাসমান বস্তু বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক গাছ ও প্রাণীর খাবার জোগায়। এ ছাড়া নদীর পানিতে গাছের সজীব বীজ ভেসে গিয়ে গাছের বংশবৃদ্ধিও ঘটায়। নদীতে যেসব প্রাণী বাস করে তাদের একটি হচ্ছে মাছ (দ্র)। মাছ আমাদের প্রিয় ও প্রধান খাদ্যের একটি। পদ্মা (দ্র), মেঘনা (দ্র), যমুনা (দ্র), ব্রহ্মপুত্র (দ্র), গোমতী, সুরমা, তিস্তা ইত্যাদি আমাদের দেশের বিখ্যাত নদী। পদ্মার ইলিশ(দ্র) বেশ সুপরিচিত। পৃথিবীর (দ্র) দীর্ঘতম নদী আফ্রিকার (দ্র) নীল নদ (দৈর্ঘ্য ৬,৬৯৫ কিলোমিটার)। আরো রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) আমাজন (দৈর্ঘ্য ৬,৪৪০ কিলোমিটার), চীনের (দ্র) ইয়াংসি (দৈর্ঘ্য ৬,৩৮০ কিলোমিটার), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) মিসিসিপি-মিসৌরি (দৈর্ঘ্য ৬,০১৯ কিলোমিটার)।

সে. শা.

## নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

নদীপ্রকৌশল, পানির গতিপ্রবাহ, মাটির গঠনপ্রণালী, কংক্রিট প্রযুক্তিবিদ্যা, পানি-রসায়ন, ভূ-রসায়ন এবং ভৌত ও গাণিতিক মডেলিং-এর ক্ষেত্রে বহুমুখী পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৭ সালে ঢাকায় এই সংস্থাটির জন্ম। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি তার সমুদয় সম্পদসহ এর সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় ফরিদপুরে। বর্তমানে এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক জন মহাপরিচালক বা ডাইরেক্টর জেনারেল।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সারফেস ওয়াটার মডেলিং সেন্টার'কে (এস ডব্লু এম সি) ওয়াটার রিসোর্সেস প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (ডব্লু এ আর পি ও) থেকে পৃথক করে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম 'আর আর আই' RRI= River Research Institute। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন্যান্য প্রধান কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচব্যবস্থা, নদীতীর সংরক্ষণ ও সুদৃঢ়ীকরণ, পাললিকীকরণ ও নাব্যতারক্ষা বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি এই সব ক্ষেত্রে সরেজমিনে জরিপকাজ পরিচালনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ছাড়া জোয়ার-ভাটাসৃষ্ট স্রোতনিয়ন্ত্রিত মোহনা, উপকূলীয় ও পোতাশ্রয় কৃৎকৌশল, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও ভূমি পুনরুদ্ধার; ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর, স্লুইস গেট ও কালভার্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে পানির গতিপ্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণও এর কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৯ সাল থেকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ নদীর তীর ও শহর প্রতিরক্ষা, বন্যা প্রতিরোধ ও সেতুসংরক্ষণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, কর্মী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিবিদ্যা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, ইউ এন ডি পি(দ্র) এবং ডানিডা (DANIDA) পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আ. হু.



www.pathagar.com

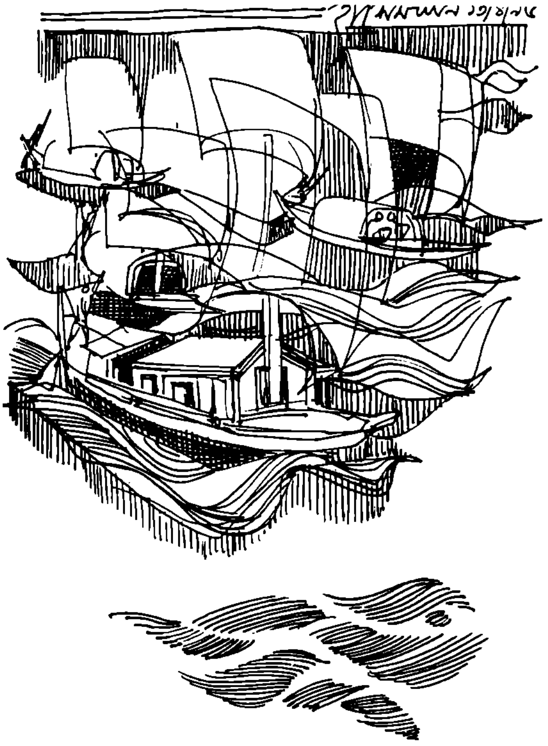

*নদী ও নৌকা : শিল্পী হাশেম খানের ড্রইং*

*নদীমাতৃক বাংলাদেশের একটি পরিচিত দৃশ্য—পালতোলা নৌকা*

## নদী, বাংলাদেশের

পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের ছোট্ট এই বাংলাদেশের (দ্র) ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। তাই বাংলাদেশকে বলা হয় 'নদীমাতৃক দেশ'। ছোট-বড় মিলিয়ে বাংলাদেশে মোট নদীর সংখ্যা সাত শ'রও ওপর। তবে, প্রধান নদী চারটি—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও কর্ণফুলি।

**পদ্মা :** পদ্মার আসল নাম গঙ্গা। হিমালয় পর্বতমালা (দ্র) থেকে উৎপন্ন হয়ে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর কাছে মাথাভাঙা নদী যেখানে শেষ, সেখানে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নামে গোয়ালন্দ পর্যন্ত এসে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে এর আরেক নাম কীর্তিনাশা। পদ্মার প্রধান উপনদী মহানন্দা এবং পূর্ণভবা (বা পুনর্ভবা) বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার শাখানদীর মধ্যে ভৈরব, মাথাভাঙা, কুমার, গড়াই, আড়িয়ল খাঁ এবং প্রশাখানদীর মধ্যে মধুমতী, পসুর ও কপোতাক্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলি কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, বাগেরহাট, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল দিয়ে গতিপথ রচনা করেছে।

পদ্মার তীরে প্রসিদ্ধ স্থানগুলো হল কুমারখালী, শিবালয় বা আরিচাঘাট, গোয়ালন্দ, চর ভদ্রাসন, লৌহজং ও চাঁদপুর। পদ্মার ওপর পাকশিতে সারা সেতু বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (দ্র) বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সেতু। পদ্মার ইলিশ(দ্র), বোয়াল ও পাঙ্গাসের স্বাদ অতুলনীয়।



www.pathagar.com

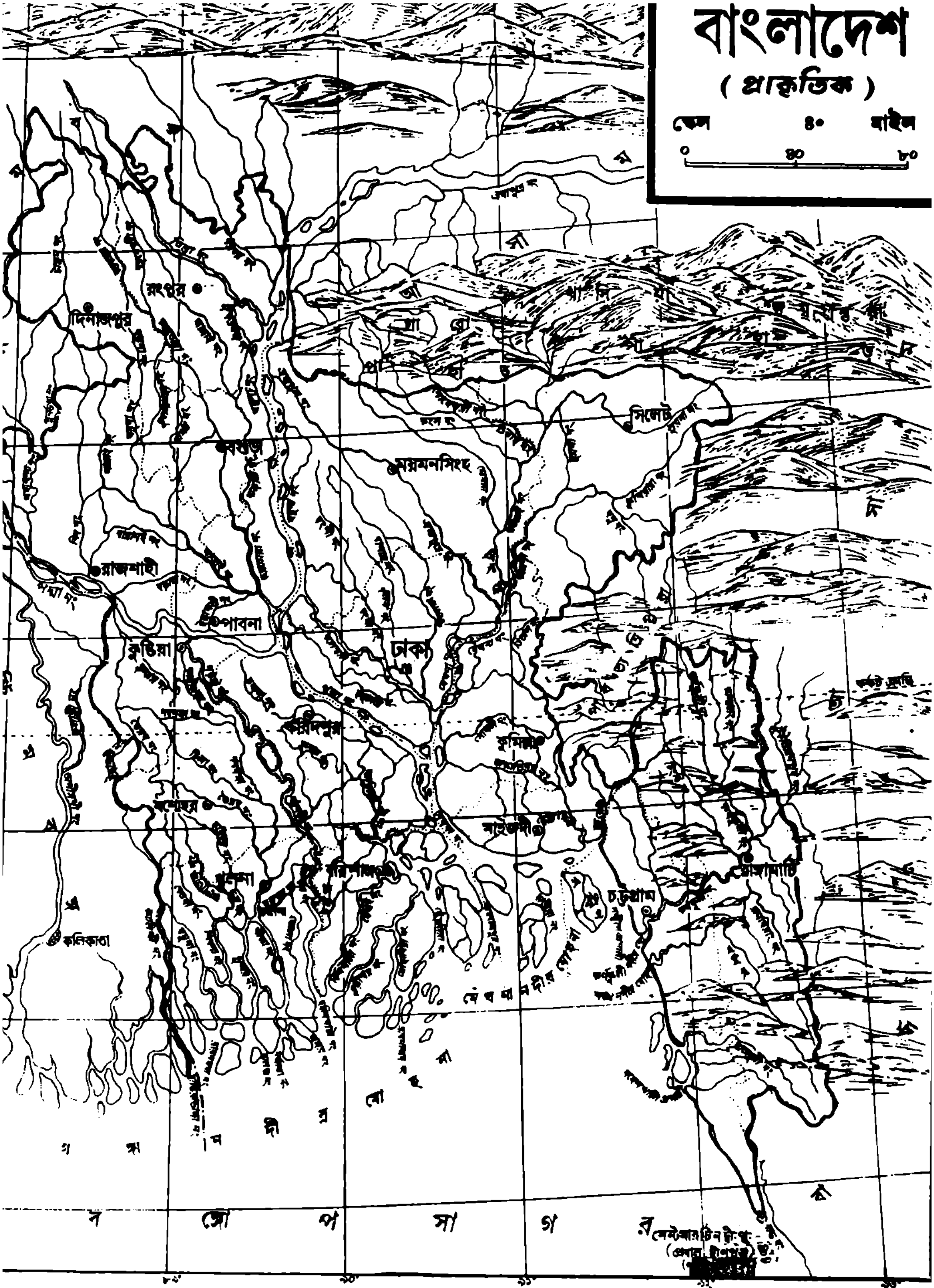


...শে নদীপ্রবাহ



www.pathagar.com

**মেঘনা** : মেঘনা (দ্র)

**যমুনা** : বাংলাদেশে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) মূল ধারার নাম যমুনা। ১৭৮৭ সালে এক ভয়াবহ বন্যায় ব্রহ্মপুত্র নতুন যে খাত সৃষ্টি করে বগুড়া ও পাবনা জেলার পূর্ব সীমান্ত ধরে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদীতে মিশেছে, তা-ই যমুনা নামে পরিচিত। উৎপত্তিস্থান থেকে পদ্মা পর্যন্ত যমুনার দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার আর ব্রহ্মপুত্রসহ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। যমুনার প্রধান উপনদীগুলোর মধ্যে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই ও সুবর্ণশ্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাখানদীর মধ্যে ধলেশ্বরী এবং প্রশাখানদীর মধ্যে বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যার নাম উল্লেখ করা যায়। বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা (দ্র) মহানগরী এবং শীতলক্ষ্যার তীরে বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জ গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রায় সব নদীই যমুনায় গিয়ে মিশেছে। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং ঢাকার বিশাল অংশ নিয়ে যমুনার অববাহিকা গঠিত। যমুনার তীরে চিলমারী, ফুলছড়ি, সিরাজগঞ্জ ঘাট, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান।

**কর্ণফুলি** : আসামের লুসাই পাহাড়ের লুগলেহ অঞ্চল থেকে প্রবাহিত তুই চাং এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত থেকে তুইলিয়াং পুই—এই দুই নদীর মিলিত ধারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাছে মিজোরাম সীমান্তের দেমাগিরিতে এসে কর্ণফুলি নদী নামে খ্যাত হয়েছে। তবে লুসাই পাহাড় থেকে আসা তুই চাং-ই কর্ণফুলির মূল ধারা। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, বড়ইছড়ি, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, কালুরঘাট ও চট্টগ্রাম (দ্র) শহরের পাশ দিয়ে পতেঙ্গায় এসে কর্ণফুলি বঙ্গোপসাগরে (দ্র) পড়েছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার। কর্ণফুলির গোড়ার দিকে কয়েকটি জলপ্রপাত আছে। তাদের মধ্যে মিজোরামের দেমাগিরি ও পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার বরকল জলপ্রপাত বিখ্যাত। কর্ণফুলির সঙ্গে মিলিত বড় বড় উপনদীর মধ্যে চেঙ্গী, কাসলং, মাইনী, রাখিয়াং ও হালদা নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাপ্তাইতে বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে কাপ্তাইয়ের ওপরে পানি জমে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। হ্রদে মাছের চাষ হয় এবং এখান থেকে ঢাকা সিদ্ধিরগঞ্জে ১৩২ কে. ভি. বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কর্ণফুলির তীরে চন্দ্রঘোনায় এশিয়ার (দ্র) এক কালের বৃহত্তম কাগজকল আছে। সেই সঙ্গে কাগজকলের পাশে বাঁশ থেকে কৃত্রিম রেয়নতন্তু তৈরির কারখানাও রয়েছে। কর্ণফুলির মোহনায় বাংলাদেশের বৃহত্তম বন্দর চট্টগ্রাম অবস্থিত।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে আরো কয়েকটি নদী রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সাঙ্গু বা শঙ্খ, মাতামুহুরী, বাঘখালী, নাফ নদী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জালের মতো খাল ও নদী ছড়িয়ে অছে। তবে একই নদী বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামেও পরিচিত।

যমুনাসহ ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। প্রশস্ততম নদী পদ্মা আর খরস্রোতা নদী মেঘনা। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনা নদীর অববাহিকার মোট আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এর মাত্র সাড়ে সাত ভাগ পড়েছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের নদীপথ প্রায় ৭,২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পথের গুরুত্ব অপরিসীম। নদীপথের সুবিধার জন্য প্রাচীন কালে বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই জনপদে আসত। আসলে নদীর জন্যই এ দেশে এত ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। নদী এ দেশকে সুজলা-সুফলা করেছে, করেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। অবশ্য বর্ষাকালে নদীর উদ্দামতা, বন্যা-ভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটায়। তবু নদী এ দেশের মানুষের কণ্ঠে দিয়েছে ভাটিয়ালি (দ্র), ভাওয়াইয়া (দ্র), সারি, বাউল প্রভৃতি নানা ধরনের গান, আর এ দেশের মানুষের বুকে দিয়েছে সংগ্রাম করার অদম্য শক্তি ও অসম সাহস। তাই দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে নদীর বিপুল প্রভাবের কথা বলে শেষ করা যায় না।

**সুজ. ব.**

## নন্দনতত্ত্ব

যে তত্ত্বের সাহায্যে শিল্পকলাকে সৌন্দর্যের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং অথবা যার সাহায্যে শিল্পের সৌন্দর্যের রূপ ও প্রকৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়


www.pathagar.com

তাকে 'নন্দনতত্ত্ব' বলা হয়। নন্দনতত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র, শিল্পসৃষ্টির প্রথম দিক থেকেই এর উৎপত্তি, তবে কালের যাত্রার মধ্য দিয়ে এই শাস্ত্রের বহুমুখী বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে।

নন্দনতত্ত্বের সাহায্যে আমরা কোনো একটি শিল্পকর্মের শুধু বিষয়বস্তু নয়, তার অন্তর্নিহিত নানা দিক, যেমন রূপক, প্রতীক, সাঙ্কেতিকতা ও গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার ও উপভোগ করার প্রয়াস পাই। এটা সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সকল শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এক সময় নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় আর্ট ফর আর্টস সেইক (Art for art's sake) তথা 'শিল্পের জন্যই শিল্প' মতবাদটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু ওই প্রবণতা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় নি। এখন শিল্পের সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তাকে জীবনের সত্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে নন্দনতত্ত্ববিদেরা সবাই প্রায় একমত।

ক. চৌ.

*জতুগৃহদাহ : ১৯১০ এবং নিচে : গোপালপুরে ধীবর। শিল্পী নন্দলাল বসু*

**নন্দলাল বসু** [১৮৮২—১৯৬৬]

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম ১৮৮২ সালের, মুঙ্গের- খড়্গপুরে। নন্দলাল বসুর বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে দেবদেবীর মূর্তিসহ পুতুল তৈরি করতেন। চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ এবং পড়ালেখায় অমনোযোগিতার কারণে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্) পরীক্ষায় পর পর দু'বার ফেল করেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সাহায্যে কলিকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পান। আর্ট স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'কর্ণের সূর্যস্তব', 'গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য', 'কৈকেয়ী', 'শিবমতী', 'নৌকাবিহার' প্রভৃতি ছবি এঁকে নিজের প্রতিভার

www.pathagar.com

*শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা সাঁওতালদের শস্যবপন নৃত্য*

পরিচয় দেন। 'শিবসতী' ছবিটির জন্য তিনি ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে (১৯০৮) পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার পান। এই সময়ই তিনি পাটনা, রাজগির, বুদ্ধগয়া, বারাণসী, দিল্লি (দ্র), আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ (দ্র) ভ্রমণ করে উত্তর ভারতের শিল্পঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রায় একই সময়ে পুরী থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন এবং কোণারকের সূর্যমন্দির (দ্র) তাঁকে প্রভাবিত করে। ১৯০৯ সালে অজন্তা গুহা পরিদর্শন তাঁর প্রতিভাবিকাশে বিশেষ প্রভাব ফেলে, যার ফলে ১৯২১ সালে তিনি বাঘ গুহার নষ্ট হয়ে যাওয়া চিত্রগুলি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।

১৯০২ সালে ছাত্রাবস্থার শেষ দিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে নন্দলাল বসু আর্ট স্কুল ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময় তিনি ভগিনী নিবেদিতার (দ্র) 'হিন্দু-বৌদ্ধ পুরাকাহিনী' বইটির অঙ্গসজ্জা করেন এবং ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলার তালিকা তৈরিতেও সাহায্য করেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নন্দলাল বসু সেখানে শিল্পকলার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। জাপানি শিল্পী আরিসান বিচিত্রায় অতিথি হিসাবে এলে নন্দলাল তাঁর কাছ থেকে দূরপ্রাচ্যের তুলি-কালিশৈলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

১৯০২ সাল থেকে নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে (দ্র) স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৫–৩৭ সালে পর পর তিন বছর তিনি কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে শিল্প-প্রদর্শনী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা সম্মেলনে তিনি লোকচিত্রের ধারাবাহী ৮৩টি পট প্রদর্শন করেন যা 'হরিপুরা পট' নামে খ্যাত।

১৯৪৩ সালে নন্দলাল বসু বরোদার মহারাজের কীর্তিমন্দির অলঙ্কৃত করার দায়িত্ব লাভ করেন। এই



www.pathagar.com

*হরিপুর দেয়ালচিত্র ১৯৭৩*

কীর্তিমন্দিরের চারদিকের এবং শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের (দ্র) দেয়ালচিত্র নন্দলাল বসুকে বিশেষ খ্যাতিমান করে তোলে। ভারতীয় সংবিধানের সচিত্র সংস্করণও নন্দলাল বসুই অলঙ্কৃত করেন। তাঁর আঁকা ছোট ছোট ছবিগুলোতেও তাঁর প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে। শেষ জীবনে নন্দলাল বসু তুলি-কালি এবং ছাপচিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন এবং এ ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দেন। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী (দ্র) তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬৬ সালে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু পরলোকগমন করেন।

মে. খা.

**নফল**

'নফল' শাব্দিক অর্থে অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক কাজ। ইসলামী পরিভাষায় ফরয্ (দ্র), ওয়াজিব (দ্র) এবং সুন্নত (দ্র) ইবাদতের (দ্র) অতিরিক্ত হিসাবে যে সকল ইবাদত করা হয়, তাই নফল বা অতিরিক্ত ইবাদত। 'নফল' পালন করলে সওয়াব বা পুণ্য হয়, পালন না করলে কোনো গোনাহ্ বা পাপ হয় না।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ নফল ইবাদত হিসাবে বিভিন্ন প্রকার নামায (দ্র) আদায়, রমযান (দ্র) ব্যতীত অন্য সময়ের রোজা (দ্র) পালন ও অন্যান্য ইবাদত করে থাকেন।

মু. মা.

**নবশক্তি** অদ্বৈত মল্লবর্মণ দ্র
**নবারুণ-১** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
**নবারুণ-২** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
**নবী, শেষ** হযরত মুহম্মদ (স.) দ্র
**নবীন বিজ্ঞানী** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

**নবীনচন্দ্র দাস** [১৮৫৩—১৯১৪]

জন্ম ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ সালে, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং এলএল. বি. পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে আইনের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন, পরে রংপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে 'বিভাকর' ও 'প্রভাতী' নামক দু'টি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত 'প্রভাত' পত্রিকা কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'(দ্র) -এর মুখপত্রস্বরূপ ছিল। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'কবিগুণাকর' উপাধি দেন, চট্টল ধর্মমণ্ডলী দেন 'বিদ্যাপতি' উপাধি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রঘুবংশ' (১৮৯১), 'লোকগীতি' (১৯০০), 'শিশুপালবধ' (১৯০৩), 'কিরাতার্জুন' (১৯০৬), 'কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্রের চারুচর্যাশতক' (১৯১৩), 'মিরাকল্‌স অব বুদ্ধ' এবং 'এনশিয়েন্ট জিওগ্রাফি অব ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি। ১৯১৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বি. ব.

**নবীনচন্দ্র সেন** [১৮৪৭—১৯০৯]

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।



www.pathagar.com

তাঁর পিতার নাম গোপীমোহন সেন। গোপীমোহন চট্টগ্রাম জজকোর্টের পেশকার ছিলেন। নবীনচন্দ্র ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান।

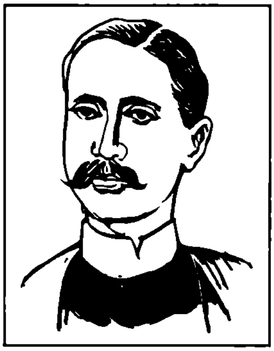

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) অনুসারী মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে নবীনচন্দ্র অধিক পরিচিত। তবে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। পাঁচ খণ্ডে রচিত তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' যেমন উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য, তেমনি তাঁর সমকালের সমাজচিত্রও বটে।

নবীনচন্দ্র সেন কৈশোরকাল থেকেই কাব্যচর্চায় আগ্রহী হন। স্কুলে পণ্ডিত মশায় শ্রী জগদীশ তর্কালঙ্কারের কাছে তিনি সর্বপ্রথম কাব্য রচনায় উৎসাহ লাভ করেন। নবীনচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ সালে চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন ও বৃত্তি লাভ করেন। এর পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৫ সালে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্) পাশ করেন। এ সময় তিনি বিবাহ করেন। ১৮৬৮ সালে জেনারেল এসেমব্লিস ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পড়ার সময় তাঁর পিতা মারা যান। ১৮৬৮ সালে তিনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। ছাত্রজীবন থেকে চাকুরিলাভ পর্যন্ত বরাবরই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (দ্র) অশেষ স্নেহ, প্রেরণা ও আনুকূল্য লাভ করেন।

প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকলে কবি হিসাবে সর্বপ্রথম পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর 'প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হলে এবং ১৮৭৫ সালে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হলে তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ হল 'ভারত উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০), 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩)।

নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর সরকারি চাকুরি করেন। চাকুরিজীবনে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। চাকুরিকালে বিভিন্ন সময়ে তিনি চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালি, যশোর ও মাদারীপুরে কর্মরত ছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে নানা মতবিরোধ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে তাঁকে চাকুরি করতে হয়েছে। নবীনচন্দ্র ১৮৭০ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে নিজ জেলা চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। এখানে প্রায় ছ' বছর তিনি কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রামে চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবিধানের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকায় ইংরেজ শাসকেরা তাঁর ওপর রুষ্ট হন। তাঁকে প্রায় দেড় মাস চাকুরি থেকে সাসপেণ্ড করে রাখা হয়। অথচ অন্য দিকে তিনি 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে ইংরেজদের ভারত আগমনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

নবীনচন্দ্র সেন ১৯০৪ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। পাঁচ বছর পর ১৯০৯ সালের ২০শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শ. আ.

## নবীবংশ

মধ্যযুগের (দ্র) বাংলায় মুসলিম কবিদের মধ্যে বিখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতানের (আনু. ১৫৫০–১৬৪৮) শ্রেষ্ঠ রচনা 'নবীবংশ'। 'নবীবংশ' বিষয়বৈচিত্র্য ও আকারের দিক থেকে 'রামায়ণের' চেয়েও বিশাল। সৈয়দ সুলতান তাঁর কাব্যে নবীর প্রতিশব্দ হিসাবে 'অবতার' গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর কাব্যরচনার মূল উদ্দেশ্য তৌহিদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচার। তিনি 'নবীবংশে' ব্রহ্মা, বিষ্ণু , মহেশ্বর, হরি বা কৃষ্ণকে অবতার হিসাবে এবং সাম, যজু, ঋক্ ও অথর্ব বেদকে আসমানী কিতাব হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু এগুলিকে মানবকল্যাণে ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করে আদম থেকে মুহম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব এবং মানবকল্যাণে তাঁদের অবদানের কথাই তিনি প্রচার করেছেন। 'নবীবংশ' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম (দ্র) ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও প্রচার। 'সৃষ্টি পত্তন' অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনী দিয়ে এ কাব্য আরম্ভ হয়েছে এবং হযরত মুহম্মদ (স.)-এর



www.pathagar.com

আবির্ভাবের কথা বলে কাব্য সমাপ্ত হয়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু কাব্যরচনার উপযোগী না হলেও ভাবের উদারতায়, কল্পনাবিলাসে, সৌন্দর্যবোধে কাব্যটি মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগেও কবি সফল।

মে. খা.

**নভশ্চর** (astronaut)

মহাকাশযান চালানোর কিংবা মহাকাশে কোনো পরীক্ষাকার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) প্রতিরক্ষা বিভাগে যেসব বৈমানিক ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) বা তদূর্ধ্বে বিমান চালনা করেন, তাদেরকেও নভশ্চর বলা হয়ে থাকে।

*নভশ্চর ইউরি গাগারিন্ ও ভালেন্তিনা তেরেশকোভা*

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) নভশ্চর ইউরি গাগারিন্ (দ্র) ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশযান 'ভস্তোক্'-এ চড়ে প্রথম মহাশূন্যে পৃথিবীকে (দ্র) প্রদক্ষিণ করেন।

প্রথম প্রথম শুধু সামরিক বাহিনীর বৈমানিকদের মধ্য থেকে নভশ্চরদের নির্বাচিত করা হত। বর্তমানে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রিধারীদেরকেও নভশ্চর হিসাবে মনোনীত করা হয়; এমনকি যাঁরা এখনো বিমান চালান নি তাঁদেরকেও নির্বাচন করা হচ্ছে। অবশ্য, এসব ক্ষেত্রে বাড়তি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

*নভশ্চর অলড্রিন চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, দূরে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে*

মহাকাশে জটিল শারীরিক ও মানসিক চাপ সহ্য করতে পারার উদ্দেশ্যে নভশ্চরদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। শ্রেণীকক্ষের পাঠ ছাড়াও এই প্রশিক্ষণে কম্পিউটার সিমুলেটরের সাহায্যে মহাকাশযানের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। মহাকাশের ওজনহীন স্থানে কাজ করতে পারার জন্য নভশ্চরদের কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট 'শূন্য মাধ্যাকর্ষণ' ক্ষেত্রে কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

মু. হা.

**নমরূদ**

মুসলিম কিংবদন্তি মতে, নবী ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ে নমরূদ ছিল আরব দেশের অধিপতি। সে নিজেকে আল্লাহ্ (দ্র) বলে দাবি করত।

কুরআন শরীফে (দ্র) বর্ণিত আছে যে এই অধিপতিকে আল্লাহ্ বলে মান্য না করায় এবং তার প্রতিমাপূজা না করায়



www.pathagar.com

সে ইবরাহিমকে (স.) আগুনে পুড়িয়ে মারার আদেশ প্রদান করে। তদনুযায়ী ইবরাহিমকে (স.) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর আদেশে অগ্নিকুণ্ড সুশীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যায় এবং ইবরাহিম (আ.) থেকে যান অক্ষত ও নিরাপদ।

নমরূদের বাড়াবাড়ি দেখে আল্লাহ্ পাঠিয়ে দিলেন অনেকগুলো মশা। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আক্রমণ করল নমরূদ ও তার লোকলস্করকে। মশাগুলো নমরূদের লোকদের নাক দিয়ে ঢুকে দংশন করে তাদের হত্যা করল। নমরূদের নাক দিয়েও ঢুকল একটি মশা। সে সুতীব্র দংশন কাতর করল নমরূদকে এবং এভাবে দিনের পর দিন দংশন করে হত্যা করল তাকে।

মো. ই.

## নরহরি সরকার ঠাকুর

কাটোয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন শ্রীচৈতন্যের (দ্র) ভক্ত শিষ্য এবং বিখ্যাত পদকর্তা। নরহরি সরকার ঠাকুরের বড় ভাই মুকুন্দ ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (দ্র) চিকিৎসক। ব্রজলীলা বিষয়ে নরহরি সরকারের বেশ কিছু সুন্দর পদ রয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পরিচিত। চৈতন্যদেবের ভাবজীবন বিষয়ে নরহরি সরকার ঠাকুর রচিত পদগুলোতে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর পদগুলোর ভাষা সহজ এবং পদগুলোও ছোট। 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' এবং 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' তাঁর দু'টি সুপরিচিত গ্রন্থ।

মে. খা.

## নলিনীকান্ত ভট্টশালী [১৮৮৮—১৯৪৭]

প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার নয়নানন্দ গ্রামে, ১৮৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি। পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার সাবেক বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে।

১৯১২ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কিছুকাল বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনাকাজে অতিবাহিত হয়। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (দ্র) সুপারিশে ভট্টশালী তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর হিসাবে যোগ দেন। জাদুঘরের পরিচালককে সচরাচর কিউরেটর (curator) বলা হয়। তাঁর আমলে এবং তাঁরই একান্ত উদ্যোগে

১৯২০ সালে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তরিত হয় ঢাকার নিমতলির বারোদুয়ারিতে। দীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি এই জাদুঘরের কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ ঘুরে প্রচুর প্রত্ন-নিদর্শন সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁর পরিচালনাধীন এই প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তাঁর সারা জীবনের কৃতির মধ্যে এটি উজ্জ্বলতম। ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটরের দায়িত্ব পালনের ফাঁকে কিছুকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। মুদ্রাতত্ত্ব (নুমিজম্যাটিক্স), প্রত্নলিপিবিদ্যা (প্যালিওগ্রাফি) এবং মৌর্য ও গুপ্তবংশের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করার পর ১৯৩৪ সালে নলিনীকান্ত ভট্টশালী উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতের (দ্র) ইতিহাস, বিশেষত বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নবিষয়ে তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায়।

কৈশোর ও যৌবনে তিনি রচনা করেন বহুসংখ্যক কবিতা ও গল্পের বই। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'হাসি ও অশ্রু' নামের একটি গল্পগ্রন্থ। বইটি ভারতের বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সেকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ১৯২২ সালে ড. ভট্টশালী স্বরচিত গ্রন্থ 'ক্রোনোলজি অব আর্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সুলতান্স্ অব বেঙ্গল'-এর জন্য লাভ করেন 'গ্রিফিথ প্রাইজ'। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি রাজা গণেশ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য তুলে ধরেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় ১৯৪৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।

আ. হু.



www.pathagar.com

**নষ্টচন্দ্র**

দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করার পাপে পাপভাগী চন্দ্র। ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রকেও নষ্টচন্দ্র বলা হয়। এই চন্দ্র দেখা নিষেধ। সাধারণের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে ঐ রাতে চৌর্যবৃত্তির জন্য কারো গালমন্দ শুনলে নষ্টচন্দ্র দেখার পাপ দূর হয়। বাংলার কোথাও কোথাও এই প্রথা এখনো প্রচলিত আছে।

সুজ. ব.

**নাইটিঙ্গেল্, ফ্লোরেন্স্** [১৮২০—১৯১০]

আধুনিক সেবিকাবৃত্তির (nursing) ক্ষেত্রে অগ্রপথিক এবং আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ মহিলা। তিনিই হাসপাতালে মেয়েদের রোগী-পরিচর্যার কাজকে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ সালের ১২ই মে ইতালির ফ্লোরেন্স্ শহরে ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের (Florence Nightingale) জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল ইংল্যাণ্ডের ডার্বিশায়ারে। ধনাঢ্য পিতার বিত্তবিলাসে ইংল্যাণ্ডেই তিনি বড় হন এবং শিক্ষালাভ করেন।

শৈশব থেকেই বিলাসী জীবনে নাইটিঙ্গেল্ ছিলেন অনাগ্রহী। তাই পিতা-মাতার আপত্তি সত্ত্বেও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি নার্স বা সেবিকাবিদ্যা শেখেন। ১৮৫১ সালে তিনি জার্মানির কাইজার্সভের্ট (Kaiserswerth) ট্রেনিং স্কুল থেকে এবং এর পর প্যারিস হাসপাতাল থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি লণ্ডনের (দ্র) রুগ্ণ বয়স্ক মহিলাদের হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর আগে উচ্চ বংশের আর কোনো মেয়ে এই পেশা গ্রহণ করেন নি।

১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোকদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য নাইটিঙ্গেল্ স্বেচ্ছায় ৩৮ জন সেবিকা নিয়ে ক্রিমিয়ায় যান। সেখানে হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসাসুবিধার উন্নতি ঘটিয়ে নাইটিঙ্গেল মাত্র ৫ মাসে আহত সৈন্যদের মৃত্যুর হার ৪০% থেকে ২%-এ কমিয়ে আনেন।

১৮৫৬ সালে যুদ্ধ শেষ হলে নাইটিঙ্গেল্ ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে বক্তৃতা দান ও লেখার মধ্য দিয়ে আর্মি মেডিক্যাল

*ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ ও আহত সৈন্যদের হাসপাতাল*

সার্ভিস উন্নত করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময়ে প্রণীত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যবিধি ও সেনা-হাসপাতালের প্রশাসন সম্পর্কিত তথ্যনির্দেশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার জন্যও কাজ করেন।

সেনাবিভাগের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে গভীর গবেষণাজ্ঞান নাইটিঙ্গেল্‌কে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধকালীন সেবাদানের জন্য তাঁকে যে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সম্মানী দেওয়া হয়, সেই অর্থে তিনি ১৮৬০ সালে সেবিকা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে 'নাইটিঙ্গেল্ ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এটিকে আধুনিক সেবিকাবৃত্তির সূচনাকেন্দ্র বলা হয়ে থাকে।

১৯০৭ সালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেলকে প্রথম মহিলা হিসাবে 'ব্রিটিশ অর্ডার অব মেরিট' পুরস্কারে ভূষিত করেন। ১৯১০ সালের ১৩ই আগস্ট ৯০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন।

সুজ. ব.

**নাইট্রাস অক্সাইড** লাফিং গ্যাস দ্র

**নাইট্রোজেন** (nitrogen)

বায়ু (দ্র) কতকগুলি গ্যাসের সংমিশ্রণ। এদের মধ্যে একটি গ্যাস হল নাইট্রোজেন। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন। বায়ুতে এর পরিমাণ এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও



www.pathagar.com

অধিকাংশ জীব অণু-নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডে (দ্র) বিদ্যমান নাইট্রোজেন প্রাণী (দ্র) ও উদ্ভিদের (দ্র) দেহে আত্তীকরণের সময় সংশ্লেষিত হয়। অবশ্য আত্তীকরণের পূর্বে নাইট্রোজেনকে কতকগুলো অবস্থান্তর-পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। জটিল অবস্থান্তরীকরণ-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অণুজীব, বিশেষ করে ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অবস্থান্তর-পর্যায়গুলো যথাক্রমে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন, নাইট্রিফিকেশন, অ্যাসিমিলেশন, অ্যামোনিফিকেশন ও ডিনাইট্রিফিকেশন ইত্যাদি। অ্যামোনিফিকেশন অর্থাৎ অ্যামোনিয়া পর্যায়েই জীবদেহ নাইট্রোজেনকে আত্তীকরণ করতে পারে। শিল্প-কারখানায় উচ্চ তাপে ও চাপের সাহায্যে হাইড্রোজেন (দ্র) ও নাইট্রোজেনকে সংযুক্ত করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় এটি করা হয় তার নাম হ্যাবার প্রোসেস (Haber process)। প্রকৃতিতে মেঘের ঘর্ষণ-সৃষ্ট বিদ্যুৎ, উল্কাপতন-সৃষ্ট তাপ ও সৌর বিকিরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন (দ্র) বা হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটে। নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় (দ্র) বিজারিত করতে পারে পরজীবী উদ্ভিদ, আলো সংশ্লেষণক্ষম ব্যাক্টেরিয়া ও নানা ধরনের নীল-সবুজ শৈবাল। অ্যামোনিয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অধিকাংশ জীব অ্যামোনিয়াকে সরাসরি জীবকলায় প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডে (দ্র) রূপান্তর করতে সক্ষম হয় না। নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াকে পর্যায়ক্রমে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট-এ জারিত করা হয়। নাইট্রেট অবস্থাতেই নাইট্রোজেন আত্তীকরণের উপযুক্ত; কৃষিজমিতে নাইট্রেট সরবরাহ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। সজীব কোষে নাইট্রেট বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। পরে এটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপে সংযুক্ত হয়, যেমন প্লটামিক ও অ্যাস্পটিক অ্যাসিড। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রধান উৎসই এই দু'টি অ্যাসিড।

ত. চ.

## নাইট্রোসেলুলোজ্ (nitrocellulose)

আঁশ হচ্ছে এক ধরনের পলিমার (দ্র)। পলিমার মানে বহু অংশবিশিষ্ট দেহ। প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া আঁশকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা হয়: (১) সেলুলোজ্, (২) পশম, ও (৩) রেশম। সেলুলোজ্ (দ্র) শর্করাগঠিত পলিমার। সেলুলোজ্ আঁশের প্রধান উৎস কার্পাস তুলা। এতে সেলুলোজের পরিমাণ শতকরা নব্বই ভাগ এ ছাড়া ঘাস, বাঁশ, গাছ, খড় ইত্যাদি সেলুলোজের উৎস। প্রাকৃতিক আঁশের মধ্যে সেলুলোজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের পরিধেয় বস্ত্র থেকে সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপাদান কাগজ (দ্র) তৈরিতে সেলুলোজের অবদান স্মরণযোগ্য। জৈব রসায়ন থেকে আমাদের জানা আছে যে অ্যালকোহলের হাইড্রোক্সিলগুচ্ছ ও অ্যাসিডের কার্বোক্সিলগুচ্ছের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ইস্টার (ester) উৎপন্ন হয়। সেলুলোজ্ ইস্টারগুলোর মধ্যে প্রথমে যে ইস্টারের ব্যাপক ব্যবহার হয় তা হল সেলুলোজ্ নাইট্রেট বা নাইট্রোসেলুলোজ্। প্রথমে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিডের সাহায্যে সেলুলোজ্ নাইট্রেট উৎপাদন করা হত। কিন্তু তাতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। পানির পরিমাণ কম হলে সেলুলোজ্ নাইট্রেটের উৎপাদন বাড়ে। এ কারণে পরবর্তী কালে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়। সেলুলোজ্ নাইট্রেটে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৭ শতাংশের কম হলে তা কোনো জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না। অবশ্য ১৪.২ শতাংশের উপরে হলে সেলুলোজের আঁশ-প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। সেলুলোজ্ নাইট্রেটকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে মধ্যযুগে (দ্র) বন্দুকের বারুদ তৈরি করা হত। এই বারুদের নাম দেওয়া হয়েছিল গান্‌কটন্ (Guncotton)। সেলুলয়েড্ (দ্র) ফিল্মের কথা আমরা চিত্রজগতের মাধ্যমে হরহামেশা শুনে থাকি। সেলুলোজ্ নাইট্রেটের সঙ্গে কর্পূর (দ্র) বা অনান্য উপাদান মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়। সেলুলোজ্ নাইট্রেট দিয়ে সর্বপ্রথম রেয়ন তৈরি করা হয়। রেয়নকে নকল সিল্ক বলা হয়। নাইট্রোসেলুলোজের আরো অনেক ব্যবহার আছে।

ত. চ.

## নাইডু, সরোজিনী [১৮৭৯—১৯৪৯]

কবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা বরদাসুন্দরী।

অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে বড় হওয়ার কারণে বাংলা



www.pathagar.com

*সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী ও তৎকালীন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ*

ভাষা বিশেষ শিখতে না পারলেও সরোজিনী ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৯১ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এর পর ইংরেজিতে দুই হাজার পঙ্‌ক্তির একটি নাটিকা রচনা করে হায়দ্রাবাদের নিজামপ্রদত্ত বৃত্তি পেয়ে তিনি বিলেত যান। সেখানে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত প্রথমে ইংল্যাণ্ডের কিংস কলেজে ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন এবং ডা. মোতিয়ালা গোবিন্দরাজুলু নাইডুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

সরোজিনী নাইডু ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। স্বতন্ত্র কাব্যনৈপুণ্যে সূচনাপর্বেই তিনি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং অচিরেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের সংমিশ্রণসহ ভারতীয় বিষয়বৈচিত্র্যের এক রোম্যান্টিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এক সময় তাঁর লেখা কবিতা গান হিসাবে বিলেতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি ১৯১৪ সালে ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর কাব্যগুলো হল: 'Golden Threshold', 'The Bird of Time', 'The Broken Wing' ও 'The Songs of India'।

সরোজিনী নাইডু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় নারী-অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে কাজ করেন। ইংরেজি ভাষায় বাগ্মী হিসাবেও তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল।

সরোজিনী নাইডু ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সভানেত্রী হন। ১৯৩০ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে (দ্র) যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। এর পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) লবণ সত্যাগ্রহে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ অলঙ্কৃত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ২রা মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কন্যা পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হয়েছিলেন।

**সুজ. ব.**

## নাইলন (nylon)

কতকগুলি কৃত্রিম প্লাস্টিক (দ্র) জাতীয় পদার্থের সাধারণ নাম। ওয়ালেস এইচ. ক্যারোদার্স্ (Wallace H. Carothers) নামে এক জন রসায়নবিদ নাইলন আবিষ্কারের অগ্রদূত। ১৯৩৫ সালে তিনি নাইলন তৈরি করতে সক্ষম হন। এর কয়েক বছর পর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাইলন ও নাইলন-সামগ্রী তৈরি শুরু হয়।

কয়লা (দ্র), পানি (দ্র), বাতাস(দ্র), পেট্রোলিয়াম (দ্র), চুনাপাথর (দ্র), বায়োগ্যাস (দ্র) ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে এক জটিল প্রক্রিয়ায় নাইলন বানানো হয়। এটা খুব শক্ত স্থিতিস্থাপক পদার্থ, যা দিয়ে তন্তু, পর্দা, রড, এমনকি নল পর্যন্ত বানানো যায়।

সুতা ও কাপড় তৈরির জন্য নাইলন বেশি ব্যবহার করা হয়। নাইলনের সুতাই প্রথম কৃত্রিম সুতা, যেটাকে প্রাকৃতিক সুতার চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। নাইলনের সুতা ও কাপড় উভয়ই টেকসই, শক্ত, সহজে রঙ করা যায় এবং পোকা-



www.pathagar.com

মাকড় এদের নষ্ট করতে পারে না। পানিতে ভিজালেও এদের খুব সহজে শুকানো যায়।

কার্পেট, টায়ার, সাঁতারের পোশাক, প্যারাশুট (দ্র) প্রভৃতি তৈরির জন্য নাইলন ব্যবহার করা হয়। মাছ (দ্র) ধরার ছিপের সুতা এবং ব্রাশ তৈরিতেও এর ব্যবহার রয়েছে। ক্ষতস্থান সেলাই করার জন্য শল্যচিকিৎসকগণ নাইলনের সুতা ব্যবহার করেন।

সা. এ.

**নাক** নাসিকা / নাক দ্র

**নাকড়া** দুন্দুভি দ্র

## নাগরী লিপি

বর্তমান কালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশে এবং ব্রহ্মদেশ (দ্র), তিব্বত (দ্র) ইত্যাদি স্থানে যেসব লিপি ব্যবহৃত হয়, তাদের অনেকগুলিই ব্রাহ্মী লিপি (দ্র) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই লিপি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময় থেকে প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ব্রাহ্মী লিপির পরের ধাপ হচ্ছে অশোকলিপি বা মৌর্যলিপি। সম্রাট অশোক (দ্র) মৌর্যবংশের (দ্র) শাসক ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মী লিপি মৌর্য সাম্রাজ্যে বিস্তারলাভ করে বলে তাঁর বা তাঁর বংশের নাম অনুসারে ঐ লিপিকে অশোকলিপি (দ্র) বা মৌর্যলিপি বলা হয়। ব্রাহ্মী লিপির দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে কুষাণলিপি (দ্র)। প্রথম থেকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুষাণ রাজাদের আমলে প্রচলিত ছিল বলে এ-লিপি কুষাণলিপি নামে পরিচিত। এর পর ব্রাহ্মী লিপি দু'টি শাখায় ভাগ হয়। এর একটি শাখা উত্তর ভারতে এবং অন্য শাখাটি দক্ষিণ ভারতে বিস্তারলাভ করে। উত্তর ভারতীয় শাখার মধ্যে যে লিপিগুলি অন্তর্গত, তাদের মধ্যে রয়েছে গুপ্তলিপি এবং কুটিললিপি (দ্র)। গুপ্তবংশের রাজাদের আমলে এই লিপি উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল বলে এর নাম গুপ্তলিপি (দ্র)। এ লিপি চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে চালু ছিল। কুটিললিপি ষষ্ঠ থেকে নবম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ লিপি জটিল আকৃতির ছিল বলে এর এই নাম। কুটিললিপি থেকে উৎপত্তি হয়েছে নাগরী লিপির। কুষাণলিপির কোনো কোনো অক্ষরের সঙ্গেও নাগরী লিপির কোনো কোনো অক্ষরের মিল দেখা যায়।

ভারতের গুজরাটবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নাগর ব্রাহ্মণ বলা হত। নগরে বাস করতেন বলে এঁরা নাগর নামে অভিহিত হতেন। নগরে যে অক্ষর চালু ছিল বা নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষর ব্যবহার করতেন, তা ছিল নাগর অক্ষর, আর তাই ঐ লিপিকে বলা হত নাগরী লিপি।

দুই হাজার বছর আগে নাগরী লিপি নামে কোনো লিপির নাম পাওয়া যায় না। প্রথম নাগরী লিপির উল্লেখ পাওয়া যায় গুপ্তযুগে জৈনদের ধর্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে। নন্দীসূত্রের কাল অনুযায়ী চতুর্থ / পঞ্চম শতকে প্রথম নাগরী লিপির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জৈন পণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগনি আঠারো প্রকার লিপির নামের সঙ্গে নাগরী লিপিরও উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলালিপিতে নাগরী লিপির সুস্পষ্ট সূচনা লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতের বেশির ভাগ জায়গাতেই নাগরী লিপি চালু ছিল। উত্তর ভারতে এই লিপির ব্যবহার দশম শতকের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল। বিহার ও বঙ্গদেশেও এই লিপি দশম শতক পর্যন্ত চালু ছিল। একাদশ শতকের নাগরী লিপির সঙ্গে বর্তমান নাগরী লিপির মিল পাওয়া যায়। দ্বাদশ

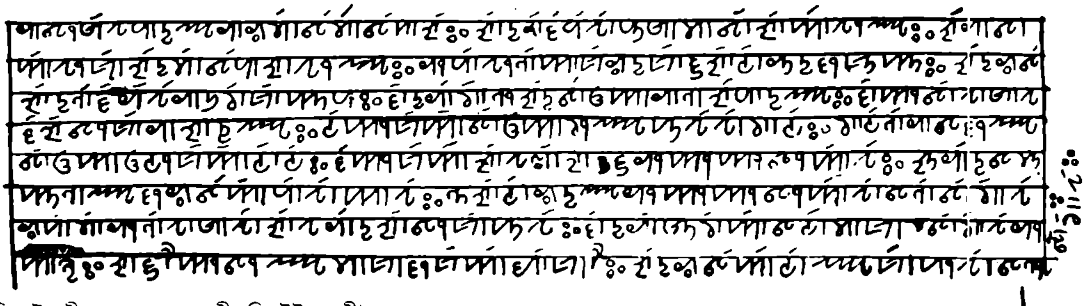

*সিলেটবাসীদের ব্যবহৃত নাগরী (শিলইট নাগরী)*



www.pathagar.com

শতক থেকে বর্তমান নাগরী লিপির উৎপত্তি।

বাংলাদেশের (দ্র) সিলেট (দ্র) জেলায় এক প্রকার নাগরী লিপি ব্যবহৃত হত। ঐ লিপিকে সিলেটবাসীরা 'শিলইট নাগরী' (অর্থাৎ সিলেট নাগরী) বলে থাকেন। ব্রাহ্মী লিপি দেবনাগরী লিপি থেকে এ লিপির জন্ম।

শা. হ.

## নাগার্জুন

প্রাচীন বিদর্ভ দেশে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগার্জুনের জন্ম। বাল্যকাল থেকে তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তার পর ভিক্ষুত্ব বরণ করার পর তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং গৌতম বুদ্ধের (দ্র) বাণী প্রচারে মনোযোগ দেন। পরবর্তী কালে দাক্ষিণাত্যের (দ্র) অন্ধ্রের শ্রী পর্বতে তিনি নিজের আবাস তৈরি করেন এবং খ্যাতির চরম শিখরে উপনীত হন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) ও রসায়নশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' এখনো তিব্বতী চিকিৎসকদের প্রামাণিক গ্রন্থ। চীনা ও তিব্বতী ভাষা থেকে নাগার্জুনের পরিচয় ও গ্রন্থাবলির অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো সূত্র থেকে এখন আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

নাগার্জুন অন্ধ্ররাজ গৌতমীর পুত্র যজ্ঞশ্রীর (১৬৬–১৯৬ খ্রি.) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসক ছিলেন। জাদুবিদ্যায়ও তাঁর খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে তন্ত্রমন্ত্র ও সিদ্ধাচার্য এক নাগার্জুনের সঙ্গে এই দার্শনিক নাগার্জুনের কোনো সম্বন্ধ নেই। অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন সময়ে অন্তত চার জন নাগার্জুন ছিলেন। এক জন আলোচ্য নাগার্জুন, আরেক জন তন্ত্রশাস্ত্ররচয়িতা, আরেক জন চিকিৎসাশাস্ত্রকর্তা এবং আরেক জন রসায়নশাস্ত্রবিদ।

দার্শনিক নাগার্জুনের প্রবর্তিত দর্শনের নাম মাধ্যমিক দর্শন। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' দর্শন অবলম্বন করে নাগার্জুন তাঁর দর্শন মাধ্যমিক-কারিকা-রীতির প্রবর্তক। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'মাধ্যমিক-কারিকা'। মাধ্যমিক-কারিকা শূন্যতা সম্বন্ধে রচিত। এ জন্য তাঁর দর্শনের অপর নাম 'শূন্যবাদ'। তাঁর অপর দু'টি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'যুক্তিষষ্টিকা' ও 'শূন্যতাসপ্ততি'তেও এই শূন্যবাদ আলোচিত হয়েছে। তাঁর আরেকটি রচনা 'সুহৃদ-লেখ'। চীনা পরিব্রাজক ঈৎ-সিঙ (দ্র) এই বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সুহৃদ রাজা সাতবাহন যজ্ঞশ্রীকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য তিনি এই বইটি রচনা করেন। এ ছাড়া 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র', 'দশভূমিবিভাষাশাস্ত্র', 'মহাযানবিংশক' প্রভৃতি গ্রন্থে নাগার্জুন তাঁর দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে আচার্য নাগার্জুন প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। হিউএন-ৎসাঙ (দ্র) লিখেছেন, অশ্বঘোষ (দ্র), নাগার্জুন, আর্যদেব এবং কুমারলাত (কুমারলব্ধ) সসসাময়িক ছিলেন।

নাগার্জুনের 'সুহৃদ-লেখ' বইতে যজ্ঞশ্রীকে দেওয়া অমর উপদেশের কয়েকটি হচ্ছে—

১. ধনকে চঞ্চল ও অসার জানবে। তাই ধর্ম অনুসারে ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও মিত্রকে দান করবে। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনো মিত্র নেই।

২. নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, উত্তম শীল (সদাচার) অবশ্য করণীয়রূপে ঘোষণা করো। সমস্ত চরাচরের ধারক যেমন ধরণী, তেমনি শীলও যাবতীয় প্রভুত্বের ধারক।

৩. পরের স্ত্রীর প্রতি নজর দিও না, যদি দাও তা হলে বয়স অনুসারে তাকে মা, বোন ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করবে।

৪. জগৎকে জেনে রাখো। লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, প্রশংসা-নিন্দা—এই আট প্রকার বিষয়ে অকম্পিত থাকবে। কেননা এসব বিচারের বিষয় তোমার নয়।

বি. ব.

## নাগাসাকি

জাপানের (দ্র) একটি শিল্প নগরী। জাপানের রাজধানী টোকিও (দ্র) থেকে ৯৫০ কিমি (৫৯০ মাইল) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ব চীন সাগরের তীরে কিউশুর পশ্চিম সৈকতে এই নগরী অবস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় জাপানের যে দু'টি শহরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, নাগাসাকি তার মধ্যে দ্বিতীয়। ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট মিৎসুবিশি জাহাজ-নির্মাণঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা (দ্র) নিক্ষেপ করে। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং এর আঘাতে নাগাসাকির প্রায়



www.pathagar.com

উপরে : আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ও নিচে : বোমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নাগাসাকি শহর

অর্ধেক অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়; আনুমানিক ৭৫,০০০ লোক প্রাণ হারায়। নিহতদের স্মরণে এখানে একটি শান্তি-উদ্যান (peace park) নির্মিত হয়েছে।

নাগাসাকি জাপানের একটি পুরানো বন্দর। ষোল শতকে এই বন্দর দিয়েই প্রথম পাশ্চাত্য বণিকেরা জাপানে প্রবেশ করে। ১৬০৯ সালে হল্যাণ্ড এখানে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৮৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এবং ১৮৫৮ সালে ইউরোপের (দ্র) অন্যান্য বৃহৎ শক্তির জন্য এই বন্দর উন্মুক্ত হয়।

নাগাসাকিতে লৌহ (দ্র) ও ইস্পাত (দ্র) উৎপাদন কারখানা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা, কয়লাখনি ও মৎস্যশিকার কেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রচুর কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়।

সুজ. ব.

## নাজিম হিকমত [১৯০২—১৯৬৩]

তুরস্কের (দ্র) বিখ্যাত কবি। তাঁকে তুর্কি ভাষায় আধুনিক কবিতার জনক বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

নাজিম হিকমত তুরস্কের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কবিতা রচনায় তিনি পারদর্শিতা দেখান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) তুরস্ক মিত্রশক্তির (দ্র) দখলে চলে গেলে নাজিম হিকমত ১৯২১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ইস্তাম্বুল ছেড়ে গোপনে আনাতোলিয়ায় (দ্র) চলে যান। তার পর সেখান থেকে নানা পথ ঘুরে মস্কো (দ্র) পৌঁছান। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় তিনি নানা দেশের লেখক-শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময়েই রুশ কবি মায়াকোফস্কির (দ্র) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁর কাছ থেকেই তিনি কবিতার নতুন আঙ্গিক বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

দেশ স্বাধীন হলে নাজিম হিকমত ইস্তাম্বুলে ফিরে এসে একটি বামপন্থী পত্রিকায় কাজ করার অপরাধে গ্রেফতার হন। কিন্তু গ্রেফতারি এড়িয়ে তিনি পুনরায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) মাটিতে পা রাখেন। ১৯২৮ সালে নাজিম দেশে ফেরার অনুমতি পান। এর পর এক নাগাড়ে দশ বছর দেশে অবস্থানকালে তিনি কখনো প্রুফ রীডার, সাংবাদিক, অনুবাদক এবং কখনো চিত্রনাট্যকার হিসাবে কাজ করেন। এই সময়কালে তাঁর দশটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়।



www.pathagar.com

অবশ্য এর মধ্যে মোট চার বছর তাঁকে জেলও খাটতে হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে নাজিম হিকমত আবার গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সেনাবাহিনীর লোকজনদের মধ্যে বিদ্রোহ সংঘটনের ইন্ধন যুগিয়েছেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এবার তাঁকে ২৮ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই পর্যায়ে তিনি মোট ১৩ বছর জেল খাটেন। কারাগারে বসে তিনি লেখেন অজস্র কবিতা। তারপর সেগুলো কারাকর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে জেলের বাইরে পাঠান। এই রকম অবস্থার মুখে তাঁর বহু কবিতা হারিয়ে যায়।

নাজিম হিকমতের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৯ সালে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চিলির কবি পাবলো নেরুদা (দ্র), চিত্রকর পাবলো পিকাসো (দ্র), ফরাসি কবি লুই আরাগঁ (দ্র) এবং দার্শনিক জঁ পল সার্ত্র্‌ (দ্র) মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁর মুক্তির দাবিতে তুরস্কেও সমানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। শারীরিকভাবে ভয়ানক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বন্দি অবস্থায় নাজিম হিকমত ১৯৫০ সালে আঠারো দিনের এক অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ঐ একই বছরে (১৯৫০) তিনি বিশ্বশান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

অবশেষে বিশ্বজনমতের চাপে তিনি ১৯৫১ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। তখন তাঁর বয়স ৪৮ বছর। তবুও তাঁকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার চেষ্টা করা হলে বাধ্য হয়ে তিনি গোপনে দেশত্যাগ করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যান। জীবনের বাদবাকি ১৩ বছর তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি নিজের দেশ ছাড়া এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকার (দ্র) বহু দেশ সফর করেন আর লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। নাজিম হিকমতের অমূল্য কবিকৃতি 'শিরি-ফরহাদ' নামের একটি মহাকাব্য। তাঁর এই গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বন করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ধ্রুপদী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, তার চিত্রনাট্যকারও তিনি। এ ছাড়া যেসব কবিতা তিনি রচনা করেছেন, সেগুলো মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ এবং বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে পরিগণিত। তাঁর কবিতা বাংলাসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত ও বহুল পঠিত।

তিনি ১৯৬৩ সালের জুন মাসে মস্কোয় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

**নাজীর আহমদ** [১৯২৫—১৯৯০]

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রশিল্পের গোড়াপত্তনের পুরোধা পুরুষ এবং বিখ্যাত বেতার ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকার বিশিষ্ট মির্জা পরিবারে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

নাজীর আহমদ ১৯৩৮ সালে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে সংস্কৃত ভাষা নিয়েছিলেন। অল্প বয়সে এ ভাষায় তিনি এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে নিখুঁত উচ্চারণের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করার জন্য প্রায়শ তাঁর ডাক পড়ত।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর নাজীর আহমদ জগন্নাথ কলেজে আই. এসসি. ক্লাসে ভর্তি হন। এখান থেকেই তিনি প্রথম বিভাগে আই. এসসি. পাশ করেন এবং টেক্সটাইল ড্রয়িং গ্রুপেও প্রথম হন। ফলে এ বিষয়ে জাপানে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি সরকারি বৃত্তি পেলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) কারণে শেষ পর্যন্ত সেখানে যেতে পারেন নি। পরে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে পারিবারিক চাপে তাঁকে শিবপুর থেকে ঢাকায় ফিরে আসতে হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে তিনি বি. এসসি. পাশ করেন। ছাত্র হিসাবে মেধাবী নাজীর আহমদ প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও স্নাতক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। ফলে তাঁর শিক্ষাজীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাজীর আহমদ ছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রথম মুসলমান ঘোষক। অবশ্য ১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতারের কার্যক্রম শুরু হওয়ার সুবাদে তাতে তিনি মাঝেমধ্যে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু প্রকৃত বেতার-ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর চাকুরিজীবনের সূচনা ১৯৪২ সাল থেকেই।



www.pathagar.com

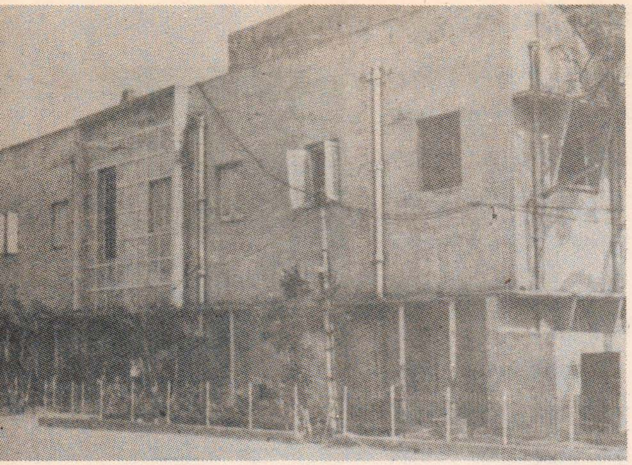

এফ ডি সি-র প্রথম স্টুডিও

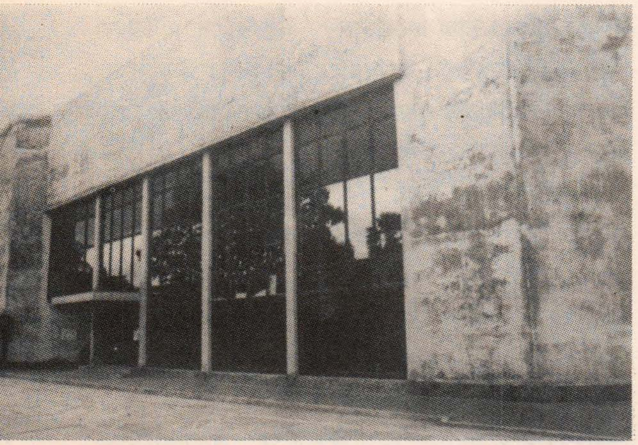

নাজীর আহমদ সাউণ্ড কমপ্লেক্স

আসিয়া ছবিতে সুমিতা ও শহীদ (১৯৬০)

১৯৪৪ সালে কলিকাতায় (দ্র) অবস্থানকালে তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় তথ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ইউনিটের সঙ্গে জড়িত হন। এই সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল এখান থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর ধারাভাষ্যে কণ্ঠ দেওয়া। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে তাঁর পেশাগত জীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন এবং স্থানীয় বেতার কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ঢাকা বেতার 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'-এ পরিণত হওয়া পর্যন্ত তিনি এর জন্য বহু গান, নাটক, কথিকা ইত্যাদি রচনা ও প্রযোজনা করেন। তিনি এসব অনুষ্ঠানে কণ্ঠ দেন এবং অভিনয়ও করেন।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এলে সাবেক প্রাদেশিক সরকারের তরফ থেকে তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করার দায়িত্ব নাজীর আহমদের ওপরই ন্যস্ত হয়। তাঁর তৈরি সেই তথ্যচিত্রের নাম 'ইন আওয়ার মিড্স্ট্' (১৯৪৮)। এটি ছিল দেশের প্রথম তথ্যচিত্র।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে নাজীর আহমদ লণ্ডনে (দ্র) যান, যোগ দেন বি বি সি (দ্র)-তে। তাঁর উদ্যোগেই এই বেতারকেন্দ্র থেকে পূর্ববঙ্গবাসীর জন্য বাংলা অনুষ্ঠান 'আঞ্জুমান' চালু করা হয়। পাশাপাশি লণ্ডনের ব্রিটিশ মুভিটোন স্টুডিওতে পাকিস্তান সরকারের যেসব প্রচার ও তথ্যচিত্র নির্মিত হত, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেগুলো তদারক করতেন। সরকারের তরফ থেকেই তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে এসে সরকারের জনসংযোগ বিভাগে যোগদান করেন। তাঁকে এই বিভাগের চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান করা হয়। মূলত নাজীর আহমদের উদ্যোগেই প্রথমে সরকারের জনসংযোগ বিভাগের চলচ্চিত্র ইউনিট—বর্তমানে যা 'ডি এফ পি' (দ্র) নামে পরিচিত—এবং 'এফ ডি সি' (দ্র) গড়ে ওঠে। তিনি শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অপারেটিভ ডাইরেক্টরও ছিলেন।

নাজীর আহমদ এ দেশের প্রথম তথ্য বা প্রামাণ্য চিত্র এবং প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রের নির্মাতা হিসাবে কৃতিত্বের দাবিদার। ছবি দু'টির নাম যথাক্রমে 'ইন আওয়ার মিড্স্ট্'



www.pathagar.com

এবং 'সালামত'। 'নতুন দিগন্ত' নামেও একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন তিনি। এ ছাড়া 'আসিয়া' নামের একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্রের তিনি কাহিনীকার ও সংলাপরচয়িতাও ছিলেন।

সুঅভিনেতা হিসাবেও তাঁর নামডাক ছিল। বেতার ছাড়াও মঞ্চে তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেন। সাহিত্যের প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। অসংখ্য গান, বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পের রচয়িতা তিনি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কেই তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম।

১৯৬২ সাল থেকে তিনি লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর অন্যতম প্রধান কর্মস্থল ছিল বি বি সি। এই বেতারকেন্দ্রের বহু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করা ছাড়াও এখান থেকে সম্প্রচারিত বহু নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হন।

লণ্ডনে প্রবাসজীবনে তাঁর বাসভবন ছিল দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণী জনের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) প্রতি তাঁর ছিল সক্রিয় সমর্থন। এফ ডি সি-র সাউণ্ড কমপ্লেক্সের নাম তাঁর নামানুসারেই রাখা হয়েছে।

নাজীর আহমদ লণ্ডনে ১৯৯০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আ. হু.

## নাটক

মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত, একান্তভাবে সংলাপনির্ভর সাহিত্যকর্মকে নাটক বলা হয়। নাটকে লেখকের নিজের পক্ষ থেকে কাহিনী তুলে ধরা বা ঘটনা বর্ণনা করা বা চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে চরিত্ররা সংলাপ উচ্চারণ ও ঘটনা অভিনয় করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রধানত দেখার জিনিস, সেহেতু তার কয়েকটি অপরিহার্য উপাদান হল মঞ্চ, দৃশ্যপট, অভিনয়, আলোকপ্রক্ষেপণ, অভিনেতাদের রূপসজ্জা ইত্যাদি। তবে নাটক শুধুই দেখবার জিনিস নয়, শোনবার জিনিসও বটে। তাই নাটকের অন্যান্য অপরিহার্য উপাদান হল সংলাপ, প্রাসঙ্গিক গান, আবহসঙ্গীত ইত্যাদি। অধিকাংশ নাটকের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব দু'টি বা ততোধিক চরিত্রের মধ্যে হতে পারে, আবার একই চরিত্রের মনোজগতে দু'টি ইচ্ছা বা প্রবণতার মধ্যেও হতে পারে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাটককে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন— বিয়োগান্তক বা বিষাদাত্মক নাটক তথা ট্র্যাজেডি (দ্র) এবং মিলনান্তক বা হাস্যরসাত্মক নাটক তথা কমেডি (দ্র)। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবধর্মী নাটক, রোম্যান্টিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, উদ্ভট বা অ্যাবসার্ড নাটকের কথা বলা যেতে পারে। আরেকটি দিক থেকে কাব্যনাটক, রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটক, গীতিনাটক, নৃত্যনাট্য (দ্র) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

বিশ্বসাহিত্যের প্রথম দিকে নাটক কবিতায় রচিত হত। শেক্সপীয়র্ (দ্র) তাঁর নাটকগুলি কবিতায় রচনা করেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত গ্রিসের ধ্রুপদী নাটকগুলিও ছিল কাব্যনাটক।

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) এবং বিজন ভট্টাচার্যের (দ্র) 'নবান্ন' (১৯৪৪) প্রভৃতি।

*থিয়েটার প্রযোজিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের একটি দৃশ্য। নাটকের রচয়িতা—সৈয়দ শামসুল হক, নির্দেশক—আবদুল্লাহ আল মামুন*

www.pathagar.com

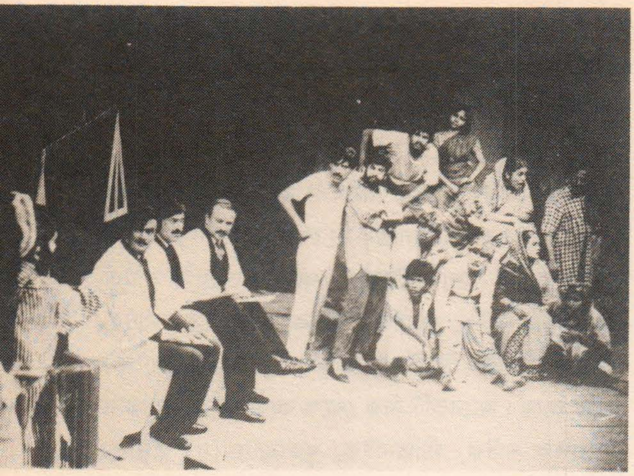

*উপরে : বাঁ দিকে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত 'সৎ মানুষের খোঁজে' নাটকের একটি দৃশ্যে অন্যান্যের সঙ্গে সারা যাকের, আবুল কাশেম, জামালউদ্দিন হোসেন, আতাউর রহমান, আবুল হায়াৎ, আসাদুজ্জামান নূর ও নিমা রহমানকে দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের একটি দৃশ্যে অন্যান্যের সঙ্গে আলী যাকের ও আসাদুজ্জামান নূর। নিচে : নাগরিক নাট্যাঙ্গনের নাটক 'জনতার রঙ্গশালা'র দু'টি দৃশ্য। এই নাটকের নির্দেশক জামালউদ্দিন হোসেন*

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর থেকে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের (দ্র) অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ববাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানে যেসব উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়, সেগুলির মধ্যে রয়েছে নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস', শওকত ওসমানের 'কাঁকরমণি', মুনীর চৌধুরীর (দ্র) 'কবর', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', আসকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহী পদ্মা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (দ্র) 'বহিপীর', সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' এবং মমতাজউদদীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'।

স্বাধীন বাংলাদেশে একাত্তরপরবর্তী সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির কয়েকটি হল সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখনো ক্রীতদাস', সেলিম আল দীনের 'কীত্তনখোলা' এবং মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী'।

ক. চৌ.



www.pathagar.com

*থিয়েটার প্রযোজিত 'কোকিলারা' নাটকে ফেরদৌসী মজুমদার। ডান দিকে ঢাকা নান্দনিক প্রযোজিত 'শ্যামলী কেবলই নীল হয়' নাটকের একটি দৃশ্য। নির্দেশক—নিরঞ্জন অধিকারী*

## নাট্যকাব্য

নাট্যকাব্যে সংলাপ রচিত হয় কবিতায় (দ্র)। ঐ সংলাপ রচিত হতে পারে ছন্দে কিংবা গদ্যকবিতায়। বিশ্বনাটকের সূচনালগ্নে কবিতা ছিল নাটকের মূল ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত ধ্রুপদী গ্রিক নাট্যকারেরা, সোফোক্লেস (দ্র) এবং তাঁর সঙ্গীরা কবিতাতেই তাঁদের নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম্ শেক্সপীয়র্ও (দ্র) তাঁর নাটকে কাব্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী কালে কিন্তু নাটকের প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে গদ্য এবং নাট্যকাব্য খুব অল্পই রচিত হয়। আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্যকাররূপে টি. এস. এলিয়ট (দ্র) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) প্রভৃতি সার্থক নাট্যকাব্য। বুদ্ধদেব বসুর (দ্র) 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' (১৯৬৬), 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' (১৯৬৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৭০) প্রভৃতিও নাট্যকাব্য হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশে সৈয়দ শামসুল হক বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য দ্বারা এই ধারাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত নাট্যকাব্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬), 'নূরলদীনের সারা জীবন' (১৯৮২), 'এখানে এখন' (১৯৮৮) এবং 'ঈর্ষা' (১৯৯১) মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

ক. চৌ.

## নাড়ি (pulse)

হৃৎপিণ্ডের (দ্র) বাম নিলয়ে সঙ্কোচনের ফলে ধমনী-প্রাচীরে রক্তের চাপে সৃষ্ট তরঙ্গাঘাতকে নাড়ি (পাল্স্) বা ধমনীঘাত বলা হয়। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নাড়ির স্পন্দনহার মিনিটে ৭০ থেকে ৮০, গড়ে ৭২। বৃদ্ধবয়সে নাড়ির গতিহার মিনিটে ৬০ থেকে ৭০ এবং নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে মিনিটে ১৩০। নাড়ির স্পন্দনহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনহারের সমান।

সাধারণত নাড়ি কব্জির রেডিয়াল ধমনী অথবা কণ্ঠের



www.pathagar.com

যে কোনো পাশে ক্যারোটিড্ ধমনীতে আঙুল চেপে পরীক্ষা করে দেখা হয়। নাড়ির স্পন্দনহার, ছন্দ, আয়তন ও চাপ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে এই পরীক্ষা। এর ফলে দেহের রোগ সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধান মেলে। বোঝা যায় হৃৎপিণ্ড, ধমনী (দ্র) ও রক্তচাপের (দ্র) অবস্থা।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ নাড়ি পর্যবেক্ষণ করে রোগের ভাল-মন্দ ও পরিণতি অনুধাবন করতে পারতেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের নাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন 'পাল্সাস অল্টারন্যান্স'-এ নাড়ির গতি স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও পরপর দুর্বল ও সতেজ স্পন্দন অনুভব করা যায়। আবার 'পাল্সাস প্যারাডক্সাস'-এ নাড়িঘাতের আয়তনগত তারতম্য ঘটে (হৃৎপিণ্ডের আবরণীর রোগে)। হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার (ভাল্ভ্) বিশেষ রোগে সৃষ্ট নাড়ির বৈষম্যের নাম 'ওয়াটার হ্যামার পাল্স্' এবং এমনি আরো অনেক রোগ ও রোগের অবস্থা অনুধাবনে নাড়ি পরীক্ষা চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে থাকে।

রু. হা.

## নাৎসি (Nazi)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) পূর্বে জার্মানির একটি রাজনৈতিক দল 'নাসিওনাল্জোৎসিয়ালিস্টিশে ডয়চে আর্বাইটের্পার্টাই' (Nationalsozialistieche Deutsche Arbeiterpartei)। এর ইংরেজি অনুবাদ German National Socialist Workers Party এবং বাংলায় বলা যায় 'জার্মান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক দল'। জার্মান নামটির সংক্ষেপণ NSDAP করা যেত। কিন্তু Nazi শব্দটি তৈরি হয়েছে দলটির তিন-শব্দের নামের প্রথম শব্দের ভেতর থেকে। (প্রকৃত উচ্চারণ নাৎসি; ইংরেজিতে নাজি বলে)। এই দলের নেতা ছিলেন আডোল্ফ্ হিটলার্ (দ্র)। নাৎসি দল জয়লাভ করার ফলেই ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির রাষ্ট্রনেতা হয়ে ক্রমে একনায়কত্ব কায়েম করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) বাধিয়ে তোলেন। নাৎসি মতাবলম্বীরা প্রচণ্ডভাবে সাম্যবাদবিরোধী ও একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল।

সুজ. ব.

## নাথ সাহিত্য

নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাহিত্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় তান্ত্রিক ধর্মের প্রচারমূলক সাহিত্যই নাথ সাহিত্য। তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত কালক্রমে তান্ত্রিক শৈব ধর্মে রূপান্তরিত হয়। নাথ ধর্মের নামে রচিত হয় নাথ সাহিত্য। জর্জ গ্রিয়ারস্ন্ (দ্র) রংপুর থেকে একটি পল্লীগ্রামের পুঁথি পান এবং তা ১৮৭৮ সালে 'মানিকচাঁদের গীতি' নামে প্রকাশ করেন। এতে রাজা মানিকচন্দ্র, তাঁর পত্নী ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচন্দ্রের জীবনকথা বর্ণিত আছে। গ্রিয়ার্সনের পুঁথি প্রকাশিত হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের গীত', 'মানিকচাঁদের গীত' নামে একই কাহিনীর বিভিন্ন পুঁথি পাওয়া যায়। এ ছাড়া আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (দ্র) 'গোরক্ষ-বিজয়' নামক একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। গবেষকগণ মনে করেন, এই নাথ ধর্ম ও সাহিত্য দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বিকশিত হয়। গোরক্ষনাথকে মানিকচন্দ্রের সমসাময়িক ধরে তাঁকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলে অনুমান করা হয়। গোরক্ষনাথ নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা। গোরক্ষনাথের সঙ্গে মীননাথকে পাওয়া যায়। 'ময়নামতীর গান' ও 'গোরক্ষ-বিজয়ে' যেসকল নাথ সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে হাড়িপা, কানুপা, জালন্ধরীপা অন্যতম।

নাথ সাহিত্যের ভণিতায় ভীমদাস, শ্যামদাস ও ফয়জুল্লার উল্লেখ আছে। এ ছাড়া 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' পুঁথির রচয়িতা সুকুর মামুদ। 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র রচয়িতা ছিলেন ভবানী দাস। নাথ সাহিত্য এক সময় সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বি. ব.

## নাদির শাহ্ [১৬৮৮—১৭৪৭]

নাদির শাহ্ ১৭৩৬ থেকে ১৭৪৭ পর্যন্ত ইরানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সম্রাট হবার আগে তাঁর নাম ছিল নাদির কুলি খাঁ। শৈশবে নাদির শাহ্ উজবেকদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে এসে তিনি খুরাশানের শাসকের অধীনে চাকুরি



www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বিশেষ সাহসের পরিচয় দেন। এ সময় ইরানে আফগানদের প্রভাব ছিল ব্যাপক। নাদির শাহ্ আফগানদের ইরান থেকে বিতাড়িত করেন।

ইরানের সাফাবি বংশের শিশুসম্রাট আব্বাসের মৃত্যু হলে ১৭৩৬ সালে নাদির শাহ্ ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৩৮ সালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময় ভারতে মোগল সাম্রাজ্য ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সম্রাট মাহমুদ শাহ্ ছিলেন অকর্মণ্য ও অপদার্থ। তিনি নাদির শাহ্কে বাধা দিতে পারেন নি। দিল্লিতে নাদির শাহ্ দুই মাস ছিলেন। এই সময়ে তিনি দিল্লিতে অসংখ্য লোক হত্যা করেন এবং ব্যাপক লুটতরাজ করেন। তিনি সম্রাট শাহজাহানের হীরকখচিত ময়ূরসিংহাসনটি সঙ্গে নিয়ে যান।

অত্যাচারী নাদির শাহ্ নিজ দেহরক্ষীর হাতে প্রাণ হারান। নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত।

**খু. জা.**

**নানক** [১৪৬৯—১৫৩৮]

নানক শিখধর্মের (দ্র) প্রবর্তক। তিনি ১৪৬৯ সালে এপ্রিল মাসে বর্তমান পাকিস্তানের (দ্র) লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তালবন্দিরাইভয় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

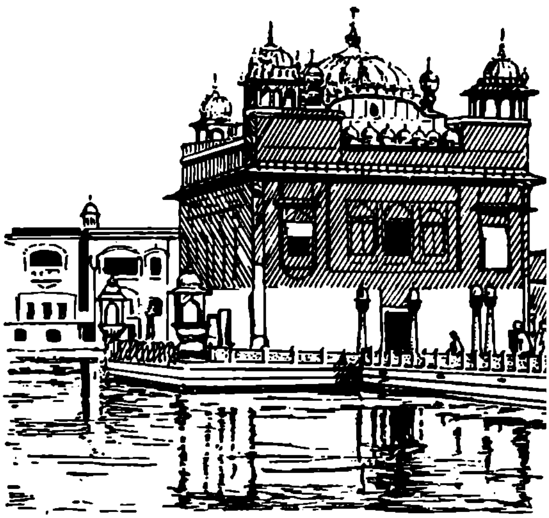

*শিখদের স্বর্ণমন্দির অমৃতসর*

*দু'জন শিষ্যের মাঝে গুরু নানক*

বর্তমানে তাঁর এই জন্মস্থান 'নানকানা সাহেব' নামে পরিচিত।

নানক ছোটবেলা থেকেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ভাবতেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর হয় নি। কিন্তু জগৎ ও জীবন থেকে তিনি শিখেছেন অনেক। পরে শিখিয়েছেন তাঁর চারপাশের মানুষদের। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে কষ্ট দিত। তিনি এসব দূর করার সঙ্কল্প করেন। তিনি মানুষকে দাঁড় করাতে চান এক মহামিলনের মোহানায়। তিনি একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলেন, যার নাম ছিল 'সঙ্গত্'। এই সঙ্গতের অর্থ হল সার্বজনীন মিলনক্ষেত্র। তাঁর শিষ্য বা অনুসারীরা সেখানে সন্ধ্যাকালে গুরুভাইয়ের মতো একে অন্যের সাথে



www.pathagar.com

মিলিত হত।

গুরু নানক 'গুরুকা লঙ্গর' নামে একটি সর্বজনীন রন্ধনশালা স্থাপন করেন। সেখানে সকলে মিলে এক পঙ্ক্তি বা সারিতে বসে আহার করত। তখনকার সমাজে উচ্চ ও নীচ বলে কথিত বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা বা নানা ধর্মের অনুসারীরা এক সারিতে বসে আহার করত না। এই এক পঙ্ক্তিতে বসে আহারগ্রহণকে বলা হত 'পঙ্গত্'। নানকের এই সঙ্গত্ ও পঙ্গত্-এর মধ্যেই তাঁর উদার মতের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবি ভাষায় শিখ শব্দটি সংস্কৃত 'শিক্ষ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শিক্ষার্থী। সম্প্রদায়গতভাবে শিখেরা গুরুজীর শিষ্য বা অনুসারী। গুরু নানকের ধর্মমতের মূলকথা হল তিনটি : (১) এক সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর, অর্থাৎ সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য, (২) ধর্মজীবনের নায়ক গুরু, (৩) মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নামকীর্তন বা গুণগান করতে হবে। নানক ছিলেন কঠোর একেশ্বরবাদী। তিনি সাধনার দ্বারা কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবেন নি, তিনি নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য জনগণের সচেতনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার কথাও ভেবেছেন এবং তার জন্য কাজ করে গেছেন।

জ্ঞানার্জন এবং উপদেশ বিতরণের জন্য তিনি দেশ-বিদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এমনকি তিনি মক্কা (দ্র) ও মদিনা (দ্র) এবং বাগদাদেও নাকি গিয়েছিলেন। তিনি বহু ধর্মসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। এগুলো পরে শিখদের অন্যতম ধর্মগুরু অর্জুন সিং গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত করেন। 'গ্রন্থসাহেব' (দ্র) শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম। পণ্ডিতেরা বলেন, গুরু নানকের গাথাগুলো উন্নত কবিপ্রতিভার পরিচায়ক এবং এই গাথাগুলোই পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

নি. অ.

## নানকার বিদ্রোহ

নানকারপ্রথা ছিল অনেকটা দাসপ্রথার মতো। আসলে আদিযুগের দাসপ্রথাকেই নানকারব্যবস্থার মধ্যে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। জমি ও বসতবাটির জায়গা দিয়ে জমিদার নানকার প্রজাদের সারা বছর তার কাজ করাত। এদের খাটুনি ছিল বাধ্যতামূলক। সারা দিনের খাটুনির জন্য ওরা কোনো ধরনের খাবার বা মজুরি পেত না। যে জমি ওদের দেওয়া হত সে জমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর তাদের পুরোপুরি অধিকার ছিল না। জমিদার ইচ্ছা করলেই নানকার প্রজাকে তার বাড়ি-জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। তা ছাড়া কাজের কোনো ধরাবাঁধা সময় বা নিয়মও ছিল না। ছিল দৈহিক নির্যাতন, পীড়ন।

এই অমানবিক, অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯২২-২৩ সালে। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার ধর্মপাসা থানায় সুনখাইড় গ্রামে বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়। দু'বছর বিদ্রোহ চলার পর সরকার ও জমিদারের মিলিত শক্তির মোকাবেলায় ওরা হেরে যায়।

দশ বছর পর ১৯৩১-৩২ সালে কুপাতড়ায় নানকার প্রজারা আবার বিদ্রোহ করে। দু'বছর জমিদারের কাজে বেগার খাটা বন্ধ রেখে ওরা বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়।

সুনামগঞ্জ মহকুমার দিরাই থানার জকিনগর গ্রামের নানকার প্রজারা ১৯৩৮-৩৯ সালে 'কৃষকসভা' পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শক্তিপ্রয়োগ করে জমিদারদের পক্ষে এ বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় নি। পরে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) বেধে গেলে আন্দোলন সীমিত হয়ে যায়। এই একই সময়ে সদর সিলেট মহকুমার গোপালগঞ্জ থানায় রনিকেলি ও ভাদেশ্বর এলাকাতেও বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে 'কৃষকসভা'র সমর্থন ছিল বলে তা বেশ জোরদার হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিলেট জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই বিদ্রোহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে নানকার কৃষকদের দাবি স্বীকৃত হয়। সরকার ১৯৪৮ সালে বিয়ানিবাজার ও বড়লেখা থানার নানকারপ্রথা বিলোপ করতে বাধ্য হয় এবং নানকারদের বাড়ি ও অর্ধেক জমির ওপর জোত-স্বত্ব স্বীকার করে নেয়। এটি একটি বড় বিজয়। পরে ১৯৫০ সালে ভূমিদখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে নানকারপ্রথা রদ করা হয়।

সে. হো.



www.pathagar.com

**নাভ্রাতিলোভা, মার্তিনা** [১৯৫৬— ]

টেনিস তারকা। তাঁর জন্ম ১৮ই অক্টোবর ১৯৫৬, সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে। পেশাদার টেনিসজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মার্তিনা ছোটবেলায় আইস হকি খেলতে ভালবাসতেন। ৭/৮ বছর বয়সে টেনিসে হাতে খড়ি এবং ৯ বছর বয়সে টুর্নামেন্টে খেলা শুরু করেন। ১৪ বছর বয়সে মহিলা এককে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলেও সবার নজর কাড়েন আরো দুই বছর পর। ১৯৭২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) পেশাদারি টেনিসজীবন শুরু । ১৯৭৩ সালে উইম্বলডন টেনিসের জুনিয়র ফাইনালে উঠে অ্যান কিয়োমোয়ারার কাছে হেরে যান। প্রথম শিরোপা জয় করেন ১৯৭৪ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিসে কলম্বিয়ার ইভানের সঙ্গে মিশ্র দ্বৈততে। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে ক্রিস এভার্টের সঙ্গে যথাক্রমে ফ্রেঞ্চ ওপেন দ্বৈত ও উইম্বলডন দ্বৈত শিরোপা জয় করেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম বারের মতো উইম্বলডন একক শিরোপা অর্জন করেন। এই পর্যন্ত গ্রাণ্ড স্লাম টেনিস শিরোপা জিতেছেন ১৮ বার। রেকর্ড : ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৯ বার উইম্বলডন একক শিরোপা জিতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত হেলেন উইলস মুডির ৮ বার জয়ের রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৯৩ সালে ১৬০তম একক শিরোপা জিতে বিশ্বরেকর্ড করেন। ১৯৯১ সালে মিলান ওপেন টেনিসের সেমিফাইনালে জিতে ক্রিস এভার্ট-এর সর্বাধিক ১৩০৯টি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বছরে কমপক্ষে দু'টি শিরোপা জিতেছেন টানা ১৭ বার। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা সর্বাধিক ৭৪টি ম্যাচে জয়ী হন। একই ইভেন্টে ৬৩ বার একক ও দ্বৈত শিরোপা জয় করেন। পামেলা শ্রাইভারের সঙ্গে জুটি হয়ে টানা ১০৯ বার দ্বৈত শিরোপা জয় করেন।

মার্তিনা ১৯৯৩ পর্যন্ত ১ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশের মুদ্রায় প্রায় ৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা) আয় করেছেন। তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং নির্বাচিত শিশুদের প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

১৯৯৪ সালের ১৫ই নভেম্বর নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে তিনি টেনিস থেকে অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর।

অ. ব.

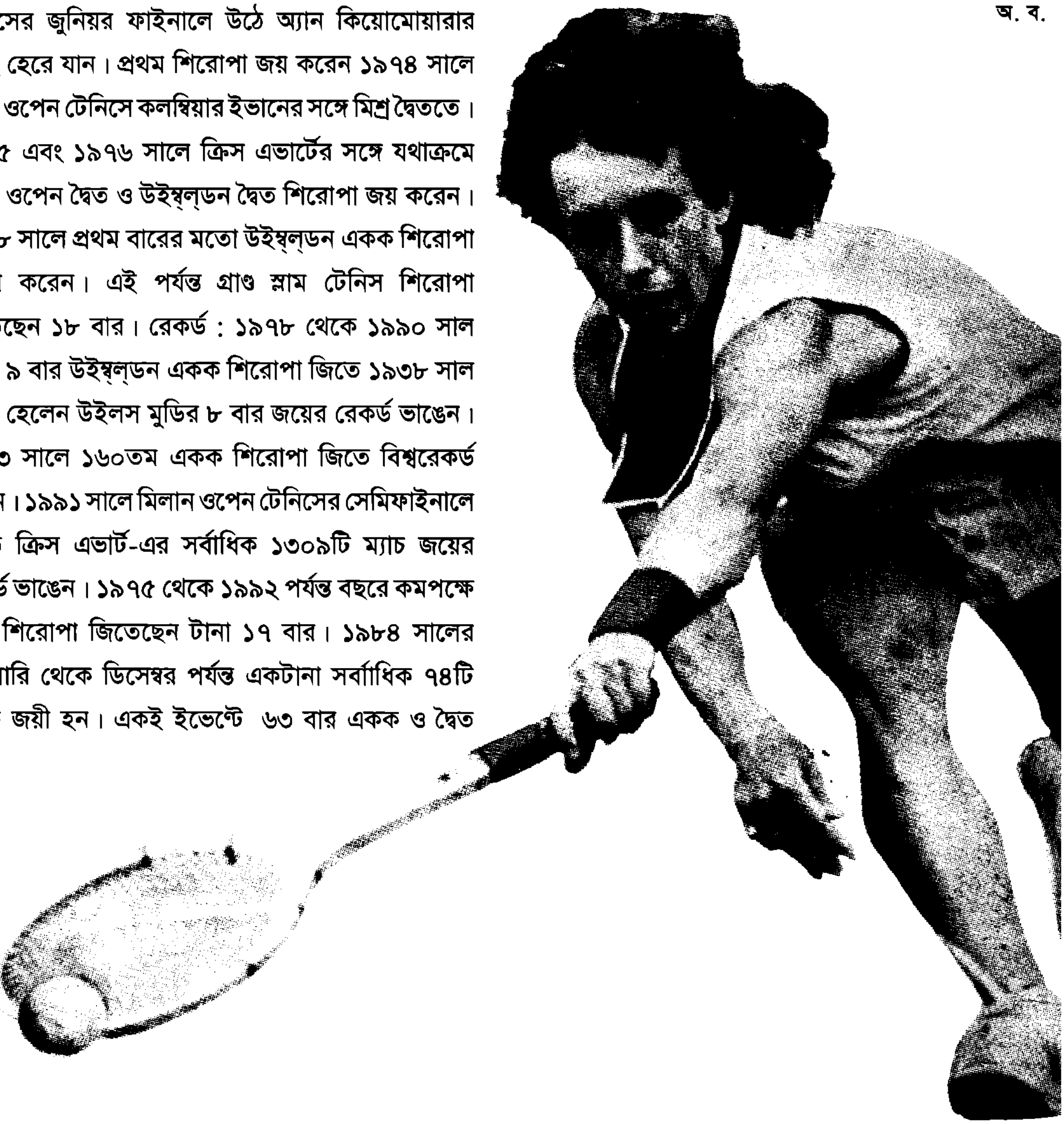



www.pathagar.com

*নামাযের পর মোনাজাত করছেন মুসল্লিরা*

## নামায

নামায ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয়। এটি ফার্সি শব্দ, যার আরবি প্রতিশব্দ 'সালাত'। ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উপাসনা করাকেই নামায বলা হয়।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দিনে-রাতে পাঁচ বার নামায আদায় করেন। এগুলির নাম হল : ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। ভোর বেলায় ফজর, দুপুরে জোহর, বিকেলে আসর, সন্ধ্যায় মাগরিব এবং রাত্রে এশার নামায আদায় করা হয়। কুরআনের (দ্র) বিভিন্ন আয়াত বা অনুচ্ছেদ পাঠের মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করা হয়।

মুসলমানদের জন্য পাঁচ বার নামায আদায় করা ফরজ বা আবশ্যকীয় কর্তব্য।

মু. মা.

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [১৯১৮—১৯৭০]

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, গবেষক ও অধ্যাপক। তিনি ১৯১৮ সালে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস বরিশালের (দ্র) বাসুদেবপাড়া। তাঁর আসল নাম তারকনাথ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল ও কলিকাতার (দ্র) বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প (দ্র) বিষয়ে গবেষণাকর্মের জন্য ডি. লিট. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। পেশাগত জীবনে তিনি প্রথমে সিটি কলেজ ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সাংবাদিক ও সমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। শেষ জীবনে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে রসরচনা লিখতেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রজীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্রথম দিকে কবিতা লিখতেন। পরে গদ্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। চল্লিশের দশকের সূচনায় 'উপনিবেশ' শিরোনামে তিন খণ্ডে একটি উপন্যাস রচনা করে তিনি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। গল্প, উপন্যাস (দ্র), নাটক (দ্র) ইত্যাদি শাখায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। শিশুসাহিত্য রচনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। সাধারণ ঘটনার বুদ্ধিদীপ্ত ও সরস প্রকাশই তাঁর শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। 'টেনিদা' চরিত্র তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। শিশু-কিশোরদের কাছে 'টেনিদা'র কীর্তি-কাহিনী সংবলিত গল্পগুলো ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—উপন্যাস : 'উপনিবেশ' (তিন খণ্ড ১৯৪৪), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫১ ব.), 'মন্দ্রমুখর' (১৩৫২ ব.), 'মহানন্দা', 'ট্রফি' (১৩৫৬ ব.), 'লালমাটি' (১৩৫৮ ব.), 'বিদূষক' (১৯৫৯), 'শিলালিপি', 'বৈতালিক' ইত্যাদি; নাটক : 'রামমোহন', 'ভাড়াটে চাই', 'আগন্তুক'; প্রবন্ধ : 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'ছোটগল্পের সীমারেখা'। কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁর বহু গান চলচ্চিত্রে ও রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।

'বসুমতী' পত্রিকা সংবাদ-সাহিত্যের জন্য তাঁকে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭০ সালের ৬ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.



www.pathagar.com

## নারিকেল/ নারকেল

পামি (Palmae) পরিবারভুক্ত শাখা-প্রশাখাবিহীন লম্বা একবীজপত্রী বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *কোকস্ নুসিফেরা,* লিন *(Cocos nucifera,* Linn) / গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের অনেক দেশেই এ গাছ আছে। বিশেষ করে সমুদ্রোপকূলে নিচু জমি ও ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চলে এ গাছ ভাল জন্মে। নারিকেল গাছের উচ্চতা ২০–২৫ মিটার। এ গাছের কাণ্ড বেলনাকার এবং উপরের দিক ক্রমশ সরু। নারিকেল গাছ বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সর্বত্রই জন্মে। তবে এ দেশের সমুদ্রতীরবর্তী লোনা মাটিতে এর উৎপাদন ভাল হয়। নারিকেল গাছ সাধারণত ৬-৭ বছরে ফল দিতে শুরু করে। এ গাছ ৬০–৭০ বছর বাঁচে। শ্রীলঙ্কা (দ্র), মালয়েশিয়া এবং ভারতে (দ্র)এ গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। কচি নারিকেলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুপেয়।

নারিকেল গাছের পাতা যৌগিক এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় তিন-চার মিটার। পাতার প্রতিটি ফলকের দৈর্ঘ্য প্রায় এক মিটারের মতো। নারিকেল গাছের পাতা দিয়ে মাদুর ও ঝুড়ি এবং এর মধ্যশিরা দিয়ে ঝাঁটা তৈরি করা যায়। এ গাছের পাতাপোড়া ছাইয়ে প্রচুর পরিমাণে পটাশ থাকে। এ ছাই জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

ফুল ফোটার পর থেকে এক বছরের মধ্যে নারিকেল গাছে ফল পাকে। এ ফল ডিম্বাকৃতি এবং বেশ বড়। এর বীজাবরণ খুব শক্ত। দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার তাগিদে নারিকেল প্রচুর খাদ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। এর আবরণকে মালা বলা হয়। নারিকেলের কঠিন শাঁস দুধের মতো সাদা এবং বেশ সুস্বাদু। বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরিতে এবং রান্নায় নারিকেল ব্যবহৃত হয়। রোদে শুকানো নারিকেল-শাঁস থেকে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ তেল আহরণ করা যায়। শুকনো শাঁসকে ঘানিতে মাড়াই করলে তেল পাওয়া যায়। তেল নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত খৈল পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল তেল চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মার্জারিন ও রান্নার তেল, সাবান, শ্যাম্পু এবং অন্যান্য প্রসাধনসামগ্রী তৈরিতে নারিকেল তেল ব্যবহৃত হয়।

নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি করা হয়।

এ দড়ি পানিতে ভিজেও সহজে নষ্ট হয় না। তাই বন্দরের জেটিতে এবং জাহাজে এ দড়ি ব্যবহার করা হয়। নারিকেলের ছোবড়া জাজিম ও কুশন তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। এ ছোবড়া দিয়ে পাপোশ এবং ঘর পরিষ্কার করার ঝাঁটাও তৈরি করা যায়। নারিকেলের খোল দিয়ে হুঁকা তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশে যেসব নারিকেলের চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে টিপিকা সবুজ, টিপিকা বাদামি ও দুধে। বিদেশী বিভিন্ন জাতের মধ্যে আন্দামান জায়ান্ট, আন্দামান ডোয়ার্ফ, লুনিমান, ফুমিলা, রেজিয়া ও লুনো প্রধান। জাতভেদে বছরে প্রতি গাছে ৫০-১০০টি নারিকেল পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারিকেল তাই গুরুত্বপূর্ণ ফল।

মু. আ.



www.pathagar.com

*নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম*

## নারীবাদী আন্দোলন

নারীবাদ (ইংরেজিতে feminism-'ফেমিনিজ্‌ম্') সম্পর্কিত আন্দোলনের উদ্ভব পশ্চিমী দুনিয়ায় অর্থাৎ ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকায় (দ্র)। নারীবাদ ধারণার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, সর্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা দাবি, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য থাকবে না— এই ধারণাকেই ব্যক্ত করে 'নারীবাদ'। সমান অধিকার লাভের জন্য নারীসমাজের এই লড়াই প্রায় দু' শ' বছর ধরে চলছে।

ইংল্যাণ্ডে মেরি ওল্‌স্টোন্‌ক্রাফ্‌ট্ (দ্র) প্রমুখ তেজস্বিনী মহিলাদের রচনা, আন্দোলন ইত্যাদির ফলে নারীদের প্রতি সমাজের সার্বিক সচেতনতা তৈরি হতে শুরু করে। মেরির অত্যন্ত বিখ্যাত বই এবং নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম স্বাক্ষর 'নারী-অধিকারের যাথার্থ্য' (Vindication of the Rights of Women) প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯২ সালে। এর প্রায় এক শ' বছর পর ১৮৯০ সালে প্যারিসে নারীবাদী আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে পুরুষের সমানাধিকারের দাবি আর থামে নি, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, সংহত রূপ নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এখন এই আন্দোলন পৃথিবী (দ্র) জুড়ে দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

আরম্ভ থেকে এ পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলনের যে রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে নারীসমাজের ন্যায্য দাবিগুলো এভাবে লিপিবদ্ধ করা চলে : ১. কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান মজুরি, ২. শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা দাবি, ৩. বিবাহ ও সংসারজীবন যাপনে নারীর মতামতকে সম্মান দেওয়া ও মান্য করা, ৪. নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার, ৫. বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার, ৬. স্বাস্থ্যগত কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে সন্তানধারণে অসম্মতির অধিকার,



www.pathagar.com

৭. স্বামীর পরিচয় ছাড়াই নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষা-যোগ্যতার মানদণ্ডে সমাজে একক ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতিলাভের অধিকার (প্রসঙ্গত ইউরোপ-আমেরিকায় মেয়েদের নামের পূর্বে Miss/Mrs যেমন লেখা হত, এখন তা হয় না, লেখা হয় Ms যাতে স্বামী আছে কি নেই কিছুই বোঝা সম্ভব না হয়)। এসব অধিকারের অনেক কিছুই ইউরোপ ও আমেরিকার নারীসমাজ আদায় করে নিতে পেরেছেন।

এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকার (দ্র) বিভিন্ন অনুন্নত দেশে অবস্থা অন্য রকম। বাংলাদেশ (দ্র) নিজেই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীর উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে আইনের প্রয়োগ এখানে কদাচিৎ দেখা যায়; এর ফলে নারী-অধিকার লঙ্ঘন বাংলাদেশে প্রতি মুর্হূতের ঘটনা। তবে আশার কথা, নারীবাদী আন্দোলন এখানেও ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে এবং মহিলাসমাজ ক্রমে তাঁদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, সংঘবদ্ধ হচ্ছেন এবং তাঁদের দাবি সম্পর্কে সোচ্চার হচ্ছেন।

হা. মা.

*উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম*

## নালন্দা

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চা এবং বৌদ্ধ প্রাচীন কীর্তির জন্য বিখ্যাত স্থান। ভারতের (দ্র) বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগিরের প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) উত্তরে নালন্দা অবস্থিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ (দ্র) বেশ কয়েক বার এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানকার পাবারিক আম্রকাননে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এখানে একটি মহাবিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করার কথাও জানা যায়। এখানেই বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শারিপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নালন্দাই ছিল শারিপুত্রের জন্ম ও নির্বাণ (দ্র) লাভের স্থান। সম্রাট অশোক (দ্র) শারিপুত্রের স্মৃতিতে এখানে একটি চৈত্য (বুদ্ধের চিতাভস্ম বা অস্থি দন্ত ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্নসংবলিত মন্দির) নির্মাণ ও একটি মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টীয় ৫ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পর গুপ্তসম্রাট কুমার গুপ্ত নালন্দা



www.pathagar.com

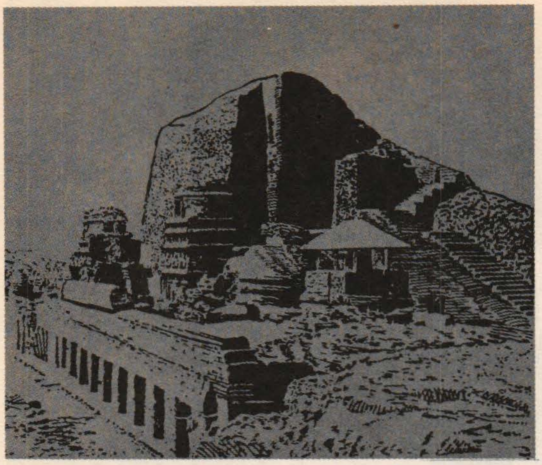

*নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ*

মহাবিহারের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৪১৫-৫৫ খ্রিস্টাব্দ। গুপ্তবংশের পাঁচ জন রাজা এখানে পাঁচটি সংঘারাম (ভিক্ষুদের বিশ্রামাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মধ্যে বালাদিত্য (নরসিংহ গুপ্ত) একটি সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধের প্রায় ২৪ মিটার (৮০ফুট) উচ্চ তাম্রমূর্তি স্থাপনের জন্য পূর্ণবর্মণ ছয় তলা মন্দিরসহ কয়েকটি মনোরম মন্দির নির্মাণ করেন। কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭) একটি ব্রোঞ্জের বিহার নির্মাণ করেন। তিনি এই মহাবিহারের এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে পাল-রাজাদের সময়েই (খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতক) নালন্দা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে নালন্দার এই সমৃদ্ধি ও সংস্কারকাজে গুপ্ত, হর্ষ ও পাল সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি, স্থাপত্যকলা ও গঠনকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

পালরাজত্বের সময় নালন্দা সমগ্র এশিয়ার (দ্র) মধ্যে বৌদ্ধধর্মের (দ্র) প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে এক সঙ্গে ১০ হাজার বিদ্যার্থী ও দেড় হাজার আচার্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানের প্রায় সকল শাখাই নালন্দার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি এখানে মূর্তিনির্মাণবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হত। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষু হিউএন-ৎসাঙ (দ্র) এখানে তিন বছর (অন্য মতে পাঁচ বছর) এবং ঈৎ-সিঙ (দ্র) প্রায় দশ বছর অধ্যয়ন ও বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা করেন। পাল রাজাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্যে নালন্দা ক্রমে মহাযান (দ্র) ও বজ্রযান মতপ্রচারকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এই ধর্মমত এখানকার ভিক্ষু-শ্রমণদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে মূর্তিনির্মাণবিদ্যা সারা পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলোতে প্রসারলাভ করে। আসলে পাল রাজাদের আমলে বিক্রমশীলা, সোমপুরী (দ্র), জগদ্দল, ওদন্তপুরী (দ্র)-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে, সেগুলোর উৎস বা প্রাণকেন্দ্র ছিল নালন্দা। নালন্দার পণ্ডিতেরাই ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হতেন। তাই নালন্দাকে 'বৌদ্ধ ভারতের অক্সফোর্ড' বলা হত। সেন ও বর্মণ রাজাদের বৌদ্ধবিদ্বেষী তৎপরতা এবং তেরো শতকের সূচনায় তুর্কী আক্রমণের ফলে নালন্দা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পরবর্তী কালে বহু প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন এখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের বিহার রাজ্য সরকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য নালন্দার স্থলে 'নব নালন্দা মহাবিহার' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

সুজ. ব.

## নাসিকা / নাক

নাসিকা ঊর্ধ্ব শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অঙ্গ, যা দিয়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসকার্য পরিচালনা করি এবং কোনো বস্তুর গন্ধও বুঝতে পারি। অস্থি (দ্র) ও তরুণাস্থি দিয়ে নাসিকা তৈরি। নাসিকার ভেতরটা খুব পাতলা, চকচকে ও ভেজা শ্লেষ্মাঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। নাসাপথ তরুণাস্থিও অস্থিদ্বারা তৈরি বিভেদপ্রাচীর (septum) দ্বারা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত। নাসাপথের শেষেই গলবিল (ফ্যারিংস) অবস্থিত।

শুকনো বাতাস নাকের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ভেজা শ্লেষ্মাঝিল্লির সংস্পর্শে আর্দ্র হয়ে ওঠে। এ ছাড়া নাকের ভেতরের ছোট ছোট লোম বা সিলিয়া বাতাসের ধুলোবালি, রোগজীবাণু আটকে রাখে। নাকের ভেতর ছোট ছোট প্রচুর রক্তনালি আছে। এগুলো নাকের ভেতর প্রবাহিত বাতাসকে গরম করে। সুতরাং, নাকের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বাতাস আর্দ্র, পরিষ্কার ও উষ্ণ হয়ে থাকে। নাসাঝিল্লিতে অবস্থিত ঘ্রাণস্নায়ুর সাহায্যে আমরা বস্তুর গন্ধ অনুভব করে



www.pathagar.com

থাকি। এই স্নায়ু মস্তিষ্ককোষের সঙ্গে যুক্ত। নাকের চারপাশের অস্থিতে অবস্থিত বায়ুগহ্বরকে বলা হয় 'সাইনাস'।

নাক সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয়। নাক পরিষ্কার করতে হয় আস্তে আস্তে এবং একই সাথে দুটো নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করতে হয়। সর্দি হলে নাকের শ্লেষ্মাঝিল্লি ফুলে উঠে। তখন নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়ে থাকে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, ভাইরাস বা জীবাণুসংক্রমণ ইত্যাদি কারণে নাসাপথে এবং সাইনাস-ঝিল্লিতে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে।

আ. আ. হা.

**নাসির আলী, মোহাম্মদ** [১৯১০-১৯৭৫]

জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক। ১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার ধাইদা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মোহাম্মদ হায়দার আলী শিকদার ও মাতা কসিমুন নিসা। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯২৬ সালে অঙ্কে স্বর্ণপদকসহ স্থানীয় তেলীরবাগ কালীমোহন দুর্গামোহন ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এর পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৩১ সালে বি. কম. পাশ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠ করতেন এবং এভাবেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে।

শিক্ষাজীবন শেষ করে মোহাম্মদ নাসির আলী ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতা (দ্র) যান এবং কলিকাতায় হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি লেখালেখিসূত্রে দৈনিক ইত্তেহাদ, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী এবং সওগাত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। আজাদ পত্রিকার শিশু-কিশোর বিভাগ 'মুকুলের মহফিল'ও তিনি পরিচালনা করেন। ১৩৪৬ সালের মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

নাসির আলীর লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় আমিনা মেহের ছদ্মনামে। 'লেখাপড়া' শিরোনামের এই বইটি ছিল একটি পাঠ্যবই। এটি অবিভক্ত বাংলায় প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। নিজের নামে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪০টিরও বেশি। তাঁর ভাষা যেমন সহজ-সাবলীল ও বিষয়োপযোগী, তেমনি রচনাভঙ্গিও গতিময়। মৌলিক রচনার মতো অনুবাদকর্মেও তিনি ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল—'লেবুমামার সপ্তকাণ্ড' (১৯৬৮), 'ভিনদেশী এক বীরবল' (১৯৭৯), 'আকাশ যারা করল জয়' (১৯৫৭), 'আলীফ লাইলার গল্প', 'একটি কুকুরের কাহিনী', 'ভিনদেশী গল্প', 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা', 'তিমির পেটে কয়েক ঘণ্টা, 'বোকা বকাই' (১৯৫৬), 'ইবনে বতুতার সফরনামা' (১৩৭৫), 'ইতালির জনক গ্যারিবল্ডি' (১৯৬৩), 'ছোটদের ওমর ফারুক', 'আলবার্ট আইনস্টাইন', 'ছোটদের আলমগীর' (১৩৭৭), 'আমাদের কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ' (১৩৫৫), 'মোহাম্মদ বিন কাসিম' (১৩৭০), 'বীরবলের খোশগল্প' (১৯৬৪), 'সাতপাঁচ গল্প' (১৯৬৫), 'টলস্টয়ের সেরা গল্প' (১৯৬২), 'যোগাযোগ' (১৯৬৮), 'শাহী দিনের কাহিনী' (১৩৫৯) ইত্যাদি।

পুস্তক রচনার পাশাপাশি রুচিশীল পুস্তক প্রকাশের প্রতিও নাসির আলীর প্রবল আগ্রহ ছিল। ১৯৪৯ সালে তাঁর বন্ধু আইনুল হক খানের সঙ্গে যৌথভাবে 'নওরোজ কিতাবিস্তান' নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে গ্রন্থপ্রকাশনা সম্পর্কে করাচি থেকে ইউনেস্কো ট্রেনিং গ্রহণ করেন। তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। ফটোগ্রাফির কাজেও তাঁর প্রশংসনীয় দক্ষতা ছিল।

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নাসির আলী বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র), ১৯৬৮ সালে ইউনেস্কো এবং একই বছর ইউনাইটেড ব্যাংক অব পাকিস্তান পুরস্কার লাভ করেন। পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাঁকে স্বর্ণপদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.



www.pathagar.com

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা

বিখ্যাত রসজ্ঞ। তবে তাঁর জন্মস্থান, জন্মসাল ও জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। অনেক গবেষকের মতে, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুরস্কের (দ্র) খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি মোল্লা নাসিরুদ্দিন নামেও পরিচিত। জানা যায়, তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সুকবি। ধর্মশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় ইমাম হিসাবেও তিনি নিযুক্তি পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তেমন লিখতে-পড়তে জানতেন না, তবে স্বভাবদত্ত জ্ঞানবুদ্ধি ছিল

খুবই প্রখর। তাঁকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গল্পগুলোই তার প্রমাণ।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা জন্মভূমি তুরস্ক ছেড়ে এক সময় ইরানে চলে আসেন। এর মূলে ছিল তাঁর উদার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে গোঁড়া মোল্লাদের বাড়াবাড়ি রকমের তৎপরতা। ইরানের শাসনকর্তা তাঁর প্রতিভা ও রসবোধের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন এবং তাঁকে তাঁর রাজদরবারে ঠাঁই দেন। সম্ভবত পরে তিনি তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করে থাকবেন, কেননা জন্মভূমির আকশোহির শহরে তাঁর সমাধিস্থল এখনো আছে বলে জানা যায়।

মধ্যপ্রাচ্য (দ্র), আফগানিস্তান এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোয় নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্পের জনপ্রিয়তা এখনো সমভাবে অক্ষুণ্ন।

অন্য একটি বিশেষজ্ঞ সূত্রের অভিমত, চীন (দ্র) দেশে তিনি নাসেরুদ্দিন আফান্দি নামে পরিচিত। দেশটির সিনচিয়াং উইগুর জাতিসত্তার বহু লোককাহিনীর এক প্রবাদ পুরুষ বলে তিনি অভিহিত। ভালমন্দের বিচারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি এক জন বিজ্ঞ, বিনয়ী ও রসিক ব্যক্তি। সমগ্র চীনের ঘরে ঘরে আফান্দির নাম এক ডাকে পরিচিত। 'আফান্দি' একটি পদবি।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মৌখিক সাহিত্য থেকেই হোজ্জার গল্পগুলোর উৎপত্তি। এইসব গল্পে ব্যক্ত হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার, হঠকারিতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং মানবিক গুণাবলি ও সততার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। আবার এর পাশাপাশি রয়েছে নির্মল হাস্যকৌতুক।

বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁর গল্প অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প অনূদিত হয়েছে।

আ. হু.

**নাসের, গামাল আবদেল** [১৯১৮—১৯৭০]

আরব ঐক্যের প্রতীক, মিশর প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট। জন্ম ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি বেনিমোর-এ। বিদ্যালয়জীবন শেষ করে ১৯৩৭ সালে ভর্তি হন মিলিটারি কলেজে। তরুণ বয়সেই মিশরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়। তিনি ১৯৪৯ সালে গড়ে তোলেন 'ফ্রি অফিসার্স' নামের একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী। ১৯৫২ সালে এই দলই রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করে। ১৯৫৪ সালে জেনারেল নাগিবকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি নিজেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'আরব সোশ্যালিজম্' নামে খ্যাত।

নাসেরের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ১৯৫৬ সালে দেশের ধনী ভূস্বামীদের ৬ লক্ষ একর জমি দখল করে নেওয়া, সুয়েজ খাল (দ্র) কোম্পানি জাতীয়করণ, নীল নদের ওপর আসওয়ান বাঁধ (দ্র) তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। সর্বপ্রথম



www.pathagar.com

মিশরে বিদেশী শাসন ও আধিপত্যের অবসান ঘটান তিনিই। তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থের ধারক-বাহক হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭০ সালে।

তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'দ্য ফিলসফি অব দ্য রেভোলিউশান' গ্রন্থে।

আ. হু.

**নিউইয়র্ক** (New York)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সবচেয়ে বড় শহর। শহরটি পাঁচটি বারা (borough) বা অংশে বিভক্ত। এগুলো হল ম্যানহাটান, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস্, কুইন্স এবং স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড। সব মিলে আয়তন ৮৩১ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ৭২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১শ (১৯৮৬ সাল)। শহরটি মূলত দ্বীপ অথবা দ্বীপের অংশ নিয়ে গঠিত, কেবল ব্রঙ্কস্ মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান হল ৪০·৪৫° উত্তর অক্ষাংশ, ৭৪·০০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। জানুয়ারিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম ০° সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮° সে. (০° ফা.) এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা —জুলাই মাসে ৩৮° সে. (১০০° ফা.)। বছরে গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি।

নিউইয়র্ক শহরের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ হল মধ্য নিউইয়র্কের বারা অব ম্যানহাটান; এটি হাডসন নদী এবং ইস্ট রিভার–এর মধ্যবর্তী একটি সরু লম্বা দ্বীপ। ম্যানহাটানের অধিকাংশ রাস্তায় নামের পরিবর্তে নম্বর ব্যবহৃত হয় (সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য)। ম্যানহাটানের দক্ষিণাংশে স্ট্যাচু অব লিবার্টি (স্বাধীনতার মূর্তি) দাঁড়িয়ে আছে। শহরের অর্থনৈতিক লেনদেন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দু'টি অট্টালিকা World Trade Centre এবং Empire State Building অবস্থিত। শহরের উত্তরাংশে সেন্ট্রাল পার্ক, বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে শুধু সবুজ ঘাস ও গাছের

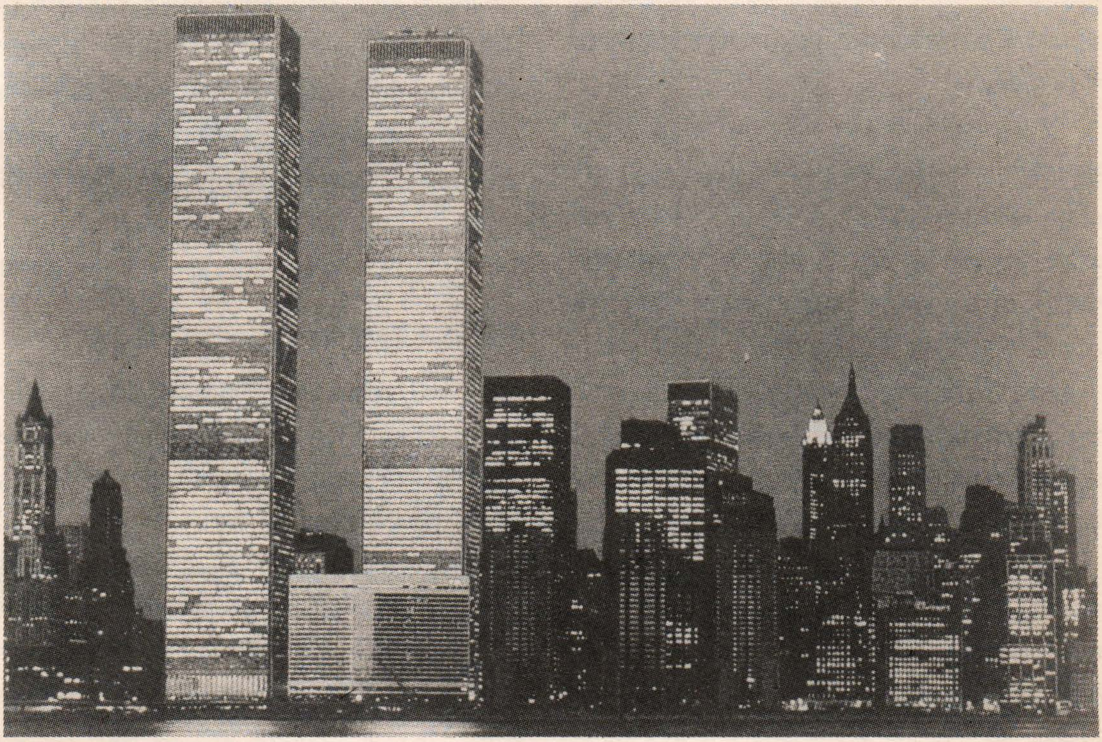

*নিউইয়র্ক শহরের রাত্রিকালীন দৃশ্য*



www.pathagar.com

সমারোহ। শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে নিউইয়র্ক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য নগরগুলির একটি।

স. রা.

## নিউক্লিক অ্যাসিড (nucleic acid)

সুইজারল্যাণ্ডবাসী তরুণ প্রাণরসায়নবিদ ইওহান ফ্রিড্‌রিশ মিশের (Johann Friedrich Miescher) ১৮৬৯ সালে কোষের কেন্দ্রক (nucleus) থেকে যে উপাদানটি আবিষ্কার করেন, তার নাম দেওয়া হয় নিউক্লিন। সাদা পাউডারের মতো এই পদার্থটিই আসলে নিউক্লিক অ্যাসিড। কিন্তু দীর্ঘদিন এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে জার্মান বিজ্ঞানী ফুলজেন কোষের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড শনাক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। দেখা গেল, কোষকেন্দ্রকের মধ্যেই নিউক্লিক অ্যাসিড ডি এন এ (দ্র)র (ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিডের) অবস্থান। কিছুকাল পর মার্টিন বেহ্‌রেন্স ১৯৩৮ সালে প্রমাণ করেন যে ডি এন এ কোষের কেন্দ্রকে এবং আর এন এ (রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড) কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশের দশকে এসে নিউক্লিক অ্যাসিডের রহস্য উন্মোচিত হল। ফ্রান্সিস ক্রিক (Francis Crick) এবং জেমস্ ওয়াটসন (James D. Watson) ডি এন এ অণুর মডেল তৈরি করে দেখিয়ে দেন যে এই বিশাল অণুটি দুটো পাকানো সুতোর কুণ্ডলীর মতো। ঘোরানো সিঁড়ি ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে।

এর পর ১৯৫৩ সালে গবেষণাগারে কৃত্রিম আর এন এ অণু সংশ্লেষণের দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করেন স্পেনীয় প্রাণরসায়নবিদ সেভেরো ওশোয়া এবং ডি এন এ সংশ্লেষণ করেন মার্কিন চিকিৎসক আর্থার কর্নবার্গ।

নিউক্লিক অ্যাসিডের দুটো রূপ ডি এন এ এবং আরএনএ। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ডি এন এ'র কুণ্ডলী-পাকানো জটিল অণুটিই জীবদেহে বংশগতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপাদান এবং এটি বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরিরও ছাঁচ। ডি এন এ'র অনুপস্থিতিতে আর এন এ বংশগতির উপাদান হিসাবে কাজ করে। জীবন সৃষ্টির মৌল উপাদান হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড, মূলত ডি এন এ।

আরো দেখা গেছে যে ভাইরাসের(দ্র) প্রধান উপাদান ডি এন এ অথবা আর এন এ অণু, যা প্রোটিন-আবরণী দ্বারা সুরক্ষিত। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে নিউক্লিক অ্যাসিড-অণুরই বিভাজন। নিউক্লিক অ্যাসিডের কার্যক্রম এতই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যে এর আবিষ্কার জীবনের রহস্য উন্মোচনের পথে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলা চলে।

রু. হা.

## নিউটন

বলের আন্তর্জাতিক একক। সঙ্কেত N। যে বল প্রয়োগ করে এক কিলোগ্রাম বস্তুর এক মিটার/সেকেণ্ড² ত্বরণ সৃষ্টি করা যায়, তাকে এক নিউটন বলে।

গাণিতিকভাবে নিউটন = কিলোগ্রাম, মিটার/ সেকেণ্ড²

বা $1\ N = 1\ kg.\ ms^{-2}$

অন্য কথায় এক কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটার/সেকেণ্ডে বৃদ্ধি পায়, তাকে এক নিউটন বলা হয়। এটি কোনো মৌলিক একক নয়, একটি উদ্ভূত বা প্রতিপাদিত (derived) একক। ভরের একক কিলোগ্রাম এবং ত্বরণের একক মিটার/সেকেণ্ড² এর সমন্বয়ে বলের একক নিউটন গঠিত।

হো. আ.

## নিউটন, স্যার আইজ্যাক [১৬৪২—১৭২৭]

বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী বিজ্ঞানী ও প্রকৃতিদার্শনিক (natural philosopher)। এই ইংরেজ গণিতবিদ ও পদার্থবিদ স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর গতির সূত্র (laws of motion) ও মহাকর্ষ-তত্ত্বের জন্য।

নিউটন (Sir Isaac Newton) ১৬৪২ সালের বড় দিনে লিঙ্কনশায়ারের উল্‌স্‌থর্পে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সে নিউটনের মধ্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার প্রবণতা দেখা যায়। মেধাবী নিউটন স্কুলের পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিলেন। পিতৃহারা নিউটনকে মা সফল কৃষক বানানোর



www.pathagar.com

জন্য স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। কিন্তু কৃষিকাজ তাঁর দ্বারা হয় নি। ১৯ বছর বয়সে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে পড়াশোনার দ্বিতীয় বর্ষেই নিউটন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করতে থাকেন।

নিউটন খুব অল্প বয়স থেকেই নানান বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ডুবে থাকতেন। তাঁর বয়স যখন ২৩ তখন গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে থাকেন; পৃথিবী, চাঁদ ও গ্রহগুলো কীভাবে চলছে তা নিয়ে নতুন করে ভাবনায় ডুবে যান। এই অনুসন্ধান থেকেই তিনি আবিষ্কার করেন যে, মহাকর্ষ–বলের (force of gravity) আকর্ষণেই আপেল মাটিতে পড়ে এবং পৃথিবী, চাঁদ ও গ্রহগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে ঘোরে। ২১ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে নিউটন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি জ্যোতিষ্ক নিয়ে গবেষণার জন্য টেলিস্কোপ (দ্র) আবিষ্কার করেন। আজকাল আমরা যে টেলিস্কোপ ব্যবহার করি তার অনেকগুলোই নিউটনের দেওয়া নকশার উপর ভিত্তি করে তৈরি। তিনিই প্রথম বলেন যে সাদা আলো (white light) রঙধনুর সব ক'টি রঙের মিশ্রণ। নিউটন ২৩/২৪ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন সমাকলন বা ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস (integral calculus), যার কারণে আধুনিক গণিতের বিকাশ ঘটেছে আর বিজ্ঞানের অধিকাংশ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। নিউটনের আবিষ্কারগুলোর সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ ঘটে জ্যোতির্বিদ্যায়। নিউটনকে তাই অনেক সময় বলা হয় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। নিউটন 'প্রিন্সিপিয়া' নামে লাতিন ভাষায় একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদদের কাজে বিরাট প্রভাব ফেলে আসছে। ১৭০৫ সালে নিউটন 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। নিউটন তাঁর কাজগুলো প্রকাশের ব্যাপারে সব সময় অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন। তাই তাঁর কাজ অনেক দিন পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল।

নিউটন বৈষয়িক বিষয়ে অন্যমনস্ক স্বভাবের ছিলেন। এ ব্যাপারে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক দিন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বাসায় দাওয়াত করেন। কিন্তু তিনি তা ভুলে যান। বন্ধুটি নিউটনের বাসায় এসে তাঁর দেরি দেখে গোশ্‌ত খেয়ে হাড়গুলো প্লেটে ঢেকে রেখে চলে যান। নিউটন বাড়ি ফিরে ঢাকনা উল্টিয়ে হাড় দেখে বলে ওঠেন আমি তো ভুলেই গেছিলাম যে আমি ডিনার খেয়ে নিয়েছি। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ১৭২৭ সালে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হো. আ.



www.pathagar.com

## নিউট্রন (neutron)

একটি নিরপেক্ষ প্রাথমিক কণিকা—হ্যাড্রন শ্রেণীভুক্ত। প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রনের সমবায়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত। প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত, নিউট্রনের কোনো চার্জ (দ্র) নেই, এটি চার্জবিহীন কণিকা। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান; তবে নিউট্রনের ভর সামান্য বেশি—শতকরা এক ভাগের মতো বেশি। বিজ্ঞানী জেম্স্ চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে নিউট্রনকণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। সব পরমাণুতে নিউট্রন থাকলেও শুধু হাইড্রোজেন-পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই। পরমাণুর ভেতর নিউট্রন সুস্থিত বা স্থায়ী কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে এলে নিউট্রন ভেঙে যায় এবং একটি প্রোটন, একটি ইলেক্ট্রন (দ্র) ও একটি প্রতিনিউট্রিনো উৎপন্ন হয়। নিউক্লিয়াসের বাইরে এর গড় আয়ু ১২ মিনিট। চার্জবিহীন হওয়ার ফলে নিউট্রন কণিকাকে বিশেষ ব্যবস্থায় নিউক্লিয়াস থেকে বের করে নেওয়া যায়। নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে পরমাণু ভাঙা যায়—একে বলা হয় নিউক্লীয় বিক্রিয়া। নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। নিউট্রনের সাহায্যে শৃঙ্খলবিক্রিয়া ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করা যায়।

শা. ত.

## নিউমোনিয়া (pneumonia)

ফুসফুসের প্রদাহের ফলে সৃষ্ট রোগের নাম নিউমোনিয়া। জীবাণু (দ্র) ভাইরাস (দ্র), ছত্রাক (দ্র), প্রোটোজোয়া (দ্র) ইত্যাদির সংক্রমণ, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়া, এমনকি বিষাক্ত গ্যাসের কারণেও নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর মধ্যে *ডিপলোকক্কাস নিউমোনি (diplococcus pneumoniae)* নামক জীবাণুই এ রোগের জন্য বহুলাংশে দায়ী। নিউমোনিয়ার প্রধান লক্ষণ কাশি, বুকে ব্যথা, জ্বর, শীতভাব, কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

শ্বসনতন্ত্রের (দ্র) অন্তর্গত ক্লোমনালি (ব্রঙ্কাস) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে 'ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া' (bronchopneumonia) বলা হয়। অন্য দিকে যদি ফুসফুসের অংশবিশেষ ('লোব') নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় তা হলে তাকে বলা হয় 'লোবার নিউমোনিয়া' (lober pneumonia)।

নিউমোনিয়া বায়ুবাহিত রোগ। এ রোগের জীবাণু রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হতে পারে। নিউমোনিয়াগ্রস্ত রোগীর জন্য দরকার বিশ্রাম, সার্বক্ষণিক সেবা ও চিকিৎসা। নিউমোনিয়ার চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

## নিউরোসিস (neurosis)

নিউরোসিস এক ধরনের মানসিক রোগ। মনোবিজ্ঞানীরা এ রোগকে উদ্বেগজনিত নিউরোসিস (anxiety neurosis), অব্‌সেশনাল নিউরোসিস (obsessional neurosis), হিস্টিরিয়া (hysteria), ফোবিয়া (phobia), হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস (hypochondriasis), কম্পালশান (compulsion) ইত্যাদি মানসিক রোগের সমন্বয় বলে বর্ণনা করেছেন।

নিউরোসিসগ্রস্ত রোগীদের কেউ কেউ প্রচণ্ড রকম অবাস্তব ভয়ে তাড়িত হয়ে থাকে। কেউ বিশেষ কোনো কাজ করতে বা কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থান করতে অমূলক ভয় পায়। যেমন, বিমানে চড়ার ভীতি। কোনো কোনো নিউরোসিসের রোগী নিজেকে সব সময় অসুস্থ মনে করতে থাকে। কেউ কেউ সর্বদাই অর্থহীন কল্পনাপ্রবণতায় ভুগে থাকে।

পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে নিউরোসিস রোগের সমস্যাগুলো সুস্থ মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। কিন্তু নিউরোসিসগ্রস্ত রোগীর ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলো ঘন ঘন বা সার্বক্ষণিকভাবে ঘটতে দেখা যায়। এতে রোগীর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিউরোসিস রোগের প্রতিকার সম্ভব।

মানসিক রোগ ছাড়াও নিউরোসিসের আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী জিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের (দ্র) মতে নিউরোসিস এক ধরনের স্নায়বিক প্রক্রিয়া, যা কোনো অজ্ঞানতাপ্রসূত ইচ্ছা বাস্তবায়ন বা ক্রিয়াকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ কারো অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করলে আমাদের



www.pathagar.com

মনে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয় এবং সেই অপরাধবোধের কারণে আমরা অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকি। মনের এই পরিবর্তন নিউরোসিস নামক স্নায়বিক প্রক্রিয়ার কারণেই সৃষ্ট।

সি. না. হ.

**নিকেল** (nickel)

নিকেল একটি মৌলিক ধাতু। এর পারমাণবিক ওজন ৫৮·৬৯, পারমাণবিক সংখ্যা ২৮। গলনাঙ্ক ১৪৫৫°সে., স্ফুটনাঙ্ক ২৩৭০° সে.। এটি লোহার মতো চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন সাদা রঙের ধাতব পদার্থ। এতে মরচে ধরে না। বায়ু ও আর্দ্রতার প্রভাবে এটি মলিন হয় না। এ জন্য ইলেক্ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় লোহার জিনিসের ওপরে নিকেলের একটা পাতলা আস্তরণ ধরানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিকেল প্লেটিং। নিকেল-স্টিল, নিক্রোম প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্কর ধাতু (দ্র) মুদ্রা তৈরি করতে দরকার হয়। কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিকেল একটি উৎকৃষ্ট প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে। গন্ধক (দ্র) ও আর্সেনিকের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় 'নিকোলাইট' নামক খনিজ থেকে ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। উদ্ভিজ্জ তেলকে হাইড্রোজেন (দ্র) দ্বারা সম্পৃক্ত করে 'বনস্পতি' উৎপাদনের কাজে প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে নিকেলচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

**নিক্তি**

হাটে-বাজারে গেলেই আমাদের ওজন মাপতে হয়। ওজন মাপতে আমরা ব্যবহার করি নিক্তি, সাধারণ ভাষায় দাঁড়িপাল্লা। আসলে দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি দিয়ে বস্তুর ভর (দ্র) মাপা হয়। বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণ হল তার ভর। একটি আদর্শ বস্তুর ভরের সঙ্গে তুলনা করে কোনো বস্তুর ভর মাপার যন্ত্রই হল নিক্তি বা তুলাদণ্ড। তুলাদণ্ডের ব্যবহার অতি প্রাচীন। প্রাচীন কালে একটি দণ্ডের ঠিক মাঝখানে (ভরকেন্দ্রে) একটি রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত এবং দণ্ডের দুই প্রান্তে দু'টি বস্তু ঝুলিয়ে দণ্ডটিকে আনুভূমিক করে ভরের তুলনা করা হত। এটি আসলে লিভারের নিয়ম। এই নিয়মেই আধুনিক যুগের তুলাদণ্ড বা নিক্তি তৈরি করা হয়,

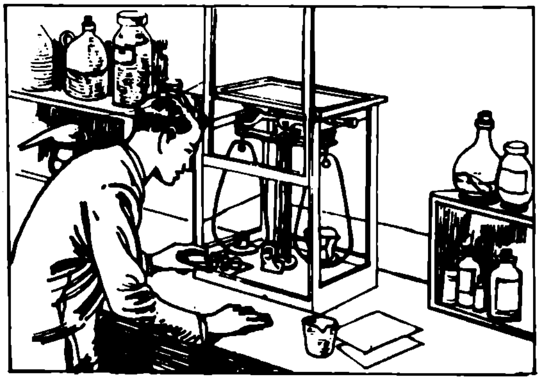

তবে এগুলির কোনো কোনোটিতে অনেক উন্নত মানের যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে।

সাধারণ নিক্তি বা দাঁড়িপাল্লা হাট-বাজারে ব্যবহৃত হয়। এই নিক্তির যান্ত্রিক সুবিধা বাড়িয়ে তৈরি করা হয় অ্যানালিটিক্যাল ব্যালান্স। এর দ্বারা ·০১ মিলিগ্রাম পর্যন্ত সঠিকভাবে মাপা যায়। জলবায়ু (দ্র) বা বাতাসের (দ্র) প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য এসব নিক্তিকে একটি কাচের তৈরি বিশেষ ধরনের বাক্সের মধ্যে বসানো হয়। বিজ্ঞানাগারে, গবেষণাগারে এ ধরনের নিক্তি ব্যবহৃত হয়।

বড় মাপের জিনিস মাপতে যেখানে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নেই, সেখানে বিশেষ ধরনের নিক্তি ব্যবহৃত হয়। রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, নদীবন্দর, লোহালক্কড়ের দোকান প্রভৃতি জায়গায় এ ধরনের নিক্তি থাকে। এতে একটি প্ল্যাটফর্মের উপর বস্তু তুলে দেওয়া হয় এবং একটি বা একাধিক বীমকে সাম্যাবস্থায় এনে বস্তুর ওজন নেওয়া হয়।

কোনো কোনো বস্তু আছে যার উপর বলপ্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য বা আকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। বল তুলে নিলে বস্তু আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই তত্ত্ব ব্যবহার করে অন্য এক ধরনের নিক্তি তৈরি হয়েছে। এতে প্রত্যেক বার পরিমাপের জন্য বাটখারা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই নিক্তিতে দাগকাটা একটি ডায়াল বা স্কেল থাকে। বস্তুটিকে পরিমাপের জন্য বস্তুটিকে প্যান বা প্ল্যাটফর্মের উপর রাখলে সূচকটি ডায়ালের উপর একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। এ থেকে বস্তুর ভর বা ওজন পরিমাপ করা হয়। এ ধরনের নিক্তিকে বলা হয় সাবস্টিটিউশান (subsitution) ব্যালান্স। স্প্রিং নিক্তি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

সম্প্রতি অতি উন্নত মানের ইলেক্ট্রনিক নিক্তি আবিষ্কৃত



www.pathagar.com

হয়েছে। এই নিক্তি যান্ত্রিক নিক্তি থেকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং ক্ষুদ্র পরিমাপও নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, বস্তুর প্রকৃত ভর এবং এতে শোষিত পানির পরিমাণও বলতে পারে। একটি ইলেক্ট্রনিক স্ক্যানার বস্তুর ভরের প্রভাবে পাল্লাটির বিচ্যুতির পরিমাণকে বিবর্ধিত করে কম্পিউটারের (দ্র) সাহায্যে তা বিভাজন করে। এসব নিক্তির একটি ডিজিটাল ডিস্‌প্লে বোর্ড থাকে, তাতে সঠিক ওজন/ভর পরিমাপের সংখ্যাটি লেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি কাগজে ছাপা হয়ে যায়।

স. রা.

**নিগ্রো** আফ্রিকা দ্র

**নিজাম** তেলেঙ্গানা কৃষক-বিদ্রোহ দ্র

**নিজামুদ্দিন আউলিয়া** [১২৩৬—১৩২৫]

যেসকল ওলি-দরবেশ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া বিশিষ্ট।

নিজামুদ্দিনের পৈতৃক নিবাস মধ্য-এশিয়ার বোখারায়। তাঁর জন্ম ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাদাউন শহরে। শৈশবে পিতৃহারা নিজামুদ্দিন মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় লালিতপালিত হন এবং অল্প বয়সেই কুরআন (দ্র) -হাদিস (দ্র) ও ইসলামের অন্যান্য শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পর উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি দিল্লি (দ্র) গমন করেন। তাঁর মেধা, প্রতিভা, সর্বোপরি তাঁর প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের আশায় তৎকালীন ভারত-বিখ্যাত দরবেশ ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকরের নিকট দীক্ষা নেন এবং সাফল্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর দিল্লির একটি মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। ক্রমে তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত ফার্সি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসপুর মহল্লাস্থ নিজ আস্তানায় ইন্তেকাল করেন। এখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

মু. মা.

**নিট্‌শে, ফ্রিড্‌রিশ্ ভিল্‌হেল্‌ম্** [১৮৪৪—১৯০০]

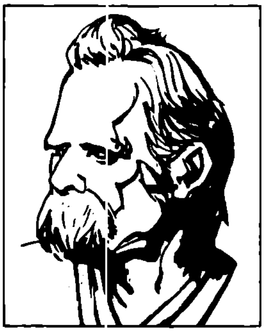

ভাববাদী জার্মান দার্শনিক। ১৮৪৪ সালের ১৫ই অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্টান্ট পুরোহিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বন্ ও লাইপৎসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং আইনের সমস্যাবলিতেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায়।

১৮৬৯ সালে নিট্‌শে (Friedr.ch Wilhelm Nietzsche) তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই বাজেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষাবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে ১৮৭৯ সালে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৮৮৯ সালে তিনি গুরুতর মনোরোগে আক্রান্ত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ১৮৭০ সালে তিনি স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিট্‌শের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তাঁর দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতি-মানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিস্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যে কোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসাবে তাঁর মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে।

নিট্‌শের দর্শনের মুলকথা হল—প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা আর বাঁচার সংগ্রাম চলছে। এর ফলে দুর্বলের ওপর সবল ক্ষমতা বিস্তারে আগ্রহ বোধ করে। তাই শোষক, শোষিত বা দাস, প্রভু এগুলো প্রকৃতিগত ব্যাপার। জীবমাত্রেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল শোষণ করা আবার বাঁচার সংগ্রামে পরাজিত পক্ষের অনিবার্য নিয়তি হল দাস হওয়া। পরাজিতের পক্ষে দাসত্ব স্বীকার করার অর্থ হল



www.pathagar.com

বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া। তিনি বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণীকে বশে রাখতে হলে তার মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এবং পুঁজিবাদী প্রভুদের মধ্যে প্রভুত্বের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিট্‌শের দর্শনের প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাঁর রচনাবলিতে কবিত্বময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি অসুস্থ মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। 'জরথুস্ত্রের বাণী', 'ভালমন্দের অতীত', 'নীতির বিবর্তন' এবং 'খ্রিস্ট বিরোধী' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নিট্‌শে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট পরলোক গমন করেন।

সুজ. ব.

**নিধুবাবু** [১৭৪১—১৮৩৯]

বিখ্যাত বাঙালি কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। বাংলায় টপ্পা (দ্র) রচনার পথিকৃৎ। প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলায় তাঁর মামার বাড়িতে জন্ম। পিতা কলিকাতা শহরনিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশবেই তাঁর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সি ছাড়া নিধুবাবুকে ইংরেজি শেখানো হয়। তিনি ছিলেন প্রথম দিককার ইংরেজি-জানা বাঙালি। সঙ্গীতের প্রতি নিধুবাবু ছোটবেলা থেকেই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো গুরুর অধীনে সঙ্গীত শেখার সুযোগ পান নি তেমন। নিজের চেষ্টাতেই গাইতেন। সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পান তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারের চাকুরি নিয়ে বিহারের ছাপরায় যান ও সেখানে আঠারো বছর যাবৎ বসবাস করেন। সে সময় ছাপরা ছিল একটি সঙ্গীতকেন্দ্র। রাগসঙ্গীতে পারদর্শী কয়েক জন ওস্তাদ সেখানে থাকতেন। তাঁদের কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিধুবাবু প্রথমে খেয়াল (দ্র) ও পরে টপ্পায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। টপ্পাই ছিল তাঁর অতি প্রিয় সঙ্গীতরীতি, টপ্পাতেই নিজেকে প্রগাঢ়ভাবে শিক্ষিত করে তোলেন। হিন্দি টপ্পা গাইতে গাইতে তাঁর মনে হত, বাংলায় এমন গান থাকলে ভাল হয়। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষাপ্রীতির প্রথম গান 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা / বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ?' গানটি তাঁরই রচনা। নিধুবাবু বাংলায় টপ্পা গান রচনা করতে লাগলেন। ১৭৯৪ সালে চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে নিধুবাবু কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং টপ্পা গান রচনা ও সেই গান প্রচার করে জীবন কাটাবেন বলে স্থির করেন। সুকণ্ঠ গায়ক নিধুবাবু শীঘ্রই এই গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তে আরো অনেক বাঙালি কবি ও সঙ্গীতবিদ টপ্পা রচনায় মনোনিবেশ করেন। সারা ঊনবিংশ শতক জুড়ে বাংলায় টপ্পা রচনার এক প্রচণ্ড প্রবাহ বয়ে যায়। টপ্পার সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গীতরীতির মিশ্রণে বাংলায় নানা সঙ্গীতরীতি গড়ে ওঠে। এই সব সঙ্গীতরচয়িতার ওপর নিধুবাবুর গভীর প্রভাব ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) নিধুবাবু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। নিধুবাবু হিন্দি টপ্পার সঙ্গীতকলাকে হুবহু অনুসরণ করেন নি। তিনি বাংলা টপ্পার জন্য একটি উপযোগী সঙ্গীতরূপ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে সকল বাঙালি টপ্পা রচয়িতাই তাঁর সঙ্গীতরূপ অনুসরণ করেন। গানের বিষয়বস্তুতেও নিধুবাবু যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্বেকার বাংলা গান ছিল ভক্তিসঙ্গীত। প্রধানত রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে গান রচনা করা হত। সেই সঙ্গে ছিল শক্তিদেবী কালীর (দ্র) মাহাত্ম্য বর্ণনা করে গান রচনার ধারা। গীতরচয়িতারা ছিলেন সাধক কবি। নিধুবাবু একেবারে নতুন একটি ধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর গানে দেবদেবীর কোনো প্রসঙ্গ এল না। তিনি মানুষের মনের কথাটি বলার জন্য গান রচনা করলেন। সেই থেকে মানুষের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার উপযোগী বাংলা গীতিকবিতার একটি ধারা গড়ে উঠল। নিধুবাবু হলেন বাংলা গীতিকবিতার মানবিক যুগের স্রষ্টা। তিনি বাংলা আখড়াই গানেরও নতুন রূপ দিয়েছিলেন। ৯৭ বছর বয়সে নিধুবাবু নিজেই তাঁর গান সঙ্কলন করে 'গীতরত্ন' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় নিজগৃহে তিনি মারা যান।

ক. গো.



www.pathagar.com

## নিবেদিতা, ভগিনী [ ১৮৬৭-১৯১১]

ভগিনী নিবেদিতার পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্‌। জন্ম আয়ারল্যাণ্ড। বাবা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল্‌ জাতিতে স্কচ এবং মা ইসাবেল ছিলেন আইরিশ। ভারতীয় হিন্দুধর্ম (দ্র) সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের (দ্র) বাণী মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে কলিকাতা চলে আসেন। ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে তিনি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'নিবেদিতা' নামকরণ করেন। ১৮৯৮-৯৯ সালে কলিকাতায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে রামকৃষ্ণ (দ্র) মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), জগদীশচন্দ্র বসু (দ্র), শ্রীঅরবিন্দ (দ্র) প্রমুখ মনীষীসহ বাংলার বহু বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯১১ সালে ভারতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'The Wave of Indian Life' , 'The Master as I saw him' ইত্যাদি।

মে. খা.

## নিম

মাঝারি আকারের এই সুন্দর গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *আজাদারাক্তা ইণ্ডিকা (Azadarachta indica A.)*, গোত্র মেলিয়াসি (Meliaceae)। এ ছাড়া ঘোড়ানিম বা মহানিম, সুরভি নিম বা কাঠনিম, ঘোড়করঞ্জ বা মহারুক প্রভৃতি তিন রকম নিম আছে। এদের মধ্যে নিম ও মহানিম ছাড়া বাকিগুলো মেলিয়াসি পরিবারভুক্ত নয়।

নিমের পাতা যৌগিক। কাণ্ড দীর্ঘ, সরল, বাকল ধূসর, অমসৃণ। পাতা বিশিষ্ট ভঙ্গিতে কাস্তের মতো বাঁকা। করাতের ধারের মতো পাতার প্রান্তভাগ দাঁতালো। এটি নিম গোত্রের বৈশিষ্ট্য। সারা বছর এর পাতা গজায়। পাতা ও ডাল ভাঙলে আরো বেশি গজায়। সারা বছর এর পাতা ঝরে, লোকে খায়। আর বসন্তে প্রায় সব পাতা ঝরে যায়, কিন্তু তার পরপরই কচি পাতার উজ্জ্বল তামাটে রঙ ডালে ডালে উঁকি দেয়। পাতা গজাবার পর সারা গাছে ফুলের বন্যা আসে। ফুল খুব ছোট হলেও অজস্র মঞ্জরির সৌন্দর্যে ভরে যায়। গন্ধও মধুর। এমন আকর্ষণীয় ও উপকারী বলে লোকে ঘরের দক্ষিণ পাশে নিমগাছ লাগায়। ফুলের রঙ শাদা, গুচ্ছবদ্ধ, পরাগচক্র হলুদ। ফল ডিম্বাকৃতি। সব মিলে নিম

সুন্দর তরুরাজির অন্যতম। নিমফল পাকলে মিষ্টি হয়, পাখির প্রিয় খাদ্য। সন্ন্যাসীরা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য পাতা ও ফল খায়, গৃহস্থেরা খায় রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বসন্তে কচি পাতা খুব উপকারী। কফ-শ্লেষ্মা, ডায়াবেটিস (দ্র), দৃষ্টিক্ষীণতায় ও চোখে পিঁচুটি হলে নিম পাতা উপকারী। রাতকানা রোগে (দ্র) নিমফুল ভাজা খাওয়া ভাল। ঘুসঘুসে জ্বরে, অজীর্ণে, যকৃতের (দ্র) ব্যথায়, বমিতে, অম্লরোগে, রক্তদুষ্টিতে ও পাঁচড়ায়, জণ্ডিসে (দ্র), কৃমি, অরুচিতে রোগে (দ্র) মাঢ়ীর ক্ষতে নিম মহৌষধ। নিমের দাঁতন অনেকে ব্যবহার করেন। নিম থেকে টুথপেস্টও তৈরি হয়।

নিম অশুভকে দূর করে বলে অনেকের ধারণা। এ জন্য অনেকে বসন্ত ও গ্রীষ্মে নিমের ডাল দরজায় গুঁজে রাখে। রাজস্থানে বরযাত্রায় বরের হাতে নিমের ডাল থাকে। মায়ানমার (দ্র) , বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতে (দ্র) সর্বত্র নিম জন্মায় এবং এটি এখানকার স্বাভাবিক গাছ।

বি. ব.



www.pathagar.com

## নিয়ন (neon)

নিয়ন একটি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, নিষ্ক্রিয় গ্যাস (দ্র)। এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন Ne, পারমাণবিক ওজন ২০.১৮৩, পারমাণবিক সংখ্যা ১০। বায়ুমণ্ডলে (দ্র) অতি সামান্য পরিমাণে (শতকরা ০.০০১৮ আয়তনে) এই গ্যাস থাকে। গ্যাসটি একটি পরমাণুযুক্ত। নিম্নচাপে গ্যাসটির মধ্যে তড়িৎ পরিচালনা করলে কমলাভ লাল রঙের আলো নির্গত হয়। এই আলোর নাম 'নিয়ন সাইন (neon sign)। নিয়ন বাতির বাল্ব সাধারণত লম্বা নলের মতো হয়। বিজ্ঞাপনের উপযোগী নিয়ন বাতির নল বাঁকিয়ে নানা আকারের করা হয়। এই নলের দুই প্রান্তে দু'টি ধাতব চাকতি থাকে। এই চাকতি দুটো হল নিয়ন বাতির দুই তড়িৎপ্রান্ত। নলকে বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে অল্প চাপে নিয়ন গ্যাস ভরে রাখা হয়। এই গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়। এই তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলে নিয়ন গ্যাসের তড়িতাবিষ্ট অণুগুলি ধাতব চাকতি দু'টির গায়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। আর তার ফলে সৃষ্টি হয় উজ্জ্বল কমলাভ লাল রঙের সুদৃশ্য নিয়ন আলো।

আ. হ. খ.

## নিয়াজ মোর্শেদ [১৯৬৬— ]

বাংলাদেশের (দ্র) সবচেয়ে খ্যাতিমান দাবাড়ু। সারা পৃথিবীর (দ্র) দাবাবিশ্বকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। নিয়াজ মোর্শেদ দশম অঞ্চলের প্রথম গ্র্যাণ্ডমাস্টার। একের পর এক সাফল্যের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছেন বিশ্বখ্যাতি। তাঁর সাফল্যের কারণেই বাংলাদেশ দাবাবিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

*কলিকাতায় এক আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় নিয়াজ মোর্শেদ*

১৯৬৬ সালের ১৩ই মে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন নিয়াজ মোর্শেদ। ছোটবেলা থেকেই দাবায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ করা যায়। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্র্যাণ্ডমাস্টার লুতিকভের সঙ্গে ড্র করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। এত কম বয়সে বাংলাদেশের আর কোনো দাবাড়ু এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি।

১৯৮৭ সালে নিয়াজ মোর্শেদ বিশ্বদাবার বাছাই পর্বের খেলায় যুগ্ম রানার্স আপ হয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব অর্জন করেন। গ্র্যাণ্ডমাস্টার হবার জন্য প্রয়োজনীয় দুটো নর্ম্ (norm) তিনি অর্জন করেন ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৪ সালে প্রথম নর্ম অর্জন করেন হংকং-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নোভাক কমনওয়েলথ দাবা প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় নর্ম অর্জন করেন ভারতের (দ্র) কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আলেখিন টাটা দাবা প্রতিযোগিতায়।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাসেল্স-এর বিশ্বদাবা সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সভায় গ্র্যাণ্ডমাস্টার হিসাবে নিয়াজ মোর্শেদের নাম ঘোষাণা করা হয়।

নিয়াজ মোর্শেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অধ্যয়ন শেষ করে বর্তমানে দেশে অবস্থান করছেন।

টি. কি.


www.pathagar.com

**নিয়াণ্ডার্থাল্ মানব** (Neanderthal man)

পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগের মানুষ। ইউরোপ (দ্র), এশিয়া (দ্র) এবং আফ্রিকার (দ্র) বিভিন্ন অঞ্চলে এরা বসবাস করত। অনেক বিজ্ঞানী এদের হোমো সেপিয়ান্সদের (দ্র) পরের স্তরের মানুষ বলে নির্দেশ করেন। জার্মানির ডুসেলডোর্ফ অঞ্চলে নিয়াণ্ডার গর্জ্ নামক স্থানে এদের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় বলে এরা নিয়াণ্ডার্থাল্ মানুষ নামে পরিচিত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এদের মাথার একটি খুলি পাওয়া যায়। এর পর চল্লিশটি বিভিন্ন স্থানে এদের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

নিয়াণ্ডার্থাল্ মানুষ সোজাভাবে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারত। উচ্চতায় মোটামুটি পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি (১৫৭ সেন্টিমিটার)। খাড়াভাবে চলাফেরা করলেও এদের মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ত এবং হাঁটু সামান্য বেঁকে যেত। হাড় ছিল শক্ত। দুই ভ্রূর মাঝখানে ভাঁজ ছিল। দাঁত শক্ত। মস্তিষ্কের আয়তন আধুনিক মানুষের মতো (১৪০০ ঘন সেন্টিমিটার)। তা সত্ত্বেও এরা দক্ষতার সঙ্গে হাতের ব্যবহার কিংবা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের চেয়ে শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভর করত বেশি। তবে এরা ছিল ভাল শিকারী। এরা ছিল পেশিবহুল ও বলিষ্ঠ গড়নের।

জীবজন্তু শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর সময় নিয়াণ্ডার্থাল্ মানুষ সাময়িকভাবে আশ্রয় নিত নানা স্থানে। কখনো কখনো গুহাতেও বাস করত। রকমারি পাথর থেকে নানা রকম অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করার কায়দা এরা রপ্ত করেছিল। পশমের পোশাক এবং সেলাই করার সুঁচ তৈরি এরা জানত। কোনো কোনো নিয়াণ্ডার্থাল্ মানুষ কবর দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এদের জীবনের শেষ দিকে চতুর্থ তুষার যুগের শুরু। ফলে এরা গুহায় বাস করতে বাধ্য হয়।

সৈ. আ. ই.

নিরক্ষরেখা  বিষুবরেখা  দ্র

**নিরুপমা দেবী** [১৮৮৩—১৯৫১]

নিরুপমা দেবীর জন্ম ১৮৮৩ সালের মে মাসে। তাঁর জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমাশহর বহরমপুরে। নিরুপমা দেবীর পিতার নাম নফরচন্দ্র ভট্ট। তাঁর বাল্যজীবন কাটে ভাগলপুরে। অল্পবয়সে তাঁর স্বামী মারা যান। বৈধব্যজীবনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য লেখালেখি শুরু করেন। এই কাজে তাঁকে প্রেরণা দান করেন তাঁর বড়ভাই বিভূতিভূষণ ভট্ট। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র)-ও তাঁকে অনুপ্রেরণা দান করেন। আরো এক জন নিরুপমা দেবীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সুলেখিকা অনুরূপা দেবী। বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্র একটি হাতেলেখা পত্রিকা বের করতেন। নিরুপমা দেবী ঐ পত্রিকায় লিখতেন। এভাবেই লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে গদ্য লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। অনুরূপা দেবী তাঁকে উপন্যাস রচনা করায় উৎসাহিত করেন। নিরুপমা দেবী রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'উচ্ছৃঙ্খল'। তিনি গান ও কবিতাও রচনা করেন। তাঁর গান বাংলার স্বদেশী যুগে পরমাগ্রহে গীত হত। নিরুপমা দেবীর বহু কবিতা গান হিসাবে গাওয়াও হয়েছিল। এসব গান ও কবিতা রচনায়



www.pathagar.com

তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর উপন্যাসগুলোও সুপরিচিত। তাঁর উপন্যাসের বিষয় ছিল ভালবাসা ও স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপনের নানা সমস্যা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। নিরুপমা দেবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিদি'। সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'-তে 'দিদি' উপন্যাসটি ছাপা হয় ১৯১৯-২১ সালে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'আলেয়া', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'বন্ধু', 'পরের ছেলে', 'আমার ডায়েরী', 'দেবত্র', 'যুগান্তরের কথা' এবং 'অনুকর্ষ'। তাঁর উপন্যাসগুলোর, বিশেষ করে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'দিদি'র, ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উল্লেখ করার মতো। গদ্য রচনায় তাঁর যে একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় বেশি নয়, এগুলোতে বিষয়ের বৈচিত্র্যও তেমন নেই। কিন্তু তাঁর রচনাকৌশলের দক্ষতা লক্ষ করবার মতো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) তাঁকে ১৯৩৮ সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক প্রদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি আরেকটি পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'(দ্র) প্রদান করেন। ১৩৪৩ বাংলা সনে তিনি বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্মানিত হন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। এগুলোর মধ্যে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উল্লেখযোগ্য। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' সিনেমায় রূপ পেয়েছিল ১৯৩৬ সালে। তাঁর একাধিক উপন্যাস মঞ্চেও অভিনীত হয়েছিল। শেষ জীবনে নিরুপমা দেবী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৭ই জানুয়ারি ১৯৫১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

**নিরো** [৩৭—৬৮]

রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত সম্রাট নিরো (Nero Claudius Caesar) তাঁর মাত্র চৌদ্দ বৎসরের (খ্রি. ৫৪-৬৮) শাসনকালে পৃথিবীর (দ্র) অন্যতম নৃশংস রাজা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। সম্রাট জুলিয়াস সিজার (দ্র)-এর রাজবংশে ইনি ছিলেন শেষ সম্রাট, তবে ইনি পূর্ববতী সম্রাট ১ম ক্লাউদিউস্ (ইংরেজিতে ক্লডিয়াস উচ্চারণ করা হয়)-এর (শা. ৪১-৫৪) সন্তান ছিলেন না। সম্রাট কালিগুলার (Caligula : শা. ৩৭-৪১) বোন ২য় আগ্রিপ্পিনা সম্রাট ১ম ক্লাউদিউস্‌কে বিবাহের পর নিরোকে পোষ্যপুত্র নিতে বাধ্য করেন। ফলে ক্লাউদিউসের মৃত্যুর পর নিরো সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

*রোম পুড়ছে, সম্রাট নিরো তা-ই দেখছেন.....*

নিরো বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সেনেকা (দ্র)-র ছাত্র ছিলেন; কিন্তু অহঙ্কার, উচ্চাশা, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছিল। নিজের মা, স্ত্রী ও গুরু সেনেকাসহ অজস্র মানুষকে নিরো হত্যা করেছিলেন। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়; অনেকেই মনে করেন যে সম্রাট নিজে সেই আগুন লাগিয়েছিলেন। কথিত আছে, জ্বলন্ত রোমের লেলিহান শিখা দেখতে-দেখতে ইনি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ও বাঁশি বাজিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অমাত্যবর্গ-সেনাপতি সকলে মিলে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নিরো আত্মহত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

হা. মা.



www.pathagar.com

## নির্বাণ

বৌদ্ধধর্ম (দ্র) ও দর্শনের মূল ভিত্তি হল–অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ও নির্বাণ। নির্বাণ লাভই বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য। নির্বাণ অনুভূতিজ্ঞাপক। একে শুধু বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে বোঝার জন্য বলা হয় :

১. পুনর্জন্মের নিরোধ হওয়াই নির্বাণ।

২. সব রকম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভই নির্বাণ।

৩. তৃষ্ণার বিনাশই নির্বাণ।

গৌতম বুদ্ধের (দ্র) মতে মানুষকে ভাল কাজের সুফল ও মন্দ কর্মের কুফল ভোগ করতেই হবে। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, অলৌকিক কোনো শক্তিও তা মাফ করে দিতে পারে না। আর ভাল কাজ করে রাগ, দ্বেষ ও মোহ থেকে বিমুক্ত হয়ে নির্বাণ-প্রাপ্ত হলে নতুন তৃষ্ণা বা বাসনার আর সৃষ্টি হয় না। অন্য ভাবে বলা যায়, তৃষ্ণাকে ক্ষয় করে মুক্ত হতে পারলে নির্বাণ লাভ সম্ভব। নির্বাণ পেতে হলে চারটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়–স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব (দ্র)।

নির্বাণ আনন্দময়। দুঃখের পরিসমাপ্তির সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে। দার্শনিক নাগার্জুন (দ্র) নির্বাণকে বলেছেন 'শূন্যতা'। এই শূন্যতা সাধারণ শব্দ নয়, গভীর অর্থজ্ঞাপক। নির্বাণ অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান (দ্র)। এতে সকল দুঃখের অবসান হয়। নির্বাণ মানুষের জীবনকে কল্যাণ ও মঙ্গলে ভরে দেয়, এনে দেয় জীবনের পরম পরিপূর্ণতা। নির্বাণ লাভ করলে পৃথিবীতে (দ্র) আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

বি. ব.

## নির্বীজন

স্টেরিলাইজেশন (Sterilisation), ডিসিন্‌ফেকশন (Disinfection) অ্যান্টিসেপ্‌সিস, (Antisepsis) ইত্যাদি শব্দের বাংলা প্রতিরূপ হিসাবে নির্বীজন শব্দটিই প্রচলিত, যদিও ইংরেজি শব্দগুলোতে কিছুটা অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। স্টেরিলাইজেশন বলতে কোনো বস্তুকে অণুজীব-মুক্ত করার পদ্ধতি বোঝায়, আর ডিসিন্‌ফেকশনের অর্থ রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। অ্যান্টিসেপ্‌সিস্ শব্দটিও শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পার্থক্য খুব একটা বিবেচনায় আসে না।

নির্বীজন প্রক্রিয়ার প্রধান ব্যবহার অণুজীববিদ্যায়, শল্যচিকিৎসায়, পানি (দ্র) ও পানীয় তরল বিশোধনে এবং খাদ্য ও ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে। উদ্দেশ্য জীবাণুদূষণ প্রতিরোধ এবং জীবাণুমুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণ।

বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে নির্বীজনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। যেমন ভৌত পদ্ধতিতে তাপ (শুষ্ক ও আর্দ্র) বিকিরণ, অতিশাব্দিক কম্পন ইত্যাদি এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে।

কাচের সিরিঞ্জ, টেস্টটিউব, ফ্লাস্ক, পিপেট, তুলার গজ–ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি, অস্ত্রোপচারের ছুরি, কাঁচি ও অনুরূপ যন্ত্রপাতি 'হট-এয়ার ওভেনে' ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস শুষ্কতাপে ১ ঘন্টা রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। আর্দ্রতাপে নির্বীজনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি ফুটন্ত পানিতে বিশোধনযোগ্য যন্ত্রপাতি ১০ থেকে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা। তবে অটোক্লেভ (দ্র) নামক যন্ত্রে উচ্চচাপে বাষ্পের সাহায্যে নির্বীজন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। জীবাণুবিদ্যায় ও শল্যচিকিৎসার কাজে ব্যবহার্য জিনিসপত্র নির্বীজনের কাজে অটোক্লেভই ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, এক্স-রে ও অন্যান্য আয়োনাইজিং বিকিরণ (দ্র) নির্বীজনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে অ্যাসিড (দ্র), অ্যালকালি (দ্র), আয়োডিন (দ্র), ফেনল, ফর্ম্যাল্ডিহাইড (দ্র), অ্যালকোহল (দ্র), জারক ও বিজারক পদার্থ ইত্যাদি। ক্লোরিন বা ফর্মালিন গ্যাসও বায়ু নির্বীজনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

রু. হা.

নিলয় রক্তসংবহনতন্ত্র দ্র

## নিষেক ক্রিয়া

যৌন প্রজননের একটি পর্যায়। এ পর্যায়ে পুংজননকোষ বা শুক্রাণু স্ত্রীজননকোষ বা ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং এর ফলে উভয় জননকোষের ক্রোমোজোম (দ্র)-সমূহের মিশ্রণ ঘটে। নিষেক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ (দ্র) কিংবা প্রাণীর (দ্র) ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং পরিণত জীব গঠনের পরবর্তী ধাপগুলো



www.pathagar.com

শুরু হয়।

প্রাণীদের মধ্যে দু'রকমের মিলন এবং নিষেক ক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে বহির্নিষেক ক্রিয়া ঘটে। এ ধরনের নিষেক ক্রিয়া ঘটানোর জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ প্রাণী প্রথমে কাছাকাছি আসে এবং তারা পানিতে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু ছেড়ে দেয়। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে নিষেক ক্রিয়া ঘটে।

দ্বিতীয় ধরনের নিষেক ক্রিয়াকে অভ্যন্তরীণ নিষেক ক্রিয়া বলা হয়। ভূমিতে বাসকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ এবং অনেক কৃমির মধ্যে এ ধরনের নিষেক ক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। অভ্যন্তরীণ নিষেক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং পুরুষ প্রাণীর দৈহিক মিলনের মাধ্যমে পুংজননাঙ্গ থেকে নিঃসৃত শুক্রাণু স্ত্রী প্রজননাঙ্গে স্থাপিত হয়।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণত পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপিত হয়। পরাগরেণু থেকে দু'টি শুক্রকোষ তৈরি হয়। এদের একটি শুক্রকোষ গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

সা. এ.

**নিষ্ক্রিয় গ্যাস** গ্যাস, নিষ্ক্রিয় দ্র

**নিহিলিজ্‌ম্‌** নৈরাজ্যবাদ দ্র

## নীতিকথা

নীতিকথা অথবা নৈতিক দর্শন হচ্ছে ভাল-মন্দের নিরিখে মানবকার্যাবলির আলোচনা। ব্যক্তিমানুষ কিংবা সামাজিক দলগুলোর কার্যকলাপই নীতিকথার বিষয়বস্তু যোগায়। আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মকে অন্যটির চেয়ে পৃথক করে দেখি। যেমন— স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং অন্যটি অনিচ্ছাকৃত বা অস্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ। নীতিশাস্ত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করে। মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজবিদেরাও এ ধরনের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করে থাকেন।

মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যকলাপের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে নীতিশাস্ত্রবিদ বা নীতিশাস্ত্রের ছাত্রদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তাঁরা জানতে চান, জ্ঞান (দ্র) জিনিসটি সেগুলোর ভাল-মন্দের নিয়ামক এবং তাদেরকে নৈতিক গুণ দান করে। মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে, সে জিজ্ঞাসু। কোনটি করা উচিত আর কোনটি করা উচিত নয় সে বিষয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে। শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করতে হয় না, (স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের ক্ষেত্রে) প্রশ্ন করতে হয়— আমাদের কি ঘুষ নেওয়া উচিত কিংবা সন্তানদের সঙ্গেই বা আমরা কেমন আচরণ করব সে বিষয়ে। কিছু কিছু কাজ পূর্বনির্ধারিত নয়। কিন্তু সেগুলো আমাদের নৈতিক বাছবিচারের অন্তর্ভুক্ত।

নীতিশাস্ত্র মানুষের নৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পছন্দ এবং ভাল-মন্দ আচরণের ধরনগুলো সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলোচনা করে। এটি সঠিক জীবনপদ্ধতির বিজ্ঞান। তবে এ ধরনের নৈতিক কর্মকাণ্ড বা জীবনাচরণ এ নয়। নীতিশাস্ত্র আমাদের কিছু সাধারণ বাস্তব জ্ঞান দেয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমাদের নিজেদেরই নিতে হয়, যার মাধ্যমে ঐ জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়।

আ. কা.

## নীল বিদ্রোহ

ফরাসি বণিক জঁলিয়ে লুই বোর্নাদ ১৭৭২ সালে বঙ্গদেশে প্রথম নীলচাষ আরম্ভ করেন। তিনি হুগলি জেলার তালডাঙ্গায় একটি কুঠি স্থাপন করেন। তখন ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল। নীলচাষ খুব লাভজনক দেখে ইংরেজেরাও এই চাষে উদ্যোগী হয়।

১৭৮৮ সালে কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে বাংলাদেশের নীল ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যে নীলচাষ ব্যাপকতা লাভ করে। নদীয়া, কুষ্টিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, বীরভূম, যশোর, হাওড়া, পাবনা ও ফরিদপুর জেলায় নীলের চাষ শুরু হয়। ১৭৯৫ সালে যশোরের রূপদিয়ায় প্রথম নীলকারখানা স্থাপিত হয়। উনিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশের নীল বিশ্ববাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ইংরেজেরা দু'ভাবে নীলচাষ করত। একটি ছিল আবাদী প্রথা। এই নিয়মে নীলকরেরা দিনমজুর খাটিয়ে নিজেদের খরচে ও তত্ত্বাবধানে চাষ করাত। পুরুষ মজুরেরা পেত তিন টাকা আর মহিলা ও শিশু মজুরেরা পেত দু' টাকা।



www.pathagar.com

আরেকটি ছিল বারতী প্রথা। এই নিয়মে নীলকরদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চাষী নিজের জমিতে নীলচাষ করত। চুক্তি অনুযায়ী চাষী কিছু অগ্রিম টাকা পেত। কিন্তু চুক্তির শর্ত ছিল খুব খারাপ। এতে চাষীদের ভীষণ ঠকানো হত। তা ছাড়া নীলকরেরা পাইক-বরকন্দাজদের দিয়ে জোর করে চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করত। আর যে দরে তারা নীলের মূল্য দিত তা ছিল বাজারদরের চেয়ে অনেক কম। অথচ নীল উৎপাদনের জন্য চাষীদের খরচ হত এর চেয়ে বেশি। উপরন্তু যেসব ফসল উৎপন্ন করে বেশি লাভ হয়, চাষীরা সেসব ফসল লাগালে তা লাঙ্গল চালিয়ে নষ্ট করে নীলচাষ করানো হত। ফলে দেখা গেছে, ঐ অগ্রিম কিছু টাকা ছাড়া নীলচাষীরা আর তেমন কিছু পেত না।

বছরের পর বছর বঙ্গদেশের চাষী এভাবে নীলকরদের নিপীড়ন সহ্য করে। এক সময় বিরোধ বেধে যায়। ১৮৫৯-৬০ সালে তারা বিদ্রোহ করে। যশোর জেলার চৌগাছা গ্রামের চাষীরা প্রথমে সংঘবদ্ধ হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আর নীলচাষ করবে না। নীলকরেরা রাতের অন্ধকারে চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ করে, লুটপাট করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। এক জন চাষী নিহত হয়। কিন্তু চাষীদের দমন করা যায় নি। ১৮৬০ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে পাবনা, যশোর, নদীয়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, বারাসত ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে।

এই বিদ্রোহের জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি। প্রথম দিকে চাষীরা আদালতে বিচার দিত। কিন্তু কখনো তারা ন্যায়বিচার পায় নি। ফলে দীর্ঘদিনের নির্যাতন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। বিদ্রোহ চলাকালে সরকার ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য নীল কমিশন গঠন করে।

কমিশন স্বীকার করেছিল যে নীলচাষীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন নীলচাষ বন্ধ করার সুপারিশ করে নি। কিন্তু ১৮৮০ সালে কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ক্রমশ নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

সে. হো.

**নীলমণি ঠাকুর** [ ? —১৭৯১]

বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ। নীলমণি ঠাকুরের জন্মতারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তিনি আঠারো শতকে কলিকাতার (দ্র) দক্ষিণে গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়রাম। তাঁর বংশগত উপাধি ছিল কুশারী। তাঁর এক পূর্বপুরুষের নাম মহেশ্বর। তাঁর ভাইয়ের নাম শুকদেব। তাঁদের গ্রাম ছিল যশোরের বারোপাড়া। তাঁরা গ্রাম ছেড়ে কলিকাতার গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতামহের নাম ছিল পঞ্চানন। ইনি 'ঠাকুর মশাই' বলে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে 'ঠাকুর' নামটি তাঁদের বংশের পদবি হিসাবে প্রচলিত হয়ে যায়।

নীলমণি ঠাকুরের পিতামহ পঞ্চানন যেহেতু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজী কারবারে কাজ করতেন, সেহেতু বিদেশী বণিক ও জাহাজের কাপ্তানেরাও তাঁদের ঠাকুরই বলত। পদবী যাই হোক, কুশারী কিন্তু মুছে গেল। নীলমণি ঠাকুর নাম চালু হয়ে গেল। নীলমণি নিজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী কাজে নিযুক্ত হন। রাজস্ব আদায়ের নতুন বন্দোবস্ত করে তিনি সুনাম অর্জন করেন। ফলে তিনি কালেক্টরের সেরেস্তাদারের কাজ পান। এ কাজ করে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। তাঁর ছোট ভাই দর্পনারায়ণও নানাবিধ ব্যবসা করতেন। তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এই অর্থই কাল হল। দু' ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। তখন বিষয়-সম্পত্তি দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। নীলমণি এক লাখ টাকা পান। এই টাকা পাওয়ায় তিনি দর্পনারায়ণকে পাথুরেঘাটার বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। যে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তাও দিয়ে দিলেন। নীলমণি জোড়া-বাগানে কিছু জমির সন্ধান পান। এ জমির মালিক ছিল বৈষ্ণচরণ শেঠ। নীলমণি তাঁর কাছ থেকে এক বিঘা জমি পেলেন। জমি পেয়ে বাড়ি করেন। এভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জন্ম হল—১৭৮৪ সালের জুন মাসে। এখন সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথ (দ্র) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

আ. হা.



www.pathagar.com

**নীহাররঞ্জন গুপ্ত** [১৯১১—১৯৮৬]

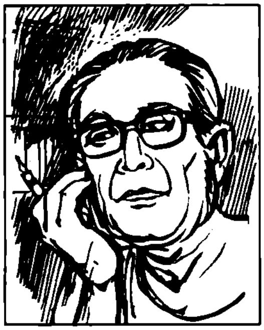

জনপ্রিয় রহস্যকাহিনীকার এবং চিকিৎসক। তিনি ১৯১১ সালের ৬ই জুন যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন কাটে কলিকাতায় (দ্র)। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং মেজর পদে উন্নীত হন। এই চাকুরির সূত্রে তিনি চট্টগ্রাম (দ্র) থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ঘুরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুদ্ধের পরে তিনি লণ্ডন (দ্র) থেকে ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করেছেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রহস্য-কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক ছিলেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র কিরীটি রায় বাংলা কিশোরসাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন। বড়দের ও ছোটদের উভয় ধরনের রচনায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো : 'কালোভ্রমর', 'মৃত্যুবাণ', 'কালনাগ', 'উল্কা', 'উত্তরফাল্গুনী', 'হাসপাতাল' 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী', 'লালুভুলু', 'রাতের রজনীগন্ধা', 'কিরীটি অমনিবাস' ইত্যাদি। তাঁর অনেক কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

সুজ. ব.

**নীহাররঞ্জন রায়** [১৯০৩—১৯৮১]

ইতিহাসবিদ, সাহিত্যসমালোচক ও শিল্পকলা-গবেষক পণ্ডিত। দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ছিলেন।

নীহাররঞ্জনের জন্ম ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে ১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে। পিতার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহে সম্পন্ন হয়। শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন ১৯২৪ সালে। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯২৬ সালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের শিল্পকলা শাখায় এম. এ. পাশ করেন রেকর্ড মার্কসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হয়ে গবেষণায় ব্রতী হন। ১৯২৮ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) ও মোয়াট পদক লাভ করেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয়। বৃত্তি নিয়ে ১৯৩৫ সালে ইউরোপ (দ্র) যান এবং হল্যাণ্ডের লাইডেন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি এবং লণ্ডন থেকে গ্রন্থাগার (দ্র) পরিচালনা বিষয়ে ডিপ্লোমা নেন। ১৯৩৭ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে শিল্পকলা বিষয়ে 'রানী বাগেশ্বরী' অধ্যাপক পদে বৃত হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই। ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে 'প্রফেসর এমিরিটাস্' করা হয়। সিমলায় প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক হয়ে ১৯৭৩ পর্যন্ত ঐ পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। ইউনেস্কোর (দ্র) প্রতিনিধি রূপে ব্রহ্মদেশ (দ্র) সরকারের সংস্কৃতি ও ইতিহাস-বিষয়ক উপদেশক ছিলেন ১৯৭৩-৭৬ সালে। আমৃত্যু দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন সারস্বত সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর কর্ম-কুশলতা ও সাংস্কৃতিক অবদানের স্বীকৃতিতে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই নীহাররঞ্জন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা করেছেন : আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র (দ্র) প্রতি, অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশ নিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র) প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি 'লিবার্টি' পত্রিকার সাহিত্যবিভাগ পরিচালনা করেছেন। আর এস পি (R S



www.pathagar.com

P= Revolutionary Socialist Party) দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দলের মুখপত্র 'ক্রান্তি'র পরিচালনামণ্ডলীতে ছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে (দ্র) অংশ নেওয়ায় কারাবরণ করেন।

নীহাররঞ্জনের অক্ষয় কীর্তি 'বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব' (১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১) এখন পর্যন্ত এক অনন্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলায় লেখা তাঁর ছোট্ট একটি বই 'সংস্কৃতি' অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। বলা দরকার, নীহাররঞ্জনের রচনার অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় রচিত এবং ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতসমাজে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সেসব গ্রন্থের উপরেই মূলত প্রতিষ্ঠিত। সেসবের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত বই : Brahminical Gods in Burma (১৯৩৩), Sanskrit Buddhism in Burma (১৯৩৬), Maurya Sunga Art (১৯৪৫), Theravada Buddhism in Burma (১৯৪৬), Idea and Image in Indian Art (১৯৭২), An Approach to Indian Art (১৯৭৪) ইত্যাদি।

এই প্রগাঢ় পণ্ডিত মানুষটি ১৯৮১ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে কলিকাতায় তাঁর বাসভবনে লোকান্তরিত হন।

হা. মা.

## নীহারিকা

ইংরেজি 'নেবুলা'র (nebula) বাংলা প্রতিশব্দ নীহারিকা। নেবুলা একটি লাতিন শব্দ (যার অর্থ পাতলা কুয়াশা) থেকে এসেছে। রাতের পরিষ্কার আকাশে কখনো কখনো কুয়াশাচ্ছন্ন স্পষ্ট আলোকখণ্ডের মতো কিছু বস্তু দেখা যায়। জ্যোতির্বিদেরা এদের নাম দিয়েছেন নীহারিকা। কতকগুলো নীহারিকা আমাদের ছায়াপথ (দ্র) বা তার কাছাকাছি দেখা যায়, এগুলোকে ধুলো ও গ্যাসের মেঘখণ্ড বলা চলে। এদেরকে গ্যাস-নীহারিকা বলে। এরা আকৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে। আর কিছু নীহারিকা আছে, যারা আমাদের ছায়াপথ থেকে অনেক দূরে। এরা আয়তনে এত বড় যে এদের মধ্যে সূর্যের (দ্র) মতো লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র থাকে। দূরত্বের জন্য নক্ষত্রগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এসব

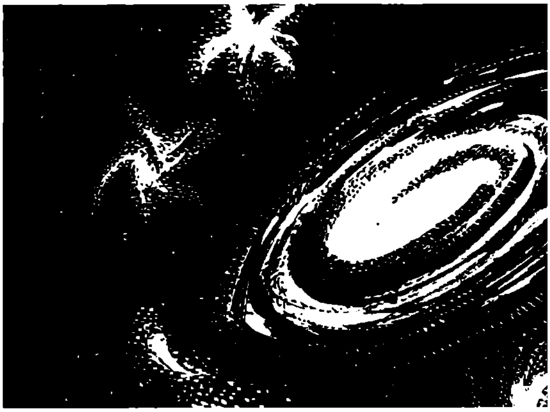

*নীহারিকা*

নীহারিকা গ্যাস-নীহারিকার মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। দূরবীনের সাহায্যে নীহারিকা অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। খালি চোখে দু'টি নীহারিকা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় : একটি অতি পরিচিত 'ওরায়ন' (Orion) নীহারিকা, এটি আমাদের ছায়াপথ বা তার কাছাকাছি অবস্থিত; আরেকটি অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda) নীহারিকা।

আমাদের ছায়াপথে যেসব নীহারিকা রয়েছে, তাদের কতকগুলোর নিজের আলো রয়েছে। এরা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কতকগুলো নীহারিকা অন্ধকার ও কালো বর্ণের। এদের নিজের আলো নেই। এরা নিকটবর্তী নক্ষত্র বা তারকা থেকে আলো নিয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

সে. শা.

## নূতনচন্দ্র সিংহ [১৯০০—১৯৭১]

সমাজসেবক ও এদেশে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ শিল্পের অন্যতম অগ্রণী পুরুষ। তিনি চট্টগ্রামের (দ্র) কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে রাউজান থানার গহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

নূতনচন্দ্রের প্রথম জীবন খুব বেশি সুখের ছিল না। ছয়



www.pathagar.com

বছর বয়সে শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে জগৎপুর পূর্ণানন্দ আশ্রমে থাকতে হয়। আট বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে ব্রহ্মদেশ (দ্র) যাত্রা করেন। এ সময় কিছুকাল তাঁকে মুদির দোকানে কাজ করতে হয়। এর পর আকিয়াব গিয়ে সাবান ও ঔষধ তৈরির ব্যবসায় যুক্ত হন।

নূতনচন্দ্র মধ্যবয়সে বিহারের কুণ্ডীধাম তীর্থ দর্শন করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে প্রথমে কুণ্ডেশ্বরী বিগ্রহ স্থাপন ও পরে কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় নামে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

নূতনচন্দ্র নারী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে তাঁর গ্রামে বিশাল এলাকা জুড়ে আবাসিক সুবিধাসহ বালিকা বিদ্যালয় ও কুণ্ডেশ্বরী মহিলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুণ্ডেশ্বরী ভবন ও ডাকঘর ইত্যাদিরও প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলাদেশের (দ্র) মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নূতনচন্দ্র ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল শহীদ হন।

সুজ. ব.

**নূর মোহাম্মদ শেখ (ল্যান্স নায়েক)** বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

**নূর হোসেন, শহীদ** [ ? —১৯৮৭]

'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'—ব্যতিক্রমধর্মী এই স্লোগানটি বুকে-পিঠে ধারণ করে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ঢাকার রাস্তায় নেমেছিলেন চব্বিশ বছর বয়সী সুঠামদেহী এক যুবক। নাম নূর হোসেন। বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়ার ঝাটিবুনিয়া গ্রামে তাঁদের আদিবাস। পিতা মুজিবুর রহমান ষাটের দশকে জীবিকার টানে ঢাকায় চলে আসেন। নূর হোসেনেরা তিন ভাই এক বোন। শ্রীনগর হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার পর জীবিকার দায়ে গাড়িচালনা শেখেন, রাজপথে গাড়ি চালান; মাঝে-মধ্যে শ্রমিকের কাজও করেন।

দিনটি ছিল ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সেদিন ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা সত্ত্বেও গুলিস্তান ও মতিঝিল এলাকায় একেক করে প্রতিবাদী

*শহীদ নূর হোসেন*

মানুষ জড়ো হতে থাকে। এক সময় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এই প্রতিবাদী সমাবেশে এসে হাজির হন নূর হোসেন। নিরস্ত্র নূর হোসেন জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বন্দি গণতন্ত্রের মুক্তি এবং স্বৈরতন্ত্র হটানোর দাবিতে স্লোগান তোলেন।

ঢাকার বনগ্রামবাসী এই সাহসী যুবকের প্রতিবাদ সহ্য করে নি স্বৈরাচারী সরকার। বুলেটের গুলিতে নিহত হন তিনি। জুরাইন গোরস্থানে সমাহিত করা হয় শহীদ নূর হোসেনকে। পোস্টারে অঙ্কিত হয় শহীদ নূর হোসেনের মুখ।

হা. র.

**নূরজাহান** জাহাঙ্গীর দ্র

**নূরুল আমিন** [১৮৯৩—১৯৭৪]

রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। জন্ম বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাহবাজপুরে, ১৮৯৩ সালে। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর ১৯২৪ সাল থেকে নূরুল আমিন ময়মনসিংহ জজ কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।



www.pathagar.com

নূরুল আমিন ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৪ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ আইনসভার স্পিকার ছিলেন।

১৯৪৮ সালে নূরুল আমিন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক (দ্র), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র) ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) নেতৃত্বে গঠিত বিরোধী দলীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা যুক্তফ্রন্টের (দ্র) মনোনীত প্রার্থীদের কাছে মুসলিম লীগ (দ্র) প্রার্থীদের সকলেই পরাজয় বরণ করেন। নূরুল আমিন নিজেও যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে নূরুল আমিন বিভিন্নভাবে সক্রিয় হলেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) বিরুদ্ধে পাক সামরিক জান্তাকে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে (১৯৭১) পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৪ সালের ২রা অক্টোবর।

আ. হু.

**নূহ্** (আ.), **হযরত**

হযরত নূহ্ (আ.) আল্লাহ্‌র (দ্র) ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত নবী ছিলেন। অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনিও আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করেন—পথভ্রান্ত, সত্যভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সঠিক পথে আহ্বান করেন।

পবিত্র কুরআনের (দ্র) অনেক স্থানে নূহ্ (আ.)-এর বিবরণ রয়েছে। কুরআনের ৭১ নং সূরাটির নাম 'সূরা নূহ্'। তিনি বাইবেলে (দ্র) 'নোয়াহ্' (Noah) নামে পরিচিত।

নূহ্ (আ.)-এর আমলে মানুষ নানা পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। নূহ্ (আ.) তাদের সৎ পথে জীবনযাপনের আহ্বান জানালে তারা তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করে, ঠাট্টা-উপহাস করে; এমনকি পাগল বলতেও দ্বিধা করে নি। এই দলে তাঁর স্ত্রী এবং এক ছেলেও ছিল।

এই সময় এক প্রবল বন্যায় সমস্ত জনপদ প্লাবিত হয়ে যায়। বুদ্ধিমান নূহ্ (আ.) তখন এই ভয়াবহ প্লাবন থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি সুবিশাল কাঠের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি তাঁর সঙ্গে এক জোড়া করে প্রত্যেক প্রকার জীব নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। সেই মহাপ্লাবনে নূহের (আ.) আশ্রিত মানুষ ও প্রাণী ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। প্লাবনশেষে তিনি এক নূতন জনপদ পত্তন করেন।

হযরত নূহ্ (আ.) ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন বলে কথিত আছে।

মু. মা.

**নৃতত্ত্ব** (anthropology)

'নৃ' অর্থ মানুষ, 'তত্ত্ব' অর্থ বিদ্যা। শব্দার্থ অনুসারে 'নৃতত্ত্ব' তাই মানুষ সম্পর্কিত বিদ্যা অর্থাৎ মানব জাতির উদ্ভব, বিকাশ ও সংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। যাঁরা এই বিজ্ঞানে পারদর্শী হন তাঁদের বলা হয় নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানী।

মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা হল নৃতত্ত্বের কাজ। মানুষ কিভাবে সামাজিক জীব হিসাবে বসবাস করার কায়দা রপ্ত করেছে তা এই বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায়। সামাজিক নানা দলে বিভক্ত বিভিন্ন পরিবেশে থেকে মানুষ কী রকম বৈশিষ্ট্য ও আচরণ লাভ করেছে, গবেষণার মাধ্যমে নৃতত্ত্ব তা-ই বের করে। মানুষের উদ্ভাবিত বস্তুনিদর্শনসহ তার বিশ্বাস কিংবা মূল্যবোধের ধারণা নিয়েও এ বিদ্যায় আলোচনা হয়। এ বিদ্যা তুলনামূলক এবং পারস্পরিক



www.pathagar.com

সম্পর্কযুক্ত সংস্কৃতি নিয়েও আলোচনা করে। বিভিন্ন মানুষের সাযুজ্য এবং পার্থক্য উভয়ই এ বিদ্যার গবেষণার বস্তু। সমাজ, পৃথিবী ও নিখিল বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনাও এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব নৃতত্ত্ব নানা দিক থেকে আলোচিত হতে পারে : প্রাকৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানী মানুষের মুখের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের খাপ খাওয়ানো নিয়ে আলোচনা করেন পরিবেশ-নৃবিজ্ঞানী। অর্থনীতিক নৃতত্ত্ববিদ আলোচনা করেন মানুষের উৎপাদন ও বিতরণব্যবস্থার বিষয়ে। এথনোগ্রাফিক (ethnographic) বা জাতিগত অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন জাতিতাত্ত্বিক নৃবিদ। শারীরিক নৃতত্ত্বে আলোচিত হয় মানবদেহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক নৃতত্ত্ব আলোচনা করে মানুষের রাজনীতির বিষয়, যেমন যুদ্ধ, রাষ্ট্রগঠন ইত্যাদি। প্রাইমেটোলজি (primatology) নৃবিদ্যা আলোচনা করে প্রাইমেটদের উদ্ভব, প্রকৃতি, বিকাশ এবং মানুষের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এপ্ (দ্র)-দের প্রসঙ্গে। মনোবিজ্ঞান-নৃতত্ত্বে আলোচিত হয় মানুষের মনোজগৎ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। সামাজিক নৃতত্ত্ব আলোচনা করে মানবসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ এবং চলমান ধারা অনুসন্ধান করেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ। মানুষের পুরানো সংস্কৃতির সন্ধান করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ।

নৃতত্ত্বের প্রয়োজনে সাধারণত সরজমিনে কাজ করতে হয়। কারণ যেসব মানুষজন সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা থাকে, তাদের ভিতর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমেই কেবল সঠিক তথ্য জানা সম্ভব।

সৈ. আ. ই.

## নৃত্যনাট্য (dance-drama)

নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত নাটককে (দ্র) নৃত্যনাট্য বলা হয়। নৃত্যনাট্যে কাহিনী, সংলাপ এবং চরিত্রসমূহের ভাব, অন্তরের দ্বন্দ্ব, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি তুলে ধরা হয় নাচের মুদ্রা ও তালের মধ্য দিয়ে। নৃত্যনাট্যের সব চরিত্রই নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়। তবে

*'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে অলকানন্দা দত্ত রায় ও শান্তি বসু*

নৃত্যের অনুষঙ্গী হিসাবে নৃত্যনাট্যে প্রায় সব সময়ই পর্দার অন্তরাল থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিতে গানকে একটা বড় ভূমিকা দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে রয়েছে 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৫) এবং 'শ্যামা' (১৯৩৯)।

ক. চৌ.

www.pathagar.com

## নৃ-পরিমিতি (anthropometry)

মানুষ এবং তাকে পরিমাপ করার তাত্ত্বিক জ্ঞান যে শাস্ত্র দ্বারা আহৃত হয় তাঁর নাম ইংরেজি ভাষায় 'এনথ্রোপোমেট্রি'। এর বাংলা করা যায় 'নৃ-পরিমিতি'। ফরাসি প্রকৃতিবিজ্ঞানী জর্জ ক্যুভিয়ে (Georges Cuvier : ১৭৬৯-১৮৩২) এই শব্দটির উদ্ভাবক। বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানবগোষ্ঠীর পরিমাপ আজকের দিনে কেবল দৈর্ঘ্য-প্রস্থই নয়, তিন— এমনকি চার ধারার পর্যায় পর্যন্ত বিচার করা হয়। অর্থাৎ মানবদেহের 'টিসু' (কোষকলা) গঠন থেকে শক্তির পরিমাপ, সময়ের প্রতিক্ষেপণ এবং দৈহিক ক্ষয় পর্যন্ত এর মাধ্যমে বিচার করা হয়।

সৈ. আ. ই.

## নেপচুন (Neptune)

সৌর জগতের অন্যতম গ্রহ নেপচুন। সূর্য (দ্র) থেকে দূরত্ব অনুসারে এর স্থান অষ্টম। এই গ্রহটি সূর্য থেকে বহুদূরে রয়েছে। এই দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। নেপচুন তাই সূর্যের আলো ও তাপ খুব কম পায়। পৃথিবী (দ্র) থেকেও এর অবস্থান অনেক দূরে বলে এটি খুব কমই দেখা যায়।

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র) দিয়েও একে ধূলিকণার বিন্দুর মতো দেখায়, অথচ এটি আমাদের পৃথিবীর চাইতেও অনেক বড়। প্রায় পঁচিশটি পৃথিবী জোড়া দিলে নেপচুনের সমান হবে। এর ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার। নেপচুন গ্যাস (দ্র) ও ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি। এর বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগই মিথেন (দ্র) ও অ্যামোনিয়া (দ্র) গ্যাস। কুয়াশার পাতলা স্তরের নিচে নেপচুন ঢাকা থাকে। কখনো কখনো বেশ কয়েক দিনের জন্য কুয়াশা অর্ধেক গ্রহকে ঢেকে ফেলে, আবার হঠাৎ করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এই ঘন কুয়াশা কিসের এবং কী করে তৈরি হয় বিজ্ঞানীরা তা জানতে পারেন নি। নেপচুনে প্রায় ১৬ ঘণ্টায় দিন হয়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগে প্রায় ১৬৫ বছর। তাই নেপচুনের ১ বছর আমাদের পৃথিবীর ১৬৫ বছরের সমান। নেপচুনের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা −২২০° সে.। ইউরেনাসের (দ্র) গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ১৮৪৬ সালে বিজ্ঞানীদের চোখে নেপচুন প্রথম ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের

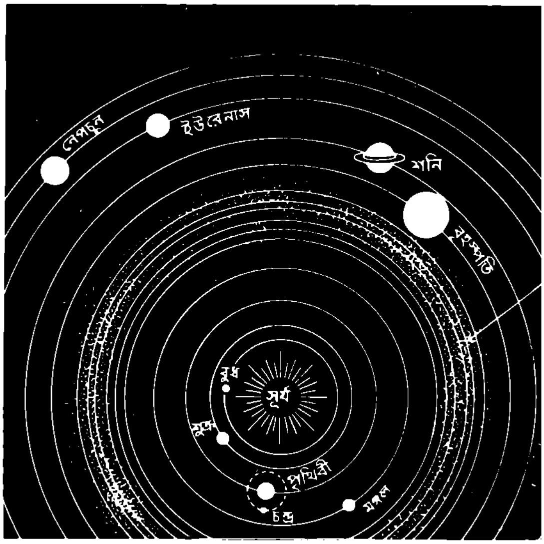

*অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে নেপচুন*

হিসাব অনুযায়ী ইউরেনাস যে সময়ে আকাশের যে স্থানে থাকার কথা সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন্ কোচ্ অ্যাডাম্স্ এবং ফরাসি জ্যোতির্বিদ উর্ব্যাঁ জঁ জোসেফ্ ল্যভ্‌রিয়ে (Urbain Jean Joseph Leverrier) তাঁদের পৃথক গবেষণা থেকে বলেন যে অন্য একটি গ্রহের আকর্ষণের জন্যই ইউরেনাসকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা যাচ্ছিল না, এবং সেই গ্রহটিই নেপচুন। টাইট্রন ও নেরিড নামে নেপচুনের দু'টি বড় উপগ্রহের সন্ধান মিলেছে; তা ছাড়া আছে গোটা ছয়েক ছোট উপগ্রহ; এদের মধ্যে টাইট্রন সৌরমণ্ডলের অন্যতম বড় ও বেশি ভরের উপগ্রহ। এ ছাড়া নেপচুনের অনেকগুলো বলয়ও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সে. শা.

## নেপাল

দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা (দ্র) পাদদেশে অবস্থিত লম্বাটে একটি দেশ নেপাল। নেপালের আয়তন ১,৪০,৭৪৭ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী কাঠমাণ্ডু। জনসংখ্যা ২ কোটি ১ লক্ষ (১৯৯২)। ভাষা নেপালি, নেওয়ারি, তিব্বতি। তবে জাতীয় ভাষা নেপালি। অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে প্রধানত হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ ও কিছু মুসলমান। মুদ্রার নাম নেপালি রুপি। 'পৃথিবীর ছাদ' নামে পরিচিত এলাকায় পৃথিবীর



www.pathagar.com

সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট (দ্র) নেপালের সঙ্গে চীনের সীমান্ত তৈরি করেছে। দেশটির পূর্ব দিকে রয়েছে ভারত (দ্র), আর উত্তরে তিব্বত (দ্র)। উত্তরের অধিবাসীদের সংস্কৃতি তিব্বতের মতোই। দক্ষিণের সমভূমিবাসীদের ভাষা, জীবনধারা সীমান্তবর্তী ভারতীয়দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বাস করে হিমালয় ও সমতল ভূমির মাঝখানে। এখানকার ঘন জঙ্গলে রয়েছে বাঘ ও হাতি। খোলা মাঠে যেখানে গাছ কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে সেখানে ধান ও আখের চাষ করা হয়। কৃষকেরা উপত্যকার নিচে ধান জন্মায় এবং খাড়া ঢালু জমিতে গম (দ্র), ভুট্টা (দ্র), যব ইত্যাদি চাষ করে। জ্বালানি কাঠ ও সমতল জমি তৈরির জন্য বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এর ফলে পাহাড়ি এলাকার মাটি ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে এবং জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল। পূর্বে এখানে রাজতন্ত্র ছিল, বর্তমানে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে দেশটি পরিচালিত হলেও রাজা এখনো দেশের অধিকর্তা।

সে. শা.

*নেপালের গ্রামে—ক্ষেত থেকে বাড়ি ফেরা*

*নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে পাটান দরবার স্কোয়ার*

www.pathagar.com

## নেপোলিয়ন বোনাপার্ট [১৭৬৯—১৮২১]

ফরাসি সমরনায়ক ও সম্রাট নেপোলিয়ন (Napoléon Bonaparte; ফরাসি উচ্চারণ : নাপলেয়ঁ বনাপার্ৎ) ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরের (দ্র) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কর্সিকা দ্বীপের আয়াচ্চো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইতালীয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানসভা কর্সিকা দ্বীপটিকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করলে নেপোলিয়ন জাতিতে ফরাসি হয়ে যান। পিতা কাউন্ট বোনাপার্ট এক জন সামরিক অফিসার ছিলেন। পিতা-মাতার আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

ষোল বছর বয়সে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ব্রিয়েন্ সামরিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৭৮৫ সালে ফরাসি সেনাবিভাগে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দেন। এর পর দায়িত্বপালনে দক্ষতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য তাঁর সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৯৩ সালে তুলঁ নগর অধিকার করার অভিযানে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়লে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হন।

১৭৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পুরস্কার হিসাবে ইতালি অভিযানে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নেপোলিয়নের ওপর ন্যস্ত হয়। ১৭৯৯ সালে ফরাসিরা তাঁকে প্রজাতন্ত্রের প্রথম কন্সাল হিসাবে মেনে নেয়। তিনি দেশের নতুন সংবিধান রচনা করে ১৮০৪ সালে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষণা করেন।

১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন ইউরোপে (দ্র) ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়া (দ্র) জোটের বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হন। অস্টার্‌লিৎস্ ও জেনার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে জয়লাভ করেন এবং রাশিয়াকে টিল্‌সিটের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এ সময় তিনি সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করেন।

১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের সাফল্যে ছেদ পড়ে। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধনের জন্য তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যর্থ হয়। স্পেন ও পর্তুগালকে পদানত রাখার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

নেপোলিয়ন তাঁর রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে মিশর ও পূর্বে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ভারত আক্রমণের ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু সাত লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করার পর শীতে ও খাদ্যসঙ্কটে পড়ে তিনি দেশে ফিরতে বাধ্য হন। এরপর লাইপ্‌ৎজিগের যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৮১৪ সালে এপ্রিল মাসে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোট (রাশিয়া, প্রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড,

*আলপ্‌স্ পর্বত অতিক্রম করছেন নেপোলিয়ন*

www.pathagar.com

*'ওয়াটার্লু' যুদ্ধ : যে যুদ্ধে নেপোলিয়ন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন*

সুইডেন ও অস্ট্রিয়া) তাঁকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করে। কিন্তু ১৮১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে পালিয়ে এসে তিনি আবার কর্ণধার রূপে তিন মাস ধরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

১৮১৫ সালে জুন মাসে নেপোলিয়ন ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট পরাজিত হয়ে বন্দি হন। এবার তাঁকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। এখানে তিনি আত্মজীবনী রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। নিদারুণ দুর্ভোগ ও অসুস্থতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৮১২ সালের ৫ই মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে প্রত্যহ খাদ্যের সঙ্গে অল্পমাত্রায় আর্সেনিক প্রয়োগে তাঁকে ধীরে ধীরে হত্যা করা হয়েছিল।

সুজ.ব.

**নেরুদা, পাবলো** [১৯০৪—১৯৭৩]

স্প্যানিশ ভাষার বিখ্যাত কবি। জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই চিলির পারাল নামক স্থানে। তাঁর পুরো নাম রিকার্দো নেফ্‌তালি রেয়িস্ ই বাসোয়াল্‌তো। পাবলো নেরুদা তাঁর ছদ্মনাম এবং এই নামেই তিনি সারা পৃথিবীতে পরিচিত। অল্প বয়স থেকে কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।



www.pathagar.com

১৯২৭ সালে রেঙ্গুনে (বার্মা) চিলির বাণিজ্যদূত নিযুক্ত হন, পরের বছর সিংহলে (দ্র) বাণিজ্যদূতের দায়িত্বও পান। এ সময় তিনি কলিকাতায় (দ্র) ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে যোগ দেন। তারপর বাটাভিয়া, জাভা, সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যদূতের দায়িত্ব পান। স্বদেশে ফিরে গিয়ে আবার বুয়েনোস্ আয়ার্স, বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে বাণিজ্যদূত হিসাবে কাজ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৬-৩৭ সালে পারীতে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোলেন ও নানা স্থানে বক্তৃতা দেন।

কবি হিসাবে তিনি সমগ্র লাতিন আমেরিকা (দ্র), ইউরোপ (দ্র), এশিয়ার (দ্র) সর্বত্র অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানসূচক অনেক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। অবশেষে ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে (দ্র) ভূষিত হন। প্রায় সারা জীবন তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি বার বার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে গন্‌জালেস-এর পক্ষে নির্বাচনী প্রধান হিসাবে কাজ করেন। পরে গন্‌জালেস্ রাষ্ট্রপতি হয়ে কবির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার মিথ্যা মামলা করেন এবং নেরুদা গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়াতে দেশত্যাগ করেন। তিন বছর পর গ্রেপ্তার–আদেশ প্রত্যাহার করা হলে তিনি দেশে ফেরেন। ১৯৬৯ সালে চিলির কমিউনিস্ট পার্টি নেরুদাকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেন এবং পরে সম্মিলিত বামফ্রন্ট সালভাদোর আলেন্দে (দ্র)-কে সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করলে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন নেরুদা। ১৯৭০ সালে আলেন্দে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিপুল ভোটে জয়ী হন। কিন্তু মার্কিন সরকার আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ ও চক্রান্তের ফলে এবং সি আই এ–র সাহায্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে আলেন্দে নিহত হন। এভাবে চিলির জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটে। চিলির হাজার হাজার মানুষের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় অত্যাচার। এর মাত্র বার দিন পরে ১৯৭৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কবি মারা যান।

নেরুদার প্রকাশিত ৬৫টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বইয়ের বাংলা নাম হল—'গোধূলি লগ্ন', 'ক্ষুদ্র মানুষের ঝুঁকি', 'মর্তের অধিবাসী ১ ও ২', 'তৃতীয় অধিবাসী', 'হে স্পেন আমার হৃদয়', 'স্তালিনগ্রাদের সঙ্গীত', 'মাচ্চু-পিচ্চুর শিখরে', 'মুক্তিযোদ্ধা', 'এই প্রান্তরের নাম হুয়ান্', 'হে মহাসমুদ্র', 'আমি আছি', 'প্রজ্বলিত তরবারী', 'অনুর্বর ভূখণ্ড', 'সমুদ্রের ঘণ্টাধ্বনি' ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর আত্মজীবনী 'অনুস্মৃতি' একটি অসাধারণ বই। নেরুদা বিশ্বের বিবেকবান কবি, নির্যাতিত মানুষের কবি এবং সর্বোপরি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত।

বি. ব.

## নেলী সেনগুপ্তা [১৮৮৬—১৯৭৩]

ভারতের (দ্র) জাতীয় আন্দোলনের নেত্রী। ১৮৮৬ সালের, ১২ই জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফ্রেড্‌রিক গ্রে এবং তাঁর নাম ছিল নেলী গ্রে। ১৯০৯ সালে ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের (দ্র) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূতা হয়েও তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

নেলী সেনগুপ্তা প্রথমে স্বামীর সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হরতালে অংশ নিয়ে শ্রমিকদের সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতা দানের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। একই সঙ্গে তাঁর স্বামীরও কারাদণ্ড হয়।

১৯২৮ সালে তিনি মতিলাল নেহরুর (দ্র) অনুসারী



www.pathagar.com

হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩১ সালে দিল্লিতে (দ্র) নিষিদ্ধ জনসভায় ও দিল্লি কোর্টে বৃক্তৃতা দানের অভিযোগে চার মাস কারারুদ্ধ থাকেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা আগ্রাহ্য করে ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। এ সময় কলিকাতার নিষিদ্ধ জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। এ বছরই কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁকে অল্ডারম্যান নিযুক্ত করে।

১৯৪০ সালে নেলী সেনগুপ্তা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালেও তিনি পুনরায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি দেশবিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

দেশবিভাগের পর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে (দ্র) স্বামীর জন্মস্থানে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রাম থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে নেলী সেনগুপ্তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ঐ বছরই ২৩শে অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

সুজ. ব.

**নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল** [১৮৮৯—১৯৬৪]

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ। বিশিষ্ট রাজনীতিক পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এবং স্বরূপরাণী নেহরুর একমাত্র পুত্র। ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ভারতের এলাহাবাদে তাঁর জন্ম। পনেরো বছর বয়সে বিলাতে গিয়ে হ্যারো স্কুলে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ইনার টেম্প্‌ল্‌ থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ১৯১২ সালে দেশে ফিরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ (দ্র) হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০-২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (দ্র) মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) অহিংস অসহযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করলে তিনি এই আন্দোলনে সরাসরি অংশ নেন। অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য তিনি অল্প দিনের মধ্যেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং এ বছরই আবার তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি আরো চার বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন গান্ধীজীর স্নেহধন্য রাজনীতিবিদ। জীবনদর্শন, ধর্মদৃষ্টি, রাষ্ট্রচিন্তা এবং অর্থনৈতিক চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁকেই গান্ধীজী উত্তরসূরি মনোনয়ন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ১৭



www.pathagar.com

বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। তিনি ছিলেন জোট নিরপেক্ষ শান্তিনীতির প্রধান প্রবক্তাদের এক জন। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে অনেক বার কারাভোগ করতে হয়। কারাগারে বসে ইংরেজি ভাষায় তিনি বেশ কয়েকটি বই লেখেন। বইগুলোর মধ্যে 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি', 'গ্লিম্প্‌সেস অব্ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি', 'দ্য ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া', 'টুওয়ার্ডস ফ্রিডম', 'এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও (দ্র.) পরবর্তী কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন।

সুজ. ব.

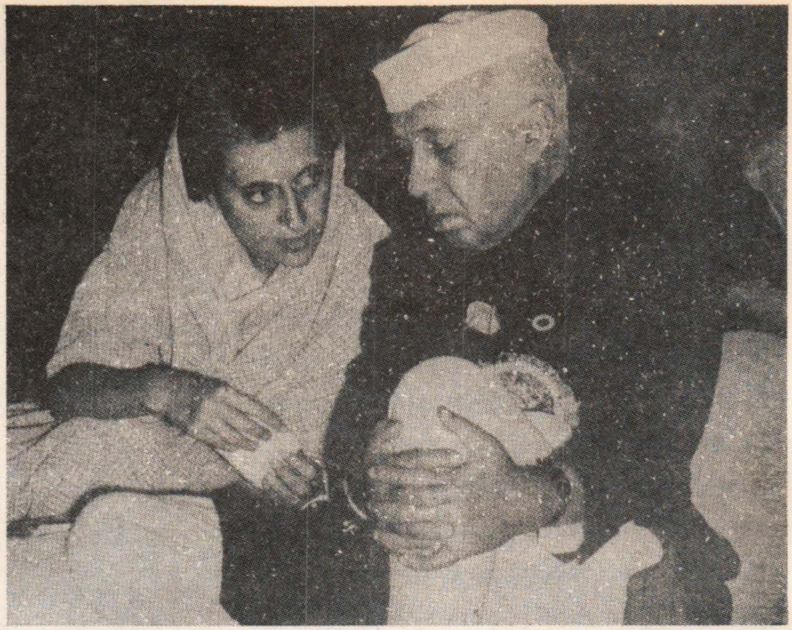

জওহরলাল নেহরু ও কন্যা—মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৬৪

## নেহরু, পণ্ডিত মোতিলাল

[১৮৬১—১৯৩১]

প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর (দ্র.) পিতা। ১৮৬১ সালের ৬ই মে আগ্রায় তাঁর জন্ম। পিতার নাম গঙ্গাধর কাউল নেহরু।

প্রথম জীবনে আইন ব্যবসায় বিপুল সুনাম অর্জন করেন। ১৯১৯ সালে এলাহাবাদ থেকে 'ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট' নামে

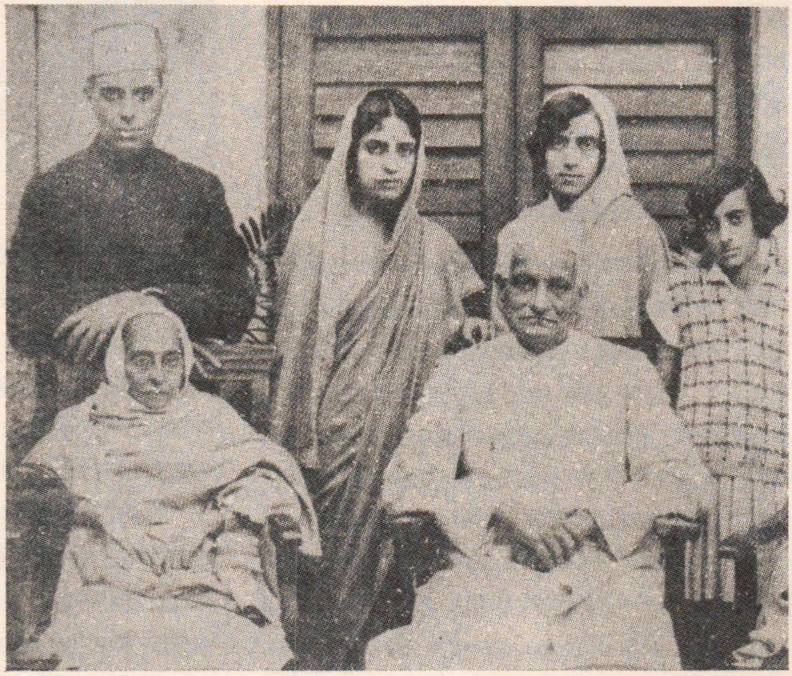

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পেছনে সর্ববামে পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্বডানে ফ্রক পরা পৌত্রী ইন্দিরা গান্ধী



www.pathagar.com

একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ বছর তিনি পাঞ্জাব অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের অনুসন্ধান কমিটির সদস্য মনোনীত হন এবং মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) সংস্পর্শে আসেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি রাজনীতি শুরু করেন। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য তিনি যুক্তপ্রদেশ কাউন্সিলের সদস্যপদ ও আইনজীবীর পেশা ত্যাগ করেন। দুই বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে স্বরাজ্য পার্টি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৪ সাল থেকে ৬ বছর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯৩১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

**সুজ. ব.**

## নেহরু পুরস্কার

আন্তর্জাতিক সমঝোতা, সহানুভূতি ও মৈত্রী বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার। এ পুরস্কারের মান ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ রুপি এবং একটা প্রশংসাপত্র।

**খু. জা.**

## নৈরাজ্যবাদ

'নৈরাজ্যবাদ' শব্দটি ইংরেজি anarchism ও nihilism শব্দ দু'টির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় চালু রয়েছে।

নৈরাজ্যবাদ হল একটি দার্শনিক ধারণা এবং এক সমাজদর্শনের নাম। 'অ্যানার্কিজ্‌ম্' শব্দের উৎপত্তিস্থল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড এবং 'নিহিলিজ্‌ম্' শব্দের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকের রাশিয়ায় ঔপন্যাসিক ইভান্ তুর্গিয়েনেফ্ (দ্র)-এর একটি উপন্যাস থেকে। কিন্তু এ দুটো শব্দ যখন কেউ জানত না, তখনো নৈরাজ্যবাদের ধারণা পৃথিবীর নানা দেশে নানা মনীষীর চিন্তায় জন্ম নিয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে চীন দেশে 'তাও'বাদ, এর কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষ ও গ্রিসে এবং মধ্যযুগে (দ্র) রোম সাম্রাজ্যে নানা ধরনের দর্শনচিন্তার ভিতরে 'নৈরাজ্যবাদ'-এর প্রকাশ ঘটেছে।

নৈরাজ্যবাদের মূল বক্তব্য এরকম : মানুষের অশান্তি ও কষ্টের জন্য আসলে যা দায়ী তা হল সম্পত্তি। কারণ সম্পত্তির অধিকার নিয়ে, ভোগদখল-ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ ঘটে। সম্পত্তিই শ্রেণীবৈষম্য তৈরি করে, তাকে কেন্দ্র করেই সমাজে ধনী-গরিবের সৃষ্টি হয়, ধনী শোষণ করে গরিবকে। বিত্ত ও শক্তির বলে এক জন রাজা হয়ে অন্য সবাইকে প্রজা বানায় এবং তাদের শাসন করে, শোষণ করে, তাদের ওপর অত্যাচার চালায়। তাই নৈরাজ্যবাদ দাবি করে যে রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির বিকশিত হওয়ার পথে বড় বাধা, তা মানুষের জীবনে শৃঙ্খলবিশেষ ও অত্যাচারের যন্ত্র, তাই মনুষ্যসমাজে রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন। সমাজের লোকজন পারস্পরিক ইচ্ছা ও চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা গড়বে এবং সেগুলোই মানুষের জীবনকে চালনা করবে; আইন, সেনা-পুলিশ-রক্ষীবাহিনী, শাসন, সংগঠন ইত্যাদি মিলিয়ে যে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে, তা চালনা করবে না। অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদ চায় রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন।

কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুপস্থিতিতে সমাজে অরাজকতা, সন্ত্রাস ইত্যাদি দেখা দেবার প্রশ্ন ওঠে। যে সমস্ত মনীষী-দার্শনিক এই ধারণাকে লালন ও প্রচার করে গেছেন তাঁরা কেউই অরাজকতা, সন্ত্রাস, রক্তক্ষয় ইত্যাদিকে নৈরাজ্যবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান মনে করেন নি। আধুনিক কালে এই মতের খুব বড় প্রবক্তা পাঁচ জন : ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬–১৮৩৬), ফ্রান্সের পিয়ের্ জোসেফ্ প্রুদঁ (১৮০৯–৬৫) এবং রাশিয়ার মিখাইল্ বাকুনিন্ (১৮১৪–৭৬), পিওৎর্ ক্রোপোৎকিন্ (১৮৪২–১৯২১) ও বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিয়েফ্ তল্‌স্তোয় (দ্র)।

পরবর্তী কালে মার্ক্সবাদও রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলেছে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদ যেভাবে সভ্যতার গতিধারায় সমাজে শোষণের উদ্ভব ও শোষণের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছে তার সঙ্গে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা মেলে না।

**হা. মা.**

**নৈরাত্ম্যবাদ** অনাত্মবাদ দ্র

## নোবেল, আলফ্রেড্ বের্ন্‌হার্ড্ [১৮৩৩—১৮৯৬]

সুইডেনের রসায়নবিদ, উদ্ভাবক ও শিল্পপতি। ডিনামাইট (dynamite) আবিষ্কার করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১৮৩৩ সালের ২১শে অক্টোবর স্টক্‌হোল্‌ম্ (Stock-



www.pathagar.com

holm) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইমানুয়েল নোবেল নিজেও একজন উদ্ভাবক এবং শিল্পপতি ছিলেন।

আলফ্রেড নোবেল

আলফ্রেড্ বের্ন্হার্ড্ নোবেল (Alfred Bernhard Nobel) প্রধানত পারিবারিকভাবেই শিক্ষা লাভ করেন। পিতার নিকট থেকে তিনি 'টর্পেডো' ও 'মাইন' নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেন। ১৮৬২ সালে তিনি স্টক্হোল্মের কাছে এক কারখানায় নাইট্রোগ্লিসারিন (nitroglycerin) নামক বিস্ফোরক উৎপাদনে মনোযোগী হন। ১৮৬৪ সালে বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় আলফ্রেড্ নোবেলের ছোট ভাই এমিল (Emil) -সহ পাঁচ জন লোক মারা যায়। এরপর তিনি নাইট্রোগ্লিসারিনের নিরাপদ ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন।

১৮৬৬ সালে তিনি কিজেল্গুর্ (kieselguhr) নামে বিশেষ এক ধরনের শৈবালযুক্ত মাটির জৈব মোড়ক (organic packing material) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন—যা নাইট্রোগ্লিসারিনের উদ্বায়ী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। ১৮৬৭ সালে তাঁর এই উদ্ভাবন ডিনামাইট নামে পেটেন্ট (patent) হয়। তাঁর এই পেটেন্ট বিশ্বের বিস্ফোরক উৎপাদকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি বিশাল বিত্তের অধিকারী হন।

ডিনামাইট ছাড়াও নোবেল ১৮৭৫ সালে ব্লাস্টিং জেলাটিন (blasting gelatin) নামে বিশুদ্ধ নাইট্রোগ্লিসারিনের চেয়ে অধিক বিস্ফোরণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন।

ডিনামাইট সূত্রে অর্জিত সমুদয় অর্থ মানুষের কল্যাণে দান করে দিয়ে নোবেল ১৮৯৫ সালে এক উইল রচনা করেন। এই উইলের শর্তাধীনে নোবেল ফাউণ্ডেশন গঠিত হয় এবং প্রতিবছর তাঁর নামানুসারে ৬টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার (দ্র) প্রদান করা হয়।

১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর নোবেল সান রেমো নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

## নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড্ বের্ন্হার্ড্ নোবেল (দ্র) নামক এক জন সুইডিশ রসায়নবিদ উইল করে তাঁর নিজের অর্থ দ্বারা নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করেন। উইলের শর্ত অনুযায়ী প্রতি বছর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব বা চিকিৎসাবিজ্ঞান, শান্তি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ফরাসি ভাষার কবি স্যুলি প্রুদোম্ (R.F.A. Sully Prudhomme) ১৯০১ সালে। তার পর থেকে সাহিত্যসহ অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়ে বিশ্বের বহু গুণী ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষার এক জন লেখকই এই পুরস্কার (১৯১৩) পেয়েছেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র)। অন্যান্য সাহিত্যিক যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং যাঁদের রচনা মূলে অথবা অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাঠকমহলে মোটামুটি পরিচিত, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : বেলজিয়ামের নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক; নরওয়ের ঔপন্যাসিক ক্ন্যুট্ হাম্সুন; ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রলাঁ (দ্র), নাট্যকার–ঔপন্যাসিক আল্বের্ কাম্যু (দ্র), দার্শনিক-ঔপন্যাসিক নাট্যকার জঁ পল সার্ত্র্ (দ্র) (তিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন); জার্মানির ঔপন্যাসিক টোমাস মান (দ্র); চিলির কবি পাবলো নেরুদা (দ্র); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লিউইস, পার্ল বাক্ (দ্র), উইলিয়াম ফক্নার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (দ্র), জন্ স্টাইনবেক এবং নাট্যকার ইউজীন ও'নীল; রাশিয়ার ঔপন্যাসিক মিখাইল্ শোলখফ্ (দ্র), বরিস্ পাস্তের্নাক্ (দ্র) ও আলেক্সান্দ্র্ সল্ঝেন্ৎসিন্; ইংরেজি ভাষার কথাশিল্পী রুডিয়ার্ড কিপ্লিং, নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড্ শ (দ্র), কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স্ (দ্র) ও টি. এস. এলিয়ট (দ্র), ঔপন্যাসিক জন গল্স্ওয়ার্দি, উইলিয়াম গোল্ডিং ও আরো অনেকে; জাপানের ঔপন্যাসিক



www.pathagar.com

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (দ্র); লাতিন আমেরিকার ঔপন্যাসিক গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজ; আফ্রিকার নাট্যকার ওল সোয়িঙ্কা এবং মিশরের ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজ।

ক. চৌ.

**নোব্‌ল্ গ্যাস** গ্যাস নিষ্ক্রিয় দ্র

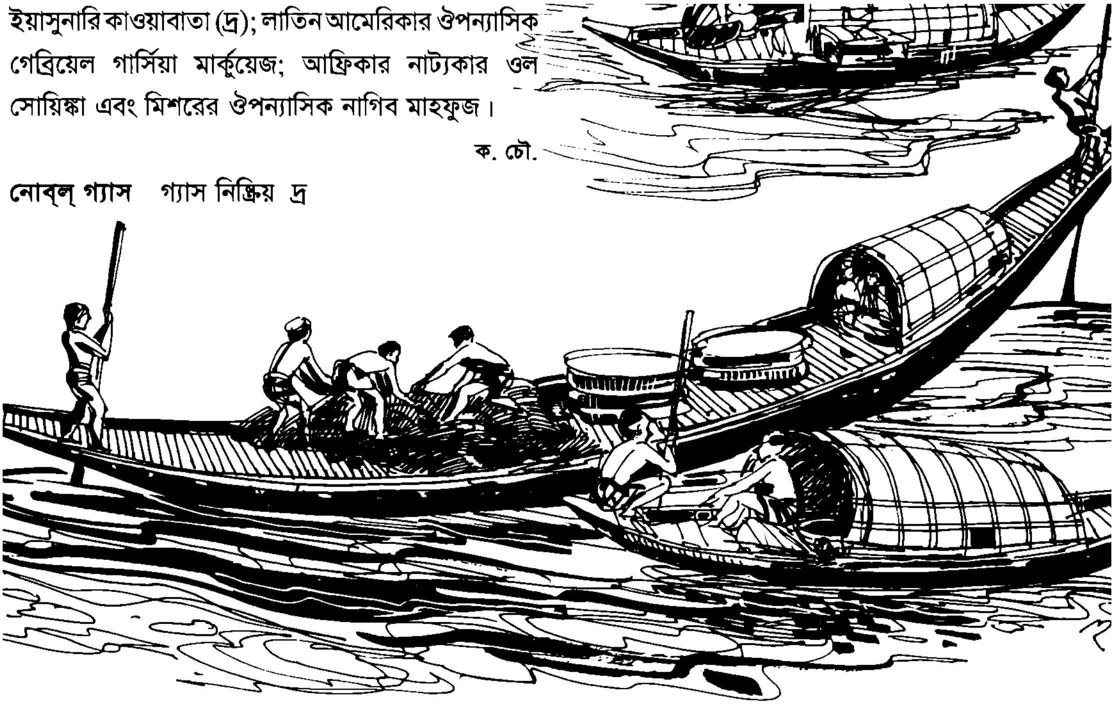

## নৌকা

নদী মাতৃক আমাদের দেশে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি যানবাহন হল নৌকা। দুনিয়ার বহু দেশে এখনো নৌকার এরকম গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে। অন্যত্র এটি প্রমোদ ও ক্রীড়ার কাজে আদৃত। আদিম মানুষ কাঠের গুঁড়ি কুঁদে কুঁদে খোল তৈরি করে তা প্রথম নৌকা হিসাবে জলে ভাসিয়েছিল। সেই থেকে কাঠ, বাকল, চামড়া এমনকি বেত পর্যন্ত নানা বস্তু নানাভাবে ব্যবহার করে নৌকা তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। আজ কাঠ ছাড়াও ফেরোসিমেণ্ট এবং ফাইবার গ্লাসের মতো আধুনিক বস্তু দিয়ে নৌকা নির্মিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে বর্ষায় ডুবে যাওয়া মাঠে-ক্ষেতে, খাল-নদীতে এবং উপকূলের কাছে সমুদ্রে বহু রকমের নৌকা আমরা ব্যবহার করছি। ছোট্ট 'ডোঙা' বা সরু ছিপ থেকে শুরু করে মালবাহী বড় বড় 'গয়না' অথবা 'বাল্লাম' নৌকা এর অন্তর্ভুক্ত। আরো আছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নৌকা—যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাম্পান। নৌকা চালাবার রীতিতেও আছে বৈচিত্র্য। কখনো দাঁড় টেনে, কখনো অল্প পানিতে বাঁশের লগি ঠেলে, কখনো গুণ টেনে পার বরাবর হেঁটে গিয়ে নৌকা চালাতে হয়। অবশ্য পাল খাটিয়ে বাতাসের শক্তিকেও কাজে লাগানো যায় এ কাজে। পালটাকে ঠিকমতো তেরচা করে খাটিয়ে এবং হালের সঠিক ব্যবহার করে প্রায় সব দিকের বাতাসকেই এভাবে কাজে লাগানো যায়। আজকাল আমাদের দেশে যন্ত্রচালিত নৌকার প্রচলন বেড়েছে। উচ্চ ফলনশীল বা উফশী (দ্র) ধানের জন্য বোরো মৌসুমে জলসেচে যে ডিজেল (দ্র) ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় সেগুলোর সহজলভ্যতা এর একটি বড় কারণ। ঐ একই ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে ছোট্ট প্রপেলার ঘুরিয়েই অধিকাংশ নৌকাকে যন্ত্রচালিত করা হচ্ছে। প্রধানত নৌকা ব্যবহারকারীরা স্ব-উদ্যোগেই এই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়েছেন বিশেষ কোনো উন্নয়নগবেষণা বা পরিকল্পিত উদ্যোগ ছাড়াই।

খোলের গঠন, পালের ব্যবস্থা, চালাবার ইঞ্জিন ইত্যাদি নানা দিক থেকে আধুনিক নৌকায় অগ্রগতি হয়েছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী নৌকা হল স্পীড বোট। এর ইঞ্জিন যদি খোলের মধ্যে থাকে তা হলে তাকে ইনবোর্ড



www.pathagar.com

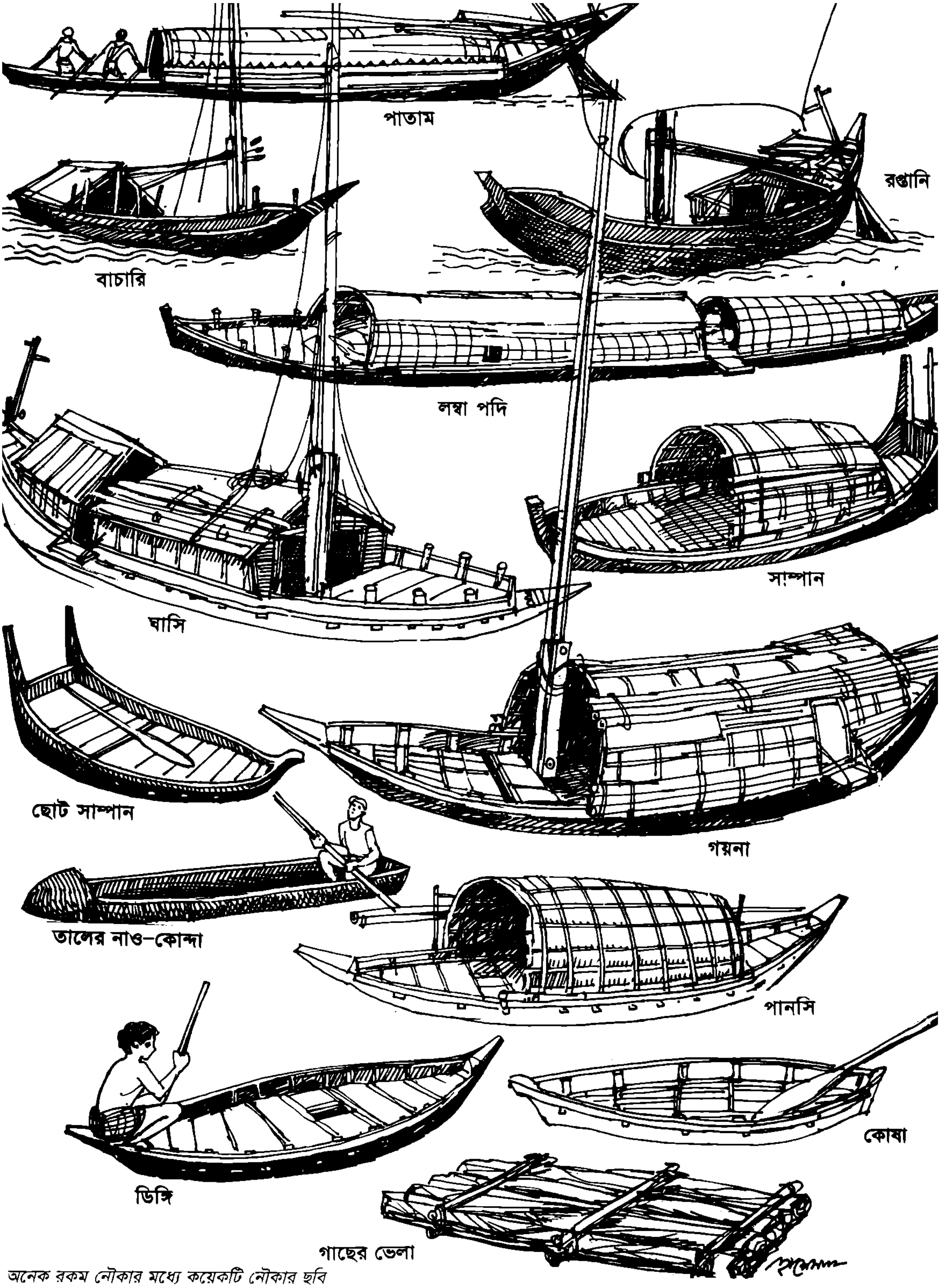


*অনেক রকম নৌকার মধ্যে কয়েকটি নৌকার ছবি*



www.pathagar.com

মোটর এবং পেছনে বাইরে ঝোলানো থাকলে তাকে আউটবোর্ড মোটর বলা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের (দ্র) সঙ্কর ধাতুতে তৈরি আউটবোর্ড মোটর খুব হাল্কা হতে পারে। বিমানের ছোট ডানার মতো দু'পাশে ডানা লাগানো এক রকম নৌকা অতি দ্রুত চলে পানির (দ্র) প্রায় উপরে উঠে আসে। এগুলোকে বলা হয় হাইড্রোফয়েল।

মু. ই.

## নৌকা বাইচ (rowing)

একাধিক দাঁড়ের বা বৈঠার সাহায্যে জলের উপর নৌকা চালনাকে 'নৌকা বাইচ' বা 'রোয়িং' বলে। এটা বিশ্বের খেলাধুলার জগতে অতি প্রাচীন একটা খেলা, যা শারীরিক উপযুক্ততা, নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তোলে এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশিকে কার্যকর ও সম্পৃক্ত রাখে। প্রাচীন কালের সভ্য জাতিগুলির হাত থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে এ খেলা পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রিস, রোম, চীন (দ্র) ও ভারতের (দ্র) নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে চীন ও মিশর রোয়িংয়ের সূচনাকারী হিসাবে প্রশংসার দাবি করতে পারে। রোমানদের ব্রিটেন জয়ের পরে এই খেলাটি ব্রিটেনের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। ১৫০৯–১৫৪৭ সালে অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ব্রিটেনে রোয়িংয়ের প্রচলন ছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক রোয়িং ফেডারেশন গঠিত হয়।

বাংলাদেশে জাতীয় রোয়িং ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশ নদী (দ্র)-মাতৃক দেশ হওয়ায় নৌকা বাইচ এ দেশের একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শৌখিন খেলা। নৌকা বাইচে দেশী নৌকার ব্যবহার করা

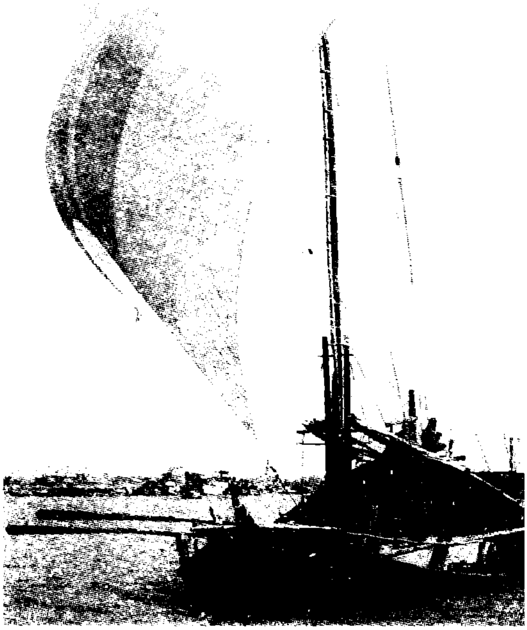

*দূর গন্তব্যে ছুটছে পাল তোলা নৌকা*

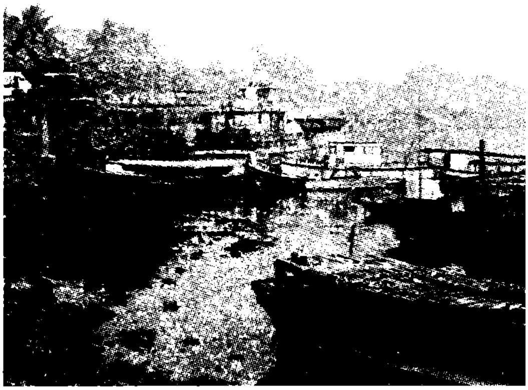

*ঘাটে বাঁধা কয়েকটি যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌকা*

www.pathagar.com

হয়। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদের উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা বড় বড় নদীতে হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রোয়িং ফেডারেশন বার্ষিক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা করে থাকেন।

অলিম্পিক সিঙ্গল্ বা একক স্কাল, দ্বৈত বা ডবল স্কাল, পেয়ার কক্সম্যানসহ, পেয়ার কক্সম্যান ছাড়া, চার জন কক্সম্যানসহ, চার জন কক্সম্যান ছাড়া এবং আট জনের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে নৌকার মাপ ও কত জনে নৌকায় বৈঠা চালাবে তার উপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতার গ্রুপ বা ক্লাস নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ দেশে পুরুষ ও মহিলা উভয় গ্রুপের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

## ন্যাটো

North Atlantic Treaty Organization, সংক্ষেপে NATO; বাংলায় বলা হয় 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা'।

১৯৫০ সালে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের দেশসমূহের সম্মিলিত সামরিক প্রতিরক্ষাচুক্তির মাধ্যমে এই সংস্থার সৃষ্টি। প্রথমে বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন (দ্র), আইসল্যাণ্ড, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ড্স্, নরওয়ে, পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) এই সংস্থার সদস্য হয়। ১৯৫২ সালে গ্রিস ও তুরস্ক (দ্র) এবং ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানি এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে। বিশ্ব সে সময় পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এই দুই শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের (দ্র) প্রেক্ষাপট এই চুক্তির ফলেই তৈরি হয়। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) আক্রমণের আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার উদ্ভব বলে দাবি করা হয়।

ন্যাটোর সদস্য যে কোনো দেশের ওপর আক্রমণকে সকলের ওপর আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া হবে—এই নীতিতে এক মত হয়ে এই সংস্থা গঠিত হয়। পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতার প্রসঙ্গও এতে উল্লিখিত হয়। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সংঘবদ্ধ হয়ে 'ওয়ার্‌শ চুক্তি' (দ্র) সম্পাদনের মাধ্যমে আরেকটি প্রতিরক্ষা জোট গঠন করে। এই জোট এখন ভেঙে গেছে।

আ. মা.

**ন্যাবা** জণ্ডিস দ্র

## ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি / ন্যাপ

পাকিস্তান আমলে উভয় অঞ্চলভিত্তিক প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল National Awami Party=NAP। ১৯৫৭ সালের ২৬শে ও ২৭শে জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলনের মাধ্যমে এটি গঠিত হয়। এর ঘোষিত অন্যতম প্রধান দাবি ছিল গণতন্ত্রবিরোধী যাবতীয় কালাকানুন বাতিল করা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সঙ্গে সম্পাদিত সকল সামরিক চুক্তি বাতিল এবং বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা। পাকিস্তানের প্রথম সারির বহু নেতা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গফ্‌ফার খান (দ্র.) অন্যতম।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় তখন ঐ পার্টির বহু নেতা-কর্মী ন্যাপ-এ যোগ দেন। ফলে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত ও পথ নিয়ে রাশিয়া (দ্র) ও চীনের (দ্র) মধ্যে বিভেদের পরিণতিতে এই দলটিও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বিভক্ত ন্যাপ-এর একটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মওলানা ভাসানী (দ্র), অন্যটির নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক মোজাফফ্‌র আহমদ।

মওলানা ভাসানী–পরিচালিত ন্যাপ এর পর থেকে প্রধানত কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত রাখে, ভোটের রাজনীতির পরিবর্তে শোষিত শ্রেণীর মৌল প্রয়োজন মেটানোর রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে (দ্র) অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে উভয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই বহুধাবিভক্ত- প্রগতিশীল আন্দোলন–সংগ্রামে এই দলটির নেতা-কর্মীদের ত্যাগের কথা স্মরণীয়।

আ. হু.

**ন্যাশনাল স্কুল** অনুশীলন সমিতি দ্র



www.pathagar.com

প

## পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার ভয়ঙ্কর কালরাত্রি নামে খ্যাত। 'কাল' অর্থ মহাকাল, মৃত্যু, সর্বনাশ; 'কালরাত্রি' তাই মৃত্যু ও সর্বনাশের রাত।

এই দিন রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। মার্কিন এম. ২৪ ট্যাঙ্কের কামান উঁচিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়(দ্র) এলাকায় সেনাবাহিনী ঢুকে পড়ে। প্রথমে হানা দেয় ইকবাল হলে। সেখানে প্রথম দফায় ২০০ ছাত্র শহীদ হয়। জগন্নাথ হলে ছিল ১০৩ ছাত্র। তাদের বেশির ভাগ শহীদ হয়। রোকেয়া হলে নির্যাতন শুরু করলে ৫০ জন ছাত্রী ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মাহুতি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব (দ্র)-সহ বহু শিক্ষক এই রাতে শহীদ হন। ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (দ্র) গুলিবিদ্ধ হয়ে কয়েক দিন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেন। গুলিস্তান থেকে নবাবপুর, ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নয়াবাজারের দোকান ও বস্তি হানাদার সেনাবাহিনীর আগুনে ভস্মীভূত হয়। সেখানকার প্রায় কেউই প্রাণে বাঁচে নি। রমনা কালী বাড়ি, নিউমার্কেট বাজার, কাওরান বাজার, পলাশী বাজার ধ্বংস করে দেওয়া হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যুদ্ধ করতে করতে ৭০০ পুলিশ শহীদ, ৩০০ বন্দি ও বাকিরা পালিয়ে যান। পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ক্যাম্পের বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন।

ঐ দিনই মধ্যরাত ১টা ২০ মিনিটে হানাদার পাকিস্তানি

*২৫শে মার্চ ১৯৭১, মধ্যরাতে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নং ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে*

সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (দ্র) বন্দি করে। গ্রেফতার হওয়ার আগে তিনি ইপিআর (EPR = East Pakistan Rifles) ওয়্যারলেসে বিশ্ববাসীর প্রতি ইংরেজি ভাষায় আবেদন জানান :

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Over The EX-EPR Transmitter."

পৃথিবীর ইতিহাসে নিরস্ত্র মানুষের ওপর এভাবে সশস্ত্র সৈন্যদের নির্দয় হামলা করে এক রাতে এত মানুষ হত্যার নজির আর নেই।

বি. ব.



www.pathagar.com

২৫শে মার্চ '৭১
মধ্যরাতে ঘাতক
পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক
নিরীহ বাঙালি
হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের
তিনটি চিত্র

www.pathagar.com

**পক্ষাঘাত** প্যারালাইসিস দ্র
**পক্ষী-পর্যবেক্ষণ শাস্ত্র** সালিম আলি দ্র

**পঙ্কজকুমার মল্লিক** [১৯০৫—১৯৭৮]

বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র) শিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত-পরিচালক। কলিকাতায় (দ্র) জন্ম। পিতা মণিমোহন মল্লিক। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সাল থেকে অর্ধশতাব্দী ধরে কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বেতারে সঙ্গীতশিক্ষার আসর প্রবর্তিত হয়। এর শিক্ষক ও পরিচালক ছিলেন তিনি। ররীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারে এই আসর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৮ সাল থেকে পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানির যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে তিনি শেষ গান রেকর্ড করেন। বাংলা সবাক চিত্রের শুরু থেকেই তিনি সুরকার, গায়ক ও সঙ্গীতপরিচালকরূপে এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়নের ব্যাপারে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু হয় মঞ্চসঙ্গীতপরিচালক হিসাবে তাঁর ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় সুরারোপ পঙ্কজ মল্লিকের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি তাঁর সুরারোপিত। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। 'আমার যুগ আমার গান' তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী। সঙ্গীতে অবদানের জন্য পঙ্কজ মল্লিক নানা সম্মানে ভূষিত হন। 'পদ্মশ্রী' উপাধি ও 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার' এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধিতেও তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। আধুনিক হিন্দি গীতিরীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ক. গো.

**পঙ্গপাল** (locust)

পঙ্গপাল অর্থ পতঙ্গের পাল। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা যখন শস্যের ক্ষতি করে তখন একে পঙ্গপালের আক্রমণ বলা হয়। লোকাস্ট নামের একটি পতঙ্গকে সাধারণত এই বিধ্বংসী আক্রমণের জন্য দায়ী করা হয়। এই পোকারা মাঝে মাঝে দল বেঁধে ধ্বংসলীলা চালায়। একেক পালে লক্ষ কোটি পোকা এক জোটে শস্যক্ষেতে হামলা করে এবং নিমেষে সকল শস্যদানা লোপাট করে। এতে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়। শুধু একটা শস্যক্ষেতই নয়, এরা একের পর এক শস্যক্ষেত সাবাড় করে চলে। এরা সংখ্যায় এত বেশি থাকে যে মনে হয় আকাশে কালো মেঘের আস্তরণ পড়েছে। এদের পাল্লায় পড়লে কীটনাশক ছিটানোর বিমান বা যাত্রীবাহী বিমানও বিপদে পড়ে। অনেক সময় বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলেও জানা যায়। হঠাৎ ওরা ক্ষেপে গিয়ে কেন জোট বাঁধে বা শস্যক্ষেতে হানা দেয় তার কারণ বিজ্ঞানীরা এখনো স্পষ্টভাবে জানতে পারেন নি। এদের নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। প্রধানত উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে পঙ্গপালের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে মরুপ্রবণ এলাকায় এদের দৌরাত্ম্য অধিক। এশিয়া (দ্র) মহাদেশে (দ্র) ভারতবর্ষের রাজস্থান, পাকিস্তান (দ্র) ও আফগানিস্তানে এদের উৎপাত অধিক লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে (দ্র) পঙ্গপালের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। উত্তরবঙ্গে মরুপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণে অদূর ভবিষ্যতে পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ত. চ.

**পজিটিভিজম্** কোঁৎ, ওগুস্ত্ দ্র
**পঞ্চ নারী, প্রাতঃস্মরণীয়** অহল্যা দ্র

**পঞ্চতন্ত্র**

পশুপক্ষী কিংবা জীব-জন্তুর ওপর মানুষের স্বভাব আরোপ করে রচিত এক রকম গল্প প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। পঞ্চতন্ত্র এই ধরনের গল্পের সমষ্টি। কাহিনীগুলো বৌদ্ধ জাতক (দ্র) থেকে গৃহীত। পঞ্চতন্ত্রের কথামুখ নামক ভূমিকায় জানা যায়, রাজপুত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য এগুলো রচিত হয়েছিল। এ জন্য চিত্তাকর্ষকভাবে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি বিষয় হল—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধি-বিগ্রহ, লব্ধসম্পদ



www.pathagar.com

নাশ ও পরীক্ষা-অপরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ। উপদেশাত্মক এই গল্পগুলো গদ্যে রচিত। তবে মাঝে মাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক যুক্ত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে অন্য কয়েকটি রূপ পাওয়া যায়। এই রূপগুলোকে ৪টি গোত্রে ভাগ করা হয়।

পঞ্চতন্ত্র সংস্কৃতে রচিত। সংস্কৃত থেকে পারস্যের পাহ্‌লবী, তা থেকে সিরিয়াক ও শেষে আরবিতে অনূদিত হয়ে তা ইউরোপে (দ্র) চলে যায়। পাহ্‌লবী ভাষায় অধুনালুপ্ত রূপটি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল। এর মাধ্যমে ইউরোপের 'ফেব্‌ল্' সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। কাশ্মীরে এর নাম তন্ত্রাখ্যায়িকা। একে প্রাচীনতম সংস্কৃত রূপ বলে মনে করা হয়। বাংলা ভাষায় (দ্র) রূপটির নাম 'হিতোপদেশ' (দ্র.)।

পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্'-এ এর প্রণেতা হিসাবে বিষ্ণুশর্মার নাম পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। পৃথিবীর ৫০টির বেশি ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের ২০০-র বেশি ভাষান্তররূপ (versions) পাওয়া গেছে।

বি. ব.

## পঞ্চভূত, পঞ্চরত্ন, পঞ্চেন্দ্রিয়

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম একযোগে পঞ্চভূত নামে পরিচিত।

নীলকান্ত, হীরক, পদ্মরাগ, মুক্তা ও প্রবাল একযোগে পঞ্চরত্ন নামে অভিহিত। কেউ কেউ সোনাকেও পঞ্চরত্নের মধ্যে গণনা করেন। তাঁদের মতে হীরক স্থানে সোনা হবে। মতান্তরে চুনি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও সোনা হচ্ছে পঞ্চরত্ন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

বি. ব.

## পঞ্চম বাহিনী

ইংরেজী fifth column (ফিফ্‌থ্ কলাম্) শব্দের অনুবাদ পঞ্চম বাহিনী। এই কথাটির উৎপত্তি স্পেনের গৃহযুদ্ধ (দ্র) থেকে। স্পেনের একনায়ক ফ্রাঙ্কোর শাসনাধীন বিদ্রোহী সেনারা চারটি সারিতে সুবিন্যস্ত হয়ে মাদ্রিদের ওপর আক্রমণ চালায়। অন্যদিকে বিদ্রোহী সেনাদের অনুসারী অপর একটি দল সরকারের ভেতরে থেকেই অভ্যুত্থান, গুপ্তচরবৃত্তি এবং অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। রণাঙ্গনবহির্ভূত গোপন অথচ সক্রিয় এই সেনাসদস্যদেরই 'ফিফ্‌থ্ কলাম্' বা পঞ্চম বাহিনী বলে অভিহিত করা হয়। রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবে পরবর্তী কালে এটি দেশবিরোধী বা দলবিরোধী কর্মকাণ্ডের বাহক হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

আ. হু.

**পঞ্চশীল** শীল দ্র

## পঞ্চশীলা

ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) বান্দুং শহরে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স) নামে আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঐ দুই মহাদেশের (দ্র) ২৮টি দেশ প্রতিনিধিত্ব করে। এই সম্মেলনে চীন (দ্র) ও ভারতের (দ্র) প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের প্রস্তাবিত জাতিসমূহের সহাবস্থানের নীতিকেই 'পঞ্চশীলা' বলে অভিহিত করা হয়। এই নীতিগুলো ছিল : ১. রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ আঞ্চলিক (ভৌগোলিক) অখণ্ডতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি পারস্পরিক মর্যাদা প্রদর্শন; ২. অনাক্রমণ; ৩. পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা; ৪. পরস্পরের প্রতি সমমর্যাদা প্রদর্শন ও একের দ্বারা অন্যের উপকার সাধন; এবং ৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

আ. হু.

## পঞ্চানন কর্মকার [ ? — ১৮০৪]

বাংলা মুদ্রণাক্ষরের স্রষ্টা এবং মুদ্রণশিল্পের প্রযুক্তিবিদ। জন্ম হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। জন্মতারিখ জানা যায় না। তাঁর পূর্বপুরুষেরা পেশায় ছিলেন কর্মকার বা লৌহজীবী। কিন্তু বেশ কয়েক পুরুষ আগে তাঁরা ছিলেন লিপিকর। তাম্রপটে, অস্ত্রশস্ত্রে অলঙ্করণ বা নামাঙ্কনের কাজে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। পঞ্চাননের চরিত্রেও পূর্বপুরুষদের এই শিল্পবৃত্তির গুণপনার প্রকাশ ঘটে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্স্ (দ্র) যখন হুগলিতে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের (দ্র)



www.pathagar.com

কাঠের টাইপ বানাচ্ছেন পঞ্চানন কর্মকার

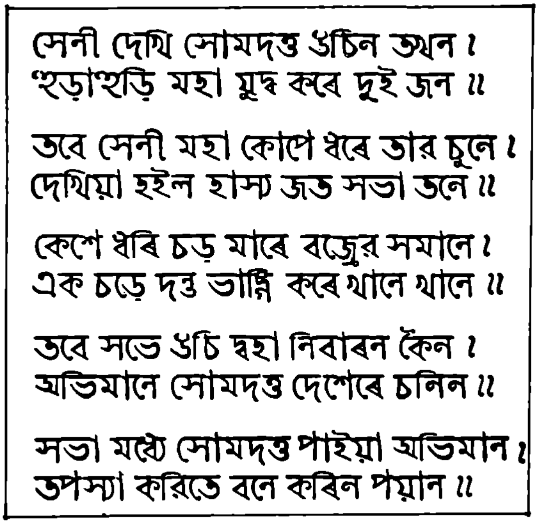


পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হ্যালহেডের ব্যাকরণের টাইপ

লেখা 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' বইটি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন পঞ্চানন তাঁর প্রযুক্তিজ্ঞান নিয়ে বাংলা হরফ প্রস্তুতের কাজে উইল্‌কিন্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। বইটির মুদ্রণে ছেনিকাটা, ঢালাই করা চলনশীল বা বিচল (অর্থাৎ moveable) যে ধাতব হরফ ব্যবহার করা হয়, তা উইল্‌কিন্স ও পঞ্চাননের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন্ হেস্টিংসের (দ্র) উৎসাহে উইল্‌কিন্সের পরিচালনাধীনে কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে উইল্‌কিন্স পঞ্চাননকে কলিকাতায় নিয়ে যান এবং সেই ছাপাখানায় কাজ করার সুযোগ দেন। সেখানে কাজ করতে করতে পঞ্চানন হরফ নির্মাণের কলাকৌশল আরো ভালভাবে আয়ত্ত করেন। আঠারো শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম কেরির (দ্র) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কেরির উৎসাহে তিনি শ্রীরামপুর মিশনের (দ্র) প্রেসে যোগদান করেন। একটি পুরানো মেশিন নিয়ে এই প্রেসের কাজ শুরু হয়। কিন্তু পঞ্চাননের মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে এটি এশিয়ার (দ্র) বৃহত্তম অক্ষর তৈরির কারখানা অর্থাৎ টাইপ ফাউণ্ড্রিতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাননের তৈরি হরফে বাংলায় বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর কেরি-কৃত অনুবাদ ছাপা হয়।

১৮০৩ সালে পঞ্চাননই ভারতবর্ষে প্রথম নাগরী ভাষায় হরফ নির্মাণ করেন। কেরির সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য তিনি নাগরী হরফ তৈরি করেছিলেন। পরে তিনি আরো ছোট ও সুন্দরতর এক সাঁট বাংলা হরফ তৈরি করেন। বাংলা মুদ্রণশিল্পে দীর্ঘকাল তাঁর তৈরি হরফ প্রচলিত ছিল। পঞ্চানন ১৮০৪ সালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে হরফ নির্মাণের কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়ে যান। মনোহর হরফ নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হন।

সুজ. ব.

**পঞ্চাশের মন্বন্তর**

ঘটনাটি ব্রিটিশ আমলের। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইতিহাসে তা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ইংরেজ সরকারের পোড়ামাটি নীতি, চাল অপসারণ, চাল পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা, বাংলার প্রতি অবাঙালি ব্যবসায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা



www.pathagar.com

*পঞ্চাশের মন্বন্তর বিষয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা দু'টি চিত্র*

ইত্যাদি কারণে এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় জাপান (দ্র) যখন বার্মা (দ্র) দখল করে, বার্মা থেকে তখন বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করে। এক শ' টাকা মণ দরে পর্যন্ত চাল বিক্রি হয়। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হল, এই দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণতই মানুষের সৃষ্টি ছিল।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র)-এর স্কেচে এই মন্বন্তর জীবন্ত হয়ে আছে।

সুজ. ব.

## পঞ্জিকা

বছরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভদিন ইত্যাদি যে বইতে থাকে তাকে পঞ্জিকা, পঞ্জী বা পাঁজি বলে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট বলে সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী একে পঞ্চাঙ্গ বলে। সভ্যতার বিকাশের প্রথম যুগেই মানবসমাজ কাল-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই অনুসারে পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে ভিন্নভিন্নভাবে বছর, মাস ও দিন গণনার প্রথার উদ্ভব হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে লৌকিক গণনা অপেক্ষা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে কাল নির্ণয়ের জন্য বর্ষপঞ্জী রচনার সূত্রপাত হয়। সেভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে ভারতবর্ষে কাল গণনা শুরু হয়। এক সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পঞ্জিকা গণনা প্রবর্তিত হয়। তারপর খ্রিস্টীয় ৪ বা ৫ শতকে সূক্ষ্ম গণনাপদ্ধতি শুরু হয়। ক্রমে গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্বিদ এই পদ্ধতিকে জ্যোতির্বিদ্যার (দ্র) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিগত ১০০ বছরের বেশি সময় থেকে বঙ্গদেশে পঞ্জিকা মুদ্রিত হচ্ছে। আদিতে পঞ্জিকা ছিল জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ। বর্তমানে পঞ্জিকায় ফলিত জ্যোতিষ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। এখন পঞ্জিকায় বর্ষফল, মাসফল, রাষ্ট্রফল, রাশিফল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বঙ্গদেশে পঞ্জিকা গণনার ইতিহাস প্রাচীন। রঘুনন্দন প্রথম পঞ্জিকা গণনা করেন বলে ধরা হয়।

তার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এর পর 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' প্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯৭ বাংলা সনে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার (দ্র) সভাপতিত্বে পঞ্জিকার সংস্কার হয়ে ১৯৫৭ সাল থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা সনের দিন-মাস সঠিক করে পঞ্জিকা প্রকাশিত হতে থাকে। আমাদের দেশে এখন মোহাম্মদী পঞ্জিকা, নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রচলিত।

আমাদের দেশে বাংলা একাডেমী (দ্র) বাংলা মাসের



www.pathagar.com

দিন-সংখ্যা সঠিক করে বাংলা ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন করে। বাংলা সনের সঙ্গে ৫৯৩ বা ৫৯৪ যোগ দিলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। বাংলা মাস গণনার জন্য বৈশাখ থেকে ভাদ্র এই পাঁচ মাস ৩১ দিন হিসাবে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র এই সাত মাস ৩০ দিন হিসাবে গণনা করতে হবে। অতিবর্ষে চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। ৪ দ্বারা যে সন বিভাজ্য তাই অতিবর্ষ (leap year)। কিন্তু কোনো শতাব্দীর শেষে দু'টি শূন্য থাকলে তাকে অতিবর্ষ ধরা হবে না; যেমন ১৪০০ সনকে অতিবর্ষ ধরা হয় নি। বাংলা একাডেমী ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করছে। বর্ষ, সন বা সালকে পঞ্জিকাকারগণ সাধারণ অব্দ নামে অভিহিত করেন, যথা ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কিন্তু ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। শতবর্ষে হয় শতাব্দ বা শতাব্দী, যথা বর্তমানে বাংলা পঞ্চদশ শতাব্দী চলছে এবং খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হচ্ছে।

বি. ব.

## পটাসিয়াম (potassium)

পটাসিয়াম একটি মৌলিক ধাতব পদার্থ। লাতিন নাম 'ক্যালিয়াম' থেকে এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন K হয়েছে। এর পারমাণবিক ওজন ৩৯.০৯৬ ও পারমাণবিক সংখ্যা ১৯। এটি দেখতে সাদা রঙের, প্রকৃতি নরম ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এক ধাতু। সোডিয়াম ধাতুর মতোই অনেকাংশে এর আচরণ লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকে। এটি কার্নেলাইট (carnallite) প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন লবণ জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের জন্য পটাসিয়াম একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং সব রকমের জীবদেহেই এটি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এটির মূল্যবান লবণগুলির মধ্যে রয়েছে পটাসিয়াম ব্রোমাইড, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট প্রভৃতি। এগুলি সবই স্ফটিকাকার এবং পানিতে বিশেষভাবে দ্রবণীয়।

পটাসিয়াম ফলের একটি প্রধান উপাদান। ফল প্রধানত ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড। ভিটামিন-এ এবং অল্পাধিক পরিমাণে ভিটামিন-বি ইত্যাদির একটি প্রধান উৎস। প্রায় সব ফলেই ভিটামিন-সি থাকে, কোনোটিতে বেশি পরিমাণে থাকে, যেমন লেবু জাতীয় ফল, বাঙ্গি ও তরমুজ এবং স্ট্রবেরি এবং কিছু কম পরিমাণে থাকে আপেল ও নাশপাতি জাতীয় ফলে। দেহের জন্য যেটুকু ভিটামিন-সি দরকার তা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই থাকে এবং এ জন্য আর অধিক কিছু খাওয়ার দরকার হয় না। স্কার্ভি নামক রোগটি যদিও আজকাল কোনো সমস্যা নয়, তবু অনেকেই শারীরিক সুস্থতার জন্য যতটা ভিটামিন-সি খাওয়ার দরকার তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না, যদিও লেবু জাতীয় ফলের সঙ্গে অন্যান্য ফল এবং শাকসবজি খেলে ভিটামিন-সি'র জন্য আর বেশি কিছু খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ইটকে একত্রে গাঁথার জন্য যেমন মর্টার দরকার হয় তেমনি দেহের কোষকে একত্রে সংযুক্ত করার জন্য কোলাজেন নামক এক প্রকার সিমেন্টের মতো জিনিসের দরকার হয়, যার অভাব পূরণ করে ভিটামিন-সি। ভিটামিন-সি'র অভাবে কোলাজেন তৈরি হতে পারে না। ফলে যা ঘটে সেগুলি হল— (১) দেহের হাড় সুষ্ঠুভাবে গঠিত হতে পারে না, ভঙ্গুর হয় এবং সহজেই ভেঙে যায়, (২) দাঁতের মাঢ়ী শক্ত হয় না এবং সহজেই রক্তক্ষরণ ঘটে।

পটাসিয়ামের অভাবে রক্তনালির দেয়াল এবং মাংসপেশির কোষগুলি শিথিল হয়, স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং ঘন ঘন ফেটে যায়। ফলে সূক্ষ্ম রক্তক্ষরণ ঘটে, ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ভাঙা হাড় ঠিকভাবে জোড়া লাগে না।

পটাসিয়াম একটি অত্যন্ত দরকারী খনিজ পদার্থ, যা কোষের অভ্যন্তরীণ তরল পদার্থে বেশ পরিমাণে থাকে এবং সামান্যই থাকে কোষের বাইরে, তরল পদার্থে। দেহের খনিজ পদার্থের মধ্যে পটাসিয়ামের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ। পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম দৈহিক পানির ভারসাম্য রক্ষা করে অর্থাৎ কোষের ভেতরের এবং বাইরের পানির পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পটাসিয়াম একটি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। মাংসপেশির সঙ্কোচন এবং দেহের তরল পদার্থের উপযুক্ত ক্ষারীয় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পটাসিয়াম একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং ত্বকের সুস্থতার জন্যও এটি প্রয়োজন। গ্লুকোজ (দ্র) গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে লিভারে জমা থাকে, পটাসিয়াম এই জমা থাকার কাজে সাহায্য করে।



www.pathagar.com

পটাসিয়াম কৌষিক বিপাক প্রক্রিয়ায়, এনজাইম (দ্র) বিক্রিয়ায় এবং রক্তের অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে মাংসপেশির প্রোটিন সংশ্লেষণের কাজে অংশগ্রহণ করে দৈহিক বিষাক্ত দ্রব্যাদি নির্গমনের কাজে কিডনি (দ্র)-কে উত্তেজিত করে। পটাসিয়াম সোডিয়ামসহ একত্রে কাজ করে হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাংসপেশিকে শক্তি যোগায়। মস্তিষ্কে অক্সিজেন (দ্র) সঞ্চালনের জন্য পটাসিয়াম ফসফরাসের (দ্র) সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ক্যালসিয়ামের সাথে নিউরো মাসকুলার কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

শাকসবজি, বিশেষ করে সবুজ পাতার শাক– সবজি, কমলা (দ্র), সূর্যমুখীর (দ্র) বীজ, গোটা শস্যদানা এবং পুদিনা পাতা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে। আলু (দ্র)-তে, বিশেষ করে তার খোসায় এবং কলা (দ্র)-তে বেশ পরিমাণ পটাসিয়াম পাওয়া যায়।

প্রত্যহ ২০০০ থেকে ২৫০০ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম খাবারের সাথে খাওয়া বাঞ্ছনীয়।এতে শরীরে পটাসিয়ামের অভাব ঘটে না।

আ. হ. খ.

**পতঙ্গ** কীটপতঙ্গ দ্র

**পতঙ্গভুক উদ্ভিদ** উদ্ভিদ, পতঙ্গভুক দ্র

## পতিসর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) নিজস্ব জমিদারি কালিগ্রাম পরগনার সদর কাছারি পতিসর। বর্তমানে নওগাঁ জেলার আত্রাই থানাধীন আত্রাই রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নাগর নদীর তীরে ছোট্ট গ্রাম পতিসর। কবি প্রথম বার পতিসরে এসেছেন ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে।

পতিসরের কুঠিবাড়ির সামনে খোলা মাঠ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এক সময় নদীর ঘাট থেকে কুঠিবাড়ির সিংহদরজা পর্যন্ত ছিল পাম গাছের সারি। কুঠিবাড়িটি দোতলা, মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। চারিদিক ঘিরে ঘরের সারি। এ ছাড়াও সিংহদরজার দু'পাশে ও বাঁদিকে খানিকটা পেছনে জমিদারি এস্টেটের কর্মচারীদের বসবাসের জন্য আবাসগৃহ। বর্তমানে মূল সিংহদরজা ও সংলগ্ন দ্বিতল ভবনটি ছাড়া প্রায় সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। কুঠিবাড়ির সামনের রবীন্দ্রসরোবর নামে ছোট্ট দিঘি (যা এখন ডোবায় পরিণত) ছাড়াও পেছনে রয়েছে আরো একটি বড় দিঘি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পতিসরে অবস্থান-কালে কবি বেশির ভাগ সময় আঁকাবাঁকা নাগর নদীর বাঁকে 'পদ্মা' বোটে বসবাস করেছেন। বট গাছ, বাঁশঝাড়, কিছু খড়ো ঘর, চালহীন মাটির দেয়াল, নদীতীরে পরিত্যক্ত জেলে ডিঙ্গি, এক পায়ে দাঁড়ানো তালগাছ আর নিস্তব্ধ নির্জন দুপুর ছিল কবির পতিসরজীবনের কাব্যসঙ্গী। 'বিদায়-অভিশাপ' এবং 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা আর কিছু অবিস্মরণীয় গান এখানে লেখা হয়েছে।

পতিসরে রবীন্দ্রনাথের সব কীর্তি ছাড়িয়ে গেছে তাঁর পল্লীউন্নয়ন ও স্বদেশী সমাজ গঠনের উদ্যোগ। কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সমবায়ের তাৎপর্য তুলে ধরতে পতিসরের মাঠে কলের লাঙ্গল চালিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন কৃষি, তাঁত ও মৃৎশিল্প ভিত্তিক সমবায় সংগঠন। পাশাপাশি স্থাপন করেছেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পতিসর রথীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সমগ্র কালিগ্রাম পরগনায় বহু সংখ্যক পাঠশালা। ১৯০৫ সালে কৃষকদের ঋণ-সাহায্যের জন্য কবি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক। নোবেল পুরস্কার (দ্র) পাবার পরে পুরস্কারের লক্ষাধিক টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা দেন, দুঃস্থ কৃষকদের হাত থেকে সেই টাকা আর ফিরে আসে নি।

১৯২১ সালে জমিদারি ভাগাভাগির পর পতিসর ও কালিগ্রাম পরগনা রবীন্দ্রনাথের ভাগে থেকে যায়। তবে জীবনযাত্রার নানা দাবির টানে পতিসরের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্কে ছেদ পড়ে। শেষ বার ১৯৩৭ সালে মৃত্যুর চার বছর আগে পুণ্যাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে এসেছিলেন, ফিরে গেছেন এলাকার জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে।

ফ. র.



www.pathagar.com

**পত্ররঞ্জক**

উদ্ভিদের (দ্র)পাতার বর্ণ প্রধানত সবুজ। কিছু কিছু উদ্ভিদের পাতা নানা রঙের হয়ে থাকে। কোষের সাইটোপ্লাজমে স্থিত প্লাস্টিড নামক পদার্থ এই সকল বর্ণের কারণ। ছত্রাক (দ্র), ব্যাক্টেরিয়া (দ্র), নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদে প্লাস্টিড নেই। প্লাস্টিড সাধারণত দুই প্রকার : (১) লিউকোপ্লাস্টিড বা লিউকোপ্লাস্ট ও (২) ক্রোম্যাটোপ্লাস্টিড বা ক্রোম্যাটোফোর। ক্রোম্যাটোপ্লাসিড আবার দু' প্রকার : (ক) ক্রোমোপ্লাস্ট ও (খ) ক্লোরোপ্লাস্ট। পাতার রঙের জন্য দায়ী হল ক্রোম্যাটোপ্লাস্ট। একে বাংলায় রঙিন বর্ণাধারও বলা হয়। পাতার সবুজ রঙের জন্য ক্লোরোপ্লাস্ট এবং অন্যান্য রঙের জন্য ক্রোমোপ্লাস্ট। ক্লোরোফিল (দ্র) নামক সবুজ বর্ণের কণা অধিক মাত্রায় ক্লোরোপ্লাস্টে থাকার দরুণ একে অধিক সবুজ দেখায়। ক্লোরোফিলের বাংলা পরিভাষা

হল পত্রহরিৎ। উচ্চতর উদ্ভিদের প্রতি কোষে ২০-৪০টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে এই সংখ্যা কম। উচ্চতর উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট আকৃতিতে লেন্সের মতো। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে নানা ধরনের আকৃতি হতে পারে। যেমন হতে পারে পেয়ালাকৃতি, সর্পিলাকৃতি, জালিকাকৃতি, তারকাকৃতি অথবা অঙ্গুরীয় আকৃতির। ক্লোরোপ্লাস্ট উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ক্রোমোপ্লাস্ট সাধারণত হলুদ ও লাল বর্ণের হয়ে থাকে। এদের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের। উদ্ভিদের পাতাসহ যে সকল অঙ্গ সবুজ ভিন্ন অন্য রঙের তার জন্য দায়ী এই ক্রোমোপ্লাস্ট। যেমন— পাতাবাহার, ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদির রঙ ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণেই। বাহারি রঙের ফুল কীটপতঙ্গ, পাখিকে আকর্ষণ করে। ফলে উদ্ভিদে পরাগায়ণের কাজটি সহজ হয়।

ত. চ.

**পত্রহরিৎ** ক্লোরোফিল দ্র

**পথের পাঁচালী**

*বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*

জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস। এর রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র)। ১৯২৯ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এর আগে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে ধারা-বাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপূর্ব নামের এক বালক। নিশ্চিন্দিপুর তাদের গ্রাম। বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরিহর, মা সর্বজয়া, কিশোরী বয়সের বড় বোন দুর্গা ও দূরসম্পর্কের এক দিদি ইন্দির ঠাকরুণকে নিয়ে অপূর্বদের সংসার। প্রতিবেশী রাণুদি ও নিজের বোন দুর্গা অপূর্বের পরম বন্ধু, খেলার সঙ্গী। এদের সঙ্গে মিলেমিশে গ্রামীণ পরিবেশে অপূর্বের বড় হয়ে ওঠাই উপন্যাসের মূল বিষয়। বড় বোন দুর্গা অসুখে দারিদ্র্যের কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে অপূর্বরা নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে বাবার কর্মস্থলে চলে যায়।

সাধারণ উপন্যাসের মতো 'পথের পাঁচালী' ঘটনাবহুল নয়। বালক অপূর্বের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার মানসিক অবস্থার ক্রমপরিণতির চিত্র এখানে এত নিবিড় ও বাস্তব হয়ে উঠেছে যে একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করার উপায় নেই। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অপূর্বের মনের নৈকট্যবোধই এই কাহিনীর ভিত্তি। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যময় ভাষা ও আকর্ষণীয় প্রকাশনৈপুণ্যে গ্রামের গাছপালা, কীটপতঙ্গ (দ্র), বনজঙ্গল, পাহাড়-নদী সবই এই গ্রন্থে আলাদা আলাদা চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে।



www.pathagar.com

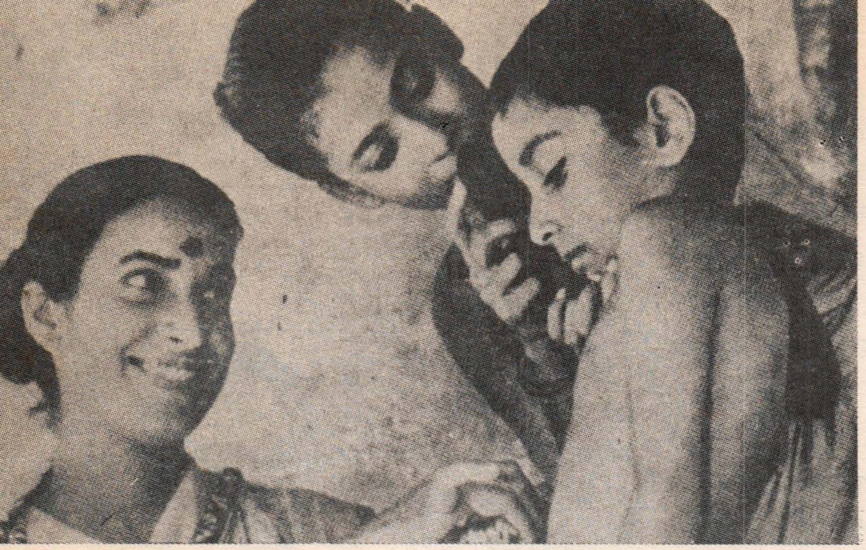

*'পথের পাঁচালী' ছবিতে অপু, দুর্গা ও মা সর্বজয়া*

*সত্যজিৎ রায়*

এই গ্রন্থ ছোট-বড় সকল পাঠককে কেবল মুগ্ধই করে না, প্রকৃতির কাছাকাছিও নিয়ে যায়।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে সত্যজিৎ রায় (দ্র) বিশ্বনন্দিত হয়েছেন।

সুজ. ব.

## পদক

কৃতী ব্যক্তিদের পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যই স্থানীয় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো পদক দেওয়া হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে পদক প্রদানের প্রচলনও রয়েছে। উদ্ভাবন, শিক্ষা, যুদ্ধ, ক্রীড়া, শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক দেওয়া হয়।

পদক সাধারণত হয় গোলাকার। তাতে কোনো বিশেষ প্রতীক বা শব্দ খোদাই করা থাকে। বেশির ভাগ পদক তৈরি হয় সোনা (দ্র), রূপা (দ্র) কিংবা ব্রোঞ্জ (দ্র) দিয়ে। একটি ফিতার সঙ্গে এই পদক বা মেডাল ঝোলানো থাকে। বিশেষ অবদান, দীর্ঘ কর্মজীবন এবং সদাচরণের জন্যও পদক প্রদানের প্রচলন আছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই যোগ্য ব্যক্তিকে পদকে ভূষিত করার রীতি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রিস দেশে রণকৌশল ও ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে লরেল গাছের পাতায় তৈরি স্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হত। প্রাচীন রোমানেরা তাদের বীরদের বরণ করে নিত সুবর্ণ লরেল, কলার্ এবং ফেলেরা নামে এক ধরনের বাহুবন্ধনী দিয়ে। ফেলেরা রূপা দিয়েও তৈরি হত। তাতে খোদিত থাকত দেবদেবী, মানুষ অথবা পশুর প্রতিকৃতি, বিশেষ করে মাথা।

ষোড়শ শতকে ফিতায় ঝোলানো পদক প্রদানের সূচনা হয় রাশিয়াতে ও অস্ট্রিয়ায়। বর্তমান কালের পদকের সঙ্গে অনেক দিক থেকেই সেগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

আ. কা.

**পদাবলী / পদাবলী কাব্য** কাব্য দ্র
**পদাবলী কীর্তন** কীর্তন দ্র

## পদার্থবিজ্ঞান / পদার্থবিদ্যা

ভৌত বিজ্ঞানের যে শাখা পদার্থ ও শক্তি এবং এদের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করে।

সাধারণভাবে যা কিছু জায়গা দখল করে, যার ওজন আছে এবং বল প্রয়োগে যা প্রতিরোধ করে, তা-ই পদার্থ। তবে উপরিউক্ত তিনটি ধর্ম পদার্থের সম্পূর্ণ চরিত্র প্রকাশ করে না। এ ছাড়াও পদার্থ সাধারণত কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় অবস্থায় থাকে; থাকে ঘনত্ব, অভেদ্যতা, স্থিতিস্থাপকতা, সচ্ছিদ্রতা, সংনম্যতা ইত্যাদি। বই, খাতা, কলম, অক্সিজেন (দ্র), হাইড্রোজেন (দ্র) ইত্যাদি পদার্থ।



www.pathagar.com

শক্তি হল কাজ করার সামর্থ্য। কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগে যদি বস্তুর সরণ ঘটে তবে কাজ হয়েছে বলা হয়। যেমন—বৈদ্যুতিক শক্তিতে পাখা ঘোরে, তেলের শক্তিতে গাড়ি চলে ইত্যাদি।

পদার্থের যেমন অবস্থান্তর হয়, তেমনি শক্তিরও রূপান্তর ঘটে। পানি (দ্র) জমে বরফ (দ্র) হওয়া পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন। আবার কয়লা (দ্র) পুড়ে ইঞ্জিন চলাটা শক্তির রূপান্তর।

পদার্থ ও শক্তির কথা ভিন্নভাবে বলা হলেও এ দু'টি আসলে একই সত্তারই দুটো রূপ। বিজ্ঞানী আল্‌বার্ট্ আইন্‌স্টাইন্ (দ্র) প্রথম দেখান যে পদার্থ ও শক্তি পরস্পর রূপান্তরযোগ্য। যেমন পরমাণু-বোমাতে পদার্থকে ভেঙে বিপুল শক্তি পাওয়া যায়।

পদার্থবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। তাই, এর নানাবিধ শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এরই কয়েকটি হল—বলবিদ্যা ও বস্তুর সাধারণ ধর্ম (mechanics), তাপবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা, পরমাণু-পদার্থবিদ্যা, নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি।

মু. হা

**পদ্ম**

নিম্ফিয়েসি (Nymphaeceae) পরিবারভুক্ত বড় পাতাওয়ালা জলজ উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *নিলাম্বো নুসিফেরা (Nelumbo nucifera)*। সারা বছর পানি থাকে এমন জায়গায় পদ্মগাছ ভাল জন্মে। পানির ওপর এর বড় বড় পাতা ভেসে থাকে। বর্ষাকালে পদ্মগাছে ফুল ফোটে। এ ফুল আকারে বেশ বড়। লাল রঙের পদ্মফুল দেখতে বেশ মনোরম। ভারতীয় এবং মিশরীয়দের কাছে পদ্মফুল পবিত্র। পুরাতন গাছের কন্দ এবং বীজের সাহায্যে এদের বংশবিস্তার হয়। পদ্মের বীজ খেতে ভাল।

ভিক্টোরিয়া রেজিস (Victoria regis) বা দেও পদ্মের পাতা খুব বড় আকারের হয়ে থাকে। এর উপরিভাগের ব্যাস ছয় ফুট পর্যন্ত হয়। পাতার প্রান্তদেশ ওপরের দিকে ওল্টানো থাকে, তার ফলে দেখতে কাঁসার থালার মতো হয়। পানির ওপর ভাসমান ভিক্টোরিয়া রেজিসের পাতার ওপর এক জন

মানুষ নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

মু. আ.

**পদ্মপাণি** অবলোকিতেশ্বর দ্র

**পদ্মসম্ভব**

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য এবং তিব্বতে লামা-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন নালন্দা (দ্র) মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য শান্তরক্ষিতের ভগ্নীপতি। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) প্রচারের পথিকৃৎ ছিলেন আচার্য শান্তরক্ষিত। ঠিস্রোং দেচানের সময় (৭৫৫–৭৯৭ খ্রি.) তিনি তিব্বতে যান। কিন্তু সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তিনি তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এর ফলে তাঁকে তিব্বত ছাড়তে হয়। তখন তাঁর পরামর্শে রাজা ঠিস্রোং দেচান পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানান।

পদ্মসম্ভব অলৌকিক ঋদ্ধিবলে পোন ধর্মে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোদের বশীভূত করেন। পদ্মসম্ভব সম্পর্কে তিব্বতে এরকম সম্ভব-অসম্ভব অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীতে দেখা যায়, আচার্য পদ্মসম্ভব তিব্বতের লৌকিক কোনো দেবদেবীকে ধ্বংস করেন নি, বরং তাঁদের বশীভূত করে বুদ্ধের পদতলে আশ্রয় দিয়েছেন। ফলে আচার্য পদ্মসম্ভবের প্রবর্তিত মতবাদ হয়ে গেল বৌদ্ধ ও পোন ধর্মের সংমিশ্রণ। এই থেকে লামাবাদের উদ্ভব হয়।

আচার্য শান্তরক্ষিতের পরিকল্পনায় রাজা ঠিস্রোং দেচান-



www.pathagar.com

এর অর্থানুকূল্যে ওদন্তপুরী (দ্র) বিহারের (দ্র) অনুকরণে পদ্মসম্ভব তিব্বতে ঐতিহাসিক বৌদ্ধবিহার 'সামিয়ে' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারই তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তিব্বতের আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায় যে পদ্মসম্ভব প্রখ্যাত তন্ত্রাচার্য 'উ-জাঙ' রাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র। সেই দেশের এক পুণ্যসরোবরে পদ্মপত্রে আসীন অবস্থায় আট বছরের এই বালকটিকে পান বলে তাঁর নাম হয় পদ্মসম্ভব।

সুজ. ব.

**পদ্মা** নদী, বাংলাদেশের দ্র

## পদ্মাবতী

মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের আলাওল (দ্র)কৃত বঙ্গানুবাদ। অনুবাদগ্রন্থ হলেও কাব্যে আলাওলের মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বহু ঘটনা এবং কবির আত্মজীবনী অনুবাদটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী হচ্ছে : চিতোরের রাজা রত্নসেন শুকপাখির মুখে সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর সৌন্দর্যের কথা শুনে বহু কষ্ট স্বীকার করে পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে সফল হন। এদিকে রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মাবতীর কথা শুনে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে পাবার আশায় রত্নসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বারো বছর যুদ্ধের পর রত্নসেনকে পরাজিত করতে পারলেও পদ্মাবতীকে জয় করতে পারেন নি। গোরা ও বাদল নামে দুই সেনাপতির সাহায্যে রত্নসেন মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু কুম্ভলনের রাজা দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েও মারা গেলে রানী পদ্মাবতী সহমরণে আত্মাহুতি দেন।

মে. খা.

## পনির

দুধ (দ্র) থেকে তৈরি স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ এক প্রকার খাদ্য। অনেক রকম পনির রয়েছে, তবে সবগুলোই প্রায়

একই নিয়মে তৈরি করা হয়। প্রথমে পাস্তুরিত দুধ রেনেট (rennet) নামের এনজাইম (দ্র) কিংবা ল্যাক্টিক অ্যাসিড-এর সাহায্যে জমাট বাঁধানো হয়। এর পর জমাট অংশ (curd)-কে গরম করে পানির পরিমাণ কমানো হয় এবং ছেঁকে চাপের সাহায্যে শক্ত করা হয় এবং কেটে কেটে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি দেওয়া হয়। এর পর প্রয়োজনবোধে শীতল কুঠুরিতে রেখে পনিরের সঙ্গে লবণ যোগ করা হয় এবং গরম কুঠুরিতে নিয়ে গাঁজানো হয়। টাটকা পনির জাত করার (ripening) দরকার হয় না। তবে অনেক পনির তৈরির পরে জাত করা হয়। এর ফলে পনিরের বিশেষ স্বাদ এবং গন্ধ সৃষ্টি হয়। দুধের প্রোটিন এবং চর্বির ওপর ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) এবং রেনেট এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে পনিরের বিশেষ স্বাদ এবং গন্ধ আসে।

পনিরে পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এটা নরম কিংবা শক্ত হতে পারে। দশ লিটার দুধ থেকে প্রায় এক লিটার পনির তৈরি হয়। বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলে তৈরি পনিরের বিভিন্ন নাম রয়েছে।

ইউরোপে (দ্র) চার শ'-রও বেশি রকমের পনির তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) প্রায় তিন শ' ধরনের পনির তৈরি হয়। ফ্রান্সের একটি অঞ্চলে তৈরি রকফোর্ট পনির (Roquefort cheese)-কে 'পনিরের রাজা' বলা হয়।

হোমারের (দ্র) ওদিসি (দ্র)-তে পনিরের উল্লেখ আছে। ওদিসিউস্ পলিফেমাস (Polyphemus)-এর গুহায় অনেক পনির দেখতে পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে আগে যে 'মে দিবস' (দ্র) পালনের বিবরণ পাওয়া যায়, তা পালন করা হত পনির তৈরির মৌসুম শুরু উপলক্ষে।

সা. এ.

**পয়ার** ছন্দ দ্র



www.pathagar.com

**পরজীবী** (parasite)

যে ক্ষুদ্র প্রাণী অন্য জীবের দেহে বসবাস এবং বংশবিস্তার করে তাকে পরজীবী বলা হয়। পরজীবী এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। পরজীবীর মধ্যে প্রোটোজোয়া (দ্র) জাতের পরজীবী এককোষী এবং মেটাজোয়া (metazoa) জাতের পরজীবী বহুকোষী। আমাশয় (দ্র) সৃষ্টিকারী পরজীবী *'এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা'* *(Entamoeba histolytica)*, ম্যালেরিয়া (দ্র) সৃষ্টিকারী পরজীবী *'প্লাজমোডিয়াম'* *(plasmodium)*, কালাজ্বর (দ্র) সৃষ্টিকারী পরজীবী *'লিশমেনিয়া ডনোভানি'* *(Leishmania donovani)* ইত্যাদি এককোষী পরজীবীর উদাহরণ। নানান ধরনের কৃমি বহুকোষী পরজীবীর উদাহরণ।

বিভিন্নভাবে প্রাণীদেহে পরজীবীসংক্রমণ ঘটতে পারে। যেমন, দূষিত পানি বা খাবারের সঙ্গে শরীরে পরজীবী প্রবেশ করে। বক্রকৃমির (hookworm) লার্ভা বা শূককীট পায়ের পাতার ত্বক ভেদ করে শরীরে ঢোকে। কীটপতঙ্গের (দ্র) দংশনেও শরীরে পরজীবীসংক্রমণ ঘটতে পারে। যেমন, পরজীবী বহনকারী অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার (দ্র) দংশনে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া (দ্র) পরজীবীর সংক্রমণ ঘটে। অধিকাংশ পরজীবী সংক্রমণের বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট ঔষধ (দ্র) আবিষ্কৃত হয়েছে।

সি. না. হ.

**পরম শূন্য তাপমাত্রা**

সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যে তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন ও চাপ শূন্য (০) হবে। এর নিচের কোনো তাপমাত্রা বাস্তবে সম্ভব নয়। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা—২৭৩.১৬° অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রিরও ২৭৩.১৬° ডিগ্রি নিচে।

তাপমাত্রার সঙ্গে কোনো গ্যাসের আয়তনের একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। ০° সে. তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের যে আয়তন দেখা গেছে, স্থির চাপে ঐ গ্যাসের তাপমাত্রা ১° সে. বাড়লে বা কমলে গ্যাসের আয়তনও ঐ ০° সে. তাপমাত্রায় যে আয়তন তার ১/২৭৩.১৬ অংশ বাড়ে বা কমে। এই থেকে বোঝা যায়, কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা ২৭৩.১৬°সে. হলে তার আয়তন শূন্য হবে। এই তাপমাত্রায় বস্তুর ভিতরকার অণু-পরমাণুর কোনো ছোটাছুটি থাকে না।

−২৭৩.১৬° কে শূন্য ধরে তাপমাত্রা পরিমাপের পরম স্কেল তৈরি হয়েছে। এটিকে কেল্‌ভিন্‌ স্কেলও বলে। এই স্কেলের ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের ১ ডিগ্রির সমান।

বাস্তবে কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা পরম শূন্য করা সম্ভব নয়। এই তাপমাত্রায় পৌঁছানোর আগেই যে কোনো গ্যাস তরলে পরিণত হয়।

মু. হা.

**পরমাণু**

মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, যাতে ঐ পদার্থের মৌলিক গুণাবলি বজায় থাকে। যে কোনো পদার্থের সব পরমাণুই একই, কিন্তু অন্য পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। হাইড্রোজেনের (দ্র) সকল পরমাণু একই রকম, কিন্তু তা অক্সিজেনের (দ্র) পরমাণু অপেক্ষা ভিন্ন।

খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেই গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (দ্র) প্রথম পরমাণুর ধারণা প্রকাশ করেন। পরমাণুকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাটম (atom)। গ্রিক অ্যাটম শব্দের অর্থ 'যা ভাঙা যায় না'। আগে ধারণা করা হত, পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না। কিন্তু উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের দশকে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর গাঠনিক উপাদানের কথা জানতে পারেন।

পরমাণুতে আছে একটি ছোট কিন্তু ভারি কেন্দ্রিণ (nucleus) এবং এর চারপাশে মেঘাকারে ইলেক্ট্রনের (দ্র) আবরণ। যে কোনো পরমাণুর গড় ব্যাস প্রায় এক অ্যাংস্ট্রম (A)। অ্যাংস্ট্রম হল এক সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে এর ৯৯.৫ শতাংশ ভর (দ্র), অথচ কেন্দ্রিণ দখল করে পরমাণুর আয়তনের $১০^{-১৫}$ অংশ। অর্থাৎ পরমাণুর ভেতর প্রায় সবটাই ফাঁকা।

ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী। কেন্দ্রিণে সচরাচর ধনাত্মক প্রোটন (দ্র) ও বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন (দ্র) থাকে। পরমাণুতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান, তাই পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।

কোনো পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যাকে ঐ মৌলের



www.pathagar.com

পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number) বলে। এই সংখ্যা মৌলের পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্দিষ্ট করে। মূলত কোনো মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এই সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যাকে একত্রে মৌলের পারমাণবিক ভরসংখ্যা (Atomic Mass Number) বলা হয়।

কেন্দ্রিণের চারপাশে ইলেক্ট্রনের বিন্যাসকে বলা হয় পরমাণুর গঠন। ইলেক্ট্রনের এই বিন্যাস কোয়ান্টাম (দ্র) বলবিদ্যার আইন-কানুন মেনে চলে।

মু. হা.

## পরমাণু-বোমা (atom bomb)

অধিক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা, যার শক্তি পরমাণু-বিক্রিয়া থেকে পাওয়া যায়। ভারি মৌল, যেমন প্লুটোনিয়াম-২৩৯ বা ইউরেনিয়াম-২৩৫— এর পরমাণু-কেন্দ্রিণকে নিউট্রনকণা দিয়ে আঘাত করলে মৌলের কেন্দ্রিণটি ভেঙে অপেক্ষাকৃত হালকা একাধিক মৌলের কেন্দ্রিণে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। বাধা না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা ভারি মৌলের পরমাণু শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই শৃঙ্খলক্রিয়া (দ্র) চলতে থাকে।

একই মাপের একটি রাসায়নিক বোমার তুলনায় একটি পরমাণু-বোমা কয়েক হাজার গুণ বেশি ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ম্যানহাটন প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা প্রথম পরমাণু-বোমা তৈরি করেন।

এ পর্যন্ত দু' ধরনের পরমাণু-বোমা বানানো হয়েছে। ইউরেনিয়াম-২৩৫সমৃদ্ধ 'লিট্‌ল্ বয়' নামক পরমাণু- বোমাটি ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা (দ্র) নগরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তিন দিন পরে জাপানের নাগাসাকি (দ্র) শহরে 'ফ্যাট ম্যান' নামের যে পরমাণু-বোমাটি ফেলা হয় সেটিতে ছিল প্লুটোনিয়াম-২৩৯।

বর্তমানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ পরমাণু-বোমা তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), রাশিয়া (দ্র), ব্রিটেন (দ্র), ফ্রান্স, ভারত (দ্র), গণচীন (দ্র), পাকিস্তান (দ্র) প্রভৃতি অন্যতম।

মু. হা.

*আকাশে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ*

## পরমাণু-শক্তি (atomic energy)

পরমাণুর (দ্র) মাঝখানে রয়েছে ভারি কেন্দ্রিণ এবং তার চারপাশের কক্ষপথে হালকা ইলেক্ট্রন (দ্র)। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কক্ষপথের ইলেক্ট্রনসমূহ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কেন্দ্রিণবিক্রিয়ায় পরমাণু-কেন্দ্রিণের উপাদানসমূহ অংশগ্রহণ করে। এবং বিক্রিয়ার ফলে নিজেদের মধ্যে পুনঃসংস্থাপিত (re-arranged) হয় কিংবা মুক্ত কণা হিসাবে কেন্দ্রিণ থেকে বের হয়ে আসে। এই বিক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তা-ই পরমাণু-শক্তি। অবশ্য সঠিক অর্থে এটিকে কেন্দ্রিণ-শক্তি (nuclear energy) বলা উচিত।



www.pathagar.com

পরমাণুর কেন্দ্রিণের উপাদানসমূহকে কেন্দ্রিণে আবদ্ধ রাখার জন্য বিপুল শক্তির প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রিণ উপাদানের তারতম্য হলে এই শক্তি প্রকাশিত হয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার ফিশন্ (দ্র) ঘটিয়ে পরমাণু-শক্তি শান্তিপূর্ণ পথে কাজে লাগানো যায়। পরমাণু-বোমার বিপুল শক্তির উৎসই হল পরমাণু-শক্তি।

মু. হা.

**পরশুরাম** রাজশেখর বসু দ্র

## পরাগল খান

পরাগল খান ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে চট্টগ্রামের (দ্র) শাসনকর্তা। তাঁর পিতা রাস্তি খান এবং পুত্র নসরৎ খান বা ছুটি খানও চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। পরাগল খানের প্রকৃত নাম সম্ভবত মিনা খান। পরাগল খানের আদেশে তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মহাভারত (দ্র) অনুবাদ করেন, যা 'পরাগলী মহাভারত' হিসাবে সুপরিচিত। চট্টগ্রামের পরাগলপুরে পরাগল খান বাস করতেন। তাঁর আমলে তৈরি দীঘি ও মসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করে এবং তাঁর বংশধরেরা আজ পরাগলপুরেই বাস করছেন।

মে. খা.

## পরাগায়ণ

ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ণ বলে। একই ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হলে একে স্বপরাগায়ণ বলা হয়। একই জাতীয় গাছের এক গাছের ফুল থেকে অন্য গাছের ফুলে পরাগায়ণ হলে তাকে পর-পরাগায়ণ বলে। পরাগায়ণের দরুন গাছে ফল ও বীজ ফলে। এতে গাছের বংশরক্ষা হয়। তুলা (দ্র), টমেটো (দ্র) ও শিম (দ্র) গাছে স্বপরাগায়ণ ঘটে। পর-পরাগায়ণের উদাহরণ বট, শিমুল, ধান ইত্যাদি।

একই ফুলে পুংদণ্ড বা গর্ভমুণ্ড জড়িয়ে থাকে। অথবা গর্ভমুণ্ড বেঁকে পুংদণ্ড এবং পুংদণ্ড বেঁকে গর্ভমুণ্ডের কাছে যায়। আবার কোনো সময় খাটো পুংদণ্ড দীর্ঘ হয়ে গর্ভমুণ্ডের এবং খাটো গর্ভমুণ্ড দীর্ঘ হয়ে পুংদণ্ডের কাছে আসে। কাজেই সহজে পুংদণ্ডের পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়তে পারে। এভাবে স্বপরাগায়ণ হয়।

পর-পরাগায়ণ হয় কীটপতঙ্গ (দ্র), বাতাস (দ্র), পাখি (দ্র), কাঠবেড়াল (দ্র), শামুক প্রভৃতি প্রাণীর সাহায্যে। কীটপতঙ্গ ফুলে ফুলে বিচরণের সময় গায়ে লেগে থাকা ফুলরেণু গর্ভমুণ্ডে ছড়িয়ে যায়। যেমন— সরিষা (দ্র), হাস্নাহেনা, বাবলা ফুলে পতঙ্গ পরাগায়ণ ঘটায়। বাতাসও রেণু বহন করে। গম (দ্র), ধান (দ্র), ভুট্টায় (দ্র) পরাগায়ণ ঘটায় বাতাস। পাখি শিমুলে (দ্র), বাদুড় (দ্র) কদমে (দ্র) ও শামুক কচু (দ্র) গাছের পরাগায়ণে সাহায্য করে।

নতুন ধরনের উদ্ভিদ ও উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করার জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা একই প্রজাতির দু'টি উদ্ভিদের মধ্যে পরাগায়ণ ঘটান। যেমন ফজলি আমের ফুলের সঙ্গে ল্যাংড়া আমের ফুলের পরাগায়ণ ঘটিয়ে নতুন স্বাদের ও গন্ধের আম যাতে ফলে তেমন গাছের সৃষ্টি করা হয়। একে কৃত্রিম পরাগায়ণ বলা হয়।

ত. চ.

**পরাবাস্তবতাবাদ** স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্ দ্র

**পরিনির্বাণ** নির্বাণ দ্র

## পরিপাকতন্ত্র (digestive system)

আমরা যে খাদ্য খাই, সেই খাদ্য দেহের ভিতরে সামনের দিকে চলার যে পথ তাকে নিয়েই গঠিত পরিপাকতন্ত্র। শরীরের কাজে লাগার জন্য জটিল খাদ্য ভেঙে গিয়ে সরল, তরল ও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এই কাজটিই হল পরিপাক। এভাবে খাদ্য দেহে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। খাদ্যের পরিপাক এবং রক্তে এর শোষণের কাজ ঘটায় এই 'পরিপাকতন্ত্র'। পৌষ্টিক নালি ও অন্যান্য পরিপাকগ্রন্থি এর অন্তর্গত। বাঁকানো, পেঁচানো পৌষ্টিক নালিকে সোজা করলে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩০ ফুট। মুখবিবর থেকে মলদ্বার পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। মুখবিবর, জিহ্বা (দ্র), গলবিল বা ফ্যারিংস (দ্র), খাদ্যনালি, পাকস্থলী (দ্র), ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র নিয়ে এটি গঠিত। পরিপাক- কাজে আরো সাহায্য করে দাঁত (দ্র), লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় (দ্র) ও যকৃৎ (দ্র)।

খাবার মুখে গেলে চট্‌পট সঙ্কেত যায় মস্তিষ্কে।



www.pathagar.com

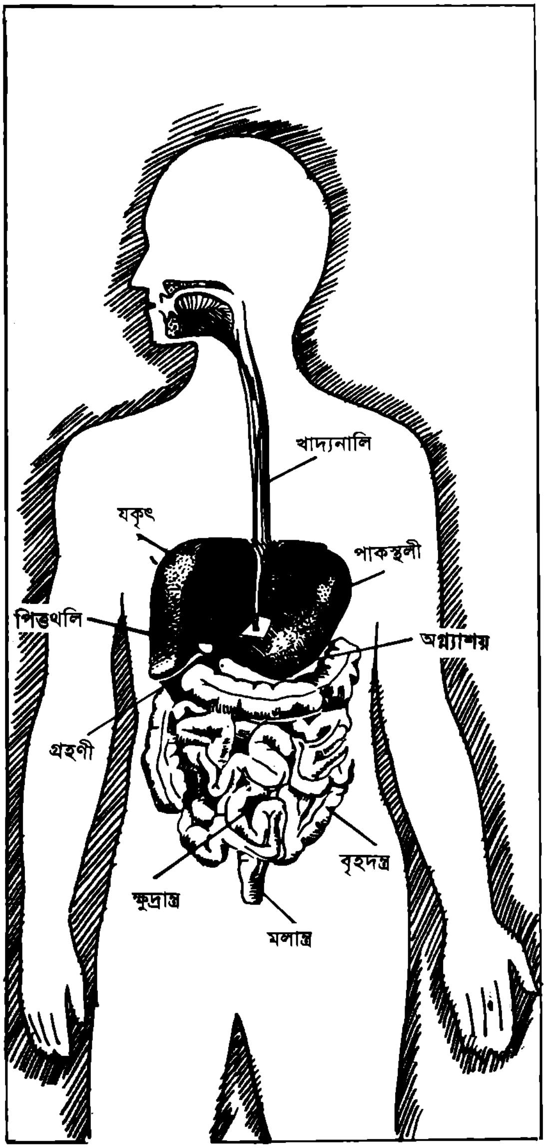


*পরিপাকতন্ত্র*

লালাগ্রন্থি থেকে লালা ঝরতে থাকে। দাঁত খাবার চিবোতে থাকে। চোয়ালের পেশিগুলোও এতে সাহায্য করে। খাবার নরম হয় ও ছোট ছোট টুকরোতে পরিণত হয়। লালার এনজাইম (দ্র) 'টায়ালিন' শ্বেতসার (দ্র)-কে পরিপাক করে। জিহ্বা খাদ্যকে ঠেলে দেয় খাদ্যনালিতে। খাদ্যনালি ও শ্বাসনালি আছে পাশাপাশি। খাদ্য শ্বাসনালিতে ঢুকলে বিপদ। এ জন্য শ্বাসনালির ওপর আছে পাটাতন 'আলজিব'। এর ওপর দিয়ে খাদ্য গড়িয়ে চলে আসে খাদ্যনালিতে। খাদ্যনালিতে আছে পেশির বলয়, এগুলোর ক্রমসঙ্কোচনে খাদ্য অগ্রসর হতে হতে ঢোকে পাকস্থলীতে। পাকস্থলী পরিপাকতন্ত্রের সবচেয়ে স্ফীতকায় অংশ, পুরু ঝিল্লি ও মাংশপেশি দিয়ে গঠিত। গড় আয়তন দেড় লিটার। প্রধান কাজ পাচক রস নিঃসারণ ও খাদ্য পরিপাচন। এখানে খাদ্য এসে মিশ্রিত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও এনজাইম 'পেপ্সিন্'-এর সঙ্গে। পেপ্সিন্ জটিল প্রোটিনকে সরল প্রোটিন 'পেপ্টাইডে' পরিণত করে।

খাদ্য এর পর যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২৫ ফুট দীর্ঘ। এর প্রথম দশ ইঞ্চি হল ডুওডিনাম বা 'গ্রহণী'। অন্ত্রে খাদ্য এলে যকৃৎ থেকে আসে 'পিত্ত' এবং অগ্ন্যাশয় থেকে পাচক রস। এই পাচক রসে আছে শ্বেতসার চর্বি ও আমিষ পরিপাকের এনজাইম। আমিষ পেপ্টাইড্ ভেঙে তৈরি হয় এমাইনো অ্যাসিড, শ্বেতসার ভেঙে হয় সরল শর্করা, চর্বি ভেঙে হয় ফ্যাটি অ্যাসিড (দ্র) ও গ্লিসারোল। চর্বির পরিপাকে সাহায্য করে পিত্তলবণ। পাচক রসের সঙ্গে মিশে খাদ্য অন্ত্রে ৪-৮ ঘণ্টা ধরে জীর্ণ হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা শোষিত হয় রক্ত ও লসিকারসে। এই শোষণকাজের জন্য অন্ত্রের দেয়ালে আছে খুবই ছোট আঙুলের মতো 'ভিলাই'। বাকি খাদ্যবস্তু বৃহদন্ত্রে অপেক্ষা করে ১০-১২ ঘণ্টা। পানি শুষে এটি শুকনো হয়ে ওঠে। খাদ্য গ্রহণের ২৪-৩০ ঘণ্টা পর তৈরি হয় মল।

পরিপাকতন্ত্রের পরিচিত রোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেপ্টিক আলসার (দ্র), ডায়রিয়া (দ্র), আমাশয় (দ্র), কলেরা (দ্র), ফুড পয়জনিং (দ্র), আন্ত্রিক যক্ষ্মা, টাইফয়েড জ্বর (দ্র), বিভিন্ন ধরনের কৃমিরোগ (দ্র), ক্যান্সার (দ্র), মলান্ত্রপ্রদাহ, পেরিটোনিয়াম প্রদাহ ইত্যাদি।

শু. চৌ.

**পরিবাহী** (conductor)

যে বস্তু বা পদার্থের ভিতর দিয়ে তাপ (দ্র) বা বিদ্যুৎ (দ্র) সহজে চলাচল করতে বা পরিবাহিত হতে পারে তাকে পরিবাহী বলা হয়। পরিবাহীকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—বিদ্যুৎপরিবাহী ও তাপপরিবাহী। যে পদার্থ বা



www.pathagar.com

বস্তুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ স্বল্প বাধা পেয়ে সহজে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় বিদ্যুৎপরিবাহী। ধাতু সাধারণত বিদ্যুৎ সুপরিবাহী (অর্থাৎ ধাতুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলতে পারে); কারণ, ধাতুর পরমাণু (দ্র)-তে অনেক মুক্ত ইলেক্ট্রন (দ্র) থাকে।গ্রাফাইট (দ্র)-ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। তামা (দ্র), রূপা (দ্র), লোহা (দ্র) ইত্যাদি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী পদার্থ। অনেক অধাতু বিদ্যুৎ কুপরিবাহী। বিদ্যুৎ কুপরিবাহী পদার্থের ভিতর দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে না। কোনোটি আবার অন্তরক, অর্থাৎ যাদের মধ্য দিয়ে একেবারেই বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না। যেসব পদার্থের ভিতর দিয়ে সহজে তাপ পরিবাহিত হয় তাদের বলা হয় তাপপরিবাহী। এদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ তাপ- পরিবাহিতা গুণ থাকে। তামা, রূপা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তাপপরিবাহী ধাতু।

শা. ত.

## পরিবেশ / পরিবেশবিদ্যা

'পরিবেশ' অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। পরিবেশ বলতে আমরা আমাদের চারপাশের অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বুঝি। যে বিদ্যায় জীবের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অধ্যয়ন, অন্বেষণ ও আলোচনা করা হয় সেই বিদ্যার নাম পরিবেশবিদ্যা। পরিবেশবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে প্রতিটি জীবের এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে সেই জীবের জন্য অত্যাবশ্যক।

স্থলজ জীবসমূহ বায়ু পরিবৃত থেকে বায়ুর সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালায় এবং এভাবেই বেঁচে থাকে। জলজ জীবসমূহ বাস করে সাগর (দ্র), মহাসাগর, নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে এবং বেঁচে থাকে নিজ নিজ পরিবেশে। নিজ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য খাদ্য হিসাবে, ঔষধ হিসাবে এবং অন্যান্যভাবে জীবদেহে প্রবেশ করে। এই কারণে পরিবেশবিদ্গণ জীবের পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন— বাহ্যিক পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ।

প্রকৃতপক্ষে জীবদেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পরিবর্তন এর বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

মানবপরিবেশ তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত। এদের একটি নির্জীব উপাদান, একটি সজীব উপাদান এবং আরেকটি সামাজিক উপাদান। নির্জীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে মাটি (দ্র), বায়ু (দ্র), পানি (দ্র), যানবাহন (দ্র), আবহাওয়া (দ্র) ও জলবায়ু (দ্র)। সজীব উপাদান গঠিত জীবাণুজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ (দ্র) নিয়ে। সামাজিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম (দ্র) ও সংস্কৃতি। এর মধ্যেই পড়ে লোকসঙ্গীত (দ্র), রাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, পেশা, খাদ্য ও পুষ্টি। ধূমপান, মদ্যপান, ড্রাগগ্রহণ, নেশাগ্রস্ততা, অবসর যাপন, বিনোদন ও জীবনের মান উন্নয়ন কিংবা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বিশ্বসংস্থা ইত্যাদি সবই সামাজিক উপাদানের অন্তর্ভুত।

মাটি, পানি, বায়ু প্রভৃতি পরিবেশের যে কোনো উপাদানের যখন কোনো ভৌত, জৈবিক, রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা জীবজগতের উপর তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে, তখন সেই অবস্থাকে পরিবেশদূষণ বলা যেতে পারে। পরিবেশ-দূষণের কারণসমূহ প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত— প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প (দ্র), সাইক্লোন (দ্র), টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, বন্যা (দ্র), ভূমিধস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও যেসব মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে ভূমির অতিকর্ষণ, ভূমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক (দ্র) প্রয়োগ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, আবাসিক এলাকায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, কলকারখানা থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশন, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃক্ষনিধন, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও বিভিন্ন প্রকার শব্দ, আবর্জনা অপসারণ না করা ও পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি।

মু. আ.



www.pathagar.com

## পরিবেশগত ভারসাম্য

পরিবেশের (দ্র) এক উপাদান অপর উপাদানের সম্পূরক বা পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। তবে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে তথা পরিবেশ দূষিত হলে মানুষের শরীর ও মনের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর ফলে মানুষ প্রথমে রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত মারাও যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দূষিত পানি পান করার কারণে মানুষ কলেরা (দ্র), টাইফয়েড জ্বর (দ্র) ও আমাশয় (দ্র)-সহ অনেক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তেমনি মানুষ রোগাক্রান্ত হতে পারে মাটিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, রাসায়নিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয়দূষণের ফলে। মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার।

সবুজ গাছপালা আমাদের পরিবেশে বায়ুদূষণ রোধে এবং অন্যান্যভাবে সহায়তা করে। এ কারণে বাড়ির আশেপাশে ও অন্যান্য খালি জায়গায় প্রচুর গাছপালা লাগানো প্রয়োজন।

বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে। তাই সেসব দেশে বাড়ছে দারিদ্র্য এবং বিঘ্নিত হচ্ছে খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, চিকিৎসা, গৃহায়ণ ও বিনোদন-ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে হতাশা। অশিক্ষা ও বিশেষ করে কর্মসংস্থানের অভাবজনিত এ হতাশা থেকে জন্ম নিচ্ছে অসামাজিক কার্যকলাপ, ড্রাগগ্রহণ ও নেশাগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা। তাই এসব দেশে 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক।

এমনটি করা হলে নিজ নিজ খাদ্য, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও গৃহায়ণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়বে। পরিণতিতে পরিবেশের ঈপ্সিত ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে মানুষ পালন করবে বর্ধিষ্ণু এক অগ্রণী ভূমিকা।

মু. আ.

*পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন*

## পরিমাপ

পরিমাপ হল কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যে কোনো ভৌত সত্তা (physical entity) সম্পর্কে পরিমাণগত ধারণার জন্য পরিমাপের প্রয়োজন।



www.pathagar.com

ভৌত বিজ্ঞান যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে, তার পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি রাশির কোনো একটির বা এদের বিভিন্ন সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এগুলো হল : ১. দৈর্ঘ্য, ২. ভর, ৩. সময়, ৪. তাপমাত্রা এবং ৫. বৈদ্যুতিক চার্জ।

কোনো কিছুর পরিমাপ করার জন্য এর সঙ্গে কোনো আদর্শের তুলনা করা হয়। আদর্শটিকে বলা হয় পরিমাপের একক। যেমন—কোনো বস্তুর ভর ৫ কেজি বলতে বোঝায় ঐ বস্তুর ভর ১ কেজি ভরের ৫টি বস্তুর ভরের যোগফলের সমান।

পরিমাপের দু'টি পদ্ধতি স্বীকৃত :

১. মেট্রিক পদ্ধতি— এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক হল যথাক্রমে মিটার, কেজি ও সেকেণ্ড। এটি একটি দশমিক পদ্ধতি।

২. ব্রিটিশ পদ্ধতি— দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক হল যথাক্রমে ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ড।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে পরিমাপের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন—আমাদের দেশে দৈর্ঘ্যের জন্য হাত, ভরের জন্য সের, এই রকম পদ্ধতি আজো চালু আছে। [এক হাত ১৮ ইঞ্চির সমান ও এক সের হল ০.৯৩৩১ কেজি] পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সমতা আনার জন্য ১৯৬০ সালে পরিমাপের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি [সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল: SI ] গ্রহণ করা হয়েছে।

মু. হা.

**পরিযায়ী পাখি** পাখি, পরিযায়ী দ্র

**পরিস্রাবণ**

পরিস্রাবণ মানে ক্ষরণ, তরল পদার্থ ছেঁকে শোধন। তরল পদার্থে দ্রবীভূত কোনো কঠিন পদার্থকে ছেঁকে পৃথক করার পদ্ধতিকে পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়া বলা হয়। আরো স্পষ্টভাবে বললে, কোনো তরল পদার্থ থেকে ভারি অদ্রবণীয় পদার্থ বা ভাসমান কোনো কঠিন পদার্থকে ছেঁকে নেওয়ার বা পৃথক করার পদ্ধতিকে পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়া বলে। এটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ধরা যাক, একটি পাত্রে জলের সাথে বালি মেশানো হল। জল তরল পদার্থ আর বালি হল কঠিন পদার্থ। পাত্রে চামচ দিয়ে নাড়লে জল-বালি গুলে যাবে বটে, তবে জল থিতু হলে বালি আবার পাত্রের তলায় জমতে থাকবে। অর্থাৎ বালি জলে দ্রবণীয় নয় বা অদ্রব। জল ও বালিকে পৃথক করার জন্য পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। ছাঁকন-কাগজের উপর ধীরে ধীরে জল চালতে থাকলে পাত্রে জল জমা হবে এবং ছাঁকন-কাগজ বালি আটকে রাখবে। এতে করে বালি ও জল পৃথক করা যাবে। জীবদেহের কোষে কোষে এ ধরনের পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়া অহরহ চলতে থাকে। রাসায়নিক গবেষণাগারে এবং রসায়নবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পরিস্রাবণ-পদ্ধতি বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখতে হয়। তাদের প্রায়ই এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়।

ত. চ.

**পরী বিবির মাজার** লালবাগ কেল্লা দ্র

**পরেশনাথের মন্দির**

কলিকাতার (দ্র) উত্তর-পূর্ব দিকে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট-এ পরেশনাথের মন্দির অবস্থিত। এটি জৈন ধর্মাবলম্বীদের একটি তীর্থস্থান। নামে পরেশনাথ হলেও এটি আসলে ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যেকার দশম তীর্থঙ্কর শীতলানাথজীর মন্দির। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে রায় বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুর এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যে শীতলানাথজীর মূর্তি রয়েছে।

১৮৬৮ সালে একই চত্বরে নির্মিত হয় জৈন শ্বেতাম্বর (দ্র) মন্দির। সুখলাল জহুরির উদ্যোগে এটি তৈরি হয়েছে।

মন্দির দুটো নানা রঙের পাথর ও কাঁচের দ্বারা সুসজ্জিত। এ ছাড়া সেখানে রয়েছে সুন্দর বাগান, ফোয়ারা, পুকুর, রঙিন মাছ ইত্যাদি। এগুলোও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

নি. অ.

**পর্নোগ্রাফি** (pornography)

সাধারণত যে রচনা সচেতনভাবে যৌনতাকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠকচিত্তে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করার প্রয়াস পায় তাকে পর্নোগ্রাফি বলা হয়। এ রচনা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট এবং সৎ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। বিশ্বের সব দেশেই পর্নোগ্রাফি আইনত নিষিদ্ধ। তবে এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে যৌনতা থাকলেই কোনো একটি রচনা পর্নোগ্রাফি হয়ে ওঠে না।



www.pathagar.com

সেটা নির্ভর করে বিষয়টির প্রকাশ, উপস্থাপনভঙ্গি এবং রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্যের উপর। যৌনতাউদ্দীপক কদর্য ছবি, রচনা ও ফিল্ম পর্নোগ্রাফি পর্যায়ে পড়ে।

ক. চৌ.

## পর্বত

পৃথিবীপৃষ্ঠ একেবারে সমতল নয়। ভূপৃষ্ঠের অতি উঁচু, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।

যেসব পর্বতের মাথা বিস্তীর্ণ আর কতকটা সমতল সেগুলোর নাম মালভূমি। পর্বতের আকৃতিও নানা রকম হতে পারে। কতকগুলো পর্বত খুব উঁচু আর তাদের চূড়া এবড়ো-খেবড়ো। কতকগুলো পর্বতের চূড়া দেখতে খুব সুন্দর ও মসৃণ। যেসব পর্বত থেকে আগুন বের হয় (অর্থাৎ যে সব পর্বতে আগ্নেয়গিরি আছে) তাদের মাথা মোচার মতো। কতকগুলো পর্বত সরু ও দীর্ঘ দেওয়ালের মতো উঠে গেছে, আবার কতকগুলো পর্বতের দু' তিনটি উঁচু চূড়াও থাকে। পর্বতের পাদদেশ থেকে অনেকটা উচ্চতা পর্যন্ত বড় বড় গাছ জন্মায়। এর পরে ছোট ছোট গুল্ম ঝোপঝাড় জন্মে। তার উপরে ঠাণ্ডায় বরফ জমে থাকে বলে কোনো গাছপালা জন্মায় না।

খুব উঁচু পর্বতের চূড়ায় বাতাস খুব ঠাণ্ডা থাকে এবং অধিকাংশ সময় এই চূড়াগুলো বরফে ঢাকা থাকে। কোনো পর্বতের চূড়ায় বেশি তুষার জমে থাকলে তা হিমবাহ (দ্র) আকারে গড়িয়ে নেমে আসে এবং নিচু জমিতে পৌঁছানোর আগেই তা গলে পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই চলন্ত তুষারস্তূপ বিরাট ভাসমান হিমশিলা আকারে সমুদ্রে নেমে আসে। এদের ধাক্কায় বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। টাইটানিক (দ্র) জাহাজ এভাবেই ধ্বংস হয়েছিল।

ভূ-আন্দোলন, ভূত্বকের পার্থক্যমূলক ক্ষয়সাধন, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রভৃতি কারণে পর্বতের সৃষ্টি হয়। গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে পর্বতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— ভঙ্গিল পর্বত, স্তূপ পর্বত, সঞ্চয়জাত পর্বত ইত্যাদি। প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে ভূপৃষ্ঠ কুঞ্চিত হয়ে ঊর্ধ্বভাঁজ ও অধঃভাঁজের সৃষ্টি করে। সুউচ্চ ভাঁজসমূহকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। হিমালয় (দ্র), আল্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি 'ভঙ্গিল

পর্বত'।

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময় কিংবা ভূ-আলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে অনেক জায়গা উঁচু হয়ে ওঠে আবার কোনো কোনো জায়গা বসে গিয়ে চ্যুতির সৃষ্টি করে। দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী উচ্চ শিলাস্তূপকে 'স্তূপ পর্বত' বলা হয়। পশ্চিম জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্পিয়ানস,



www.pathagar.com

পাকিস্তানের (দ্র) লবণ পর্বত স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

আগ্নেয়গিরির (দ্র) জ্বালামুখ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উত্তপ্ত লাভা (দ্র), ভস্ম, গ্যাস (দ্র) ইত্যাদি নির্গত পদার্থ কালক্রমে শীতল ও কঠিন হয়ে সঞ্চয়জাত পর্বতের সৃষ্টি করে। ইতালির ভিসুভিয়াস, আফ্রিকার (দ্র) কিলিমাঞ্জারো, হাওয়াই দ্বীপের মওনালোয়া পর্বত এভাবে গঠিত হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উঁচুতে ওঠা যায় বাতাসের তাপ ও চাপ ততই কমতে থাকে। সাধারণত ২৭৪ মিটার উচ্চতায় ২.৫ সেমি হিসাবে বায়ুর চাপ কমতে থাকে। তা ছাড়া বায়ুর চাপ কম থাকলে সেখানে কম তাপেই পানি ফুটতে আরম্ভ করে। কাজেই বায়ুর চাপের পার্থক্য ও পানি স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য থেকে মোটামুটিভাবে কোনো পর্বতের উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। অন্য দিকে প্রায় ১৫৬ মিটার উচ্চতায় বায়ুর তাপ ১ সেলসিয়াস হ্রাস প্রায়। এই তাপমাত্রার পার্থক্য থেকেও কোনো পর্বতের উচ্চতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

মু. এ.

**পল রোব্‌সন্** [১৮৯৮—১৯৭৬]

বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন গায়ক ও অভিনেতা। জন্ম নিউ জার্সির প্রিন্সটনে ১৮৯৮ সালের ৯ই এপ্রিল। পল রোব্‌সন্ (Paul Robeson) রুট্‌গার্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে দু'বার 'অল আমেরিকান ফুটবল (রাগ্‌বি) অ্যাওয়ার্ডস্' লাভ করেন। পরে তিনি কলম্বিয়া আইন বিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং থিয়েটারে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন।

১৯২০-এর দশকে বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও' নীলের বেশ কিছু নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে রোব্‌সন্ নিজেকে প্রতিভাবান অভিনেতা হিসাবে প্রতিপন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেন এবং অচিরকালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা গায়ক হিসাবে প্রশংসিত হন। বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন।

১৯৪৩ সালে শেক্সপীয়রের (দ্র) 'ওথেলো' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে রোব্‌সন্ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ব্রডওয়েতে এই নাটকটি ২৯৬ বার অভিনীত হয় এবং প্রতিবারই তিনি একই ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকে সর্বোত্তম অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ

১৯৪৪ সালে তিনি 'একাডেমী অব আর্টস্ অ্যাণ্ড লেটার্স্ গোল্ড মেডেল' এবং শ্রেষ্ঠ মার্কিন অভিনেতা হিসাবে 'ডোনাল্ড্‌সন অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

পল্ রোব্‌সন্ আজীবন নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া প্রতিষ্ঠার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সফর করেন বহু দেশ। এসবের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) অন্যতম। ১৯৫২ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে 'স্তালিন শান্তি পুরস্কার' লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি 'কমিউনিস্ট' সন্দেহে তাঁর জীবিকার্জনের পথে নানারূপ প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করা হয়। ফলে স্বাভাবিক আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে রোব্‌সন চরম দুর্দশায় নিপতিত হন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে তাঁকে গ্রেট ব্রিটেনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং বাদবাকি ১৩ বছর তিনি স্বেচ্ছাবন্দির মতো জীবন যাপন করেন। পল রোব্‌সন ১৯৭৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'হিয়ার আই স্ট্যাণ্ড'(১৯৫৮)।

আ. হু.

**পলাশ**

মাঝারি ধরনের পাতাঝরা গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *বুটিয়া মোনোস্পার্মা (Butea monosperma)*, গোত্র পাপিলিওনাসি



www.pathagar.com

*পলাশ ফুল, পাতা ও গাছ*

(Papilionaceae)। অন্য নাম কিংশুক। ২০ থেকে ৪০ ফুট উঁচু হয়। মাঘ-ফাল্গুনে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং প্রথম ফাল্গুনে ফুল ফোটে। ফুল ফুটলে মনে হয় যেন গাছে আগুন লেগেছে। ছোট ডালের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত থরে থরে কালো রঙের কুঁড়ি হয়। কুঁড়ি দেখতে বাঘের নখের মতো। মাদার বা পারিজাতের মতো ডালের গোড়া থেকে ফুটতে ফুটতে আগার দিকে যায়। চেহারায়ও ওদের মিল আছে। রঙ লালচে কমলা, ফুলে বোঁটা নেই। বক ফুলের গঠনও পলাশের মতো। এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা শিমের মতো বীজ হয়। বীজ অবনত ও ডালের সঙ্গে লেগে থাকে। বাংলাদেশে (দ্র) সর্বত্র জন্মে।

কাঠ নরম, রঙ সাদা বা বাদামি। প্যাকিং বাক্সের কাজে লাগে। কাঠের কয়লা বারুদে কাজে লাগে। পলাশের আঠা বেঙ্গল কিনো (Bengal Kino) নামে বিদেশে পরিচিত, ঔষধ (দ্র) ও চামড়া ট্যানিং-এ লাগে। পাপড়ি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে হলুদ রঙ বের হয়, এই রঙের সঙ্গে তুঁত মেশালে খাকি রঙ পাওয়া যায়।

পলাশ গাছে লাক্ষা (দ্র) কীটের চাষ করা যায়। শরীরের লাবণ্য রক্ষায়, পেটের রোগে, কৃমিতে, পতঙ্গ নাশের কাজে, রাতে শরীরের ঘামে পলাশ ঔষধের কাজ করে।

পলাশের সঙ্গে অমর একুশের (দ্র) স্মৃতি মিশে আছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি বর্ষিত হওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পলাশ ফুটে ছিল। সে সময় ঐ এলাকায় অনেক পলাশ গাছ ছিল। সেই থেকে একুশে এলে আগুনঝরা পলাশের কথা মনে পড়ে।

বি. ব.

### পলাশীর যুদ্ধ

অবিভক্ত বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা (দ্র)। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তাঁর সেনাবাহিনী এবং রবার্ট ক্লাইভের (দ্র) অধীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর মধ্যে পলাশী নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিহাসে 'পলাশীর যুদ্ধ ' নামে খ্যাত।

পলাশী পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার কালীগঞ্জ থানায় ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত। পলাশীর যুদ্ধে বিশাল সেনাবহর নিয়েও সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩৫,০০০। অন্যদিকে ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০। সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদের মধ্যে ছিল ১৫,০০০ অশ্বারোহী আর ৫৩টি ভারি কামান। কোম্পানির ৩,০০০ সৈন্যের মধ্যে ছিল ৮০০ ইউরোপীয়, ২,০০০ ভারতীয়।

*শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা*

সিরাজউদ্দৌলার বিশাল সৈন্যদলের পরাজয়ের একমাত্র কারণ তাঁর প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের



www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলা ভাষায় মীর জাফর (দ্র) নামটি আজও বিশ্বাসঘাতকের প্রতীক হয়ে আছে।

এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সূচিত হয়। সেদিক থেকে এই যুদ্ধ পৃথিবীর (দ্র) অনেক বড় বড় যুদ্ধের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

আ. মা.

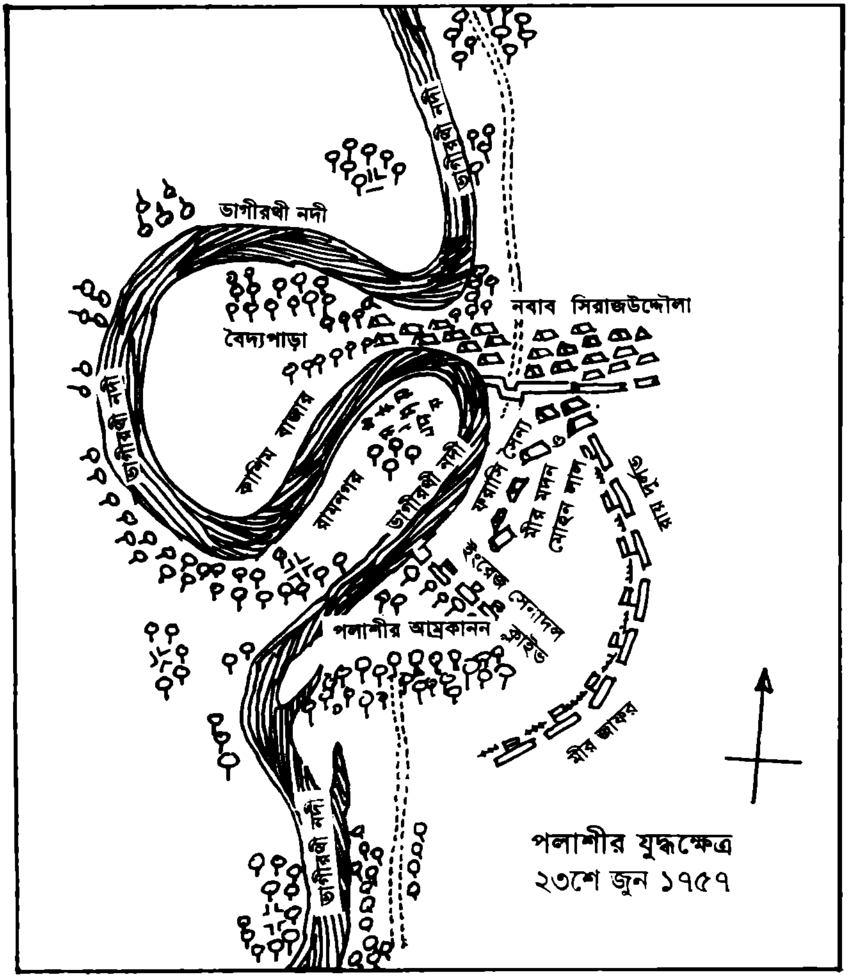

*পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ যেভাবে হয়েছিল*

**পলিথিন** (polythene)

এক রকম সাদা, অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ। ইথিলিনের (দ্র) পলিমার (দ্র) বিক্রিয়ার সাহায্যে এটা তৈরি করা হয়। কম ঘনত্বের পলিথিন উঁচু চাপের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। এটা নরম। নমনীয় নল, পাত এবং ব্যাগ তৈরির কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। উঁচু ঘনত্বের পলিথিন কম চাপের সাহায্যে তৈরি হয়। এটা শক্ত এবং বেশি তাপে গলে। ছাঁচ তৈরির কাজে একে ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

**পলিনেশিয়া** ওশেনিয়া দ্র

**পলিমার** (polymer)

একই যৌগের একাধিক ক্ষুদে সরল অণু বিক্রিয়ার ফলে একত্রে যুক্ত হয়ে একটি নতুন যৌগের বড় অণু তৈরি করলে তাকে পলিমার বলে। পলিমার সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পলিমারকরণ (polymerisation) বলে। মূল যৌগের সরল অণুসমূহকে মনোমার (monomer) বলে। উচ্চ চাপে ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অসংখ্য ইথিলিন-অণু একত্রে যুক্ত হলে পলি-ইথিলিন বা পলিথিন (দ্র) তৈরি হয়। এটা পলিমারকরণের একটি উদাহরণ।

$$(n\ CH_2{=}CH_2) = (-CH_2-CH_2-)n$$

(ইথিলিন) (পলিথিন)

এখানে পলিথিন ইথিলিনের পলিমার। ইথিলিন (দ্র) হচ্ছে মনোমার। পলিমার-এ পরিণত হতে হলে মনোমার-এর অবশ্যই দু'টি ক্রিয়াশীল অংশ থাকতে হবে। রাবার (দ্র), প্রোটিন, সেলুলোজ (দ্র), নাইলন (দ্র), ব্যাকেলাইট (দ্র) ইত্যাদি আরো কিছু পলিমার-এর উদাহরণ।

সা. এ.



www.pathagar.com

**পলিয়েস্টার** (polyester)

পলিয়েস্টার আসলে এক ধরনের পলিমার (দ্র)। এটা চার রকম হতে পারে—অ্যালকিড, অসম্পৃক্ত পলিয়েস্টার, পলিথিন টেরিফথ্যালেট্স্ এবং অ্যারোমেটিক পলিকার্বনেট্স্।

অ্যালকিড জাতীয় পলিয়েস্টার পুরোপুরি পলিমার সৃষ্টি করলে সাধারণত এক শিকল আরেক শিকলের সঙ্গে আড়াআড়ি বন্ধন তৈরি করে। অ্যালকিড রেজিন শক্ত এবং ভঙ্গুর। এটাকে তেলরঙে ব্যবহার করা হয়।

অসম্পৃক্ত পলিয়েস্টার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় আবিষ্কৃত হয়। ফাইবার গ্লাস (fibre glass)-এর সঙ্গে মিশিয়ে এটাকে নৌকা, বর্ম এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। অসম্পৃক্ত পলিয়েস্টারকে তাপের সাহায্যে পলিমারে পরিণত করার সময় অন্য প্লাস্টিকের সঙ্গে মেশালে এটা নমনীয় হয় এবং আগুনে পোড়ে না।

পলিথিলিন টেরিফথ্যালেট্স্ সাধারণত সুতা এবং পাতলা পর্দায় পরিণত হয়, যা অত্যন্ত শক্ত এবং সহজে নষ্ট হয় না। ফটোফিল্ম, ল্যামিনেশন এবং নৌকার পাল তৈরির জন্য এ ধরনের পলিয়েস্টার ব্যবহৃত হয়।

প্রকৌশলকাজে কাচ কিংবা ধাতুর বদলে অনেক সময় অ্যারোমেটিক পলিকার্বনেট ব্যবহার করা হয়। কারণ, এদের আকৃতি সহজে বদলায় না। এক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি এবং এরিয়াল ম্যাপিং-এ এদের ব্যবহার রয়েছে।

সা. এ.

**পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ** ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্র

**পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি**

ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালের ২০শে মে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশসাধন এবং তার ঐতিহ্যরক্ষায় সব রকম দায়িত্ব পালন করাই এই একাডেমীর প্রধান লক্ষ্য। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' রাজ্যসরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন হলেও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে আকাদেমির নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ার পর ১৯৯৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর একাডেমী সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

একাডেমীর কর্মসূচির মধ্যে বাংলা বানানের সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম প্রণয়ন, বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, শিশু-কিশোরদের ব্যবহারোপযোগী অভিধান প্রণয়ন, ব্যবহারিক অভিধান প্রণয়ন, সরকারি কাজ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার্য পরিভাষা সঙ্কলন, বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ প্রভৃতি রয়েছে। এ ছাড়া শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রকাশ, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও বৃত্তি প্রদান, মৌলিক কিংবা গবেষণামূলক রচনা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ এবং অনুদান ও পুরস্কার প্রদান, গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়, নিজস্ব গ্রন্থাগার, সংরক্ষণ ও সংগ্রহশালা স্থাপন, আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রভৃতিও বাংলা আকাদেমির কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা আকাদেমির সভাপতি এবং সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

মে. খা.

**পাউণ্ড, এজ্‌রা** [১৮৮৫—১৯৭২]

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ইংরেজি কবিতার অগ্রগণ্য কবিপ্রতিভা এজ্‌রা পাউণ্ড (Ezra Pound) জাতিতে মার্কিন ছিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করে ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং ভেনিস, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি নানান শহরের শিল্পী-সাহিত্যিক ও শিল্প-সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সে সব প্রভাবান্বিত করেন। টি. এস. এলিয়ট (দ্র), ডি. এইচ. লরেন্স (দ্র), জেম্স্ জয়েস্ (দ্র) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবি-ঔপন্যাসিক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'The Cantos'। তিনি একাধিক ভাষা জানতেন ও বহু শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। ১৯৪৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ধরা পড়ে। ইতালির ভেনিস শহরে ১৯৭২ সালের ১লা নভেম্বর তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

হা. মা.

**পাঁচড়া** চর্মরোগ দ্র

**পাঁচালি**

কাহিনীমূলক গানের সঙ্গে পুতুল নাচ দেখার প্রথা ছিল বলে এই গীতকে পাঁচালি বলা হত। পরে পুতুল নাচ দেখাবার



www.pathagar.com

প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়। এখন পাঁচালিতে এক জন মূল গায়েন বা গায়ক থাকে। তিনি গান গাওয়ার সময় নূপুরসহ বা হাতে চামর দুলিয়ে ও ডান হাতে মন্দিরা বাজিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করেন। কখনো কখনো তিনি পাত্র-পাত্রীর রূপ ধরে হাস্যরসও পরিবেশন করেন। মূল গায়েনের সঙ্গে দোহার ও মৃদঙ্গবাদক থাকেন এবং তিনি মাঝে মাঝে নৃত্য পরিবেশন করে মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন। মধ্যযুগে রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র) ও মঙ্গলকাব্য (দ্র) প্রভৃতির আখ্যান এই পাঁচালির সুরে গাওয়া হত। এই সুরে পুঁথিও পাঠ করা হত। পাঁচালিতে গান ও ছড়া দুই-ই থাকত। ছড়া বা বর্ণনার অংশ গায়ক দ্রুত আবৃত্তি করত। প্রথমত এক জন মূল গায়েন থাকত। পরে পাঁচালির প্রসার হতে থাকে। এই সঙ্গে পালা গানের আবির্ভাব হয়। ফলে আস্তে আস্তে মূল গায়েন ছাড়াও দুই বা ততোধিক গায়েনের আবির্ভাব হয়। এতে ঢোল (দ্র), কাঁসি, মৃদঙ্গ (দ্র) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত।

পাঁচালির শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায় (১৮০৬–৫৬ খ্রি.)। তিনি প্রথমে কবিয়াল ছিলেন। তাঁর পাঁচালিতে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ এবং সমাজ-সচেতনতা ছিল। পরে মনমোহন বসু নতুন পাঁচালির প্রবর্তন করেন। পাঁচালিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দু'জন পাঁচালিকার মুখোমুখি উত্তর-প্রত্যুত্তর সহযোগে পাঁচালি গাইতে থাকেন। এও অনেকটা কবিগানের (দ্র) মতোই। পাঁচালিতে টপ্পা (দ্র) ও বিভিন্ন ধরনের গানের প্রবেশ ঘটে।

বি. ব.

## পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর অধিকারকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত ভারতের (দ্র) সঙ্গে পাকিস্তানের (দ্র) যুদ্ধই 'পাক-ভারত যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের যে অংশ পূর্বে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল, সে অংশ বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে কাশ্মীর কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে এই বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। কাশ্মীরের মুসলমান অধিবাসীরা কাশ্মীরি রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা ভারত রাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পাকিস্তান তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে কাশ্মীরের পার্বত্য উপজাতির সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের (দ্র) আহ্বানে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় এবং এ সময় যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর অঞ্চলটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় না।

১৯৫৬ সালে কাশ্মীর পরিষদে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরকে একটি রাজ্যরূপে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ভারতবিরোধী কাশ্মীরিদের যুদ্ধবিরতি রেখার অপর পারে পাকিস্তানী অঞ্চল থেকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় বাহিনী আজাদ কাশ্মীর (পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকার নাম) এলাকায় হানা দিতে শুরু করে বলে প্রকাশ পায়। এই উপলক্ষে ১লা সেপ্টেম্বর পাকিস্তানসমর্থিত ও সাহায্যপুষ্ট আজাদ কাশ্মীর সেনাদল চাম্ব এলাকায় তৎপরতা শুরু করে এবং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ত্রিমুখী আক্রমণ চালায় এবং এভাবেই দু'দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যায়। হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে একটানা ১৭ দিন এই যুদ্ধ চলে, জাতিসংঘের নির্দেশে ২৩শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানি ঘটে।

১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) মধ্যস্থতায় সেনাপসারণ, যুদ্ধবন্দি বিনিময়, প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাশখন্দে সম্পাদিত চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যা মিটে যাবার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'দেশের এই বিরোধ এখনো মেটে নি।

সুজ. ব.

**পাকশি** গঙ্গা নদী দ্র
**পাকস্থলী** পরিপাকতন্ত্র দ্র

## পাকিস্তান

পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এর আয়তন ৮,০৩,২৯৬ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৪ লক্ষ ২৭ হাজার (১৯৯২)।



www.pathagar.com

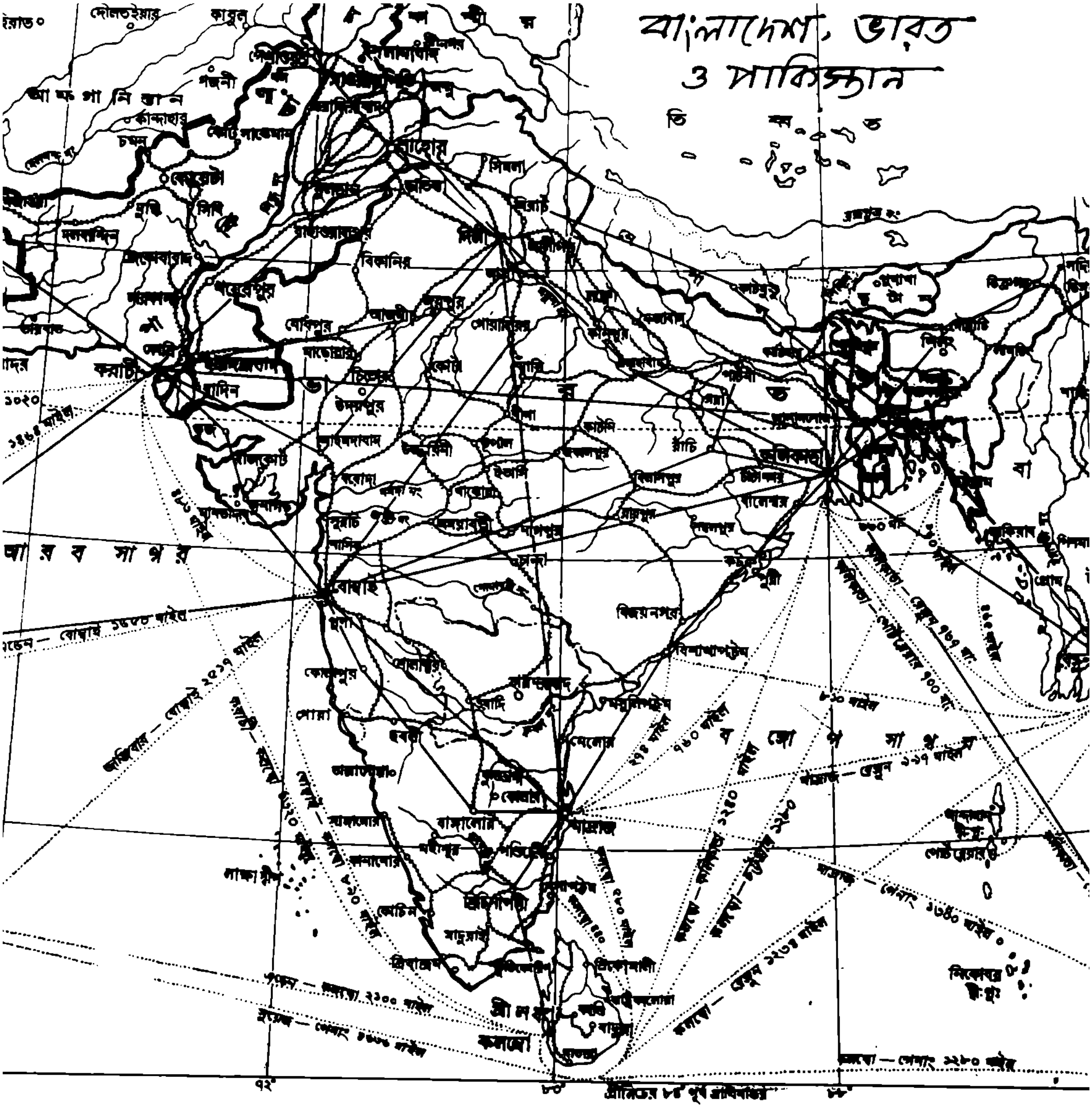


*বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র*

অধিবাসীদের শতকরা ৯৭ জন মুসলমান এবং অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। পাকিস্তানের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি বলে বেশির ভাগ লোক সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস করে। পাকিস্তান একটি ইসলামিক রিপাবলিক এবং সেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রচলিত আছে। পাকিস্তান সার্ক (দ্র)-ভুক্ত দেশ।

ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে পাকিস্তানকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : (১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল, (২) পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মালভূমি, এবং (৩) পূর্ব-দক্ষিণে সিন্ধু অববাহিকার সমভূমি। সর্বউত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত। এই অঞ্চলের তিরিচমির (৭,৬৯০ মিটার) পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সিন্ধু নদ ও তার উপনদী শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা (ঝিলাম)-র ধারাপরিবাহিত উর্বর পলিময় মৃত্তিকা পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সমতলভূমি গঠন করেছে। হিমবাহ (দ্র)-পুষ্ট নদীটিতে সারা বছর পানি থাকে এবং বহুদূর পর্যন্ত তা নাব্য। নদী থেকে খাল কেটে প্রায় ৭০ লক্ষ



www.pathagar.com

হেক্টর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া সিন্ধুর নিম্নাঞ্চলে লয়েড বাঁধ, গোলাম মোহাম্মদ বাঁধ ও গুড্ডু বাঁধ বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমিকে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে।

পাকিস্তানে মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাব বর্তমান। গ্রীষ্মকালে এখানে তাপমাত্রা খুব বেশি অনুভূত হয়। এখানকার জাকোবাবাদে পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (৫৫° সে.) পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। উত্তরাংশে বৃষ্টিপাত কিছু বেশি হলেও বেলুচিস্তান ও পেশোয়ারে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম (১০ সেমি)। ফলে সেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষাংশ, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি কারণে শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য অত্যন্ত বেশি।

গম (দ্র), ভুট্টা (দ্র), জোয়ার (দ্র) ও বাজরা এবং তুলা (দ্র) পাকিস্তানের প্রধান কৃষিদ্রব্য। তা ছাড়া আখ (দ্র), রেশম (দ্র), তামাক (দ্র) ও ধান (দ্র) উৎপন্ন হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সুমিষ্ট ফলও জন্মে থাকে। গবাদি পশু পালনে পাকিস্তান পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

পাকিস্তানের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস (দ্র), পেট্রোলিয়াম (দ্র), কয়লা (দ্র) ও লবণ (দ্র) প্রধান। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুনাপাথর (দ্র), জিপ্‌সাম (দ্র), ক্রোমাইট, গন্ধক (দ্র) ও আকরিক লোহা উল্লেখযোগ্য। বস্ত্র, পশম (দ্র), চিনি (দ্র), সিমেন্ট, সার (দ্র) প্রভৃতি পাকিস্তানের প্রধান শিল্পদ্রব্য।

পাকিস্তানে প্রায় ৯;০০০ কিমি রেলপথ আছে। এই রেলপথে দেশের একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর করাচি থেকে অন্যান্য শহরে যাতায়াত করা যায়। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার, কোয়েটা, মুলতান প্রভৃতি বড় বড় শহরের মধ্যে যাত্রী ও মাল পরিবহণ করে। তা ছাড়া পৃথিবীর বহুদেশেও যাতায়াত করে।

করাচি পাকিস্তানের প্রধান শিল্পকেন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। পূর্বে এটি পাকিস্তানের রাজধানী ছিল। দেশের অধিকাংশ কাপড়ের কল এখানে অবস্থিত। এখানে একটি তেল শোধনাগার আছে। এই বন্দর দিয়ে তুলা, পশম, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি হয়। লাহোর পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী। এই শহরটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র।

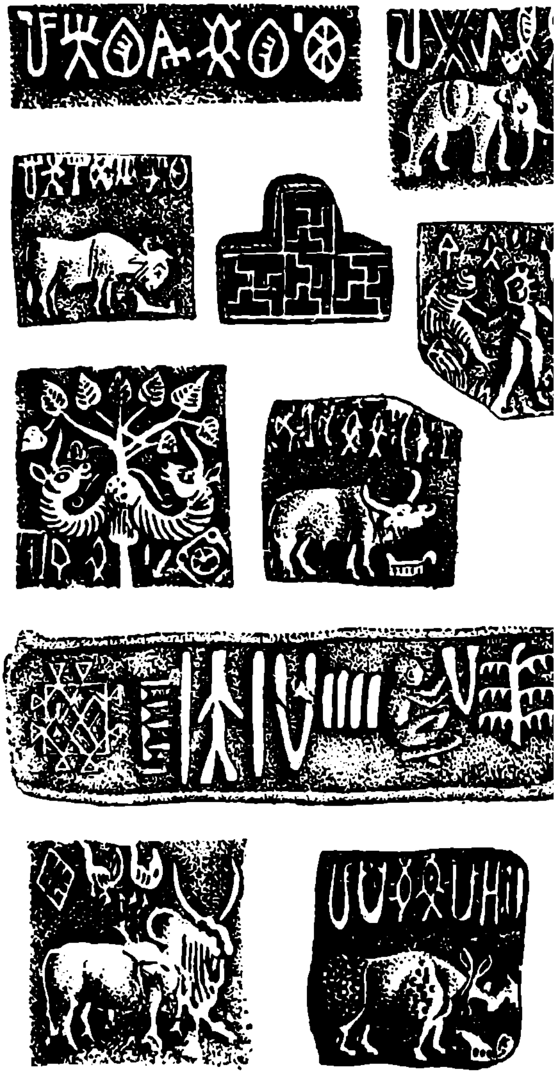

*সিন্ধু সভ্যতার কিছু নিদর্শন : মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত 'সিল'*

রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের বৃহত্তম সেনানিবাস অবস্থিত। পতোয়ার মালভূমিতে বিদ্যমান ইসলামাবাদ পাকিস্তানের বর্তমান রাজধানী। কোয়েটা বেলুচিস্তানের রাজধানী, বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যনিবাস। শিয়ালকোট খেলাধুলার সামগ্রী, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, ছুরি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। সিন্ধু প্রদেশের লারকানার নিকটবর্তী মহেনজোদারো (দ্র) এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পা (দ্র) প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার (দ্র) নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত।

মু. এ.



www.pathagar.com

## পাকিস্তান আন্দোলন

বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে ভারতে (দ্র) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যেসব সাম্প্রদায়িক জটিলতা দেখা দিচ্ছিল সেখানেই নিহিত ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে বিভক্ত করে নতুন পূর্ববঙ্গ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা নেয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনও (দ্র) সম্প্রদায়গত বিভাজন অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। এই সময় ১৯০৬ সালে ঢাকায় ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার

*পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ পদক পরাচ্ছেন এক জন সৈনিককে—পেছনে তৎকালীন প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান*

উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ (দ্র) দল গঠিত হয়। এ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে লীগের অন্যতম লক্ষ্য হবে 'ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রবর্ধিত করা'।

নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন অগ্রসর হয়। ১৯১৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সঙ্গে মুসলিম লীগের সমঝোতার নীতি হিসাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ১৯১৯ সাল থেকে খিলাফত আন্দোলনে (দ্র) কংগ্রেস সমর্থন ও সহযোগিতা করতে থাকে। তেমনিভাবে মুসলমানেরাও যোগ দেয় অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র)। মিলনের এই ধারা বেঙ্গল প্যাক্টেও প্রতিফলিত হয়। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত সংগ্রামের ধারা আবার ক্ষুণ্ন হয় ১৯২৩ ও পরবর্তী বছরগুলোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও উভয় সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী নেতাদের আচরণের কারণে।

১৯৩০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে কবি মুহম্মদ ইকবাল (দ্র) ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ধারণা প্রথম তুলে ধরেন।

১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজে চৌধুরী রহমত আলী প্রথম 'পাকিস্তান' (দ্র) শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমানদের জন্য পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানানো হয় : পাকিস্তান (P = পাঞ্জাব, A = আফগানিয়া, K = কাশ্মীর, S = সিন্ধু, Tan = বেলুচিস্তান)। ১৯৩৮ সালে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুল লতিফ একটি পুস্তিকায় ভারতে চারটি মুসলমান সাংস্কৃতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন। এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম ব্লক (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে), উত্তর-পূর্ব ব্লক (পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে), দিল্লি লখনৌ ব্লক এবং দাক্ষিণাত্য ব্লক। তিনি এগুলোকে নিয়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এর পর পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ থেকেও ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব ওঠে, যেগুলো পাকিস্তান পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই পরিবেশে ভারতে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে নানা কারণে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনি এক পরিবেশে ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত



www.pathagar.com

মুসলিম লীগের সম্মেলনে এ. কে. ফজলুল হক (দ্র.) 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপন করেন, যা লাহোর প্রস্তাব (দ্র) হিসাবেও পরিচিতি অর্জন করেছে। প্রস্তাবে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র (states) গঠনের কথা বলা হলেও পরে ১৯৪৬ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একে (অর্থাৎ s অক্ষরটিকে) ছাপার ভুল হিসাবে উল্লেখ করে একক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি সুস্পষ্ট করে তোলেন। এই সময় থেকে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই পৃথক জাতি— ধর্মভিত্তিক এমনি দ্বিজাতি-তত্ত্বের বাণী নিয়ে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের প্রচারণা দেশব্যাপী প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এহেন পটভূমিকায় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল সাফল্য অর্জন করে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে) তাদের বিজয় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা প্রায় অনিবার্য করে তোলে। ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ আহূত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। এই ব্যাপক রক্তপাত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট্ব্যাটেন্ (দ্র) ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতিক্রমে ভারত বিভক্ত হয়ে ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। শেষ মুহূর্তে বাংলার মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র) ও আবুল হাশিম (দ্র) কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্র বসুর (দ্র) সঙ্গে মিলে বাংলাকে বিভক্ত না করে অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার একটি ব্যর্থ চেষ্টা নেন।

যে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের দুই প্রান্তের বহু জাতি অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে একটি রাষ্ট্রকাঠামোর আওতাধীন করা হল তার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব ও তুলনাহীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। এই রাষ্ট্রের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল হাজার মাইলের ফারাক। ভৌগোলিক ব্যবধান ছাড়াও দুই অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সবই ছিল আলাদা। পাকিস্তানের এই নাজুক ভিত্তি এবং দ্বিজাতি-তত্ত্বের অসারতা আরো ন্যক্কারজনকভাবে প্রকাশ পেল যখন পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে তাদের আধিপত্য পূর্বাংশের ওপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হল। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে যে ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সূত্রপাত ঘটে, তাই ক্রমশ রূপ লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র)। পাকিস্তানের অবাস্তব কাঠামো ভেঙে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ম. হ.

**পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ** আতাউর রহমান খান দ্র

**পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন** কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন দ্র

**পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ** কাজী মোতাহার হোসেন দ্র

## পাখি

মেরুদণ্ডী ও পালকওয়ালা প্রাণী (দ্র), যা উড়তে পারে। পাখি ছাড়া পতঙ্গ ও বাদুড়ও উড়তে পারে। তবে পতঙ্গের মেরুদণ্ড নেই এবং বাদুড় পালকবিহীন স্তন্যপায়ী (দ্র) জীব।

ওড়ার জন্য প্রচুর শক্তি ও হালকা দেহের প্রয়োজন। পাখির হাড়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁপা, কাজেই হালকা হাড়ের গড়ন এগুলোকে শক্তিশালী করেছে। পাখির পালক নমনীয় এবং এর মাধ্যমে পাখি পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। পাখির ডানা মানুষের বাহু ও হাতের সঙ্গে তুলনীয়, তবে ওড়ার জন্য এতে বেশ পরিবর্তন হয়েছে।



www.pathagar.com

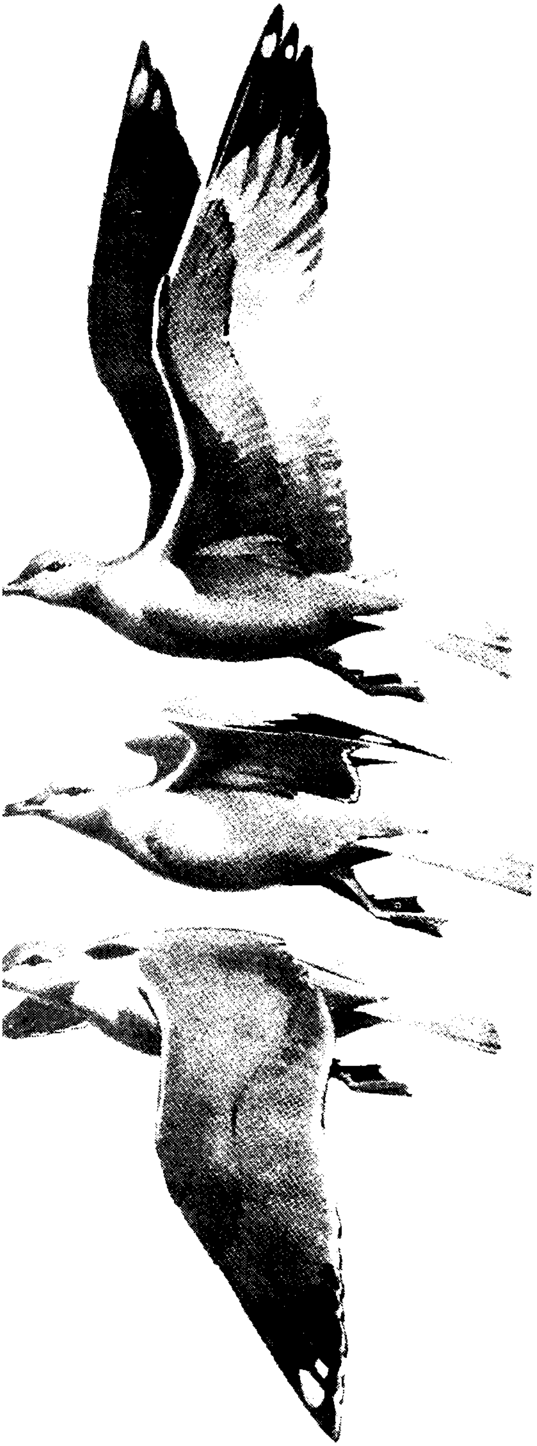

*ডানা ঝাপটিয়ে পাখি আকাশে ওড়ে*

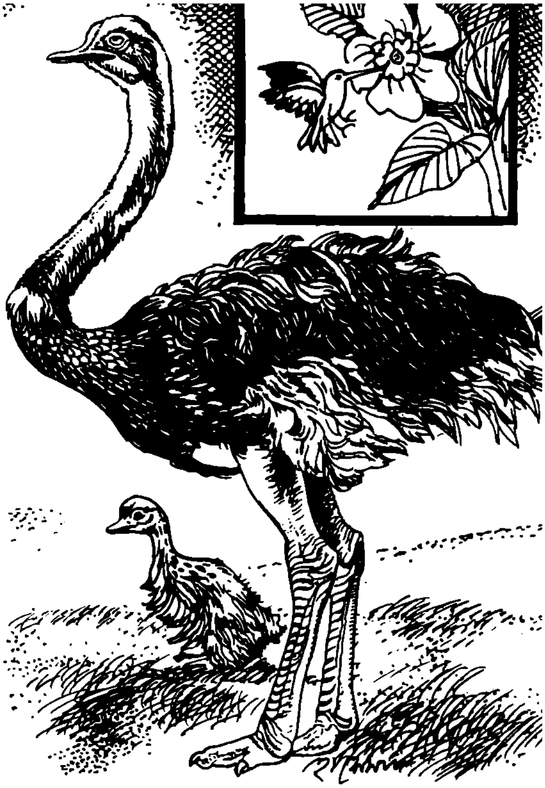

*সবচেয়ে ছোট পাখি 'হামিং বার্ড' ফুল থেকে মধু খাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় পাখি—উটপাখি ও একটি উটপাখির ছানা।*

পাখির ওড়ার সঙ্গে বিমানের ওড়ার বেশ সাদৃশ্য আছে। বিমান পাখা ও প্রপেলারের সাহায্যে ওড়ে। পাখির ডানা ঐ দুটো কাজই করে। ডানা ঝাপটিয়ে পাখি আকাশে উঠে পড়ে।

আর্কিওপটেরিক্স থেকে আধুনিক পাখির উদ্ভব বলে মানা হয়। জীবজগতে পাখি শ্রেণীর (class) প্রায় ৮,৬০০ প্রজাতি (species) রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে কিউবার হামিং বার্ড সবচেয়ে ছোট— লম্বায় মাত্র ৬.৩ সেণ্টিমিটার এবং ওজনে তিন গ্রামের চেয়েও কম।

অস্ট্রিচ বা উটপাখি (দ্র) হল সবচেয়ে বড় প্রজাতি। এটি প্রায় ২.৫ মিটার লম্বা ও ১৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের। দেহের ওজনের ভারে অস্ট্রিচ উড়তে পারে না।

আলবাট্রস পাখির রয়েছে বিশাল ডানা। এর ডানা দুটো প্রায় ৩.৫ মিটার প্রশস্ত।

মু. হা.



www.pathagar.com

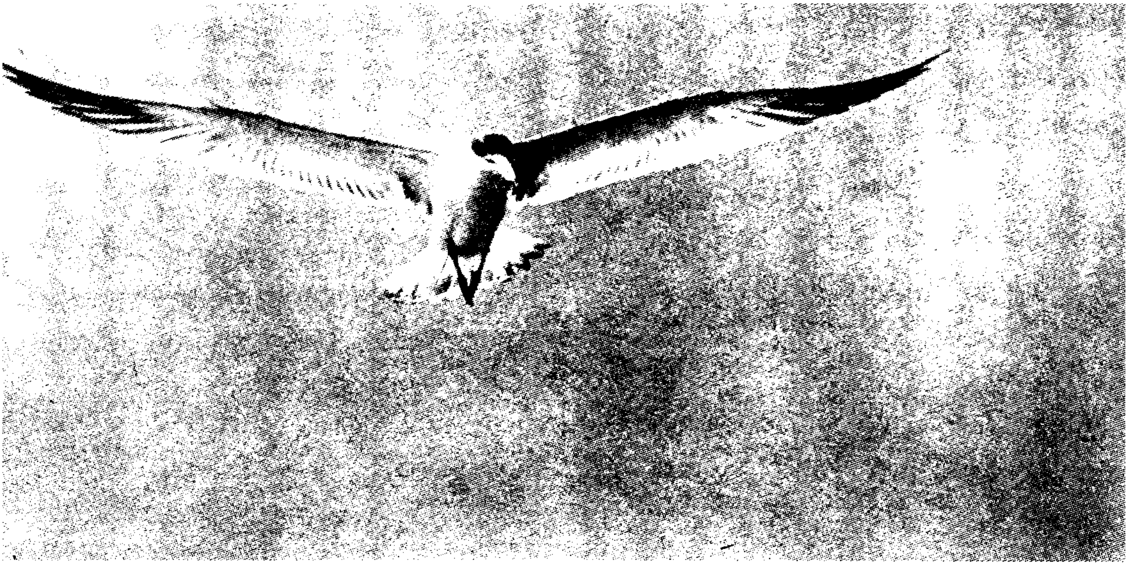

*আলবাট্রস পাখির রয়েছে বিশাল ডানা*

**পাখি, পরিযায়ী** (migratory bird)

পাখা থাকার সুবাদে পৃথিবীর (দ্র) প্রায় সর্বত্রই পাখিদের আবাস। আবাসস্থলে কোনো সঙ্কট দেখা দিলে পাখি সহজে নিকটতম নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে; আবার পরিস্থিতির উন্নতি হলে নিজ বাসভূমে ফিরে আসে।

যেসব প্রজাতির পাখি নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট মৌসুমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া-আসা করে, সেগুলোই পরিযায়ী বা পরিব্রাজক পাখি। এই আসা-যাওয়া মোটামুটি তিন ধরনের—উত্তর-দক্ষিণ পরিভ্রমণ মূলত দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা হ্রাসের জন্য, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে আসা খাবারের জন্য আর নির্দিষ্ট এলাকায় কোনো কোনো প্রজাতি যায় প্রজননের জন্য।

মরু অঞ্চলের কোনো কোনো প্রজাতি কোথাও বৃষ্টি হলে, তা সে বছরের যে সময়েই হোক না কেন, সেখানে চলে যায়। এই স্থানান্তরে যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট গমনপথ ও সময়সূচি নেই। এগুলোকে তাই পরিযায়ী প্রজাতি ধরা হয় না। এই প্রজাতির পাখিকে বলা হয় নোমাড (nomad) বা যাযাবর।

দূর-দূরান্তে যাবার জন্য অধিকাংশ প্রজাতিই পাখা ব্যবহার করে। তবে পেঙ্গুইনের মতো হেঁটে বা সাঁতার কেটে যাওয়া প্রজাতিও রয়েছে। কোনো কোনো সামুদ্রিক পাখি পাখা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ যাত্রাপথের একটি অংশ সাঁতার কেটে অতিক্রম করে।

পাখিদের পরিযায়ী হবার ধরন, প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। বলা হয়, শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন, তাপমাত্রা হ্রাস এবং সর্বোপরি আহার্যের সঙ্কট পাখিকে পরিযায়ী করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

যেসব পাখি পাহাড় থেকে নেমে আসে সেগুলোর ভ্রমণ-পথ খুবই কম। আবার কোনো কোনো প্রজাতির পাখি ৫,০০০ কিলোমিটারের দীর্ঘ পথও পাড়ি দেয়।

দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে পরিযায়ী প্রজাতির সদস্যরা যাত্রারম্ভের মাসখানেক আগে থেকে প্রচুর খাওয়াদাওয়া করতে থাকে। শরীরে চর্বি জমার কারণে এই সময় এদের দেহের ওজন এমনকি দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়। শরীরের এই সঞ্চিত চর্বিই তাকে দীর্ঘ যাত্রাপথে শক্তি যোগায়। অবশ্য এর পরও আহার সংগ্রহের জন্য যাত্রাবিরতির প্রয়োজন হয়।

প্রতি বছর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য পাখিরা আকাশে তারার অবস্থান, সূর্য, ভূমির বৈশিষ্ট্য



www.pathagar.com

রাতের বেলায় আকাশে তারার অবস্থান দেখে পরিযায়ী পাখি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়

এবং সম্ভবত পৃথিবীর চৌম্বকীয় নিশানা ব্যবহার করে পথ চিহ্নিত করে। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যই পরিযায়ী। আবার কোনো প্রজাতির কিছু পুরুষ সদস্য শীতকালে আবাসভূমি পাহারা দেওয়ার জন্য থেকে যায়।

পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে দীর্ঘতম রাস্তা পাড়ি দেয় *আর্কটিক টার্ন (Sterna paradisae)* । এটি প্রতি বছর উত্তর মেরু অঞ্চলে যায় এবং ফিরে আসে।

আমাদের দেশে প্রতি বছর শীতকালে প্রচুর প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে। এদের অধিকাংশই সাইবেরিয়ার শীতপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা।

মু. হা.

## পাখির বাসা

মাত্র কয়েক প্রজাতির পাখি ছাড়া দুনিয়ার সব পাখি বাসা বাঁধে। প্রায়ই বাসা করে গ্রীষ্ম-বসন্তকালে।

অধিকাংশ পাখিই শুধু ডিম-বাচ্চা তোলার জন্য বাসা করে, থাকার জন্য নয়। পাখির বাসা চমৎকার শিল্পকর্ম যেন।

বাসা বাঁধা শেষ করে পাখিরা ডিম পাড়ে। তার আগে বাসা বাঁধার জায়গা নির্বাচনে বের হয়। স্ত্রী পাখির পছন্দই চূড়ান্ত।

বাসা বাঁধার আগে পাখিরা কয়েকটি দিকে লক্ষ রাখে। আশেপাশে খাবার ও পানি থাকা, শত্রুর দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে থাকা, বাতাস কোন দিক দিয়ে বইছে ইত্যাদি।

বাসার উপাদান শুকনো লতাপাতা, ডালপালা, মাকড়সার জাল, খড়কুটো ইত্যাদি। কেউ কেউ অন্য পাখির পরিত্যক্ত লোম ও নিজ মুখের লালাও ব্যবহার করে। বড়দের বাসা বড় ও অগোছালো। ছোটদের বাসা ছোট, গোছালো ও শিল্পমণ্ডিত। কেউ কেউ তুলা (দ্র), কাশফুল ও নরম ঘাস দিয়ে গদি বানায়। কাশফুল দিয়ে বাসা করে মুনিয়ারা। ধান-খেজুরের পাতা সরু করে চিরে বাসা করে বাবুইরা (দ্র)। টুনটুনি বাসা করে একাধিক গাছের পাতা ঠোঁটে সেলাই করে। ছোট পাখিদের বাসা হয় গোলাকার, চায়ের কাপ বাটির মতো। ঘুঘু (দ্র) পাখির বাসা অগোছালো। সানবার্ড গোষ্ঠীর পাখিরা (নীলটুনি, মৌটুসি) ও বাবুইরা



www.pathagar.com

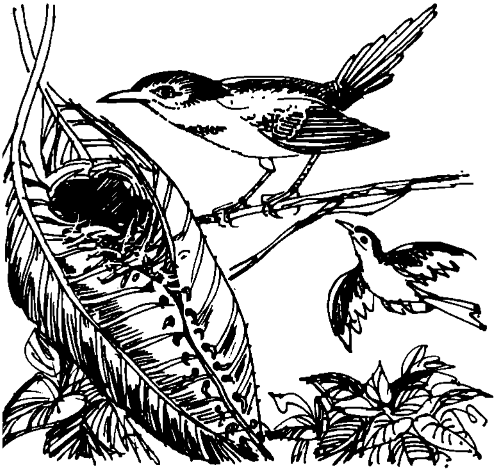

*বাবুই পাখির বাসা*
*বামে উপরে : টুনটুনির বাসা, মাঝে : মাছরাঙা ও সুঁইচোরা পাখির বাসা, নিচে : হলদে পাখির বাসা।*

(দ্র) থলের মতো বাসা করে। বাবুইয়ের বাসা সাপুড়ের সাপ খেলাবার বাঁশির মতো দেখতে।

অধিকাংশ পাখি গাছে বাসা করে। আবার কেউ বা করে গাছের ডাল ও খোঁড়লে। মাটিতে গর্তও করে কেউ কেউ। এই দলে পড়ে মাছরাঙা (King fisher), সুঁইচোরা (Bee eater)। রাতচরা, হট্টিটি ইত্যাদি পাখি মাটিতেই ডিম পাড়ে। কোকিল–পাপিয়ারা অন্যের বাসায় লুকিয়ে ডিম পাড়ে। অনেকে বাসা করে ঝোপ-ঝাড় ও ক্ষেতের আইলের ভিতরে।

পাহাড়-পর্বত-টিলার চুড়ো ও গর্তে, সমুদ্রের কিনারে, শহরের দরদালানের ফাঁক-ফোঁকরেও কেউ কেউ বাসা করে।

সবচেয়ে সুন্দর বাসা কোন পাখি বাঁধে তা নির্ণয় করা কঠিন। বাবুই, সানবার্ড, মুনিয়া, হামিং বার্ড, দুধরাজ ইত্যাদি পাখির বাসা অত্যন্ত সুন্দর।



www.pathagar.com

*ঈগল—সবচেয়ে উঁচুতে বাসা বানায়*

সবচেয়ে বড় বাসা বাঁধে সোনালি ঈগল। এদের বাসা ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে। এর বেড় ৯১ সেন্টিমিটার। ছোট বাসা হামিং বার্ডের। একটি চড়ুইয়ের ডিমকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ চিৎ করে বসিয়ে দিলে যতটুকু হয়, অতটুকুই বাসা।

সবচেয়ে উঁচুতে বাসা করে ঈগল (দ্র) শকুনেরা (দ্র)। অনেকে কলোনির মতো বাসা করে। কিছু পাখির অন্যের বাসা দখলের প্রবণতা রয়েছে , যেমন টিয়াপাখি (দ্র)।

পাখিরা বাসা করে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। সহজে নজরে পড়ে না। বাসা বাঁধার আগে অনেকে গলা ছেড়ে ফূর্তিতে গান গায়, নাচে। পাখিরা না দেখেও তাদের পূর্বপুরুষদের একই ধারায় বাসা বাঁধতে পারে। তবে কেউ কেউ প্রথম বাসা বাঁধার সময় আনাড়িপনা করে। বাচ্চারা বাসা ছাড়লে অধিকাংশ পাখিই ঐ বাসা ত্যাগ করে। নতুন করে আবার বাসা বাঁধে।

অনেক জাতের পুরুষ পাখি বাসা বাঁধতে স্ত্রীকে সাহায্য করে না। কয়েক প্রজাতির পাখির বাসার স্যুপ খাওয়া হয়। বাংলাদেশের বাবুই, সানবার্ড, হলদে বউ, নাচুনেরা সুন্দর বাসা করে।

**শ. খা.**

## পাখোয়াজ

চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। তালবাদ্যে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদ (দ্র) সঙ্গীতে পাখোয়াজ বাদন প্রশস্ত। নম্র ধ্বনি সৃষ্টিকারী— এই অর্থে পাখোয়াজ কথাটির ব্যবহার। একটি ফুট দুয়েক লম্বা কাঠের খণ্ড খোদাই করে তা দুই পাশে চামড়ায় ছেয়ে পাখোয়াজ তৈরি করা হয়। এই খোল বা লকড়ির ডান প্রান্ত বাম প্রান্ত অপেক্ষা একটু সরু হয় এবং মাঝখানটা হয় দু'পাশ থেকে কিঞ্চিৎ স্থূল। পাখোয়াজের ডান দিকের মুখের

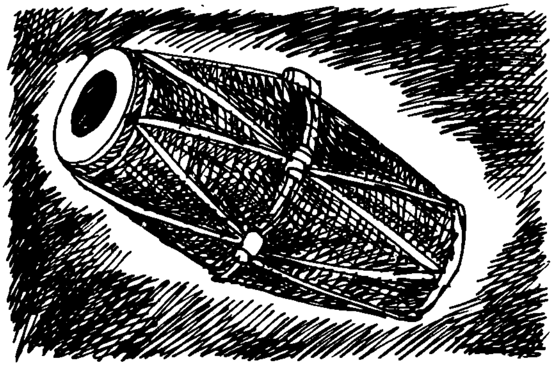

ব্যাস সাত ইঞ্চি হলে বাম দিকের মুখের ব্যাস হয় আট বা নয় ইঞ্চি। এর ডান মুখে খিরণ ব্যবহার করা হয়। বাম মুখে খিরণ থাকে না। বাজাবার পূর্বে সেখানে আটা বা ময়দার পোড় লাগিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে আওয়াজে গাম্ভীর্য আসে। দুই পাশের ছাউনি চামড়ার দোয়ালির সাহায্যে টানা থাকে। দোয়ালির ভিতর দিয়ে আটটি কাঠের গুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গুলিসমূহের স্থান পরিবর্তন করে পাখোয়াজের সুর করা হয়। পাখোয়াজ একটি শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্র। বহু ঘরানাক্রমে এর সমৃদ্ধ বাদনধারার বিকাশ হয়েছে। পাখোয়াজ বাদনের বিকাশে বাঙালির বিশেষ অবদান আছে। ধ্রুপদ ধারার রবীন্দ্রসঙ্গীতে (দ্র) পাখোয়াজ সঙ্গত করা হয়।

**ক. গো.**

## পাঞ্চজন্য–১

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে সংহ্রাদ নামক এক অসুরের উল্লেখ আছে। অসুর সংহ্রাদের পুত্রের নাম পঞ্চজন। এই পঞ্চজন শব্দ থেকে 'পাঞ্চজন্য' শব্দটি এসেছে। অসুর পঞ্চজন একদা সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে স্নানরত সন্দীপনী



www.pathagar.com

মুনির পুত্রকে হরণ করে নিয়ে যায়। কৃষ্ণ ছিলেন সন্দীপনী মুনির শিষ্য। তিনি গুরুর অনুরোধে গুরুপুত্রকে প্রভাস থেকে অসুর পঞ্চজনের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এতে গুরু সন্দীপনি মুনি কৃষ্ণের প্রতি খুব খুশি হন। তিনি কৃষ্ণকে পুরস্কার স্বরূপ 'পাঞ্চজন্য' নামক একটি শঙ্খ দান করেন। নিহত অসুর পঞ্চজনের হাড় দিয়ে তৈরি বলে এই শঙ্খের নাম হয় 'পাঞ্চজন্য'। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সময় 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজাতেন।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে 'পাঞ্চজন্য' শব্দটি অমঙ্গলকে তাড়িয়ে মঙ্গলকে আবাহন অর্থে প্রয়োগ করেছেন :

হে পার্থ-সারথি
বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর
ভয়-ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক।

শ. আ.

**পাঞ্চজন্য–২**

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ১৯১১ সালে চট্টগ্রাম (দ্র) থেকে সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তদানীন্তন বাংলার অন্যতম বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা ও চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী মহিমচন্দ্র দাস (১৮৭১-১৯৪০)। ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়ায় এ পত্রিকা বেশি দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এ সময় মহিমচন্দ্র দাসের বন্ধু শ্রী কালীশঙ্কর চক্রবর্তীর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'জ্যোতিঃ' পত্রিকা দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হলে মহিমচন্দ্র এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন। কিন্তু এ পত্রিকাও রাজরোষে পড়ে স্থায়ী হতে না পারায় ১৯২৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এ বছরই অর্থাৎ ১৯২৯ সালেই ছোট ভাই অম্বিকাচরণ দাসের সহায়তায় সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। মহিমচন্দ্র দাস 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ৮ পৃষ্ঠার 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' অবিভক্ত বাংলার কলিকাতার (দ্র) বাইরে থেকে প্রকাশিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র) চলাকালীন সময়ে কাগজের চরম অভাব ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় পত্রিকার সাইজ ও পৃষ্ঠা- সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে।

'দৈনিক পাঞ্চজন্য' ছিল সর্বতোভাবে মানসম্মত, সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি দৈনিক পত্রিকা। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিকাশ সাধনে এ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এ পত্রিকার নিয়মিত ও বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), বুদ্ধদেব বসু(দ্র), শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (দ্র) ও মুহম্মদ এনামুল হক (দ্র)-সহ বহু প্রখ্যাত লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

'দৈনিক পাঞ্চজন্যে'র শেষের পর্যায়ে সম্পাদক ছিলেন শ্রী অম্বিকাচরণ দাস। পরাধীন ভারতবর্ষের বাংলায় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে 'দৈনিক পাঞ্চজন্যের' ভূমিকা ছিল গৌরবময় ও প্রশংসনীয়। এ ভূমিকার কথা সমকালীন নানা ঘটনাপ্রবাহ ও প্রসঙ্গ থেকে জানা যায়।

১৯৩১ সালের ৩০শে আগস্ট চট্টগ্রামে পাহাড়তলী খেলার মাঠে ফুটবল খেলা শেষে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের পিস্তলের গুলিতে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর আহসানুল্লাহ নিহত হয়। এ ঘটনাকে ব্রিটিশ শাসকেরা সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক রূপ দান করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাধিয়ে দেয়। ইংরেজ শাসকেরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কিছু অসৎ প্রকৃতির ভাড়াটিয়া লোককে শহরের নানা জায়গায় লুণ্ঠনকাজে নিয়োগ করে। এ সময় এই আক্রমণ ও লুণ্ঠনের শিকার হয় 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকা। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' গ্রন্থে লেখক পূর্ণেন্দু দস্তিদার (দ্র) লিখেছেন :

"শহরের এই পরিকল্পিত লুণ্ঠনলীলার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তখনকার দিনের কলিকাতার বাইরে অবিভক্ত বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'পাঞ্চজন্যে'র ওপর হামলা। চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের নেতা মহিমচন্দ্র দাস তখন লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে বন্দি আছেন। তিনিই 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার প্রধান পরিচালক। 'পাঞ্চজন্য' কংগ্রেসের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার প্রথম থেকে এই পত্রিকায় ঐ দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বন্দিদের মামলার সমস্ত খবর খুবই বিস্তারিতভাবে উঠত। তার জন্য গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টর হত্যার পরে



www.pathagar.com

পুলিশ সার্জেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে ঐ পত্রিকা-অফিসের উপর আক্রমণ চালায়। অন্যতম কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাস তখন 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক। ঐ সময় তিনিও অফিসে ছিলেন না। বর্বর পুলিশের দল 'পাঞ্চজন্য' অফিসে ঢুকেই পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রী হীরেন চৌধুরীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে এবং তাঁর মাথায় বন্দুকের কুঁদা দিয়ে আঘাত করে। ফলে তাঁর মাথা থেকে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তিনি বহুদিন হাসপাতালে ছিলেন। ছাপাখানার জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে, অন্যান্য কর্মীদের মারধর করে ফিরে যাবার সময় তারা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার বড় মূল্যবান ছাপার যন্ত্রটি ভেঙে দিয়ে যায়।"

শ. আ.

## পাট

আঁশ জাতীয় উদ্ভিদ (দ্র), তুলার (দ্র) পর প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র) ও চীনে (দ্র) পাট উৎপন্ন হয়। প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল বলে এক সময় পাটকে বাংলাদেশের 'সোনালি আঁশ' বলা হত।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং প্লাবনভূমির দোআঁশযুক্ত পলিমাটি পাটচাষের উপযোগী। সাধারণত ধান (দ্র) ও পাট পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ করা হয়। দুটো প্রজাতির পাটের চাষ হয়— *দেশী পাট* (Chorcorus Capsularis) ও *তোষা পাট* (Chorchorus Olitorius) ।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাটগাছ ২ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছ খাড়া, শুধু ডগার দিকে শাখায় বিভক্ত। হালকা সবুজ রঙের পাতা। হলদেটে সাদা রঙের ফুল পাতার উল্টোদিকে গুচ্ছাকারে ফোটে।

পাতা ঝরতে শুরু করলে পাটগাছ কেটে পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়। দিন দশেকের মধ্যে গাছ নরম হলে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। পরে ঐ আঁশ শুকিয়ে পাটকলে পাঠানো হয়। বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে নানা কুটিরশিল্পসামগ্রী, শৌখিন ও গৃহস্থালি সামগ্রী, কার্পেট ইত্যাদি।

সিন্থেটিক বা কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের পর থেকে পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার অনেক কমেছে। কৃত্রিম তন্তু টেকসই ও সস্তা, কিন্তু তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পাটজাত দ্রব্যাদি পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। এই কারণে পৃথিবীব্যাপী পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার পুনরায় বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মু. হা.

**পাটনা** গঙ্গা নদী দ্র

**পাটলীপুত্র** গঙ্গা নদী দ্র

**পাটীগণিত** গণিত দ্র

## পাঠ্যপুস্তক

পুস্তক মাত্রই পাঠের জন্য। সে অর্থে সব পুস্তকই পাঠ্য। কিন্তু পাঠ্য হলেও সব পুস্তকই পাঠ্যপুস্তক নয়। আভিধানিক অর্থে যে পুস্তক পাঠ করার যোগ্য বা উপযোগী তাই পাঠ্যপুস্তক। যেসব বই নানা কারণে, বিশেষত পাঠক্রমানুযায়ী পরীক্ষা পাস, পদোন্নতি, পেশায় দক্ষতা অর্জন ইত্যাদির জন্য পাঠ



www.pathagar.com

করতে হয় তাই পাঠ্যপুস্তকরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিতভাবে যে পুস্তক রচিত হয় তাকেই 'পাঠ্যপুস্তক' বলা হয়।

শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, গ্রহণযোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী এক দিকে যেমন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়, তেমনি বিষয়বস্তুর ভারও (load) সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়। কোনো বিষয়ের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী যেসব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সেগুলো মূলত স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের।

পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হওয়া উচিত সহজবোধ্য। তবে বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় বৈচিত্র্য থাকতে পারে। ভাষা শেখার বইয়ে যে পরিমাণ সৃজনশীলতা লক্ষ করা যাবে, সঙ্গত কারণে অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে সে পরিমাণে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশের (দ্র) মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য কোনো সুলভ ও পর্যাপ্ত শিক্ষা-উপকরণ নেই। এখানে পাঠ্যপুস্তকই হল একমাত্র প্রধান শিক্ষা-উপকরণ। এমনকি বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভের সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম ও উপকরণ হল পাঠ্যপুস্তক।

পাঠ্যপুস্তকের ভাষা উপস্থাপনপদ্ধতি, বিন্যাস ও আয়তন কেমন হবে, তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর মেধা, ধারণক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ওপর। অন্য দিকে পাঠ্যপুস্তকের কাগজ, প্রচ্ছদ, অঙ্গসৌষ্ঠব, ছবি, বাঁধাই, মুদ্রণসৌকর্য ইত্যাদিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষাধারা প্রচলিত রয়েছে, তা হল— ১. সাধারণ ২. কারিগরি ও ৩. মাদ্রাসা শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায়ও রয়েছে রকমফের। প্রত্যেক ধারার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের নিরিখেই তৈরি হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে ধরনের শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তা হল :

ক. প্রাক্-প্রাথমিক (নার্সারি, কেজি-১ ও ২, প্লে-গ্রুপ, শিশুশ্রেণী)।

খ. প্রাথমিক স্তর (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)

গ. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী)

ঘ. মাধ্যমিক স্তর (৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

ঙ. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী (১১শ ও ১২শ শ্রেণী)

চ. স্নাতক (বি. এ., বি. কম., বি. এসসি. : সম্মান শ্রেণী, সাবসিডিয়ারি)

ছ. স্নাতকোত্তর (এম. এ., এম. কম., এম. এসসি ইত্যাদি)।

কারিগরি শিক্ষার ধারায় এ দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের কথা আসে।

তৃতীয় ধারায় রয়েছে মাদ্রাসা-শিক্ষা। মাদ্রাসা-শিক্ষার অন্তর্গত ১. ইবতেদায়ী, ২. দাখিল, ৩. ফাজেল, ও ৪. কামিল শ্রেণীর জন্য রচিত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক।

উপরে বর্ণিত তিনটি ধারা ব্যতীত আরো রয়েছে ১. চিকিৎসা, ২. নার্সিং, ৩. গার্হস্থ্যবিদ্যা, ৪. কৃষি, ৫. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, ৬. সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা। এসব বিষয়ের জন্যও বাংলা ভাষায় রচিত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর নির্দিষ্ট কয়েকটি বইসহ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সমুদয় পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশ করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এ ছাড়া বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অনেক বিষয়ের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক (Supplementary Reader, Guidebooks) অনুমোদন দিয়ে থাকে। বোর্ডের প্রাথমিক স্তরের বিনা মূল্যে বিতরণের বইগুলো সাদা কাগজে এবং মূল্যের বইগুলো নিউজপ্রিন্টে ছাপা হচ্ছে। এসব পুস্তকের প্রচ্ছদ ও ছবি তুলনামূলকভাবে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আকর্ষণীয়। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের যেসব বই বোর্ড প্রকাশ করে, তাতে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের লালচে বুকপ্রিন্ট কাগজ। এ দেশে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ও বিতরণ করে থাকে



www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত বেসরকারি প্রকাশকগণ। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমুদয় পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি প্রকাশকগণ প্রকাশ ও সরবরাহ করে থাকে। বাংলা একাডেমী (দ্র) উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে আসছে।

এ দেশে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষক-সংস্করণগুলো শ্রেণীকক্ষে প্রবর্তনের আগে দেশের নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে বইগুলোর উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য এক বছর পড়ানো হয়। তার পর বইয়ের ভাষা, বিষয়বস্তু, ছবি, উপস্থাপনা ইত্যাদি পরীক্ষার্থীদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছে তার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ শ্রেণীকক্ষে চালু করা হয়।

বাংলাদেশে সার্বিকভাবে পাঠ্যপুস্তকের মান আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন।

শ. আ.

## পাণিনি [আনু. খ্রি.পূ. ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ]

পাণিনি ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক প্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণসূত্র তাঁর চেয়ে বিশদভাবে আর কেউ লেখেন নি। সারা বিশ্বেই প্রাচীনতম ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম এক জন হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়।

পাণিনির জন্ম পেশোয়ার অঞ্চলে। তাঁর পিতার নাম দেবল, মা'র নাম দাক্ষী দেবী। বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি পেশোয়ার থেকে সুদূর পাটলিপুত্র (এখনকার পাটনা) পর্যন্ত এসেছিলেন এবং এখানেই নানা শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর কালজয়ী কীর্তি তার ব্যাকরণ গ্রন্থ, যা 'পাণিনি ব্যাকরণ' বা 'পাণিনি' হিসাবে পরিচিত। এই ব্যাকরণ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলে একে 'অষ্টাধ্যায়ী'ও বলা হয়। এই গ্রন্থে চার হাজারেরও বেশি ব্যাকরণসূত্র বা ব্যাকরণের নিয়মকানুন দেওয়া আছে।

পাণিনির প্রায় দু' শ' বছর পরে পতঞ্জলি নামে এক পণ্ডিত তাঁর ব্যাকরণের বিশদ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন, তার নাম মহাভাষ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে পতঞ্জলির মহাভাষ্য ছাড়া পাণিনিকে বোঝা যায় না।

হা. মা.

## পাণ্ডা

ভালুকের মতো দেখতে সাদা-কালো জায়ান্ট পাণ্ডাকেই সবাই পাণ্ডা (panda) বলে জানে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে পাণ্ডা বলতে জায়ান্ট ও রেড দু'প্রজাতির স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণীকেই বোঝায়। এরা পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব চীনের পাহাড়ি ঢালের বাঁশপূর্ণ জঙ্গলে বাস করে। তবে, রেড পাণ্ডা হিমালয়ের (দ্র) আশেপাশে ভারত (দ্র), নেপাল (দ্র) ও তিব্বতেও (দ্র) আছে।

দৈত্যকায় জায়ান্ট পাণ্ডাগুলো ওজনে ১০০–১৬০ কেজি এবং লম্বায় ১.২–১.৫ মিটার হয়। চোখের চারপাশ, কান, ঘাড়, পা কালো; বাদবাকি শরীর সাদা। গোলাকার মাথাটি বেশ বড়। লেজ ছোট। প্রায় পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-পাণ্ডা মাত্র ১৪০ গ্রাম ওজনের ১-২টি বাচ্চা জন্ম দেয়।

আকৃতিতে ছোট লাল পাণ্ডাগুলো মাত্র ৩–৫ কেজি। মাথা থেকে লেজের গোড়া পর্যন্ত ৫০–৬৪ সেন্টিমিটার লম্বা। এর লোমশ লেজটিও প্রায় সমান লম্বা। পুরো শরীর লালচে-বাদামি নরম লম্বা লোমে আবৃত। মুখমণ্ডল হালকা রঙের, কিছু সাদা দাগও রয়েছে। লেজে অনেকগুলো রিং



www.pathagar.com

আঁকা। প্রায় ১৩০ দিন গর্ভধারণের পর স্ত্রীটি ১ থেকে ৪টি বাচ্চা দেয়।

দু'প্রজাতির পাণ্ডারই প্রিয় খাদ্য বাঁশের কচি ডগা। তবে রসাল পাতা, পোকা-মাকড়, মাছ ও ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীও খায়। দু'প্রজাতিই প্রায় ১৩/১৪ বছর বাঁচে। বাঁশের জঙ্গল কমে যাওয়ায় ও অবৈধ শিকারের কারণে বর্তমানে উভয় প্রজাতিই বিলুপ্তির পথে।

আ. ন. ম. আ. র.

**পাণ্ডুরোগ** জণ্ডিস দ্র

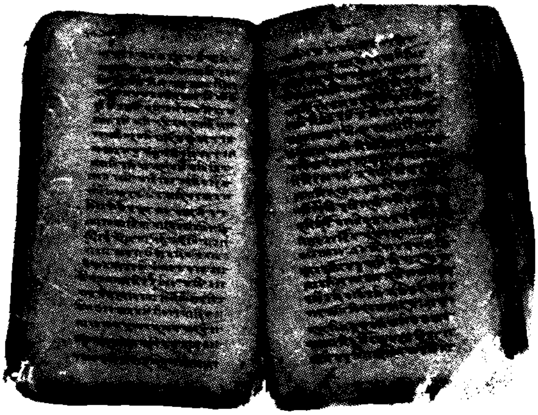

*একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি*

## পাণ্ডুলিপি (manuscript)

হাতের লেখা পাঠবস্তুকে পাণ্ডুলিপি বলে। ছাপানো বা টাইপ-করা পাঠবস্তু থেকে পাণ্ডুলিপি আলাদা। ছাপাখানার জন্মের আগে পড়ার জন্য যেসব পাঠবস্তু লেখা হত তাকে বলে পাণ্ডুলিপি। (এমনকি আধুনিক কালে ছাপার জন্য লেখা এবং টাইপ করে তৈরি পাঠবস্তুকেও পাণ্ডুলিপি বলে)।

সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি খ্রি. পূ. ৩৫০০ অব্দে প্যাপিরাসে (দ্র) লেখা হত। পরবর্তী কালে লেখার জন্য প্রচুরপরিমাণে পার্চমেণ্ট বা পশুর চামড়া ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের বাইবেলের (দ্র) ওল্ড টেস্টামেন্টের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে ১৯৪৭ সালে; প্যালেস্টাইনে।

পাণ্ডুলিপি পড়া ও লেখা গভীর চর্চার বিষয়। অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করে তার বয়স, ইতিহাস ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়। মধ্যযুগের (দ্র) পাণ্ডুলিপি প্রায়ই 'ভেলাম' (vellum) জাতীয় পশু-চামড়ার ওপর নানা রঙে চিত্রিত করা হত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনদেশে কাগজের (দ্র) আবিষ্কার হয়, কিন্তু দ্বাদশ শতকের আগে তা ইউরোপে (দ্র) অজ্ঞাত ছিল। মুদ্রণশিল্পের (দ্র) শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার পর থেকে পাণ্ডুলিপি থেকে জ্ঞান আহরণের চেয়ে সমালোচনার জন্য পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব বেড়ে যায়। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার্থী ছাড়া পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়াশোনা বা সমালোচনা আর কেউ করে না। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এখন জাদুঘর ও বড় বড় লাইব্রেরি (দ্র)-তে সংরক্ষণ করা হয়।

বি. ব.

## পাণ্ডুলিপি পাঠ-সমালোচনা

ছাপাখানা চালু হওয়ার আগে সাহিত্যের বাহন ছিল হাতে লেখা পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি (দ্র)। লেখক নিজের হাতে যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন, তাকে বলা হয় 'স্বাক্ষরিক পাণ্ডুলিপি'। এই মূল পাণ্ডুলিপি থেকে চাহিদা অনুযায়ী লিপিকর পুঁথি নকল করতেন।

পাণ্ডুলিপি লিখতে বা নকল করতে গিয়ে লিপিকরের, এমনকি স্বয়ং লেখকেরও অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটি হত—ভুল হত। এই ত্রুটি বা ভুল সাধারণত কয়েক প্রকার—পরিবর্তনজনিত, পরিবর্জনজনিত এবং সংযোজনজনিত। পাণ্ডুলিপিতে আরো থাকতে পারে ভাষা ব্যবহারের ত্রুটি, ব্যাকরণগত ত্রুটি এবং শব্দচয়নে ত্রুটি। এ ছাড়াও থাকতে পারে বানানে ভুল এবং হরফের অশুদ্ধ ব্যবহার। লিখতে গিয়ে বা নকল করার সময় অসাবধানতাবশত হরফ, শব্দ, এমনকি লাইনও বাদ পড়তে পারে। এক কথা লিখতে গিয়ে মনের ভুলে বা অমনোযোগিতার কারণে অন্য কথা বা শব্দ, এমনকি চরণ লেখাও বিচিত্র নয়। এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা ভুলে ভরা পাণ্ডুলিপি থেকে পরবর্তী কালে তৈরি অনুলিপিতেও ঐ সব ত্রুটি থাকতে পারে, ঘটতে পারে আরো অন্য রকম ত্রুটিবিচ্যুতি। ফলে পাণ্ডুলিপি পাঠে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই সব ত্রুটি ও বিভ্রান্তির ফলে পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা অনেক সময় শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। আসলে পাণ্ডুলিপির ঐ সব ভুল ও বিভ্রান্তি দূর করে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করাই পাঠ-সমালোচনার মূল কাজ।

শা. হ.



www.pathagar.com

**পাতন** (distillation)

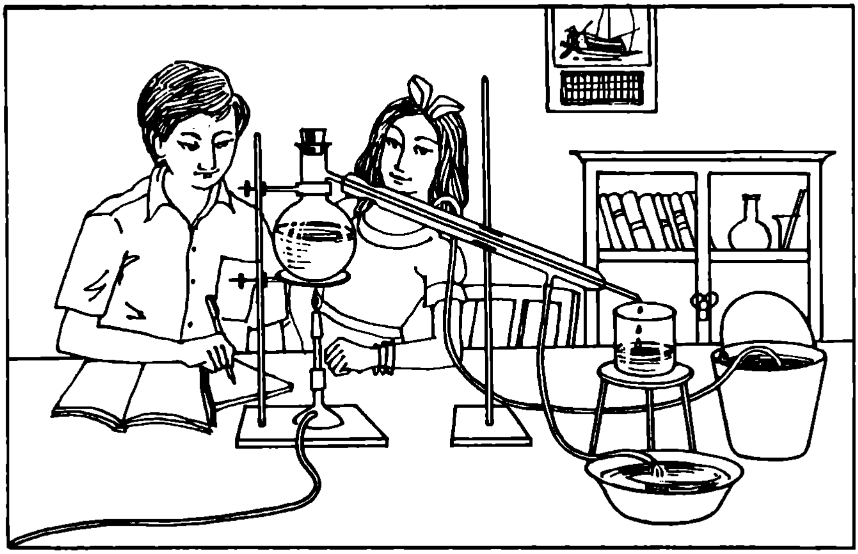

পানি (দ্র)-কে ফোটালে বাষ্পে পরিণত হয়; বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে আবার পানিতে পরিণত হয়। এভাবে পাওয়া পানি খুব পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ। এই পুরো প্রক্রিয়াকে পাতন বলা হয়; অর্থাৎ পাতন বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবনের (দ্র) সমন্বয়। পাতনের ফলে গ্রাহক ফ্লাস্কে যে তরল জমা হয়, তাকে পাতিত তরল (distillate) এবং পাতন-ফ্লাস্কে যে কঠিন পদার্থ থেকে যায়, তাকে অবশেষ (residue) বলে। সাগরের পানিকে ফোটালে পানি বাষ্প হয়ে যায়; কিন্তু কিছু লবণ তলানি হিসাবে রয়ে যায়। কোনো তরল পদার্থকে বিশুদ্ধাকারে সংগ্রহ করার জন্য পাতনক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

যেখানে বিশুদ্ধ পানির খুব অভাব, সেখানে পাতনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। যেমন—সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা শহরের পানি সরবরাহকেন্দ্র। লস এঞ্জেলেস্-এর নিকটে এক দ্বীপে দৈনিক ২৫ কোটি লিটার পাতিত পানি প্রস্তুত করার এক কারখানা আছে।

রসায়নাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাতিত পানি দরকার হয়। গাড়ির ব্যাটারির জন্যও পাতিত পানি প্রয়োজন। রোগীদের ইনজেকশন দেওয়ার জন্য পাতিত পানি ব্যবহার করা হয়।

কোনো তরল পদার্থ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। যেমন—পানির স্ফুটনাঙ্ক (দ্র) ১০০° সে. এবং অ্যালকোহলের (দ্র) স্ফুটনাঙ্ক ৭৮° সে.। ভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের দু'টি তরলের মিশ্রণকে ফোটালে প্রথমে কম স্ফুটনাঙ্কের তরল বাষ্পে পরিণত হয় এবং বেশি স্ফুটনাঙ্কের তরলটি পরে বাষ্প হয়। ফলে দু'টি তরলকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা যায়। এ ধরনের পাতনকে আংশিক পাতন (fractional distillation) বলা হয়। আংশিক পাতনের সাহায্যে খনিজ তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন (দ্র) ইত্যাদি আলাদা করা হয়।

সাধারণত কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তরলে পরিণত হয় এবং তরল পদার্থকে তাপ দিলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা তরল অবস্থায় পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে তা তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এ ধরনের পাতনকে ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) বলা হয়। আয়োডিন (দ্র), কর্পূর (দ্র), অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদির ঊর্ধ্বপাতন করা যায়।

সা. এ.

## পাতা

গাছের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখা থেকে উৎপন্ন পার্শ্বীয়, চ্যাপ্টা, প্রসারিত অসদৃশ অঙ্গের নাম পাতা। পর্বসন্ধি থেকে এর উৎপত্তি। উৎপত্তির দিক থেকে পাতা বহির্জনিষ্ণু। কক্ষে পত্রমুকুল বা পুষ্পমুকুল ধারণ করা পাতার বৈশিষ্ট্য। ক্লোরোফিল (দ্র) থাকায় পাতা সবুজ বর্ণের হয়। এর বৃদ্ধি সীমিত। এতে কোনো পর্ব বা পর্বমধ্য নেই। পাতার কোনো অগ্রমুকুল বা পার্শ্বমুকুলও নেই। একটি আদর্শ দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার পত্রমূল, পত্রবৃন্ত বা বোঁটা এবং পত্রফলক থাকে।



www.pathagar.com

উদ্ভিদের পাতা প্রধানত পাঁচ প্রকার : ক. পর্ণরাজি বা সাধারণ পাতা, খ. বীজপত্র বা ভ্রূণের পাতা, গ. শল্কপত্র বা সূক্ষ্ম পর্দার মতো অতি পাতলা পাতা, ঘ. মঞ্জরিপত্র বা পুষ্পধর পত্র, এবং ঙ. পুষ্পপত্র (যেমন বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভপত্র)।

পত্রমূল, বৃন্ত বা বোঁটা এবং পত্রফলক সাধারণ পাতার প্রধান তিনটি অংশ। বুনোট অনুযায়ী পাতা ঝিল্লিবৎ, ভঙ্গুর ও রসালো—এ তিন ভাগে বিভক্ত। পত্রফলক বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। পত্রফলকের মধ্যে ছড়ানো সরু সুতোর মতো বেশ শক্ত জালিকাকে পাতার শিরা বলা হয়। জালিকা শিরাবিন্যাস ও সমান্তরাল শিরাবিন্যাস—এ দুই প্রধান ভাগে পাতার শিরাবিন্যাস বিভক্ত।

পত্রফলক যখন অখণ্ড থাকে বা খণ্ডিত হলেও এর ছেদন মধ্যশিরাকে স্পর্শ করে না তখন তাকে একক পত্র বলে, যেমন আম পাতা। পাতার ছেদন মধ্যশিরাকে স্পর্শ করলে তাকে যৌগ পত্র বলা হয়। পত্রফলকের খণ্ডিত প্রতিটি অংশের নাম অণুফলক।

স্থায়িত্ব অনুযায়ী পাতা আশুপাতী, পাতী ও স্থায়ী—এ তিন ভাগে বিভক্ত। পাতা এবং এর বিভিন্ন অংশ পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন—মটর গাছের পাতা পত্রাকর্ষরূপে, খেজুর পাতা বা ফণীমনসার পাতা পত্রকণ্টকরূপে এবং আদা বা কাঁঠালের (দ্র) পাতা শল্কপত্ররূপে পরিবর্তিত হয়ে যান্ত্রিক কাজ সম্পাদন করে। অপরদিকে পালংশাক, পুঁইশাক ও পাথরকুচি গাছের পাতা প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে ভাণ্ডারপত্র হিসাবে জৈবনিক কাজ করে। তেমনি কলস উদ্ভিদের ফলক (পতঙ্গভুক উদ্ভিদ) পরিবর্তিত হয়ে পতঙ্গ ধরার ফাঁদ হিসাবে কাজ করে। পাথরকুচি গাছ পাতার সাহায্যে অঙ্গজ প্রজননের কাজ সম্পাদন করে থাকে। আসামের জঙ্গলে ডিস্কিডিয়া রাফ্লেসিয়ানা উদ্ভিদ এর পত্রফলককে এক প্রকার কলসে পরিবর্তন করে তাতে বৃষ্টির সময় পানি সঞ্চয় করে রাখে। পরে এর পত্রসন্ধি থেকে মূল নির্গত হয়ে কলসে ঢুকে পানি শোষণ করে।

পাতার সাধারণ কাজ সালোক সংশ্লেষণ, শ্বসন এবং প্রস্বেদন। এর বিশেষ কাজ আরোহণ ও আত্মরক্ষায় গাছকে সাহায্য করা, পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করা, পতঙ্গ ধরা ও প্রজননে অংশগ্রহণ করা। বিভিন্ন রকম পাতা শাক হিসাবে এবং চায়ের পাতা ও তামাকের পাতা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু পাতা থেকে ঔষধপত্রও তৈরি হয়।

*আকার আকৃতি ও রঙের বৈচিত্র্যে ভরপুর গাছপালার পাতা*

মু. আ.



www.pathagar.com

## পান

পাইপারেসি (piperaceae) পরিবারভুক্ত রোহিণী জাতীয় দুর্বল কাণ্ডবিশিষ্ট লতানে উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম বিটেল্ লিফ্ (betel-leaf) ও বৈজ্ঞানিক নাম *পাইপার্ বেটেল্*, লিন্ (*piper betel*, Linn)। সংস্কৃতে বলে তাম্বূল। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পানের চাষ হয়। তবে বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে বেশি পরিমাণে পানের চাষ হয়ে থাকে।

পান গাছের প্রতিটি পর্ব থেকে অল্পসংখ্যক অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এগুলোকে আরোহী মূল বলা হয়। আশ্রয়দাতা কোনো অবলম্বনকে শক্ত করে ধরে রেখে পান গাছকে লতিয়ে উঠতে সাহায্য করাই এ মূলের কাজ।

পানের পাতা অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মতো। তাই এ পাতার আকারকে হৃৎপিণ্ডাকার বা কর্ডেট (বা তাম্বূলাকার) বলা হয়। পান গাছ ছায়াতে জন্মে। তাই ঘন বেড়া ও চালা দিয়ে পান গাছকে ঢেকে রাখতে হয়। এ পদ্ধতিতে ঢেকে রাখা পানক্ষেতকে পানের বরজ বলা হয়।

পান খেলে পেট ফাঁপা কমে। পরিমিত পরিমাণ পান-পাতার রস মুখের অরুচি দূর করে। পান পরিপাকশক্তি বাড়ায়। বেশি পরিমাণে পান খেলে আবার অজীর্ণও হয়ে থাকে। পান সর্দি ও ফুসফুসের প্রদাহের ক্ষেত্রে উপকারী। প্রত্যেক দিন চার-পাঁচটি বোঁটা চিবিয়ে খেলে শরীর হাল্কা থাকে।

মু. আ.

## পানকৌড়ি (cormorant)

পানকৌড়ি, পানিকাওর, পানিকাক বা শ্যাগ (shag) জলচর পাখি। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র আছে। সমুদ্রসৈকত, নদী-নালা, খাল-বিলে বাস করে। বিশ্বে প্রজাতিসংখ্যা ২৬-৩০। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট প্রজাতিটিই টিকে আছে। বিল-হাওর-বাওর, কাপ্তাই লেক, মোহনা, খাড়ি অঞ্চলেই বেশি বাস করে। এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা যায়।

পানকৌড়ি বড় আকারের পাখি। লম্বায় ৩০-১০০ সেন্টিমিটার। পিগ্‌মি পানকৌড়ি ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। সাধারণ বা গ্রেটার পানকৌড়ি বৃহত্তম। এদের লেজ লম্বা ও প্রশস্ত

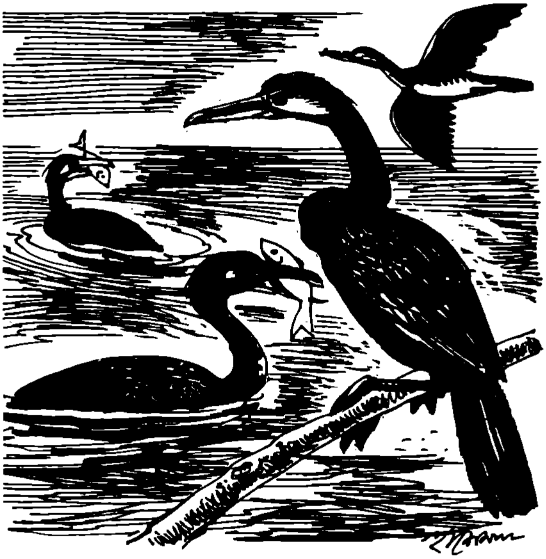

ঠোঁট লম্বা। ঠোঁটের আগা আঁকশির মতো বাঁকানো। পা হাঁসের মতো। গায়ের রঙ চকচকে কালো। এরা ওড়া এবং সাঁতার কাটায় বেশ দক্ষ। গ্যালাপাগোস (galapagos) পানকৌড়ি উড়তে পারে না।

মাছ এদের প্রধান খাদ্য। পানিতে চমৎকারভাবে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে। মাছ ঠোঁটে চেপে পানির ওপরে ভেসে ওঠে। এর পর তা সজোরে ওপরে ছুঁড়ে দেয় এবং দর্শনীয়ভাবে হাঁ করে গিলে ফেলে।

বর্ষা এদের প্রজননঋতু। জলা এলাকার উঁচু গাছে এরা আগাছা, কাঠি, নিজেদের মল বা গুয়ানো দিয়ে বাসা বানায়। গুয়ানো উন্নত মানের নাইট্রোজেন (দ্র) সার। প্রজাতিভেদে স্ত্রী-পানকৌড়ি ২-৬টি হাল্কা নীলাভ সবুজ ডিম পাড়ে। ৩-৫ সপ্তাহে ডিম ফোটে। দু' বছরে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে। ১০-১৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

## পানি

পৃথিবীতে (দ্র) সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থ। পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ জুড়েই পানি। পানিতেই জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। অধিকাংশ জীবদেহের ৬০ শতাংশই পানি।

অক্সিজেন (দ্র) ও হাইড্রোজেনের (দ্র) মিলনে সৃষ্ট একটি যৌগিক পদার্থ পানি। এর রাসায়নিক সঙ্কেত



www.pathagar.com

$H_2O$। এক অণু (দ্র) পানিতে দু'টো হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু (দ্র) রয়েছে।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের এই তিন অবস্থাতে পানির রূপান্তর সহজে লক্ষ করা যায়। সাধারণ চাপে ০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় পানি জমে বরফ হয় এবং ১০০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় পানি বাষ্পে পরিণত হয়।

৪° সেলসিয়াস উষ্ণতায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ১ (এক)। এ কারণে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপে ৪° সেলসিয়াস উষ্ণতার পানিকে আদর্শ ধরা হয়।

বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১-এর চেয়ে কম হলে তা পানিতে ভাসে এবং ১-এর বেশি হলে তা পানিতে ডুবে যায়।

পানির রয়েছে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য— কঠিন বরফ তরল পানি অপেক্ষা হালকা। অর্থাৎ বরফ পানিতে ভাসে। এ কারণে জলাশয়ে বরফ জমলেও জলচর প্রাণীর কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রায় সব খনিজ পদার্থ পানিতে মিশে যায়। এ কারণে প্রকৃতিতে শতকরা এক শ' ভাগ বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ পানি অবশ্য স্বাদহীন ও বর্ণহীন।

পানির তাপগ্রহণক্ষমতা বেশি। মানুষের শরীরে বিপাকীয় কার্যক্রমের জন্য যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৩০০° ফারেনহাইট হবার কথা। শরীরের পানিই এই তাপ শোষণ করে এবং দেহ-তাপমাত্রা কমিয়ে রাখে।

মু. হা.

## পানিপথের যুদ্ধ

পানিপথ (বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যে) নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধ। পানিপথে মোট তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যথাক্রমে ১৫২৬, ১৫৫৬ ও ১৭৬১ সালে।

১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর আফগান শাসক ইব্রাহিম লোদী (দ্র)-কে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা জয় করেন এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য শাসন করেন তাঁর পুত্র হুমায়ুন (দ্র)। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর পুত্র আকবর (দ্র) সিংহাসনে আরোহণ করলে সুরী বংশের শাসক আদিল শাহ সুর এবং তাঁর সেনাপতি তথা মন্ত্রী হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য (হিমু) মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এক সময় তাঁরা আগ্রা ও দিল্লি দখল করে নেন। মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান ১৫৫৬ সালের ১৫ই নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে হিমুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বৈরাম খানের সমর-নৈপুণ্যে এই যুদ্ধে মোগলেরা জয়লাভ করে। সম্রাট আকবর আবার দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬১ সালে। আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাশক্তির মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়।

সুজ. ব.

## পানিবিদ্যুৎ (hydraulics)

পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে পানির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ (দ্র) তৈরি করা হয়। এভাবে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে জলবিদ্যুৎ বা পানিবিদ্যুৎ বলে। কোনো পাহাড়ী অঞ্চলে উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়েই উৎপন্ন হয় পানিবিদ্যুৎ। পানিকে বাঁধ দিয়ে এর উচ্চতা বাড়িয়ে এর মধ্যে স্থিতিশক্তি জমা করা হয়। কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে সাধারণত এই কাজটি করা হয়। নদী থেকে আসা পানি বাঁধে বাধা পেয়ে জমে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করে। হ্রদটি পানিতে ভরে গেলে একটি মোটা নলের ভিতর দিয়ে পানিকে নিচের কোনো বৈদ্যুতিক পাওয়ার-স্টেশনে নামতে দেওয়া হয়। পানি পতনের সময় যে গতিশক্তি অর্জন করে তা একটি টার্বাইনকে (দ্র) ঘোরায়। টার্বাইনটি একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। টার্বাইনের ঘূর্ণনের সঙ্গে জেনারেটরটি ঘুরতে থাকে, ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

পার্বত্য এলাকার স্বাভাবিক জলাশয়কেও অনেক সময় পানিবিদ্যুৎ তৈরির কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশের কাপ্তাইতে একটি পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। এখানে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই হ্রদের পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদটি কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।



www.pathagar.com

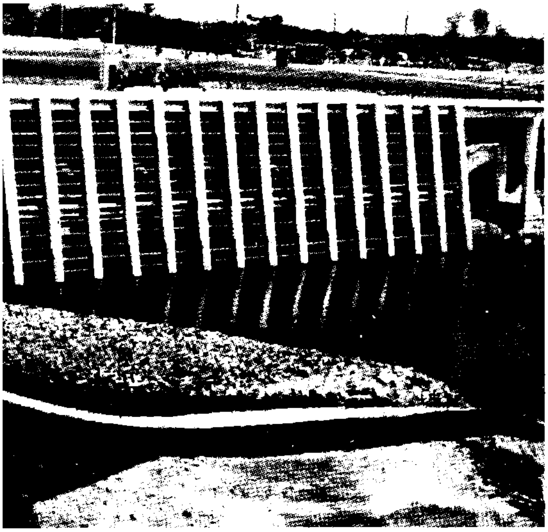

*পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র*

বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের একটি বড় অংশ কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ পাওয়ার-স্টেশন থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি (দ্র) এক দিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পানিশক্তি অফুরন্ত। তাই পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ (দ্র) নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের নদীর পানিকে কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

শা. ত.

**পাপড়ি** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

## পাবনা বিদ্রোহ / সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সংঘটিত এই কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭২ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত চলে। 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ' বা 'পাবনা বিদ্রোহ' নামে অভিহিত এই আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তৎকালীন বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায় জমির ওপর তাদের দখলী স্বত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার জমিদারি হস্তান্তরিত হবার পর নতুন জমিদারগণ নানা ধরনের উৎপীড়ন শুরু করলে কৃষকগণ এর প্রতিবাদে আদালতের শরণাপন্ন হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করলে তারা উৎসাহিত হয়ে জমিদারদের হাতে সরাসরি খাজনা না দিয়ে আদালত মারফত তা পরিশোধের ব্যবস্থা নেন। এই অবস্থার মুখে জমিদারগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের নিযুক্ত লাঠিয়ালবাহিনী ও পাইক-বরকন্দাজদের সংগঠিত করে কৃষকদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে সিরাজগঞ্জ মহকুমা জুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহের সূচনা হয়। কৃষকদের পাল্টা সুসংগঠিত প্রতিরোধের মুখে স্থানীয় জমিদারগণ আত্মরক্ষার্থে পাবনা শহরে আশ্রয় নেয় এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে একে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহের সকল নায়ক ও এতে অংশগ্রহণকারী বহু সাধারণ কৃষক গ্রেফতার হন এবং আদালতে বিচার শেষে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করলেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়ন সংযত করার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই বিদ্রোহের ফলেই ১৮৮৫ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে জমিদারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল কৃষককে জমির ওপর তাদের দখলি স্বত্ব প্রদান করা হয়।

সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন ঈশানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরণ পাল, রাজু সরকার ও বিদ্রুক প্রমুখ।

আ. হু.

## পাভ্‌লভ্‌, ইভান্‌ পেত্রোভিচ্‌ [১৮৪১—১৯৩৬]

রুশ শারীরবিজ্ঞানী। কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স বা 'শর্তাধীন প্রতিবর্ত' আবিষ্কারের জনক হিসাবে তাঁর পরিচিতি বিশ্বব্যাপী।

পাভ্‌লভের জন্ম ১৮৪১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গ (ইংরেজিতে সেন্ট পিটার্সবার্গ) শহরে। পাভ্‌লভ্‌ হৃৎসংবহনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র (দ্র) ও স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতম অংশ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন। ১৯০৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার (দ্র) দেওয়া হয় মূলত পরিপাক ও স্নায়ুতন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া বিষয়ে গবেষণাকর্মের জন্য।

স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতম অংশ নিয়ে গবেষণা এবং প্রতিবর্তক্রিয়ার মূলনীতি আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে পাভ্‌লভ্‌ মনস্তত্ত্বকে তাত্ত্বিকতা থেকে সরিয়ে এনে বাহ্য আচরণের গবেষণার বিষয় করে তোলেন।

১৯২২ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি কুকুরের ওপর



www.pathagar.com

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস নিয়ে কাজ করেন। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে আবিষ্কৃত হয় যে স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় অংশের ভারসাম্যহীনতাই মানসিক রোগ, বিশেষত স্কিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia) ও নিউরোসিস-এর কারণ। পাভ্‌লভের এই আবিষ্কার মানসিক হাসপাতালগুলোতে, মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ।

পাভ্‌লভ্ তাঁর কর্মজীবনের পুরো সময় অতিবাহিত করেন সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গে এবং এখানেই তিনি মারা যান ১৯৩৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি।

আ. হু.

## পাম্প

তরল পদার্থ উত্তোলন বা তরল পদার্থের চাপ পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র। পানি (দ্র) উত্তোলন ও প্রবাহিত করার জন্য পাম্প বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বায়ু (দ্র) গ্যাস (দ্র) ও অন্যান্য তরল পদার্থকে উত্তোলন বা প্রবাহিত করার জন্যও পাম্প ব্যবহৃত হয়। বায়ু ও গ্যাসকে সঙ্কুচিত করার জন্য যে পাম্প ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় কম্প্রেসর (compressor)। বায়ু বা গ্যাসকে সঙ্কুচিত করার অর্থ হল একে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ রাখা। আমাদের দেশে পানি সেচের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাম্প ব্যবহৃত হয়। পানি, বায়ু বা কোনো গ্যাসকে পাম্প করার যে কাজেই ব্যবহার করা হোক না কেন, পাম্পকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : রেসিপ্রোকেটিং পাম্প (অগ্র-পশ্চাৎ পাম্প), এবং রোটারি পাম্প (ঘূর্ণন পাম্প)।

রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের অন্যতম পুরানো একটি হচ্ছে লিফ্‌ট্ পাম্প। একে সাক্‌শন্ পাম্পও বলে। লিফ্‌ট্ পাম্পের সাহায্যে তাত্ত্বিকভাবে ১০ মিটার উচ্চতায় পানি তুলতে পারার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই পাম্পের সাহায্যে আরো অনেক কম উচ্চতায় পানি ওঠানো যায়। ফোর্স পাম্পের সাহায্যে অধিক উচ্চতায় পানি তোলা যায়। প্রাচীন কালে রোমে গভীর খনি থেকে পানি উত্তোলনের জন্য ফোর্স পাম্প ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া রেসিপ্রোকেটিং পাম্পের মধ্যে রয়েছে ডায়াফ্রাম পাম্প, বাইসাইকেল পাম্প ইত্যাদি। মোটর গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে কার্বুরেটরের (দ্র) জ্বালানি তেলকে পাম্প করার জন্য ডায়াফ্রাম পাম্প ব্যবহার করা হয়। রোটারি পাম্পের মধ্যে রয়েছে গিয়ার পাম্প, সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, টার্বো কম্প্রেসর ইত্যাদি।

শা. ত.

**পায়রা** কবুতর দ্র

**পারদ** মার্কারি/পারদ দ্র

## পারস্য / ইরানি সভ্যতা

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা। 'ইরান' কথাটির উৎপত্তি 'এরিয়ান' (Aryan) শব্দ থেকে। 'এরিয়ান' অর্থ 'আর্য'। এই 'আর্য' বা 'ইরানীয়রা'ই এই সভ্যতার আদি পত্তনকারী। কালক্রমে এঁদের পার্সিয়ান বা পারসিক বলে অভিহিত করা হতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরানের শক্তিশালী প্রদেশ 'পার্সিস' থেকেই এই নামের উদ্ভব। 'পার্সিস' বা 'পার্স্'-এর ভাষা ছিল 'পার্সি' (পার্সিয়ান)। বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত ইরানের ভাষাকে 'ফার্সি' বলে অভিহিত করা হয়। এখনকার ইরানে 'পার্সিয়ান' বলতে কেবল সেই সুদূর প্রাচীন কালের ইরানি বা আর্যদেরকেই বোঝায় না, পার্সিয়ান জাতীয়তাভুক্ত আরব, তুর্কি ও মঙ্গোল বংশোদ্ভূত সকল লোকজনকে বুঝিয়ে থাকে।

ইরানীয় ভূখণ্ডে প্রথম যে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তার নাম 'এলাম'। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের এই রাষ্ট্রটি ছিল উপজাতিদের একটি সম্মিলিত সংঘ। এর রাজধানী ছিল সুসো। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এরকম আরো কয়েকটি স্থানের নাম ছিল আওয়ান, আন্‌শান্ ও কিমাশ্। এই সব প্রাচীন নগররাষ্ট্রভিত্তিক সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিতরে রয়েছে ছোট-বড় আকৃতির অনুপম কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ (দ্র), সোনা (দ্র), রূপা (দ্র) ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি।

পারস্যে প্রকৃতপক্ষে এক নতুন যুগের সূচনা হয় ২২৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ও পার্থীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাসানীয় রাজবংশের ক্ষমতাসীন হওয়ার ভিতর দিয়ে। এই বংশের সম্রাটগণ প্রায় চার শতাব্দীকাল ধরে পারস্যকে শাসন করেন। তাঁদের শাসনামলেই পারস্য সভ্যতা তার বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

পারসিকেরা এই সময় জমিতে জলসেচ ও রাজস্ব আদায়ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে, ভূমির মাপজোকব্যবস্থা প্রবর্তন করে, নগরসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যের



www.pathagar.com

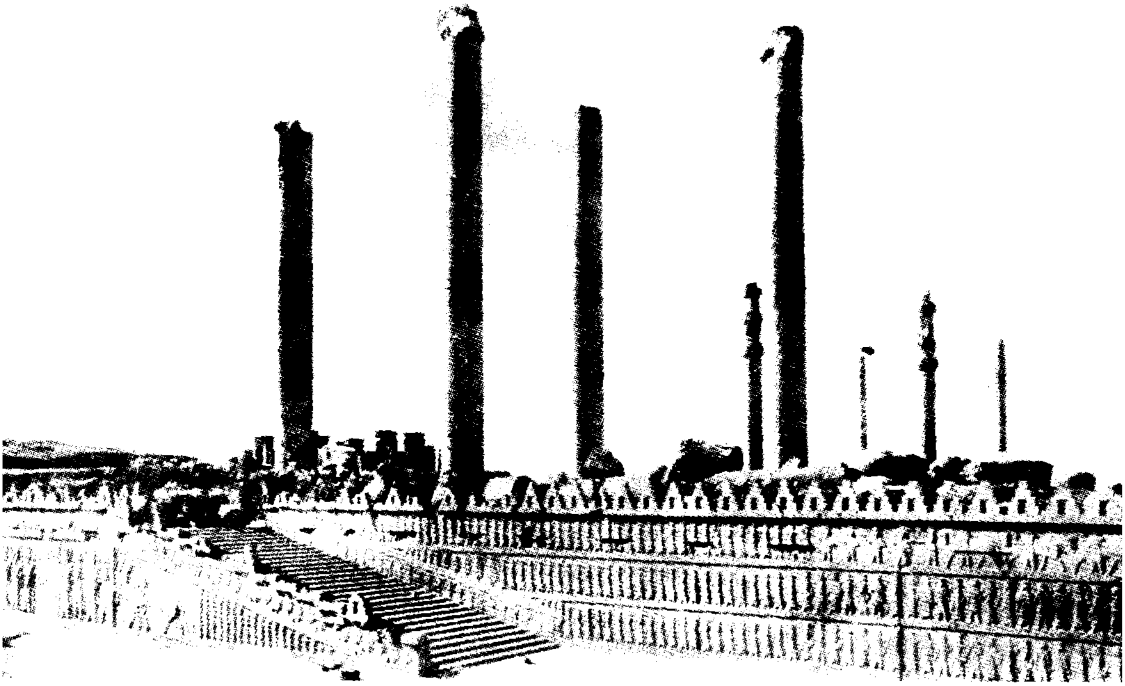

*পারস্যের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'পার্সিপোলিস'*

প্রসার ঘটায়, নানা ধরনের শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলে। বণিকেরা বাণিজ্যসূত্রে চীন (দ্র), ভারত (দ্র), আরব ও বাইজানশিয়ামে (Byzantium) নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে। আদালতগুলো মর্যাদা ও পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করে। এই সময় গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থও ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়, স্থাপন করা হয় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাই নয়, বাইজানশিয়াম থেকে খ্রিস্টানদের দ্বারা বিতাড়িত গ্রিক দার্শনিকেরাও পারস্যে আশ্রয় নেন এবং অবাধে তাঁদের দর্শনচর্চা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করেন।

প্রাচীন পারস্যের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিশরীয়, গ্রিক ও অ্যাসেরীয় সভ্যতার (দ্র) সুস্পষ্ট প্রভাব পড়লেও এসব ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তাও উল্লেখযোগ্য।

যুগের পর যুগ ধরে পারসিকেরা অনুপম ও সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত বস্ত্র বয়ন ও পুরু কম্বল তৈরিতে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন, এক কথায় তা অতুলনীয়।

পারস্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্রাট প্রথম দারিউসের (খ্রি. পূ. ৫২২-৪৮৪ অব্দ) সমাধিস্তম্ভ, পার্সিপোলিসের নির্মাণশৈলী, পোড়ানো ইট ও সোনার তৈরি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি ইত্যাদি। হালিকারনুসাসের সমাধিমন্দিরও ইরানি স্থাপত্য-শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

সুলতান মাহমুদের সভাকবি ফেরদৌসী (দ্র) রচিত 'শাহনামা' (দ্র) পারস্যের জাতীয় মহাকাব্য। এটি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদবিশেষ। অবশ্য প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি সহযোগে রচিত সাহিত্যের যেসব নমুনা পাওয়া যায়, সাহিত্যিক মূল্যের চাইতে সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি। পারস্যসম্রাট খসরু পারভেজের পত্নী শিরিনকে নিয়ে রচিত পারসিক উপন্যাস 'শিরিঁ-ফরহাদ'ও এক কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম।

পারসিকদের সবচেয়ে মৌলিক অবদান ধর্মের ক্ষেত্রে। তাদের ধর্মের নাম জরোস্ট্রিয়ানিজ্‌ম্ (Zoroastrianism বাংলায় জরথুস্ত্রবাদ) রাখা হয়েছে এই ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্রের (দ্র) নামানুসারেই। খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই ধর্মের



www.pathagar.com

অনুসারীরা ছিলেন অগ্নি-উপাসক। জরথুস্ত্রবাদের মূল কথা : বিশ্বজগৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুই দেবতা বা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জরথুস্ত্র মানুষকে মঙ্গলের দেবতার নির্দেশানুসারেই জীবন যাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রত্যাদেশগুলো তিনি যে গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন, তার নাম 'জেন্দ্-আবেস্তা'। এটিই পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ।

জরথুস্ত্র

বিশ্বধর্মের ইতিহাসে এই ধর্ম প্রভূত অবদান রেখেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ফেরেশতা-শয়তানের ধারণা 'জেন্দ-আবেস্তা' থেকেই আহৃত। এই ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত শেষ বিচারদিনের ধারণা এবং সৎ ও সরল জীবনযাপন সংক্রান্ত রীতিনীতির কিছুটা প্রভাব ইসলাম ধর্মের (দ্র) ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত। পরে পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হলে এই ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি।

আ. হ.

**পার্মানেন্ট সেট্‌ল্‌মেন্ট** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্র

## পার্লামেন্ট / সংসদ

ফরাসি শব্দ (Parle) থেকে পার্লামেন্ট (Parliament) শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ জনপ্রতিনিধিসম্মেলন। বাংলা ভাষায় (দ্র) সংসদ, জাতীয় পরিষদ, আইনসভা বা বিধানসভা নামেও পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই পার্লামেন্ট দুই কক্ষবিশিষ্ট হয়ে থাকে, যেমন—ইংল্যাণ্ডের হাউস অব লর্ড্‌স্ ও হাউস অব কমন্স। পার্লামেন্ট বা সংসদের কাজ আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, এমনকি সরকারি কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো ইত্যাদি।

পার্লামেন্টের ইতিহাস রাজতন্ত্রের (দ্র) সঙ্গে এক দীর্ঘ সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মধ্যযুগে (দ্র) ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে রাজার উপদেষ্টা-পরিষদ হিসাবে এর সূচনা। তবে পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার বা শাসনব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়, তার সূচনা, বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তি ব্রিটেনেই (দ্র)।

উনিশ শতকে ব্যাপক সংস্কারের ভিতর দিয়ে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে দেওয়া হয় ভোটাধিকার, চালু করা হয় গোপন ব্যালট। ১৯১১ সালে পার্লামেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হয় লর্ড-সভার প্রায় সকল ক্ষমতা। ১৯১৮, ১৯২৮, ১৯৪৮ ও ১৯৬৯ সালের পিপল্‌স্ অ্যাক্ট অনুযায়ী মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, চালু করা হয় 'এক ব্যক্তি এক ভোট' পদ্ধতি এবং ভোটাধিকারের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে করা হয় ১৮। আইসল্যাণ্ডে এ ধরনের আইনসভা পৃথিবীর (দ্র) মধ্যে সর্বপ্রাচীন।

আ. হ.

## পালবংশ

পালবংশের রাজত্বকাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। দু' শ' বছর স্থায়ী গুপ্ত সাম্রাজ্যের (সূচনা : খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) পতনের পর একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। বঙ্গ ও গৌড় তাদের অন্যতম। গৌড়ের পরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর (আনু. ৬৩৭ খ্রি.) পর বাংলায় ব্যাপক অরাজকতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অরাজক অবস্থা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' (বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে) নামে পরিচিত। এই অবস্থা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। এ সময় বাংলায় অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এদের আত্মকলহ ও নানা ষড়যন্ত্রে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য জনগণ গোপাল নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তাদের রাজা নির্বাচিত করে (৭৫০ খ্রি.)।

রাজা গোপালই পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বৌদ্ধধর্ম (দ্র)-অবলম্বী ছিলেন। গোপালের জন্ম রাজশাহী অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি এলাকায়। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁর বংশের খ্যাতি ছিল। রাজা গোপাল ৭৫০ থেকে ৭৭০ পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করেন।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজপদে অধিষ্ঠিত হন (৭৭০ খ্রি.) তিনি উত্তর ভারতে রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ হয়েও হিন্দুধর্মের (দ্র) পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা



www.pathagar.com

ধর্মপালের মৃত্যুর (আনু. ৮২১ খ্রি.) পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। তিনিও পিতার আদর্শে রাজ্য শাসন করেছেন।

দেবপালের মৃত্যুর (আনু. ৮৬১ খ্রি.) পর বিগ্রহ পাল, নারায়ণ পাল, রাজ্য পাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল, মহীপাল, নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহ পাল, দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল, কুমার পাল, তৃতীয় গোপাল ও মদন পাল পর্যায়ক্রমে সুদীর্ঘ তিন শতাব্দীর অধিক কাল ধরে রাজ্য শাসন করেন। গোপাল থেকে মদন পাল পর্যন্ত পাল রাজবংশের মোট সময়কাল সুদীর্ঘ ৪১১ বছর (৭৫০—১১৬১ খ্রি.)। শেষোক্তদের মধ্যে মহীপাল ও রামপাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পালবংশের শাসনামলে বাংলায় শিল্প-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। তাঁদের সময় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ও বিস্তৃতি ঘটে। এ ছাড়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও সুদৃঢ় হয়। বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর

*বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান*

শ্রীজ্ঞান (দ্র) পাল যুগের স্বর্ণসন্তান। এই যুগের প্রখ্যাত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন। তিনি বিখ্যাত পালরাজা রামপালের (মৃত্যু আনু. ১০৭৫ খ্রি.) সমসাময়িক ছিলেন। পাল রাজবংশের সুদীর্ঘ চার শতাধিক বছরের ইতিহাসকে মোটামুটি সমৃদ্ধি ও সাফল্যের ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

**মু. মা.**

**পালাগান** কাব্য দ্র

## পালি ভাষা

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যের প্রধান ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে এই ভাষার উৎপত্তি হয় বলে অনুমান করা হয়। গৌতম বুদ্ধ (দ্র) ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পালি ভাষায় তাঁর শিষ্যদের উপদেশ ও ধর্মকথা শোনাতেন। পালি এ সময় মগধ (বর্তমান বিহার প্রদেশ) অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বলে মনে করা হয়। কথ্য ভাষা হলেও পরে সাহিত্যের রূপ পেয়ে পালি পুরোপুরি লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। তবে পণ্ডিতদের মধ্যে এই ভাষার উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। পালির সঙ্গে সংস্কৃত (দ্র) ও প্রাকৃত (দ্র) ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সব পণ্ডিতই একটি ব্যাপারে একমত যে গৌতম বুদ্ধের সময়ে পালি প্রচলিত ছিল এবং এই ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য প্রচারিত হয়েছিল।

পালি ভাষা উত্তর ভারত থেকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। কারণ হীনযান (দ্র) বা থেরবাদ (দ্র) মতের বৌদ্ধধর্ম (দ্র) ক্রমশ ভারতের দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে সিংহলে (দ্র) চলে যায়। তখন সিংহল পালি ভাষার এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাষায় বার্মা (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র), লাওস ও কম্বোডিয়ার পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা সুদীর্ঘ ২৫০০ বছর ধরে ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। এসব দেশের ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন ছাড়াও ইতিহাস, চরিতকাব্য, নীতিকাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, ছন্দোবিজ্ঞান ইত্যাদি পালি ভাষায় গড়ে উঠেছিল।

পালি ভাষার অমূল্য সম্পদ ত্রিপিটক (৩২ খণ্ড), দীপবংস, মহাবংস, মহাবোধিবংস, মিলিন্দ প্রশ্ন, অট্ঠকথা ইত্যাদি। পালি ভাষার শ্রেষ্ঠ কতিপয় লেখক হলেন বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, মহাকচ্চায়ন, অনিরুদ্ধ, বুদ্ধপ্রিয়, মহানমন, শীলভদ্র, কচ্চায়ন ও মোগ্গলান।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) পালি ভাষা পঠন-পাঠনের সুযোগ আছে। পৃথিবীর আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সুযোগ রয়েছে। সংস্কৃতের ন্যায় পালিও এখন 'মৃত' ভাষা, অর্থাৎ কোনো জনগোষ্ঠী এ ভাষায় কথা বলে না।

**বি. ব.**



www.pathagar.com

## পাশা খেলা

ক্রীড়াবিশেষ। প্রাচীন অক্ষক্রীড়ার পরবর্তী রূপ। পাশা খেলার ঘুঁটি তৈরি হয় হাতির দাঁত, হাড়, কাঠ বা অনুরূপ দ্রব্য দিয়ে। ছয়টি সমান তলবিশিষ্ট এই ঘুঁটিতে বিন্দুর সাহায্যে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত নম্বর দেওয়া থাকে। এই ঘুঁটি দেখতে লুডো খেলার ঘুঁটির মতো। ঘুঁটিতে নম্বর এমনভাবে বসানো হয় যে দুই বিপরীত সংখ্যার যোগফল সব সময় ৭ হয়।

প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে পাশা খুব জনপ্রিয় একটি খেলা ছিল। মহাভারতের (দ্র) কাহিনী থেকে জানা যায়, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশেও পাশা খেলা প্রচলিত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও পাশা খেলার বর্ণনা আছে।

পাশা খেলা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা হয় ৪ কিংবা ২। ৪ জনের খেলার নাম 'চৌপড়' এবং ২ জনের খেলার নাম 'রঙ'। সম্রাট আকবর (দ্র) ১৬ জনকে নিয়ে পাশা খেলার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই পদ্ধতির নাম 'চন্দেল মন্দেল'।

পাশা খেলার বর্তমান পদ্ধতি এই রকম : ২ ফুট সাড়ে ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং সাড়ে ৪ ইঞ্চি চওড়া দু'টি বস্ত্রখণ্ডকে সমবাহুযুক্ত ক্রসের আকারে একটির ওপর আরেকটি সেলাই করা হয়। ৪টি বাহুর প্রত্যেকটিতে সমান ৩ পঙ্ক্তি করে (৩x৮) ২৪টি সমচতুষ্কোণ ঘর কেটে নেওয়া হয়। এই ক্রসের মাঝখানের সমচতুষ্কোণ ঘরটিই ছকের কেন্দ্র। প্রতি বাহুর মধ্যম পঙ্ক্তির শেষ ঘর এবং উভয় পাশের পঙ্ক্তির কেন্দ্র থেকে চতুর্থ ঘর 'X' দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে। গম্বুজাকৃতির ৪টি বিভিন্ন রঙের কাঠের ঘুঁটি যিনি প্রথমে এই ছকের ওপর দিয়ে চালিয়ে স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারেন, তিনিই খেলায় জয়লাভ করেন।

টি. কি.

## পাস্তুর, লুই [১৮২২—১৮৯৫]

রসায়নবিদ ও অণুজীববিজ্ঞানী হিসাবে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর জন্ম পূর্ব ফ্রান্সের দোল্ শহরে ১৮২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। চিত্রশিল্প, রসায়ন, অণুজীববিদ্যা (দ্র) ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ সত্ত্বেও পাস্তুরের গবেষণা প্রধানত রোগ ও অণুজীবের সম্পর্ক এবং রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকার উদ্ভাবনের উপরই

*গবেষণাগারে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর*

প্রতিষ্ঠিত। সে জন্য তাঁকে বলা হয় জীবাণুবিদ্যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

লুই পাস্তুর প্রমাণ করেন, বিভিন্ন অণুজীব শরীরে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে অণুজীবের আক্রমণে মদ নষ্ট ও তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট হয়ে যায়। নির্দিষ্ট মাত্রার তাপ প্রয়োগ করে অণুজীব ধ্বংস করার মাধ্যমে মদ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন।

খাবার, দুধ (দ্র) ও অন্যান্য পানীয় সংরক্ষণের জন্যও তাঁর উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি 'পাস্তুরাইজেশন' (pasteurization) নামে পরিচিত। বাংলায় একে আমরা 'পাস্তুরায়ণ' বলতে পারি।

রোগজীবাণু আবিষ্কার এবং জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ছাড়া আরো একটি গবেষণাকর্মে পাস্তুরের কীর্তি অবিস্মরণীয়। তিনি প্রমাণ করেন, গবেষণাগারে অণুজীবের শক্তিকে দুর্বল করে তা প্রাণীর (দ্র) শরীরে প্রবেশ করালে সেই প্রাণীর শরীরে নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে ওঠে। এ পদ্ধতিটিকে তিনি 'ভ্যাকসিনেশন' (vaccination) নামে আখ্যায়িত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জলাতঙ্ক (দ্র), এনথ্রাক্স



www.pathagar.com

ও মুরগির কলেরা (দ্র) রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেন।

লুই পাস্তুর ১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর সম্মানে প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে।

সি. না. হ.

## পাস্তুরাইজেশন (pasteurization)

দুধ (দ্র) ও অন্যান্য তরল পানীয় নির্বীজনের যে বিশেষ পদ্ধতি ফরাসি জীবাণুবিদ লুই পাস্তুর (দ্র) উদ্ভাবন করেন তার নাম পাস্তুরাইজেশন বা পাস্তুরায়ণ বা পাস্তুরীকরণ। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে এতে দুধের স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। এখনো এই পদ্ধতি চলে আসছে।

পাস্তুরায়ণে তাপমাত্রা ৬০°থেকে ৬৩° সেলসিয়াসে ৩০ মিনিট রেখে হঠাৎ করে ১৩ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা হয়। এর আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি হল ৭২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে তাপমাত্রা নামিয়ে আনা।

পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে নির্বীজনের ফলে দুধে সম্ভাব্য জীবাণু যক্ষ্মা (দ্র) ও টাইফয়েড (দ্র) ব্যাসিলাস নষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য তরলের ক্ষেত্রেও উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয়। এর ফলে দুধ ও অন্যান্য তরল নিরাপদ ও পানের উপযোগী হয়ে ওঠে।

রু. হা.

## পাস্তের্নাক্, বরিস্ লেওনিদভিচ্ [১৮৯০—১৯৬০]

বর্তমান শতাব্দীর রাশিয়ার (দ্র) সবচেয়ে বিখ্যাত কবি বরিস্ পাস্তের্নাকের জন্ম মস্কোর অদূরবর্তী মফস্বল শহর পেরেদেল্কিনো-তে, ১৮৯০ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে। তাঁর বাবা লেওনিদ্ ছিলেন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী, ঔপন্যাসিক লিয়েফ্ তল্স্তোয় (দ্র), কবি রাইনের্ মারিয়া রিল্‌কে (দ্র), ভাস্কর ওগুস্ত্যাঁ রদ্যাঁ (দ্র) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাবানদের সুহৃদ। মা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাময়ী পিয়ানোবাদিকা। বাড়ির এমন পরিবেশে বরিসের মেধা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ছোটবেলাতেই পরিস্ফুট হয়। তিনি প্রথমে পড়াশোনা করেছিলেন সঙ্গীত নিয়ে, পরে দর্শন পড়েন জার্মানির মার্বুর্গ্-এ ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, অবশেষে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯১৩ সালে স্নাতক হয়ে বেরোন।

১৯১৪ সাল থেকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করে। সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন কাব্য-আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। নিজের কবিতার পাশাপাশি অন্যের কবিতার অনুবাদ করেছেন, গদ্যও লিখেছেন– গল্প, স্মৃতিকথা। জার্মান ও ইংরেজি এবং জর্জিয়ান (রুশ প্রজাতন্ত্রের জর্জিয়া প্রদেশের ভাষা) খুব ভাল জানতেন, অনুবাদও করেছেন প্রচুর। তাঁকে রুশ ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়র-অনুবাদক বলা হয়ে থাকে। স্বদেশে কবি হিসাবে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হলেও পৃথিবীতে তাঁর নাম রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায় নোবেল পুরস্কার (দ্র) পাওয়ার (১৯৫৮) পরে। 'দোক্তর জিভাগো' নামে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, দেশে ছাপতে না পেরে তিনি বইটি ইতালি থেকে প্রকাশ করেন ১৯৫৭ সালে। মহাকাব্যিক এই উপন্যাস সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হয়; ইউরোপের (দ্র) নানান ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। এর পরপরই নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাওয়ায় তাঁর দেশবাসী ও দেশের সরকার মনে করে যে তাদের অপছন্দের বই ঐ উপন্যাসটির জন্যই বরিস পাস্তের্নাক-কে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে, ফলে এত সাহিত্যিক গণ্ডগোল হতে থাকে যে কবি শেষ পর্যন্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। মজার কথা হল, উপন্যাসের জন্য নয়, কবিতার জন্যই তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। অবশ্য উপন্যাসটিও পেতে পারত—এতই অসাধারণ ও বিশাল সেই কাহিনী। 'দোক্তর জিভাগো' বাংলাতেও অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'ডক্টর জিভাগো' নামে।

হা. মা.

## পাহাড়পুর বিহার / সোমপুর বিহার

বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় পাহাড়পুর গ্রামে এই প্রাচীন বিহার অবস্থিত। এখানে কোনো পাহাড় নেই। সমতলভূমির ওপর ৭০–৮০ ফুট উঁচু ঢিবির জন্য সম্ভবত পাহাড়পুর নাম। পাল রাজাদের আমলে এই জায়গার নাম ছিল সোমপুর।



www.pathagar.com

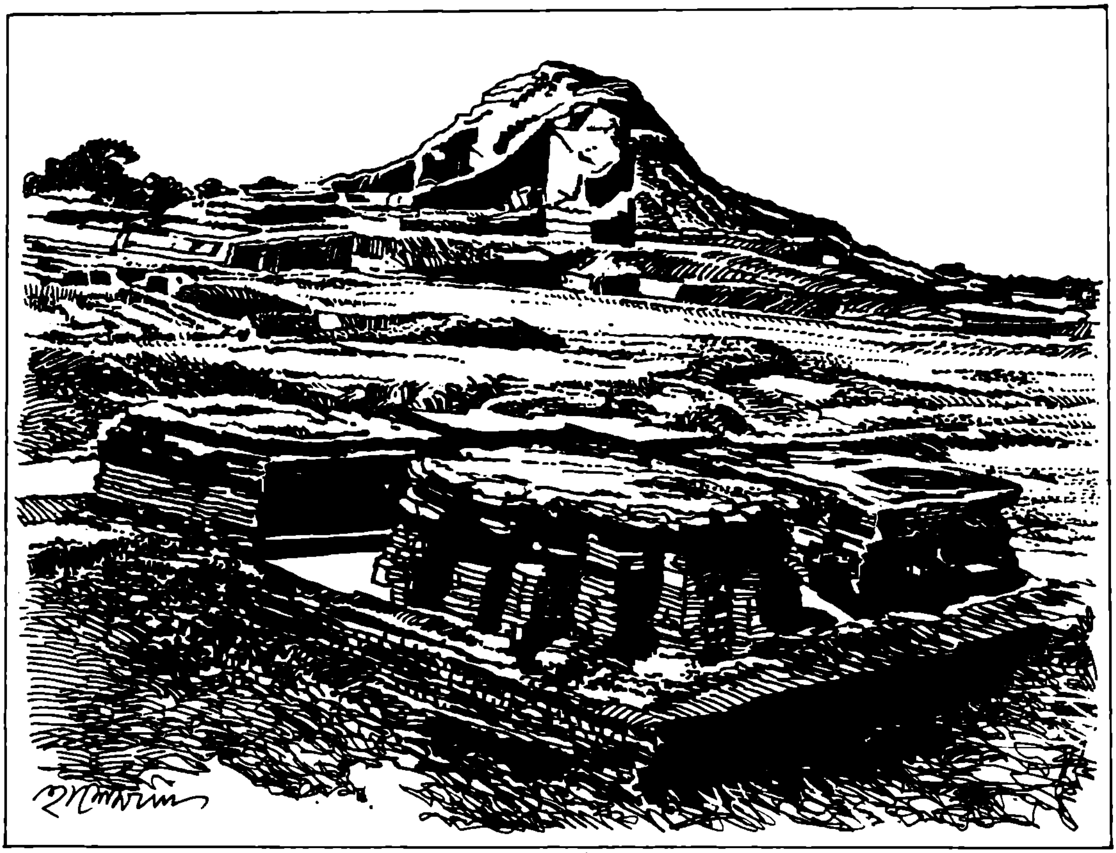

পাহাড়পুর বিহার বা সোমপুর বিহার

১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করে খনন কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্থানীয় জমিদারের বাধায় তা তখন সম্ভব হয় নি। ১৯৩৩-৩৪ সালে সরকারিভাবে খনন শুরু হয়। দ্বিতীয় পাল রাজা শ্রী ধর্মপালদেব (৭৭৭-৮১০ খ্রি. রাজত্বকাল) এই বিহার তৈরি করেছিলেন। এই বিহারের প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে সোমপুর অন্যতম। আয়তনে ভারতের নালন্দা (দ্র) ও ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) বোরবুদুর বিহারের সঙ্গে এই বিহারের তুলনা চলে। এর পূর্ব-পশ্চিম বাহু ৯২২ ফুট এবং উত্তর- দক্ষিণ বাহু ৯১৮ ফুট। বিহারের বেষ্টনীর দেয়াল ১৮ ফুট পুরু। সর্বমোট কক্ষ ১৭৭টি। কক্ষগুলোর সামনে ৮-৯ ফুট চওড়া ছাদসহ টানা বারান্দা। প্রত্যেকটি কক্ষ ১৪x১৩ ফুট। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন। বিহারের সদর দরজা ছিল একটি।

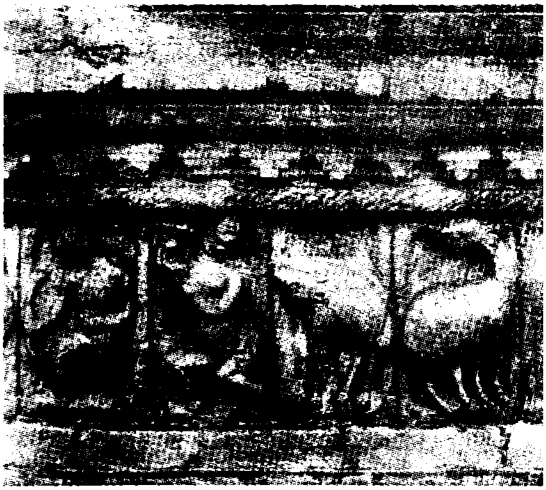

পাহাড়পুর বিহারের গায়ে পোড়ামাটির ফলকচিত্র



www.pathagar.com

বিহারের মাঝখানে কেন্দ্রীয় মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৩৫৬ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪ ফুট চওড়া। উচ্চতা এখনো ৭২ ফুট। মন্দিরের বাইরের দেয়ালে ১টি বুদ্ধমূর্তি ও ৬২টি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও ২৮০০ টেরাকোটা (দ্র) বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র পাওয়া যায়। এতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের চিত্র অঙ্কিত।

পালবংশ (দ্র) কর্তৃক নির্মিত এই বিহার নবম শতাব্দীতে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপালের দখলে চলে যায়। পরে পালরাজ প্রথম মহীপাল (আনু. ৯৮৮–১০৩৮ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বিহারের গৌরব আবার বেড়ে যায়। ১১শ শতকের প্রথম দিকে সোমপুর বিহার আগুনে পুড়ে গেলে তাতে ভিক্ষু করুণাশ্রীমিত্র দগ্ধ হন। ১১শ শতকের শেষ ভাগে রামপালের সময় (আনু. ১০৭৭–১১২০ খ্রি.) বিহারের সমৃদ্ধি ফিরে আসে। পরে সেন রাজবংশের আমলে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তার পর মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে বিশ্বসংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষণের ফলে দর্শনীয় স্থান হিসাবে এটি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে।

বি. ব.

## পাহাড়ী সান্যাল [১৯০৬—১৯৭৪]

বাংলা চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা। মঞ্চাভিনেতা হিসাবেও সুনামের অধিকারী। তাঁর প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ সরকার।

*পাহাড়ী সান্যাল (বামে) 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির দৃশ্যে, পরিচালক—সত্যজিৎ রায়*

১৯০৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি দার্জিলিং-এ জন্মগ্রহণ করেন।

পাহাড়ী সান্যাল ভারতের (দ্র) লখ্নৌ মরিস কলেজ থেকে 'সঙ্গীত উপাধি' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতার বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটার্স' -এ যোগ দেন এবং অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। চরিত্র চিত্রায়নে বাস্তবানুগ অভিনয়দক্ষতা পাহাড়ী সান্যালকে ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের অপরিহার্য শিল্পীতে পরিণত করে। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র : 'ভাগ্যচক্র', 'বড়দিদি', 'রজত জয়ন্তী', 'স্বামী', 'বিদ্যাসাগর', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র', 'এক দিন এক রাত্রে', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'শাপমোচন', 'হারানো সুর' ও 'পথে হলো দেরী' ইত্যাদি। এ ছাড়া বহু নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। ১৯৭৩ সালে কলিকাতার 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।

পাহাড়ী সান্যাল বহুভাষী ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি ও উর্দু ভাষার ওপর তাঁর উত্তম দখল ছিল।

তিনি ১৯৭৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

## পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌

এই কথাটির উৎপত্তি pure (শুদ্ধ বা পবিত্র) শব্দ থেকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে চার্চকে রোমান ক্যাথলিক পোপের কর্তৃত্ব ও অধ্যাদেশ থেকে মুক্ত করার যে ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাই ঐতিহাসিকভাবে পিউরিট্যানিজ্‌ম্‌ (puritanism) বলে পরিচিত। এই আন্দোলনের সমর্থক ও অনুসারীরা পিউরিটান (puritan) হিসাবে অভিহিত হন। তাঁরা এমন এক ধরনের জীবনধারা ও বিধানে বিশ্বাসী যার মধ্যে আত্মিক ও ধর্মীয় শুদ্ধতা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার প্রতিফলন থাকবে এবং তাঁরা এই জীবনধারাকে সমগ্র জাতির জন্য অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন এবং এ



www.pathagar.com

বিষয়ে চার্চের সুনির্দিষ্ট বিধান দাবি করেছিলেন। এই আন্দোলনের চাপেই ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয় এবং আমেরিকায় (দ্র) উপনিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পিউরিটান জীবনধারা সূচনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

রাজা অষ্টম হেন্‌রি ১৫৩৪ সালে চার্চ অব ইংল্যাণ্ডকে রোমের অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং রাজা ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে (১৫৪৭-৫৩) protestantism বা প্রোটেস্ট্যান্টবাদ (দ্র) সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু রানী মেরির রাজত্বকালে (১৫৫৩-৫৮) ইংল্যাণ্ডে রোমান Catholicism বা ক্যাথলিকবাদ (দ্র) পুনরায় প্রতিষ্ঠা পায়। এর ফলে বহু প্রোটেস্ট্যান্ট শহীদ হন অথবা দেশত্যাগে বাধ্য হন। দেশত্যাগ করে অনেকেই জেনেভায় চলে যান, যেখানে জন ক্যালভিনের (John Calvin) নেতৃত্বে এক ধরনের সুশৃঙ্খল চার্চ গড়ে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়ায় এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ডে (১৫৫৮-১৬০৩) দু'টি গ্রন্থ— Geneva Bible এবং জন ফক্স (John Foxe)-এর 'Book of Martyrs' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় বহু পিউরিটান তাঁদের আন্দোলনের সপক্ষে পার্লামেন্টের সমর্থন কামনা করেন। এঁদের ওপর প্রাথমিকভাবে বিবিধ প্রকার নির্যাতন চালানো হয়। আন্দোলনে সফল না হওয়ার ফলে পিউরিটানেরা ধর্মপ্রচারণা, পুস্তিকাপ্রকাশ, সামাজিক শিষ্টাচার ও সংগঠন বিষয়ে মনোযোগ- দান করেন। তাঁদের এই ধরনের আচরণ বহু অভিজাত ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং কালক্রমে পিউরিটানেরা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের কলেজসমূহ নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ক্যালভিনপন্থী রাজা স্কটল্যাণ্ডের ৬ষ্ঠ জেম্‌স্ ১৬০৩ সালে এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী মনোনীত হলে পিউরিটানেরা পুনরায় আশান্বিত বোধ করেন। কিন্তু ১৬০৪ সালে হ্যাম্পটন কোর্ট কনফারেন্সে রাজা জেম্‌স্ পিউরিটান দাবিসমূহ নাকচ করে দিলে বহু পিউরিটান এতে সামাজিকভাবে ও পেশাগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে (১৬২৫-৪৯) পিউরিটানদের প্রতি অবিচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। ১৬৪০ সালে পার্লামেন্ট ও রাজা চার্লসের মধ্যে বিরোধের ফলে যখন গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন পিউরিটানেরা পার্লামেন্টকে তাঁদের সপক্ষে প্রভাবিত করতে থাকেন। এই বিরোধে এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে অলিভার্ ক্রমওয়েল্ ক্ষমতায় আসেন। বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন মিল্টন (দ্র) তখন ক্রমওয়েলের লাতিন সেক্রেটারি ছিলেন। ক্রমওয়েল এক ধরনের সীমিত সুবিধা প্রদান করেন, যার ফলে Levellers, Diggers, Fifth Monarchy Men, Quakers প্রভৃতি কয়েকটি পিউরিটান গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে শেষোক্ত গোষ্ঠীই অদ্যাবধি তৎপর আছে। পিউরিটান আদর্শে Holy Commonwealth প্রতিষ্ঠার জন্য টমাস ডেল আমেরিকার ভার্জিনিয়া গমন করেন। নিউ ইংল্যাণ্ডের পিউরিটানেরা চার্চের ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের নাগরিক সংগঠন গড়ে তোলেন।

পিউরিটান শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুদ্ধতার ধারণাকেও পিউরিট্যানিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং যেহেতু তা বিশুদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই 'পিউরিটান' শব্দ আজকাল রক্ষণশীল অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

শ. আহ.

**পিং পং** টেবিল টেনিস দ্র

## পিঁপড়া

পিঁপড়া অতি পরিচিত পতঙ্গ (দ্র)। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অঞ্চল ছাড়া সবখানেই এরা বাস করে। পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পিঁপড়া আছে। ভূগর্ভস্থ গর্ত, মাটির ঢিবি, গাছের খোঁড়ল প্রভৃতিতে এরা বাস করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য

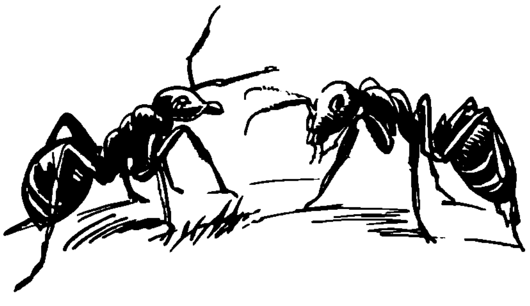

রক্ষায় যেমন এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তেমনি ফসল ও অন্যান্য জিনিসপত্রেরও বেশ ক্ষতি করে।

প্রজাতিভেদে আকার, আকৃতি ও বর্ণে এদের পার্থক্য থাকে। লম্বায় ০.১-২.৫ সেন্টিমিটার হয়। এরা দেহের ওজনের চেয়ে ১০ থেকে ৫০ গুণ ভারি বস্তুও বইতে পারে। অধিকাংশ প্রজাতির বিষাক্ত হুল থাকে।



www.pathagar.com

পিঁপড়া দলবদ্ধভাবে থাকে। একেকটি দলে এক বা একাধিক রাণী, বেশ কিছু পুরুষসহ ডজনখানেক থেকে লক্ষ লক্ষ কর্মী পিঁপড়া থাকতে পারে। রাণী প্রতিদিন হাজার হাজার ডিম পাড়ে। ডিম থেকে পর্যায়ক্রমে শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ার জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও রাণী পিঁপড়ার পাখা থাকে। এরা উড়ে উড়ে প্রজনন করে। প্রজনন শেষে পুরুষ পিঁপড়া মারা যায়, আর রাণীর পাখা খসে পড়ে। কর্মীরা ১ থেকে ৩ বছর এবং রাণী ১০ থেকে ২০ বছর বাঁচে।

পিঁপড়াদের জীবনপ্রণালী বিচিত্র। সৈনিক পিঁপড়ারা অন্যান্য পতঙ্গ হত্যা করে খায়। দাস তৈরিতে নিযুক্ত পিঁপড়ারা অন্যদের বাচ্চা ধরে এনে দাস বানায়। ডেয়ারি পিঁপড়ারা দুধের মতো তরল পদার্থ উৎপাদনকারী এক ধরনের পোকা পোষে।

এ ছাড়াও রয়েছে কৃষিজীবী, মধু উৎপাদনকারী, ছত্রাকচাষী পিঁপড়া।

আ. ন. ম. আ. র.

**পি এল ও** (PLO)

ইসরায়েল রাষ্ট্রের দখল থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য গঠিত সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে এর পুরো নাম Palestine Liberation Organisation. বাংলায় বলা হয় প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা।

প্যালেস্টাইন মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান। এক সময় এটি তুরস্কের (দ্র) সুলতানের শাসনাধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) তুরস্ক পরাজিত হলে প্যালেস্টাইন ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর ১৯৪৮ সালে ইংরেজেরা প্যালেস্টাইনকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়। ইহুদিরা এখানে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে মিশরসহ আরব লীগভুক্ত দেশসমূহ একজোট হয়ে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৭৩ সালে মোট পাঁচবার ইসরায়েল আক্রমণ করে। প্রতিবারই ইসরায়েল জয়ী হয়। এভাবে উপর্যুপরি যুদ্ধের ফলে নিরীহ প্যালেস্টাইনবাসীরা মাতৃভূমি ছেড়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উদ্বাস্তু শিবিরে দুর্দশাগ্রস্ত ও মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। এই অসহায় পরিস্থিতিতে 'পি এল ও'-র জন্ম।

প্রথমে প্যালেস্টাইনের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করার জন্য ১৯৬৪ সালে পি এল ও গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে এটি মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গকারী গেরিলা দলের সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালে আল্-ফাতাহ্ (Al-Fatah) নামে এক শক্তিশালী আরব গেরিলা দলের নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে এটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। ইয়াসির আরাফাত এর প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর নেতৃত্বে পি এল ও ক্রমে প্যালেস্টাইন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া জনগণের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন রকম গেরিলা (দ্র) ও সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে পি এল ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

১৯৭৪ সালে আরব দেশসমূহের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রাবাত সম্মেলনে (Rabat Conference) পি এল ও কে প্যালেস্টাইনি জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ (দ্র) সাধারণ পরিষদও পি এল ও কে প্যালেস্টাইনের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৮৮ সালে পি এল ও প্যালেস্টাইনকে তাদের রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে এবং তাদের সাংগঠনিক তৎরপতা বৃদ্ধি করে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইনকে স্বীকার করে নিয়ে স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হয়েছে। এখন স্বায়ত্তশাসন দানের প্রক্রিয়া চলছে।

সুজ. ব.

**পি ভি সি** অ্যাসিটাইলিন দ্র

**পি. সি. রায়** প্রফুল্লচন্দ্র রায় দ্র

**পি. সি. সরকার** [১৯১৩—১৯৭১]

বিখ্যাত জাদুশিল্পী। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ১৯১৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম প্রতুলচন্দ্র সরকার। তবে সংক্ষেপে পি. সি. সরকার নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং ১৯৩৩ সালে গণিতশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। তিনি পারিবারিক সূত্রে জাদুচর্চার গুণাবলি অর্জন করেন। তাঁর জাদুশিক্ষার গুরুর নাম গণপতি চক্রবর্তী।



www.pathagar.com

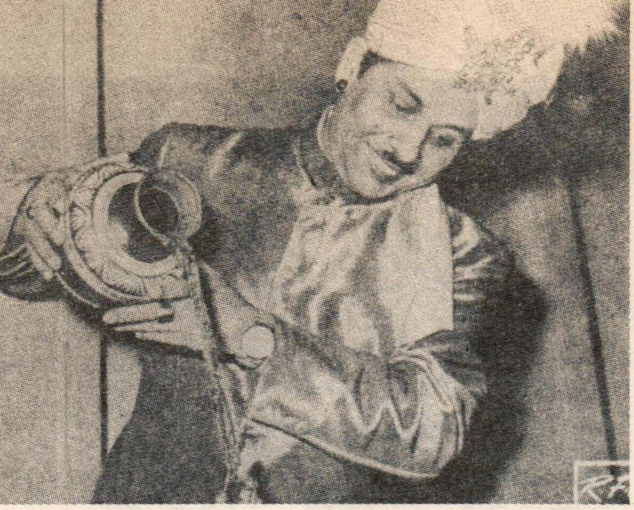

*পি. সি. সরকার, তাঁর বিখ্যাত খেলা ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া দেখাচ্ছেন।*

*বোস্টনে শিশুদের দড়ির ম্যাজিক দেখাচ্ছেন*

পি. সি. সরকার যখন আই. এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই জাদুর খেলা প্রদর্শন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে তিনি একে পুরোপুরি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন এবং বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে জাদু প্রদর্শন করে ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হন, বহু পুরস্কারও লাভ করেন। এ ছাড়া নানা দেশের দূরদর্শনে— যথা অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন, বি বি সি (দ্র), এন টি ভি এবং এ বি সি-তেও জাদু প্রদর্শন করে যেমন ব্যাপক প্রচার পান, তেমনি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। পি. সি. সরকার বহু প্রাচীন জাদু খেলার মূল সূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্বেরও অধিকারী। তাঁর বিখ্যাত, জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য খেলাসমূহের অন্যতম 'এক্স-রে আই', 'করাত দিয়ে মানুষ কাটা' এবং 'ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া'।

তিনি জাদুবিদ্যা বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থেরও রচয়িতা। তাঁর প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ১৬। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ছেলেদের ম্যাজিক', 'ম্যাজিকের কৌশল' ও 'দেশে দেশে হিপনোটিজ্‌ম্', 'মেসমেরিজ্‌ম্', 'সম্মোহনবিদ্যা' ইত্যাদি।

রাজকীয় পোশাক ও আকর্ষণীয় পাগড়ি পরে তিনিই প্রথম জাদু প্রদর্শনের প্রচলন করেন এবং জাদুশিল্পী হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেট ম্যাজিকের জন্য দু'বার 'দ্য ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি যেসব পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গোল্ডবার পুরস্কার', জার্মানির 'সুবর্ণ লরেল মালা' এবং ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' উপাধি।

পি. সি. সরকার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের সদস্য ছিলেন।

১৯৭০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর শেষ বারের মতো তিনি জাপানে (দ্র) যান এবং সেখানে ১৯৭১ সালের ৬ই জানুয়ারি অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

**পিকাসো, পাবলো** [১৮৮১—১৯৭৩]

স্প্যানিশ অঙ্কনশিল্পী, ভাস্কর এবং ছাপ-চিত্রকর। তাঁকে বিশ শতকের মহত্তম শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়। এ শতাব্দীর শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শিল্পের বিচিত্র সব মাধ্যমে তিনি সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে বিশ্বের চারুকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন।



www.pathagar.com

*পিকাসোর আঁকা কৃষাণীর মেয়ে ও মই*

*আয়নায় মুখ দেখা*

স্পেনের দক্ষিণ উপকূলীয় শহর মালাগায় ১৮৮১ সালের ২৫শে অক্টোবর পাবলো পিকাসো (Pablo Picasso) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হোসে রুইজ ব্লাস্কো এবং মাতার নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। তাঁর নামের শেষাংশ তাঁর মায়ের নামের মধ্যাংশ থেকেই নেওয়া।

পিকাসোর পিতা ছিলেন বার্সেলোনার চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৮৯৫ সালে তিনি ১৪ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষায় পাশ করেন। এর দুই বছর পর তিনি মাদ্রিদে যান রয়্যাল একাডেমীতে পড়াশোনা করতে।

পিকাসোর ছবি আঁকার হাতেখড়ি একেবারে শৈশবে শিক্ষক ও চিত্রকর পিতার তত্ত্বাবধানে। ১৯ বছর বয়সে ছবি এঁকে তিনি প্রথম শিল্পসমালোচকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। ১৯০৪ সালে পিকাসো স্থায়ীভাবে প্যারিসে চলে যান এবং আমৃত্যু তাঁর শিল্পসাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এই নগরীই।

প্যারিসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি বিত্তের মুখ দেখেছিলেন তা নয়। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে ধাপে ধাপে তিনি শিল্পী হিসাবে খ্যাতি ও সুখের মুখ দেখেছিলেন।

চিত্রকর হিসাবে পিকাসোর জীবন বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ব্লু পিরিয়ড', প্রথম মহাযুদ্ধ (দ্র) ও তার অন্তর্বর্তীকাল 'রোজ পিরিয়ড', 'নিগ্রো পিরিয়ড', 'কিউবিস্ট পিরিয়ড'। নিয়ত রূপান্তরশীল শিল্পী হিসাবে পিকাসো উল্লিখিত পর্বে বিভক্ত সময়সীমার মধ্যে ও তার পরবর্তী কালে আরো বহুবিধ শিল্পরীতি নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছেন। বাস্তববাদী অঙ্কন-রীতি যেমন তাঁর হাতে নতুন মাত্রা পেয়েছে, তেমনি পরাবাস্তববাদী শিল্পরীতিও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে। ১৯১০ সালের মধ্যেই কিউবিস্ট অঙ্কনশৈলী তাঁর একাগ্র চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করে।

পিকাসোর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পকর্মের মধ্যে বিখ্যাত : Le Moulin de la Galette, (ল্য মুল্যাঁ দ্য লা গালেৎ) 'দ্য ব্লু রুম', 'ওল্ড গিটারিস্ট', 'সাল্‌ত্যাঁবাক্ পরিবার', 'সেল্‌ফ্ - পোট্রেট', 'টু নুড্‌স্', 'আভাগঁর রমণীবৃন্দ', 'থ্রি মিউজিশিয়ান্‌স্', 'স্কাল্পটর', 'মডেল অ্যাণ্ড ফিশবৌল', 'থ্রি



www.pathagar.com

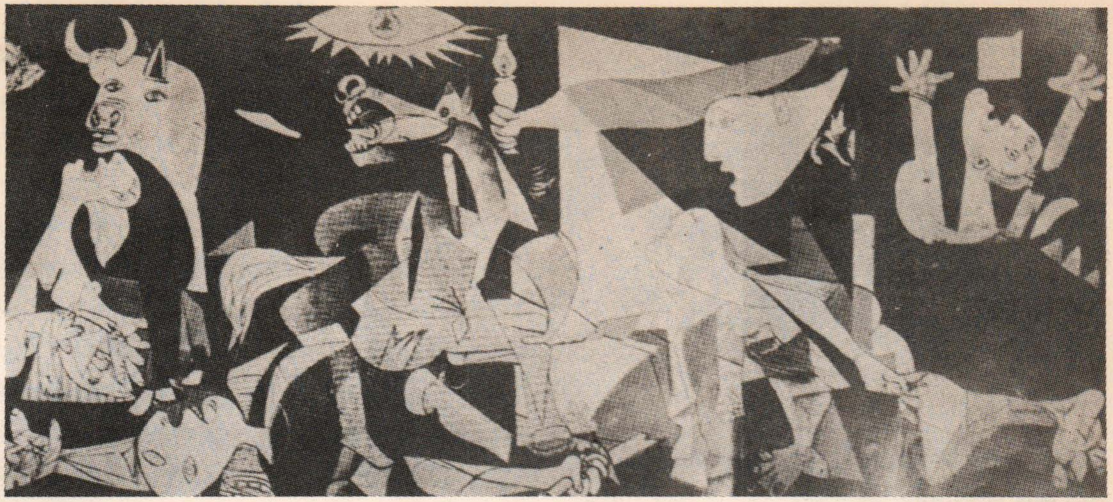

ডান্সার্স্', 'গিটার', 'গ্লাস অব আবস্যাঁৎ', 'সিটেড বাথার', 'গোয়ের্নিকা' এবং 'পালোমা' বা শান্তিকপোত ইত্যাদি।

১৯৭৩ সালে পাবলো পিকাসো প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

*স্পেনের গৃহযুদ্ধের স্মরণে পিকাসো এঁকেছিলেন গুয়ের্নিকা*
*নিচে : পিকাসো—তাঁর ছেলেমেয়ে বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রী ফ্রাঁসোয়া জিলে (বাঁয়ে)-সহ অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন।*



www.pathagar.com

*পিকিং মানব*

## পিকিং মানব

পিকিং মানব প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। এরা আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে উত্তর চীনে বসবাস করত। এদের বৈজ্ঞানিক নাম *'সিনান্থ্রোপাস পিকিনেন্সিস'*। এর অর্থ পিকিং-এর চীনা মানব। এরা আদি মানুষদের এক ধরনের উদাহরণ, যারা 'হোমো ইরেক্টুস' (দ্র) তথা সোজা হয়ে চলতে সক্ষম মানুষের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বেইজিং (বা পিকিং)-এর নিকট কানাডীয় চিকিৎসক অধ্যাপক ডেভিডসন ব্ল্যাক ১৯২০ সালে পিকিং মানবের ফসিল বা জীবাশ্ম পান। এর পর ৩০টিরও বেশি এ ধরনের ফসিল পাওয়া গেছে। এদের সঙ্গে পাওয়া গেছে পাথরের লক্ষাধিক হাতিয়ার এবং অসংখ্য হাড়গোড়, বিশেষ করে হরিণের। ফসিল থেকে বোঝা যায়, পিকিং মানব সাধারণত ৫ ফুট ১ ইঞ্চি (১৫৫ সেন্টিমিটার) দীর্ঘ হত। তাদের হাত ছিল বেশ মোটা, ভ্রূ ছিল ভাঁজযুক্ত। চোয়াল শক্ত, দাঁত লম্বা এবং আধুনিক মানুষের চেয়ে এদের মাথা ছিল আকারে ছোট (পুরুষ ১২০০ সিসি, মেয়েদের ১০০০ সিসি)। এখানে আগুনের ব্যবহারের নিদর্শনও মিলেছে।

সৈ. আ. ই.

## পিটার্ প্যান্ (Peter Pan)

স্টটল্যাণ্ডের ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার স্যার জেম্স্ ম্যাথু ব্যারি (Sir James Matthew Barrie : ১৮৬০-১৯৩৭) রচিত নাটকের নাম। কাহিনীর নায়ক একটি ছেলে, তারই নাম পিটার্ প্যান্। পৃথিবীর (দ্র) শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'পিটার্ প্যান্' (১৯০৪) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বই। পিটার্ প্যান্ বাড়ি থেকে পালিয়ে নেইকো-নেই-দেশে (Never-Never-Land) চলে যায়। সে সেখানেই থাকবে, বাচ্চা ছেলে হয়েই থাকবে, তার বড় হয়ে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই। দ্বিতীয়ত, সে বনে-বনে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে পরীদের সঙ্গে। তারই বয়সী এক মেয়ে ওয়েণ্ডি আর দু'টি ছেলে মাইকেল আর জন্‌কে সে কেমন করে উড়ে বেড়াতে হয় তা শিখিয়ে দেয়। ওদিকে পিটারের এক ভয়ানক শত্রু ছিল, সে ছিল জলদস্যু, নাম তার ক্যাপ্টেন হুক। তার আবার একটা হাত কেটে নিয়ে গিয়েছিল একটি কুমির। ঐ হাতে আবার ছিল একটা অ্যালার্ম হাতঘড়ি। কুমির সেটা হজম করতে পারে না, ফলে কুমিরের পেটের মধ্যে সেটা বাজতে থাকে, আর লোকে তখন টের পেয়ে সাবধান হয়ে যায়—ঐ যে, কুমির আসছে।

শেষ পর্যন্ত পিটার্ প্যান্, ঐ তিন বাচ্চা, ক্যাপ্টেন হুক আর কুমির, এবং এরও পরে পিটারের এক অদেখা পরীবন্ধু টিঙ্কার্ বেল্—সকলকে নিয়ে ভারি একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা জমে ওঠে।

খুবই জনপ্রিয় শিশুনাট্য হিসাবে 'পিটার্ প্যান্' ইউরোপ-আমেরিকায় এখনো খ্যাতির শীর্ষে বলা চলে।

হা. মা.

## পিটুইটারি গ্রন্থি    অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্র

## পিতল

পিতল একটি সঙ্কর ধাতু (দ্র)। শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ তামা (দ্র) ও ৪০ থেকে ২০ ভাগ দস্তার (দ্র) সংমিশ্রণে এটি তৈরি হয়। পিতলকে ইংরেজিতে ব্রাস (brass) বলে। পিতল নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে হাঁড়ি-পাতিল, কণ্ডেন্সর, টিউব, আলপিন, গহনাপত্র, বাদ্যযন্ত্র, বন্দুকের টোটা প্রভৃতির প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া টেলিস্কোপ (দ্র), ব্যারোমিটার (দ্র) প্রভৃতি তৈরিতেও পিতল ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

## পিত্ত এবং পিত্তাশয়

যকৃৎকোষ থেকে নিঃসৃত পীতরঙের তরল পদার্থের নাম পিত্ত, ইংরেজিতে বাইল্ (bile) বলে। যকৃৎ (দ্র) থেকে তৈরি পিত্ত পিত্তাশয়ে জমা হয়। দিনে ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিলিটার পরিমাণ পিত্ত যকৃতে তৈরি হয়। এর প্রধান



www.pathagar.com

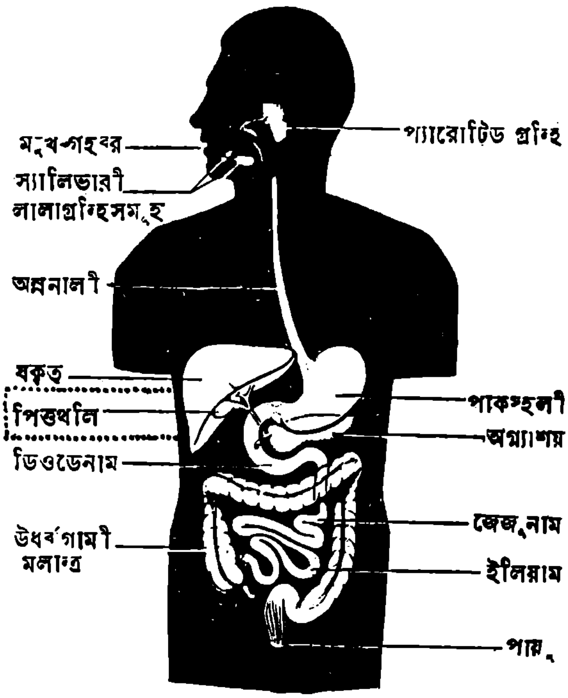


*পিত্তাশয় বা পিত্তথলির সঙ্গে মানবদেহের অন্যান্য গ্রন্থি ও নালি*

উপাদান পিত্তলবণ। সেই সঙ্গে রয়েছে পিত্তরঞ্জক, কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড (দ্র), লেসিথিন এবং অজৈব খনিজ লবণ। পিত্তের প্রধান কাজ চর্বি জাতীয় খাদ্য শোষণ ও পূর্ণপরিপাকে সাহায্য করা। এ ছাড়াও পিত্ত ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষারত্ব রক্ষায় সহায়তা করে।

পিত্তাশয় (gall-bladder) দেখতে নাসপাতির মতো থলি, লম্বায় ৮ সেন্টিমিটার এবং আয়তনে ৫০ মিলিলিটার। যকৃতের ডান অংশের নিচের দিকে পিত্তাশয়ের অবস্থান। এখানে পিত্ত সঞ্চিত ও ঘনীভূত হয়। পিত্তাশয় থেকে নালিপথে পিত্ত ডিউডিনামে এসে অন্যান্য পাচক রসের সঙ্গে খাদ্য পরিপাকক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

জীবাণুঘটিত পিত্তাশয় প্রদাহ, পিত্তপাথুরি এবং ক্যান্সার (দ্র) পিত্তাশয়ের উল্লেখযোগ্য রোগ। পিত্তপাথর সাধারণত কোলেস্টেরল, পিত্তরঞ্জক কিংবা ক্যালসিয়াম অক্সালেট দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

রু. হা.

**পিথাগোরাস** (আনু. ৫৮২-৫০০ খ্রি.পূ.)

গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ পিথাগোরাসের (Pythagorus) জন্ম গ্রিক দ্বীপ সামোসে। তিনি ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ ইতালির গ্রিক নগররাজ্য ক্রোটন্-এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর মতবাদ শিক্ষা দিতেন। পিথাগোরাসের শিষ্যদের বলা হয় 'পিথাগোরিয়ান'।

পিথাগোরাস মনে করতেন, বিশ্বের সবকিছুর মূল হল সংখ্যা এবং মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অন্য কোনো মানুষ বা জন্তুর দেহে ঢুকে পড়ে।

টানা তারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে এর সৃষ্ট শব্দের কম্পাঙ্কের সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করেন। 'যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দু' বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান'—জ্যামিতির এই উপপাদ্য 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' নামে খ্যাত।

পিথাগোরিয়ানদের ওপর ক্রোটন্‌বাসীর ক্রমাগত নির্যাতনের কারণে পিথাগোরাস মেটাফোণ্টামে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

মু. হা.

**পিথাক্যানথ্রোপাস** জাভা মানব দ্র

**পিনোচ্চিও** (Pinocchio)

পিনোচ্চিও একটি চরিত্রের নাম। এটি একটি কাঠের পুতুল। কার্লো কোল্লোদি (Carlo Collodi : ১৮২৬-৯০) নামে জনৈক ইতালীয় লেখক 'পিনোচ্চিও, এক পুতুলের গপ্পো' নামে একটি বই ১৮৮০ সালে প্রকাশ করেছিলেন। এর ইংরেজি অনুবাদ বেরয় ১৮৯২ সালে।



www.pathagar.com

ওয়াল্ট্ ডিজ্‌নি (দ্র) ১৯৩৮ সালে পিনোচ্চিওকে নিয়ে কার্টুন-চলচ্চিত্র তৈরি করায় গল্পটি সারা পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের নিকট সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

হা. মা.

**পিপ্পল** অশ্বত্থ দ্র

## পিয়ানো (piano)

পাশ্চাত্য সঙ্গীতযন্ত্র। কী (key) বা চাবিযুক্ত যন্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইতালীয় হার্পসিকর্ড (harpsichord) নির্মাতা ক্রিস্তোফোরি (১৬৬৫–১৭৩১) পিয়ানোর উদ্ভাবক-

রূপে বিবেচিত হন। ১৭০৯ সালে ফ্লোরেন্স শহরে ক্রিস্তোফোরি এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

পিয়ানো বস্তুতপক্ষে হার্পসিকর্ডের উন্নততর সংস্করণ। ষোড়শ শতক থেকে গৃহব্যবহার্য সঙ্গীতযন্ত্ররূপে হার্পসিকর্ড ইউরোপে (দ্র) প্রচলিত হয়। হার্পসিকর্ড দেখতে পা–লাগানো বাক্সের মতো। এতে অর্গ্যানের (দ্র) মতো চাবি সাজানো থাকে। নিচের দিকে প্রতিটি স্বরবাচক তার থাকে। চাবি টিপলে এক ধরনের জ্যাক বেরিয়ে তারে টান দেয়। তাতেই ধ্বনিগুলো বাজে। পিয়ানো দেখতে হার্পসিকর্ড-এর মতোই বাক্সসদৃশ এবং তেমনি চাবিযুক্ত; তবে চাবি টিপলে হার্পসিকর্ডে যেমন জ্যাকের টানে ধ্বনি সৃষ্টি হয়, পিয়ানোয় তেমন নয়। পিয়ানোতে চাবি টিপলে হাতুড়ির মতো বস্তু তারে টোকা দেয় এবং তাতেই ধ্বনিসমূহ বাজে। কালক্রমে পিয়ানোবাদনে বহু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ঘটেছে এবং ধ্বনি বাদনকে দীর্ঘ ও হ্রস্ব করার পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে। পিয়ানোর সঙ্গে পাশ্চাত্য কণ্ঠসঙ্গীতের বিকাশের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই যন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতের বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। জার্মানি থেকে সূচিত পাশ্চাত্য কাব্যসঙ্গীতের ধারার বিকাশের সঙ্গে পিয়ানোর প্রচলন গভীরভাবে যুক্ত।

ক. গো.

## পিরান্দেল্লো, লুইজি [১৮৬৭—১৯৩৬]

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নেতৃস্থানীয় নাট্যকার। তিনি ১৮৬৭ সালের ২৮শে জুলাই ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে বিশেষ খ্যাত হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিরেন্দেল্লোর (Luigi Pirandello) একমাত্র পরিচিতি অস্তিত্ববাদী নাট্যকার হিসাবে। তাঁর বিখ্যাত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে 'লেখকের খোঁজে ছয় চরিত্র' (১৯২১), 'যে যার রাস্তায়' (১৯২৪) এবং 'হেনরি দ্য ফোর্থ' (১৯২২) ইত্যাদি।

তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থ 'স্টোরিজ ফর ওয়ান ইয়ার'। ১৯৩৫ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৩৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি ইতালিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.



www.pathagar.com

## পিরান্‌হা (piranha)

চারাসিডি (characidae) বর্গের ভয়ঙ্কর প্রকৃতির শিকারি মাছ। এদের চোয়াল যেমন শক্ত, দাঁতও তেমনি ধারালো। সাধারণত এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এবং আক্রমণ চালায়। একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বভাবচরিত্রে এরা ভীতু। কিন্তু এরা সর্বদা ঝাঁক বেঁধে ঘোরে এবং যূথবদ্ধ শক্তিতে এরা অকল্পনীয় হিংস্রতার পরিচয় দেয়।

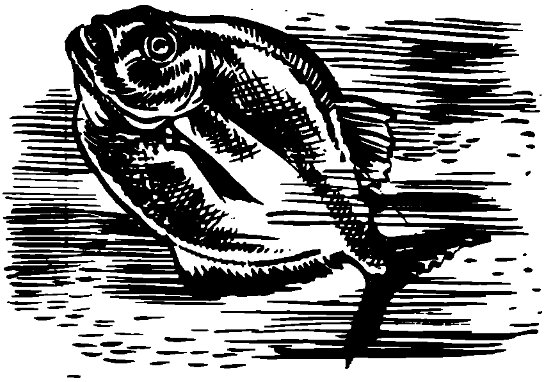

পিরান্‌হা মাছের বারো রকমেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। তার মধ্যে চার প্রজাতির পিরান্‌হা অত্যন্ত বিপজ্জনক। লাল পিরান্‌হা প্রজাতির ঝাঁক কোনো শিকার পেলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ঘোড়ার মতো বড় কোনো প্রাণী (দ্র) এদের কবলে পড়লে মাত্র ৫ মিনিটেই ভোজন সমাপ্ত করে শুধু কঙ্কাল ফেলে রাখে। সবচেয়ে বড় প্রজাতির পিরান্‌হার নাম *পিগোসেন্ত্রুস পিরাইয়া (Pygocentrus Piraya)*। এরা ৬০ সেন্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি) পর্যন্ত লম্বা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) উত্তরভাগে, বিশেষ করে আমাজন অববাহিকায় পিরান্‌হা বেশি পাওয়া যায়। এদের স্বাভাবিক খাবার হল ছোট আকারের মাছ, তবে এরা প্রায়ই দল বেঁধে বড় আকারের সামুদ্রিক প্রাণীদের আক্রমণ করে মেরে খায়। জল ছিটিয়ে এরা সগোত্রীয়দের আকৃষ্ট করে।

পিরান্‌হাকে কোথাও কোথাও অ্যাকোয়ারিয়ামে শোভা পেতেও দেখা যায়। তবে অ্যাকোয়ারিয়ামে এদের দুরন্তপনা ও হিংস্রতা খুব একটা প্রকাশ পায় না।

সুজ. ব.

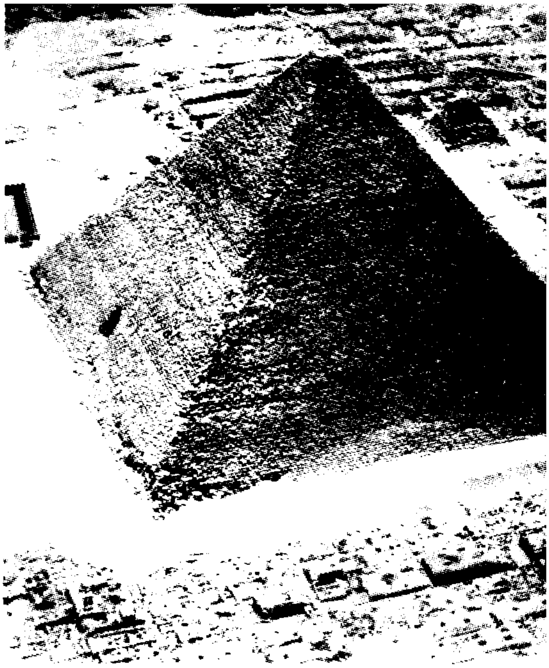

*মিশরের সর্ববৃহৎ পিরামিড—গিজা*
*৪৫১ ফুট উঁচু এবং ভূমি ৭৫০ ফুট বিস্তৃত*

## পিরামিড

প্রাচীন মিশরের ফারাও (অর্থাৎ সম্রাট) ও ধনবান ব্যক্তিদের সমাধিতে পাথরের নির্মিত বিশালাকার স্মৃতিসৌধ। এর ভিত্তি সমচতুর্ভুজ, কিন্তু ওপরের দিকে চারপাশ ক্রমশ ছোট হতে হতে ত্রিভুজ আকারের হয়ে এক বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। তামার বাটালি ও হাতুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো কেটে গ্রানাইট ও চুনাপাথর (দ্র) সহযোগে বিশাল এক দল শ্রমিক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পিরামিড নির্মাণ করত। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০-২৩০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। পিরামিড প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পরও আরেকটি জীবন আছে এবং মৃত্যুই চিরকালের আশ্রয়স্থল। রাজারা ভাবতেন, মৃত্যুর পর তাঁরা আবার রাজা হবেন। তাই তাঁদের মৃতদেহ ঔষধ (দ্র) দিয়ে এমনভাবে কবরস্থ করার ব্যবস্থা চালু করেন, যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায়। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মৃতদেহকে 'মমি' বলা হত। প্রথম দিকে রাজার মমি সাধারণভাবেই সমাহিত করা হত। সঙ্গে দেওয়া হত



www.pathagar.com

নানা রকম ধনরত্ন, স্বর্ণালঙ্কার ও ভোগ-বিলাসের সকল সরঞ্জাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে দস্যুরা এসব সামগ্রী লুট করত। ফলে কবর আরো সুরক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলে পিরামিড নির্মাণ শুরু হয়। রাজারা জীবিত অবস্থায় পিরামিড নির্মাণ করাতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁদের মৃতদেহ পিরামিডের ভিতরে নির্দিষ্ট জায়গায় সমাহিত করা হত।

সবচেয়ে বিশালাকার পিরামিডটি কায়রো শহরের কাছে গিজা নামক স্থানে অবস্থিত। এটি রাজা কেওপ্স্-এর বা খুফু-র পিরামিড নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ অব্দে এটি নির্মিত হয়। ৭৫০ বর্গফুট বা ৬৯ বর্গমিটার জমির ওপর নির্মিত এই পিরামিডের উচ্চতা ৪৫১ ফুট বা ১৩৭ মিটার। এক লক্ষ শ্রমিক ২০ লক্ষ পাথরের চাঙড় দিয়ে ২০ বছরে এটি তৈরি করে।

সুজ. ব.

## পিলখানা

ফার্সিভাষায় 'পিল' মানে হাতি। তার সাথে যুক্ত হয়েছে 'খানা'। 'খানা'ও ফার্সি শব্দ। অর্থ স্থান বা জায়গা। উল্লিখিত দু'টি শব্দ একত্র হয়ে হয়েছে পিলখানা অর্থাৎ হাতির আস্তাবল বা হস্তিশালা কিংবা হাতিশাল।

ঢাকা (দ্র) শহরে বাংলাদেশ রাইফেল্স্-এর সদর দফতরের পশ্চিম দিক অভিমুখী যে বিরাট প্রশস্ত মাঠ ছিল, তাকেই পিলখানা বলে অভিহিত করা হত। এটা ছিল বন-জঙ্গল থেকে সদ্য ধরে আনা বন্য হাতিদের পোষ মানানোর জন্য ব্যবহৃত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা সরকারি মাঠ। মোগল আমলে ঢাকা নগরীর উত্তর দিকে এ জাতীয় আরেকটি মাঠ ছিল। পিলখানার এই মাঠে বেশ কয়েক জন জমিদারও নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে তাদের হাতি চরাতেন। ১৮৯৫ সালে বাংলায় তৎকালীন গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়টকে পিলখানার এই মাঠে একটি 'হাতিখেদা' অভিযানের মহড়া দেখানো হয়েছিল।

পিলখানা ছিল ভারত সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। তবে এখানে কত সংখ্যক হাতি থাকত, সে সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। হাতির মাহুতেরা যেখানে বসবাস করতেন, সেই এলাকাটি কালক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠে মাহুতটুলি নামে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা মহানগরীর প্রধান যে ক'টি স্থান পাক হানাদার বাহিনীর সশস্ত্র হামলার শিকার হয়, পিলখানায় অবস্থিত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল্স্-এর সদর দফতর তাদের অন্যতম। ঐ হামলার মুখে রাইফেল্স্-এর সদস্যরা তাৎক্ষণিক মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুললেও তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সীমিত ও অনাধুনিক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা পেরে ওঠেন নি। ফলে তাঁদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেন এবং আহত হন। বাদবাকি বহু সংখ্যক সদস্য সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) যোগ দিয়ে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পিলখানায় অবস্থিত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স্ সদর দফতরের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'বাংলাদেশ রাইফেল্স্ হেড কোয়ার্টার'।

আ. হ.

## পিস্টন

পিস্টন দেখতে অনেকটা বর্তুলাকার টিনের ফাঁপা কৌটার মতো। এটি কোনো আধার বা সিলিণ্ডারের ভেতর ওঠানামা করে বা অগ্রপশ্চাৎ চলাফেরা করে। এই সিলিণ্ডার সাধারণত পিস্টনের সমান মাপের হয়। সিলিণ্ডারের সম্মুখে একটি ছিদ্র থাকে। সাধারণ পানির পাম্প, পিচকারি, বায়ুপাম্প, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি যন্ত্রে পিস্টন ব্যবহৃত হয়। পানির পাম্পে পিস্টন পানি (দ্র) উত্তোলন করে, বায়ুপাম্পে এটি বায়ুকে সঙ্কুচিত করে। মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের পিস্টন সিলিণ্ডারে পেট্রোল জ্বলে উঠলেই গতিশীল হয়। সাইকেল পাম্পের পিস্টনকে বলা হয় প্লাঞ্জার।

শা. ত.

## পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র শব্দের উৎপত্তি ইংরেজি capitalism শব্দের অনুবাদ হিসাবে। এটি অর্থনীতি- শাস্ত্রের একটি টার্ম বা পরিভাষা। পুঁজিবাদ হল সমাজের এক ধরনের বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মানবসভ্যতা ক্রমান্বয়ে যেভাবে বিকাশলাভ করেছে, সেই বিকশিত হওয়ার পথে পুঁজিবাদ একটি ধাপ বা স্তর।

সভ্যতার উন্নত পর্যায়ে সমাজ যখন কৃষিভিত্তিক হল, তখন জমির মালিকানার ভিত্তিতে তৈরি হল সামন্তপতি, আর যাদের জমি নেই তারা হল ভূমিদাস বা সামন্তপতিদের হুকুমের চাকর। দেশ-বিদেশের রাজরাজড়ার যেসব ইতিহাস



www.pathagar.com

আমরা পড়ি বা যেসব গালগল্প বা রূপকথা ইত্যাদি শুনি তা সব ঐ সামন্তবাদী বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই কাহিনী। সভ্যতার ইতিহাসে এ হল মধ্যপর্যায়। তাই সামন্তযুগকে সর্বদা 'মধ্যযুগ' (দ্র) বলা হয়ে থাকে।

সামন্তবাদী সমাজেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং ক্রমশ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। উৎপাদনের সহজতর ও উন্নততর বিভিন্ন হাতিয়ার, নানারকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার শুরু হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সামন্তবাদের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি নতুন এক যন্ত্রসভ্যতার জন্ম দিল, যেখানে উৎপাদনশীল যন্ত্রের মালিক হয়ে দাঁড়াল সমাজের প্রভু। অধিকতর উৎপাদনে সক্ষম যন্ত্রনির্ভর এই পদ্ধতির চাপে সামন্ততন্ত্রের ক্রমশ ক্ষয় ও বিলুপ্তি, এবং নবতর সমাজপদ্ধতিটির বিজয় সূচিত হল। এই সমাজব্যবস্থাটিই হল ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদের মূল সূত্র বা উপাদান হল পুঁজি বা মূলধন। এই পুঁজি বা মূলধন কেবলমাত্র টাকা নয়, জমি, যন্ত্র, শ্রম ও অর্থ এই চারটির সমন্বয়। উৎপাদনশীল যন্ত্রের যিনি মালিক তাঁর হাতে এই চারটি এসে যায়। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষ দিয়ে যন্ত্র চালায় এবং ক্রমান্বয়ে বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে দেশের ভিতরে বা বাইরে বিক্রি করতে পারে; বিক্রি করে অর্থ আনতে পারে, পণ্য আনতে পারে, আরো বেশি যন্ত্র তৈরি করতে পারে। তবে, যন্ত্র থেকে মুনাফা ওঠানোর মূল হাতিয়ার কিন্তু মজুর; কারণ বাঁধা মজুরির বিনিময়ে সে মালিকের জন্য শ্রম দেয়, যত বেশি শ্রম সে দেবে তত বেশি উৎপাদন হবে, এবং তার শ্রমের ওপরেই নির্ভর করছে যন্ত্রমালিকের ক্রমবর্ধমান আয়।

এ ব্যবস্থায় এক দিকে রয়েছে যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা আর অন্য দিকে রয়েছে বহু শ্রমিকের সমন্বিত শ্রমে উৎপাদনের সম্মিলিত পদ্ধতি। উৎপাদনের এই সম্পর্কের ভিতরেও যন্ত্রমালিক শোষক এবং শ্রমিক শোষিত, যদিও শোষণের চেহারাটা সাদা চোখে দেখা যায় না—সামন্তবাদী যুগে কিন্তু দেখা যেত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের (দ্র) কয়েকটি দেশে এই সমাজব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং পুরো উনিশ শতক এর অপ্রতিহত জয়যাত্রার কাল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পুঁজিবাদ নিজ নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অধিক উৎপাদন ও অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতাই হল ধনতন্ত্রের ও পুঁজিবাদী সমাজের চালিকাশক্তি। ফলে নিজের দেশে মুনাফাবৃদ্ধির সুযোগ সীমিত হয়ে এলে অন্য দেশ দখল করে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রথম করেন জার্মান দার্শনিক কার্ল্ মার্ক্স (দ্র) ও তাঁর বন্ধু ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্ (দ্র)। তাঁরা ব্যাখ্যা করে দেখান যে সামন্তবাদের চেয়ে পুঁজিবাদ সমাজবিকাশের জন্য উপকারী, উন্নততর ও অগ্রসর, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব বহু কলঙ্ক আছে, অপকর্ম রয়েছে। এবং তাঁরা পুঁজিবাদের বিপরীতে উন্নততর ও সভ্যতর সমাজ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে ও দর্শন হিসাবে সমাজতন্ত্র (দ্র) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

হা. মা.

## পুঁথিসাহিত্য

সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে 'পুথি' শব্দটি হয়েছে। পুথির নাসিক্য উচ্চারণ হল পুঁথি। সুতরাং পুথিসাহিত্য আর পুঁথিসাহিত্য একই। 'পুস্তিকা' শব্দের এক অর্থ হাতে লেখা বই। এখনকার দিনের 'বই' আর আগের দিনের 'পুঁথি' একই বস্তু। তবে 'বই' ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়; আর পুঁথি লিখতে হয়েছিল হাতে, যেহেতু আগের দিনে ছাপাখানা ছিল না। ছাপাখানা ব্যবহার শুরু হয়েছে আধুনিক কালে।

মধ্যযুগের কিংবা প্রাচীন যুগের যত সাহিত্য আছে সবটাই হাতে লিখতে হয়েছিল এবং এগুলোর একাধিক কপিও হাতে লিখেই তৈরি করা হয়েছিল। ছাপাখানা ব্যবহারের আগে যেসব বই হাতে লিখে রাখা হয়েছিল সেগুলির সবই পুঁথি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল সাহিত্য—চর্যাপদ (দ্র), শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (দ্র), ইউসুফ-জোলেখা (দ্র), রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র), পদ্মাবতী (দ্র), মঙ্গলকাব্য (দ্র), বৈষ্ণব সাহিত্য, নবীবংশ (দ্র), রসূলবিজয়, অন্নদামঙ্গল (দ্র), জঙ্গনামা ইত্যাদি সবই এক কথায় পুঁথিসাহিত্য। এখনো সেই সব হাতে-লেখা পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে,



www.pathagar.com

সাহিত্যগবেষণার কেন্দ্রে (যেমন ঢাকার বাংলা একাডেমী, কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইত্যাদিতে) এবং জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

বঙ্গদেশে ছাপাখানার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর হাতে-লেখা পুঁথিগুলিকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করার রেওয়াজ শুরু হয়। তবে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছাড়া এ কাজ সবাই পারে না। মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের প্রভাব আছে। ছাপাখানা চালু হওয়ার পর তারা মধ্যযুগের বিশেষ বিশেষ পুঁথি ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। এগুলো 'বটতলার পুঁথি' (দ্র) নামেও পরিচিত ছিল।

আঠারো-উনিশ শতকে মুসলমান শায়েরেরা বাংলা ও হিন্দুস্থানির মিশ্রণে এক নতুন ভাষারীতির সাহায্যে যে কাব্যকাহিনী রচনা করে, তাকে 'দোভাষী পুঁথি' বলা হয়। কালে কালে 'দোভাষী পুঁথি' আর 'পুঁথিসাহিত্য' এক হয়ে যায়। এখন পুঁথিসাহিত্য বলতে প্রধানত দোভাষী পুঁথিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। দোভাষী পুঁথির মধ্যেও রয়েছে ইসলামের ইতিহাস ঘেঁষা নানা সম্ভব ও অসম্ভব কল্পকথা, রূপকথাধর্মী উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রাচীন ইরানের বীর–পালোয়ানদের গল্প এবং কারবালার কাহিনী দোভাষী পুঁথিতে রচিত হয়েছে। অশিক্ষিত মানুষ পুঁথিসাহিত্য শুনে খুব মজা পেত। এক সময় পুঁথিসাহিত্য জন-সাধারণের সাহিত্যতৃষ্ণা মিটিয়েছে। আসর করে পুঁথিপাঠ হত এবং লোকজন তা শুনত।

আ. ক.

**পুটুস** শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

## পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) অন্যতম ভক্ত ও সহচর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে ভালবেসে 'প্রেমনিধি' বলতেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। কিন্তু এ ঐশ্বর্য তাঁকে ধরে রাখতে পারত না। তিনি বৈষ্ণবধর্মের (দ্র) ভক্তিকথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করে বেড়াতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ দেবের দর্শন অভিলাষে মাঝে মাঝে পুরী যেতেন। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচয়িতারা অনেকে তাঁর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। হাটহাজারীর মেখলগ্রামে পুণ্ডরীকধাম এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

শ. আ.

**পুনর্জন্মবাদ** জন্মান্তরবাদ দ্র

## পুরাতত্ত্ব (archaeology)

পুরাতন শব্দটির সংক্ষেপিত রূপ 'পুরা', আর 'তত্ত্ব' অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞান। অতএব 'পুরাতত্ত্ব' মানে হল পুরাতন বিদ্যা বা জ্ঞান। একে অন্য কথায় 'প্রত্নতত্ত্ব'ও বলা হয়।

প্রাচীন কালের জীবনযাপনের নিদর্শন হিসাবে যেসব বস্তু পাওয়া যায়, তা থেকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই হল পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব। মুদ্রা, লিপি, বইপুস্তক, ভবন, অট্টালিকা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ বিচার করে প্রাচীন কালের মানুষের ইতিহাস আবিষ্কার হল পুরাতত্ত্বের কাজ। বিরাট প্রাচীন একটি শহর থেকে ক্ষুদ্র একটি পাথরের টুকরোও পুরাতত্ত্ব গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের তৈরি এবং মানুষের ব্যবহৃত—এই দুই ধরনের জিনিসই পুরাতত্ত্বের বিষয়। ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, হাতিয়ার ইত্যাদি হল মানুষের তৈরি জিনিস। আর মানুষের ব্যবহৃত জিনিস হল আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত প্রাণীর হাড়গোড়, গাছপালা-লতাগুল্মাদি যা দিয়ে মানুষ আহার্য যুগিয়েছে এবং চুলোয় ব্যবহৃত কাঠকয়লা, যা দিয়ে মানুষ রান্না করেছে।

মূলে তিন ধরনের পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা হয়। এগুলো হচ্ছে: (১) আর্টিফ্যাক্টস (artifacts) অর্থাৎ মানুষের তৈরি নিদর্শনাদি, যেমন লিখিত কোনো বই; (২) ফিচারস (features) অর্থাৎ মানুষের তৈরি ভবনাদি, জলসেচ প্রকল্প ইত্যাদি; এবং (৩) ইকোফ্যাক্টস (ecofacts) অর্থাৎ পরিবেশ-ভূপ্রকৃতিজাত বস্তুসামগ্রী, যেমন বিশেষ কোনো স্থানের শস্যাদি বা জীবজন্তুর হাড়গোড়।

যে স্থানে প্রচুর পুরাকীর্তি পাওয়া যায় সেই স্থানকে বলা হয় পুরাতাত্ত্বিক কীর্তিকেন্দ্র, যেমন–বাংলাদেশে মহাস্থানগড় (দ্র), ময়নামতী (দ্র), পাহাড়পুর (দ্র) ইত্যাদি। পুরাকীর্তি উদ্ধারের জন্য তাই সরেজমিনে কাজ করতে হয়। কখনো কখনো খননকাজ করতে হয়। আর সেই সব প্রাপ্ত দ্রব্য বিভাজন বা শ্রেণীকরণ করতে হয় অর্থাৎ কোনটা কোন সময়ের কী–জিনিস এসব বিচার করে বের করতে হয়।



www.pathagar.com

যাঁরা এই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁদের বলা হয় পুরাবিদ্ বা পুরাতত্ত্ববিদ।

সৈ. আ. ই.

### পুলিটজার পুরস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) বিখ্যাত সাংবাদিক জোসেফ পুলিটজারের (Joseph Pulitzer : ১৮৪৭-১৯১১) নামানুসারে ১৯১৭ সাল থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকতায় ৪টি, সাহিত্যে ৬টি এবং সঙ্গীতে ১টি পুরস্কার। এতে জনকল্যাণমূলক সংবাদের জন্য একটি করে স্বর্ণপদক ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য এক হাজার ডলার করে দেওয়া হয়।

খু. জা.

### পুশ্‌কিন্, আলেক্সান্দ্র্ সের্গিয়েইয়েভিচ [১৭৯৯—১৮৩৭]

আধুনিক রুশ লেখ্য ভাষার জন্মদাতা এবং রুশ সাহিত্যে (দ্র) সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও প্রথম কথাসাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রবীন্দ্রনাথের (দ্র) যেমন আসন, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান, রুশ ভাষা ও সাহিত্যে পুশ্‌কিন তেমনই মর্যাদার অধিকারী।

পুশ্‌কিন্ অভিজাত বংশে জন্মেছিলেন। তাঁর মায়ের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে। তাঁর চেহারার মধ্যে এই ছাপ স্পষ্ট ছিল—দেখতে সাহেবদের মতো টকটকে ফর্সা ছিলেন না, মাথার চুল ছিল ঘন কালো এবং অসম্ভব কোঁকড়ানো, ঠোঁট ছিল পুরু; অর্থাৎ তিনি দেখতে তত সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন সেকালের ডাকসাইটে সুন্দরী।

পুশ্‌কিন্ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন; মাতৃভাষা রুশের বাইরে ফরাসি ও ইংরেজি জানতেন মাতৃভাষার মতোই উত্তমরূপে। কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল অল্পবয়সেই। ইংরেজ রোম্যান্টিক কবি বায়রনের (দ্র) প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপরে। সরকারী উচ্চপদে সর্বদা চাকুরি করেছেন, কিন্তু রাজা, রাজপরিবার বা অভিজাত সমাজ কোনো কিছুই তোয়াক্কা করতেন না। এই বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য তাঁকে অবশ্য অনেক অপমান ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। রাজসভারই গোপন চক্রান্তে তাঁকে এক বিদেশীর সঙ্গে ডুয়েল (দ্র) লড়তে হয়েছিল। সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধেই প্রতিপক্ষের পিস্তলের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পুশ্‌কিনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তাঁর পনেরো বছর বয়সে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'ছন্দে রচিত উপন্যাস' 'ইভ্‌গিয়েনি আনিয়েগিন্', ইংরেজি অনুবাদে যা 'ইউজিন্ ওনেগিন্' (Eugene Onegin) নামে পরিচিত। এই কাব্য তিনি আট বছর ধরে লিখেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আরো কাব্যগ্রন্থ আছে।

তিনি 'বরিস্ গদুনফ্' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক ও বেশ কিছু গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যের অনেক ক'টি বাংলা অনুবাদ মস্কো (দ্র) থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে', 'ইস্কাবনের বিবি', 'বেলকিনের গল্প'।

পুশ্‌কিন্ কেবল কবিই ছিলেন না, আধুনিক রুশ গদ্যও তাঁর হাতে জন্মলাভ করে।

হা. মা.

### পুষ্কর

হিন্দুদের একটি তীর্থ। রামায়ণ (দ্র), মহাভারত (দ্র), পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুষ্করের উল্লেখ আছে। মহাভারতে দাবি করা হয়েছে, পুষ্কর সবচেয়ে পুরাতন আদি তীর্থ। পুষ্কর মানে পদ্ম। পুরাণ মতে, পরশুরাম এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মা হাতে পদ্ম নিয়ে যজ্ঞের স্থান নির্বাচনের জন্য বেরিয়েছিলেন। তাঁর হাতের সেই পদ্মটি যেখানে পড়েছিল ব্রহ্মা সেখানে বসে তপস্যা শুরু করেন। সেই থেকে জায়গাটির নাম হয় পুষ্কর। পুষ্কর ভারতের রাজস্থানের অন্তর্গত। সেখানে একটি হ্রদ আছে। একটি শহরও গড়ে উঠেছে। এর তিন দিক আরাবল্লী পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা।



www.pathagar.com

বর্তমান আজমীর স্টেশন থেকে ১১ কিলোমিটার উত্তরে পুষ্কর অবস্থিত।

এখানে ব্রহ্মা (দ্র), সাবিত্রী, গায়ত্রী ও শিবসহ অনেক দেবতার মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মার মন্দিরটি সবচেয়ে বড়। পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দির দেখা যায় না।

নি. অ.

**পুষ্টিতন্ত্র** (nutrition)

শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য আমরা যা খাই তা হল খাদ্য। খাদ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান হল পুষ্টিবিজ্ঞান। খাদ্য গ্রহণের পর তা খাদ্যনালিতে পরিপাক হয়ে রক্তে শোষিত হয় এবং দেহকোষে পৌঁছয়। এভাবে খাদ্য শরীরের পুষ্টিসাধন করে। এসব কিছু নিয়েই গঠিত পুষ্টিতন্ত্র। যে পদ্ধতিতে খাওয়ার পর খাদ্য শক্তিতে পরিণত হয়, দেহের গঠন ও বৃদ্ধির সহায়তা করে, তাই হল পুষ্টি।

খাদ্যের প্রধান উপকরণ শর্করা, চর্বি (দ্র), আমিষ, ভিটামিন (দ্র), খনিজ লবণ (দ্র) ও পানি (দ্র)। শর্করা ও চর্বি শরীরে কাজের শক্তি জোগায়। আমিষ শরীরের বৃদ্ধি ঘটায় ও ক্ষয়পূরণ করে। ভিটামিন ও খনিজ লবণ শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করে।

শরীর শর্করাকেই মূলত তাপশক্তি জোগানোর কাজে ব্যবহার করে। যেমন—চাল, গম (দ্র), চিনি (দ্র), গুড়, আলু (দ্র), মূল জাতীয় খাদ্য। শর্করা দু'রকমের : সরল শর্করা, যেমন—গ্লুকোজ (দ্র) ও ফ্রুক্টোজ (দ্র)। তা আছে পাকা ফল ও মধুতে (দ্র)। জটিল শর্করা, যেমন—ল্যাক্টোজ ও সুক্রোজ এবং শ্বেতসার (দ্র)। ল্যাক্টোজ আছে দুধে (দ্র)। সুক্রোজ আছে চিনিতে। আলু, চাল, গম, ভুট্টায় আছে শ্বেতসার। শ্বেতসার খাদ্যনালিতে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

চর্বি ঘনীভূত শক্তির আধার। কোষ গঠন ও ভিটামিন-এ শোষণের জন্যও চর্বি প্রয়োজন। সব রকমের তেল, ঘি, মাখন (দ্র), তৈলাক্ত মাছ, দুধ, মাংস ও ডিমের কুসুমে আছে চর্বি। উদ্ভিজ্জ তৈল, যেমন—সয়াবিন বা সর্ষের তেলেও আছে চর্বি।

দেহকোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণের জন্য চাই আমিষ (প্রোটিন)। বাড়ন্ত শিশুদের জন্য আমিষ খুব দরকারী। মাছ (দ্র), মাংস, ডিম (দ্র), দুধ, ডাল (দ্র), শিম (দ্র), বাদাম, মটরশুঁটি (দ্র) ইত্যাদিতে আছে প্রোটিন। চাল ও গমে প্রোটিন কম থাকলেও ডাল, ডিম ও মটরশুঁটির সঙ্গে মিলিয়ে খিচুড়ি তৈরি করলে প্রচুর আমিষ পাওয়া যায়।

শর্করা, চর্বি, আমিষ সবই শক্তি জোগায়। বাড়ন্ত শরীরে, রোগ হলে, নারী গর্ভবতী হলে শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য কম পরিমাণে হলেও প্রয়োজন হয় ভিটামিন ও খনিজ লবণের। গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলো হল ভিটামিন এ, বি কমপ্লেক্স, ডি এবং সি। তেমনি খনিজ হল লৌহ (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র) ফসফরাস (দ্র), দস্তা (দ্র)। সব পুষ্টি-উপকরণ পরিমিত পরিমাণে মিলে সুষম খাদ্য তৈরি হয়। প্রতি দিনের খাদ্যে তাই প্রয়োজন ভাত, আটা, ডাল, শিম, মটরশুঁটি, মাছ, মাংস, সবুজ শাকসবজি, দুধ ও মৌসুমি ফল। খাদ্যে স্বাদের জন্য চাই পেঁয়াজ (দ্র), লবণ ও লঙ্কা। পানি দিনে অন্তত ৮–১০ গ্লাস তো খেতে হবেই।

শু. চৌ.

**পূর্ণিমা** চাঁদ দ্র

**পূর্ণেন্দু দস্তিদার** [১৯০৯—১৯৭১]

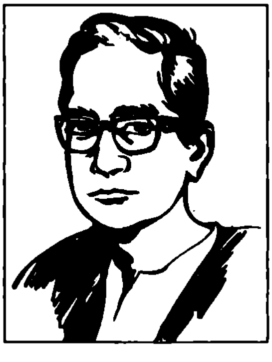

বিপ্লবী, লেখক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের (দ্র) বীর সন্তান। কিশোর বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের গুপ্ত কর্মীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্কুল জীবন শেষ করে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময়েই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অপরাধে কারাদণ্ড (১৯৩০) ভোগ করেন। বিভিন্ন বন্দিশিবির, কারাগার, ও অন্তরীণ অবস্থায় আটক থাকার পর ১৯৪০ সালে মুক্তি লাভ করেন। ইতিমধ্যে জেলখানা থেকেই তিনি পরীক্ষা দিয়ে বি.এ. এবং বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেও তিনি বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সেই সঙ্গে



www.pathagar.com

ওকালতিও করতে থাকেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান (দ্র) আমলে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁকে ফের গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি জেলের ভিতরে বন্দি থাকেন। সেই অবস্থাতেই তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান (দ্র) সামরিক শাসন জারি করলে পুনরায় তাঁকে আটক রাখা হয় ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ (দ্র) বাধলে আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়, ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ছাড়া পান।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' (১৯৬৭)। এ ছাড়াও 'কবিয়াল রমেশ শীল' (১৯৬৩) ও 'বীরকন্যা প্রীতিলতা' (১৯৭০) নামে দু'টি বই আছে। চেখফ্ (দ্র) ও মোপাসাঁর (দ্র) গল্পও তিনি অনুবাদ করেছেন।

১৯৭১ সালে পাক বাহিনী চট্টগ্রাম শহর আক্রমণ করলে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারতে পৌঁছবার পূর্বে পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

হা. মা.

## পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' (দ্র) গৃহীত হওয়ার পরে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদেরও একটি অংশ সেই চেতনার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হতে চাইলেন। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানী আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি করা। তখনো কিন্তু ভারত বিভক্ত হয় নি, পাকিস্তানও সৃষ্টি হয় নি। যাই হোক, ১৯৪০ এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় (দ্র) স্থাপিত হল 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'; এর আহবায়ক হয়েছিলেন মুজিবুর রহমান খাঁ। বাংলা ভাষায় (দ্র) অযথা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আরবি, ফার্সি-উর্দু শব্দের আমদানি, শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে প্রধান করে তুলে সাহিত্য রচনা, মুসলমানদের জন্য নতুন লেখ্য-ভাষা তৈরি করা ইত্যাদি এঁদের উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম লাভের পর এই মতাবলম্বী শিল্পী-সাহিত্যিকই ক্রমান্বয়ে ধর্মনিরপেক্ষ চিরকালীন বাঙালি-সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদির জন্ম দেওয়ায় প্রভূত সাহায্য করেছে। বলা দরকার, এই সোসাইটি বৎসরের পর বৎসর ধরে চলে নি, তবে এর উদ্যোক্তা মানুষজন দীর্ঘজীবী ছিলেন।

হা. মা.

## পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (দ্র) কর্তৃক সম্পাদিত পূর্ববাংলার লোকগাথার সঙ্কলন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করে। এই সঙ্কলনটি চার খণ্ডে সমাপ্ত ও মুদ্রিত। এর পালাগানগুলোর অধিকাংশই চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া, মঞ্জুর মা, ধোপার পাঠ, কাঞ্চনমালা, শ্যামরায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও পল্লীর নর–নারীর হৃদয়ের অনুভূতি এতে প্রকাশিত। এ ছাড়া তাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও সুখ-দুঃখের কথা বর্ণিত হয়েছে। পদ্যে রচিত এই গাথাগুলোতে পল্লীগ্রামের অপূর্ব শব্দভাণ্ডার বিধৃত আছে। এর ভাষা ও ছন্দ কিছুটা অমার্জিত, তবে সরল। কবিত্বে পরিপূর্ণ এই পালাগানগুলো গেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে পরিবেশন করা হত। এই পালাগানের গায়কদের কেউ কেউ নিরক্ষর ছিলেন বলে জানা যায়। এসব পালাগান নাটকীয় গুণে গুণান্বিত, কাহিনীও চিত্তাকর্ষক। ক্ষীতিশচন্দ্র মৌলিক ১৯৭১-৭৫ সালে ৭ খণ্ডে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামে (দ্র) আশুতোষ চৌধুরীও অনেকগুলো পালাগান সংগ্রহ করেন, যা মোমেন চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

বি. ব.

**পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ** ইস্ট ইণ্ডিজ দ্র

## পৃথিবী

মানুষের প্রিয় আবাসস্থল, সূর্য (দ্র) নামক তারার গ্রহ (দ্র)। সূর্য থেকে দূরত্ব হিসাবে পৃথিবী সৌরজগতের (দ্র) তৃতীয় গ্রহ।

সূর্য সৃষ্টির সময়েই পৃথিবীর সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম। প্রধানত ভারি পদার্থ— যেমন লোহা (দ্র), সিলিকন (দ্র), অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) প্রভৃতি দিয়ে গঠিত।

চাদরের মতো একটি বায়ুমণ্ডল (দ্র) পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলে আছে প্রধানত নাইট্রোজেন (দ্র) ও অক্সিজেন (দ্র)। এ ছাড়া সামান্য কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র), নিষ্ক্রিয় গ্যাস (দ্র), জলীয় বাষ্পও রয়েছে।



www.pathagar.com

*মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ছবি*

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে বছরে একবার আবর্তন করে। কক্ষপথে সূর্য থেকে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্ব (অনুসূর) ১৪.৭ কোটি কিলোমিটার এবং দূরতম দূরত্ব (অপসূর) ১৫.২ কোটি কিলোমিটার।

সূর্যকে আবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশেও আবর্তিত হচ্ছে। এ কারণে গোলাকার পৃথিবী মেরু (দ্র) অঞ্চলে একটু চাপা ও বিষুবীয় অঞ্চলে কিছুটা স্ফীত।

চাঁদ (দ্র) নামে এর একটি মাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২৯ শতাংশ স্থলভূমি। বাকিটুকু জলভাগ। স্থলভূমি প্রধানত ৬টি মহাদেশীয় ভূ-খণ্ডে বিভক্ত : ইউরেশিয়া, আফ্রিকা (দ্র), উত্তর আমেরিকা (দ্র), দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র) এবং অ্যান্টার্কটিকা (দ্র)।

পৃথিবীর রয়েছে এক বিরল বৈশিষ্ট্য। এখন পর্যন্ত জানা জ্ঞানে, বিশ্বে (Universe) একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সূর্যের তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের ওপর পৃথিবীতে জীবনের প্রবাহ নির্ভরশীল। প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গ সেমি ভূপৃষ্ঠে ২ ক্যালরি সৌরশক্তি এস পড়ে। এই শক্তি উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ ঘটায়, যা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জীবজগতের খাদ্যের চাহিদা মেটায়।

পৃথিবী সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেওয়া হল।

পৃথিবীর তথ্য

| | |
|---|---|
| বিষুবীয় অঞ্চলের ব্যাসার্ধ | ৬৩৭৮.১৮৮ কিলোমিটার |
| মেরু অঞ্চলের ব্যাসার্ধ | ৬৩৫৬.৭৮৪ " |
| গড় ব্যাসার্ধ | ৬৩৭১.০০০ " |
| বিষুবীয় অঞ্চলের পরিধি | ৪০,০৭৫.৫১ " |
| ভর | ৫.৯৭৬ X ১০$^{২৭}$ গ্রাম |
| আয়তন | ১.০৮৩ X ১০$^{২৭}$ ঘন সেমি |
| গড় ঘনত্ব | ৫.৫১৭ গ্রাম/ঘন সেমি |
| সূর্য : পৃথিবী : চাঁদ ভর অনুপাত | ৩৩৩,০০০ : ১ : ০.০১২২৮ |
| সূর্য থেকে গড় দূরত্ব | ১.৪৯৬ X ১০$^{৮}$ কিমি |
| অক্ষের চারপাশে ঘোরার গতি | ২৯.৮ কিমি/সেকেণ্ড |
| সূর্যকে একবার আবর্তন করে | ৩৬৫.২৫ দিনে |
| নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরে | ২৩ঘ. ৫৬ মি. ৪.০৯ সেকেণ্ডে |
| ক্ষেত্রফল | ৫.০৯৬ X ১০$^{৮}$ বর্গ কিমি |
| স্থলভূমি | ১.৪৮ X ১০$^{৮}$ বর্গ কিমি |
| উচ্চতম বিন্দু | ৯.৫২১ মিটার (এভারেস্ট শৃঙ্গ) |
| নিম্নতম বিন্দু | —১০,৯২১ মিটার (মারিয়ানাস্ ট্রেঞ্চ) |
| ভূপৃষ্ঠে নিম্নতম বিন্দু | —৩৯৭ মিটার (ডেড সী বা মরুসাগর) |

মু. হা.

## পেঁপে

দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) থেকে পর্তুগিজেরা এ দেশে নিয়ে আসে। বৈজ্ঞানিক নাম *কারিকা পাপাইয়া (Carica papaya* Linn), গোত্র পাস্‌সিফ্লোরাইসি (Passifloraceae)। মাঝারি ধরনের সোজা গাছ। ২০–২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ঋজু কাণ্ড প্রায়ই শাখাহীন। দীর্ঘ ফাঁপা বৃন্তের প্রান্তে করতল আকারের পাতা হয়। মূল কাণ্ডের মাথায় চারদিকে পাতা বের হয়। পাকলে ঝরে পড়ে। পাতার কিনারা ৭ ভাগে বিভক্ত। নলের মতো বোঁটাটি ফাঁপা, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুরুষ গাছে পুং পুষ্প হয়। স্ত্রী জাতের গাছ থেকে পেঁপে হয়। কাঁচা অবস্থায় রঙ সবুজ, পাকলে পীত বা সোনালি রঙের হয়। ফলের ভেতরটা ফাঁপা ও এতে অনেকগুলো বীজ থাকে। বীজ কচি অবস্থায় সাদা ও পাকলে কালো হয়। প্রায় সারা বছর ফুল ও ফল হয়।



www.pathagar.com

পুরুষ গাছ কেটে ফেলতে হয়। মাথা কেটে দিলেও আবার স্ত্রী-গাছ বেশি থাকলে হয়ে যায়। পেঁপে কাঁচা অবস্থায় সবজি এবং পাকলে মিষ্টি ও রসাল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' থাকে। কাঁচা পেঁপের সাদা কষে 'পেপেইন' নামক এনজাইম (দ্র) থাকে। এটি প্রোটিনের পরিপাকে সাহায্য করে। সে জন্য মাংস সিদ্ধ করতে কাঁচা পেঁপের টুকরো ব্যবহার করা হয়। যকৃতের (দ্র) জন্য পেপেইন উপকারী। এ জন্য আস্ত পেঁপে ধুয়ে তার পর খোসা ফেলে রাঁধতে হয়। বীজ কৃমি নাশ করে।

পেঁপে রক্ত-অর্শে, কৃমিরোগে, আমাশয়ে (দ্র), পেট ফাঁপায়, প্রবল জ্বরে, দাদ (দ্র) ও একজিমায় (দ্র), উকুনে উপকারী।

বি. ব.

*পেঁয়াজ ও পেঁপে*

## পেঁয়াজ

বর্ষজীবী কন্দমূল। বৈজ্ঞানিক নাম *অ্যাল্লিয়াম কেপা* (*Allium cepa* Linn). গোত্র লিলিয়াসি (Liliacae)। অর্থাৎ পেঁয়াজ লিলি বা পদ্ম গোত্রের উদ্ভিদ। বীজ, টুকরো পেঁয়াজ ও চারা দিয়ে পেঁয়াজের চাষ হয়। ছোট এক রকম পেঁয়াজ আছে, তাকে বলে ছাঁচি পেঁয়াজ।

শুকনো শল্কপত্রে গঠিত বাইরের আবরণ দ্বারা পেঁয়াজের ভেতরের রসাল শল্কপত্রগুলো আবৃত থাকে। রসাল শল্কপত্রসহ কন্দ ও পুষ্পবৃন্তগুলো খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেদ্ধ করলে পেঁয়াজ হয় মাংসের মতো থলথলে। লাল, হলুদ এবং সাদা এই তিন রকম পেঁয়াজ দেখা যায়। এটি সবজি, আনাজ এবং সালাদ রূপেও খাওয়া হয়। পেঁয়াজের সূপও উপাদেয়। পেঁয়াজ কেটে আঢাকা বেশিক্ষণ রাখতে নেই। গন্ধ দূর করতে হলে রাতে তাকে চার টুকরো করে কেটে টক দই-এ ভিজিয়ে পরদিন খাওয়া যায়। তাতে গুণ নষ্ট হয় না, কিন্তু গন্ধ চলে যায়।

সর্দিতে, হিক্কায়, অত্যধিক গরমে, কানের পুঁজে, বিষফোঁড়ায়, মাথাধরায়, মুখের রোগে, পচা ঘায়ে পেঁয়াজ খুব উপকারী। পেঁয়াজ বায়ুনাশক ও বলকারক। কিন্তু বেশি খেলে গুরুপাক ও পেটের জন্য উত্তেজক। রস কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে, কেশবৃদ্ধির সহায়ক, পোকা-মাকড়ের কামড়ে উপকারী। লু হাওয়ার সময় পেঁয়াজ খেলে কষ্টটা কমে যায়। মরুভূমিতে পথের কষ্টে ও তেষ্টায় পেঁয়াজ খেলে উপকার পাওয়া যায়। এর আদি নিবাস পশ্চিম এশিয়া। আর্যরা এটি ভারতে (দ্র) নিয়ে আসে। আজকাল ঝালহীন বড় বড় পেঁয়াজ পৃথিবীর (দ্র) নানা দেশে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের (দ্র) সবখানে পেঁয়াজ জন্মে।

বি. ব.

## পেট্রোলিয়াম (petroleum)

পেট্রোলিয়াম শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ 'রক অয়েল' (rock oil) বা 'শিলাতৈল'। পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপাদিত দ্রব্য আধুনিক জীবনযাত্রায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে মোটরগাড়ির জ্বালানি (দ্র), কেরোসিন (দ্র) প্যারাফিন, গ্যাস (দ্র), ডিজেল (দ্র) অয়েল, জ্বালানি তেল, লুব্রিক্যান্ট (পিচ্ছিলক), বিটুমিন ও মোম (দ্র)। পেট্রোল মোটরগাড়িতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কেরোসিন ব্যবহৃত হয় কুপিবাতি, হারিকেন, ট্রাক্টর ও উড়োজাহাজের জেট ইঞ্জিনে (দ্র)। ডিজেল সাধারণত ডিজেল ইঞ্জিনবিশিষ্ট বাস, লরি ও জাহাজে (দ্র) ব্যবহৃত হয়। লুব্রিক্যান্ট পিচ্ছিলক হিসাবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। এতে যন্ত্রপাতি নির্বিঘ্নে ও মসৃণভাবে চলে। বিটুমিন রাস্তার কার্পেটিং ও ওয়াটারপ্রুফ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জ্বালানি তেল বয়লার ও বিভিন্ন ফার্নেসে ব্যবহৃত হয়।

ইতালি, জার্মানি, উত্তর আমেরিকা (দ্র) ও মায়ানমারের (দ্র) অশোধিত পেট্রোলে ভেষজ গুণ রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। সাগরের মৃত উদ্ভিদ ও জীবজন্তু থেকে সম্ভবত পেট্রোল তৈরি হয়। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড (দ্র) ও তেলজাতীয় বস্তু হিসাবে সাগরতলে পড়ে থাকে। এসব বস্তু ও তেল কাদার নিচে চাপা



www.pathagar.com

পড়ে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে ক্রমে কাদা শিলান্তরে রূপান্তরিত হয় এবং তেলজাতীয় পদার্থ পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসে পরিণত হয়।

শা. ত.

**পেনিসিলিন** এণ্টিবায়োটিক দ্র

**পেন্সিল** (pencil)

এক প্রকার লেখনীবিশেষ। কালির সাহায্য ছাড়াই এ দিয়ে লেখা যায়, আঁকা যায় বা দাগ কাটা যায়। এর মূল অংশ অর্থাৎ যা দিয়ে লেখা হয় তা কাঠের শক্ত আবরণের মাঝখানে আঁটা থাকে। এই অংশটিকে সীস বলা হয়। সীস কথাটা 'সীসা' (দ্র) শব্দ থেকে এসেছে, একে ইংরেজিতে 'লেড' (lead) বলে।

গ্রাফাইট (দ্র) নামের অঙ্গার জাতীয় এক খনিজ পদার্থের সঙ্গে কাদামাটি ও পানি (দ্র) মিশিয়ে প্রথমে সরু আকারের সীস তৈরি করা হয়। সেই সীস ভালভাবে শুকিয়ে মাটির পাত্র তৈরি করার মতো আগুনে পুড়িয়ে ঘষে মসৃণ করে খাঁজ কাটা কাঠের গোলাকার আবরণে ঢোকানো হয়। তারপর সাইজ মতো কাটলেই পেন্সিল ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়।

রঙপেন্সিলের ক্ষেত্রে রঙের সঙ্গে জল শোষণের জন্য গাম এবং সীস মসৃণ হওয়ার জন্য চর্বিযুক্ত অ্যাসিড (দ্র) মেশাতে হয়। তবে রঙিন সীসকে আগুনে পোড়াতে হয় না।

ব্যবহারের সময় 'শার্প্নার' (sharpener) বা ব্লেডের সাহায্যে পেন্সিলের ওপরের কাঠ বার বার কেটে প্রয়োজনীয় সীস বের করে নিতে হয়। মেকানিক্যাল পেন্সিলে বার বার কেটে সীস বের করার পরিবর্তে সীস শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রতিবারই নতুন সীস ঢোকাতে হয়।

প্রাচীন কালে মিশরীয়রা এবং মধ্যযুগে (দ্র) মঠের অধ্যক্ষগণ সীসা দিয়ে লাইন টানতেন। সেই প্রথা থেকে লেড পেন্সিল বা কাঠে আবৃত গ্রাফাইটদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ১৭৯৫ সালে জাক কঁৎ (Jacques Conte) নামে এক ফরাসি ভদ্রলোক গ্রাফাইটের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে প্রথম লেড পেন্সিল তৈরি করেন। ১৮৩৯ সালে জার্মানির ইওহান লোটার ফন্ ফাবার্ (Johann Lother von Faber) ছাঁচের মধ্যে গ্রাফাইট পেস্ট (paste) ঢেলে সমান আকারে পেন্সিলের সীস তৈরির ধারণাসহ সীসের ওপর কাঠের আবরণ তৈরির পদ্ধতি এবং পেন্সিল কাটার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। প্রথম দিকে কোনো আবরণ ছাড়াই গ্রাফাইটদণ্ড ব্যবহার করা হত। তখন যারা পেন্সিল ব্যবহার করত, তারা গ্রাফাইট থেকে ময়লা না লাগার জন্য আঙুলে সুতো বা কাপড় জড়িয়ে নিত।

সুজ. ব.

**পেপটিক আলসার** (peptic ulcer)

খাদ্য পরিপাকের জন্য ব্যবহৃত পেপ্সিন্ (দ্র) নামক পাচক রসের প্রভাবে প্রধানত পাকস্থলী (দ্র) ও গ্রহণীর (duodenum) মধ্যে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নাম পেপটিক আলসার। পাচক রসের অম্লতা ও প্রোটিন-বিনাশী ক্রিয়া এই ক্ষত সৃষ্টির জন্য দায়ী।

পেপটিক আলসারের প্রধান লক্ষণ পেটের উপরিভাগে ব্যথা। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে বুক জ্বালা করা, বদহজম, টক ঢেঁকুর ওঠা, বমি বমি ভাব, বমি, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি।

পেপটিক আলসারের চিকিৎসার জন্য রোগীকে অম্লবিরোধী (এণ্টাসিড) ঔষধ খেতে দেওয়া হয়। আজকাল অন্যান্য কার্যকর ঔষধও ব্যবহৃত হচ্ছে। পেপটিক আলসারে আক্রান্ত ক্ষত গুরুতর হয়ে পড়লে তা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ দরকার হতে পারে। পেপটিক আলসারগ্রস্ত রোগীর জন্য অ্যালকোহল (দ্র), মদ, ধূমপান (দ্র), অধিক মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ বর্জনীয়। রোগীর শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম আবশ্যক। চিকিৎসায় অবহেলা গুরুতর উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে।

সি. না. হ.

**পেপ্সিন্** পরিপাকতন্ত্র দ্র

**পেয়ারা**

মেক্সিকোর ফল। সেখান থেকে কলম্বিয়া, ব্রাজিল ও পেরুতে ছড়িয়ে পড়েছে। পর্তুগিজেরা এ দেশে পেয়ারা নিয়ে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, সম্রাট কনিষ্কের সময় এ দেশে পেয়ারা ছিল। বৈজ্ঞানিক নাম *পসিদিয়াম গুয়াভা (Psidium guyava* Linn), গোত্র মির্তাসি (Myrtaceae)।

বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতে (দ্র) প্রচুর ফলন হয়।



www.pathagar.com

ব্রাজিলের স্ট্রবেরি স্বাদের পেয়ারা পৃথিবীবিখ্যাত। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর উৎপাদন হয়। আমেরিকার বিষুব-অঞ্চলে পেয়ারা স্বাভাবিক ফল। পাকা পেয়ারা থেকে জেলি, জ্যাম ও নানা ধরনের পানীয় হয়। পেয়ারায় প্রচুর ভিটামিন (দ্র) 'এ' ও 'সি' আছে।

বীজ ও কলম করে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে চারা রোপণ করা হয়। বীজের গাছ বড় হয়। কিন্তু ফলন হয় দেরিতে। কলমের গাছ বেশি উঁচু হয় না, তবে এতে ফল যেমন তাড়াতাড়ি হয়, তেমনি এর ফলও হয় উন্নতমানের। বর্ষা থেকে শরতে ফল হয়। ফুল হয় গ্রীষ্মে। কোনো কোনো গাছে সারা বছর দু'-দশটা ফল হয়। গাছ মসৃণ, বসন্তে চামড়া উঠে গেলে আরো সুন্দর দেখায়। কাঠ শক্ত, খুঁটির কাজে উপযোগী। বর্তমানে থাইল্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসা কাজী (আসলে কেজি বা কিলোগ্রাম অর্থাৎ আয়তনে এত বিশাল যে এতখানি ওজন হয়) পেয়ারা নামে বড় ও উন্নত জাতের পেয়ারা উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু দেশী পেয়ারা থেকে এর মিষ্টতা কম। চট্টগ্রাম (দ্র), বরিশাল (দ্র) ও কাপাসিয়ায় সবচেয়ে বেশি পেয়ারা জন্মে। চট্টগ্রামের কাঞ্চনার পেয়ারা বেশি মিষ্টি।

বি. ব.

**পেরো, শার্ল্** [১৬২৮—১৭০৩]

কবি, সমালোচক, পণ্ডিত, রূপকথার (দ্র) লেখক। শার্ল্ পেরো (Charles Perrault) জন্মেছিলেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, ১৬২৮ সালে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য এতই বিখ্যাত ছিলেন যে ফরাসি একাডেমীর সদস্যপদ তাঁকে দেওয়া তো হয়ই, এমনকি তাঁকে এর কর্তাব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হত।

কিন্তু পৃথিবী জুড়ে পেরো-র খ্যাতির মূলে তাঁর লেখা কিছু রূপকথা। এসব রূপকথা ইউরোপের (দ্র) নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ঘুরত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এগুলো সঙ্কলন করে ছোটদের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৬৯৭ সালে প্রকাশিত হয় 'ইস্তোয়া এ কঁৎ দ্যু তঁ পাস্‌সে' (Histoires et Comtes du Tems Passé) অর্থাৎ অতীত কালের ইতিহাস ও কথামালা। এখানেই সেই সব গল্প ছিল, যা পরে গ্রিম্ ভ্রাতৃদ্বয় (দ্র) ও হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ এণ্ডারসেন্ (দ্র) তাঁদের রূপকথামালায় গ্রহণ করেছিলেন। পেরো-র বইয়ের অন্তর্ভুক্ত অনেক গল্প ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে আমরা জানি, যেমন—সিণ্ডারেলা, লিট্‌ল্ থাম্ব্, স্লিপিং বিউটি, রেড্ রাইডিং হুড্ ইত্যাদি।

পেরো-র বইটিতে মোট ৮টি রূপকথা ছিল। 'শার্ল পেরো-র কথামালা' নামে একটি গ্রন্থে এগুলোর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে, ১৯৯০ সালে। পেরো-র বইয়ের সম্পূর্ণ অনুবাদ বাংলায় সম্ভবত এই-ই প্রথম।

পঁচাত্তর বছর বয়সে ১৭০৩ সালে পেরো প্যারিস শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

হা. মা.

**পেলাগ্রা** ভিটামিন দ্র

**পেলে** [১৯৪০— ]

এই অসাধারণ ফুটবল (দ্র) খেলোয়াড় ১৯৪০ সালের ২৩শে

অক্টোবর ব্রাজিলের ছোট শহর তেসাকোরাসে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম এদ্‌সন্‌ আরান্তেস্‌ দো নাসিমেন্তো। ডাক নাম দিকো।

বিশ্ববাসীর কাছে ফুটবলসম্রাট হিসাবে পরিচিত ব্রাজিলের 'কালো মানিক' পেলের (Pelé) জন্ম এক গরিব নিগ্রো পরিবারে।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে ফুটবলজীবন শুরু করে তিনি প্রথম বিভাগের ক্লাব সান্তোমে খেলার সুযোগ পান। চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যের সুবাদে ১৯৫৭ সালে ব্রাজিল দলে স্থান করে নেন। এর পর শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা। ১৯৫৮ সালে পেলের অসাধারণ কুশলতায় ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করে। ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপে প্রতিপক্ষের আঘাতে আহত হওয়ায় পেলে শেষ পর্যন্ত খেলতে পারেন নি। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপেও একই ঘটনা ঘটে। পেলেকে আহত করে ব্রাজিলের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালে পেলে শেষ বারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ব্রাজিলের প্রত্যাশা পূর্ণ করেন। পেলের নেতৃত্বে ব্রাজিল দল তৃতীয় বারের মতো বিশ্বকাপ জয় করে তৎকালীন 'জুল্‌ রিম্‌' (দ্র) কাপ চিরদিনের জন্য নিজেদের করে নেয়।

পেলে বিশ্বকাপ ফুটবলে মোট ১২টি গোল করেন। তবে দীর্ঘ ২০ বছরের খেলোয়াড়-জীবনে পেলে ১৯২১টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে অংশ নিয়ে ১২৬৮ গোল করেছেন। ১৯৯৪ সালের শেষদিকে তিনি ব্রাজিলের ক্রীড়ামন্ত্রী নিযুক্ত হন।

পেলের ফুটবলগুরু ছিলেন ব্রাজিলের প্রখ্যাত কোচ বিত্রো।

আ. ব.

**পেশি** (muscle, muscular tissue)

দেহের সচলতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মতৎপরতা বজায়

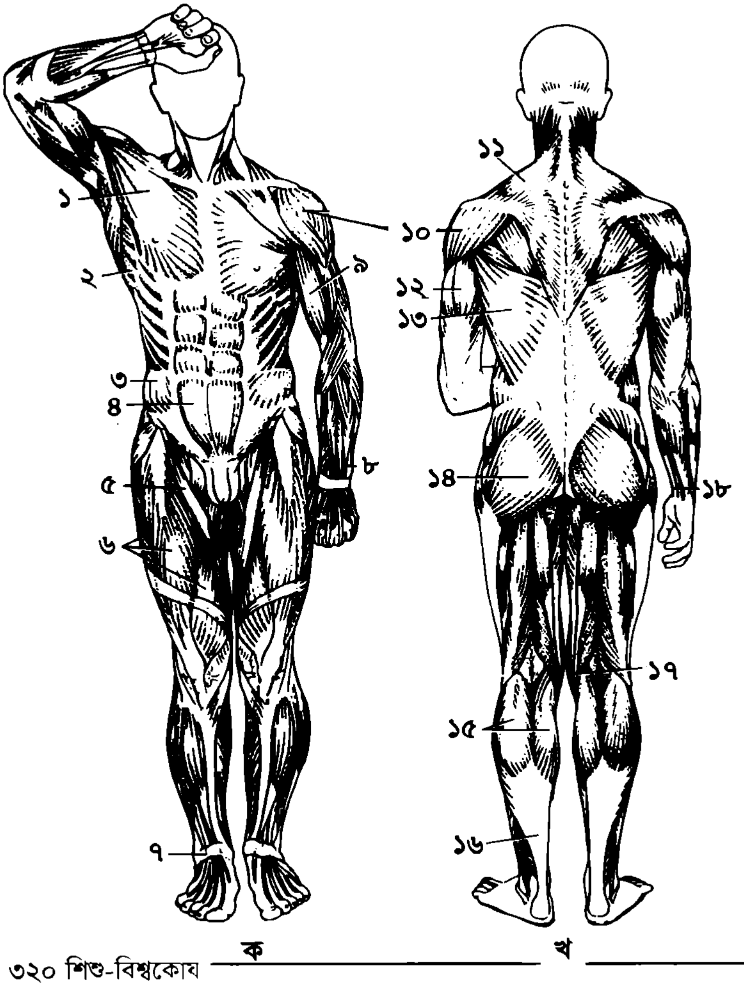


*মানবদেহে পেশির অবস্থান*
*ক ১. বক্ষপেশি, ২. বক্ষপার্শ্বের সম্মুখস্থ পেশি, ৩. বহিস্থ বক্র পেশি (উদরপার্শ্বে), ৪. উদরের সোজা পেশি, ৫. সার্‌টোরিয়াস, ৬. চতুর্শীর্ষ পেশি, ৭. ফ্যাসা (আচ্ছাদনী), ৮. হাত ও আঙুলের প্রতিনমক কণ্ডরা ৯. দ্বিশীর্ষ পেশি, ১০. ডেল্টয়েড পেশি, খ ১১. ট্রাপিজিয়াস ১২. ত্রিশীর্ষ পেশি ১৩. ল্যাটিসিয়াস ডর্সাই, ১৪. নিতম্ব পেশি, ১৫. গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস, ১৬. একিলিসের কণ্ডরা, ১৭. জঙ্ঘা- পৃষ্ঠের পেশি ১৮. হাত ও আঙুলের আনমক কণ্ডরা।*



www.pathagar.com

রাখতে পেশির প্রয়োজন। পেশির সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে এইসব ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে, রক্তসঞ্চালনে, খাদ্যগ্রহণ করতে, এমনকি মূত্র ও মল নিষ্কাশনের কাজে এবং দেহকাঠামোর তৎপরতার মতো প্রতিটি কাজে, এক কথায় জীবন রক্ষার জন্য পেশির ক্রিয়া না হলে চলে না।

পেশির মোট ওজন দেহের ওজনের ৪০ শতাংশের মতো। দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপের সিংহভাগ আসে পেশির রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে। পেশির সঙ্কোচন ক্রিয়া স্নায়বিক উদ্দীপনার প্রভাবে ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পেশি ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রের অধীন।

পেশি তিন ভাগে বিভক্ত— রেখাঙ্কিত বা ইচ্ছাধীন, রেখাহীন মসৃণ বা অনৈচ্ছিক এবং হৃৎপিণ্ডের পেশি। শেষোক্তটি দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো হয়েও কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে ভিন্ন বিভাগে অন্তর্ভুক্ত।

দেহকাঠামোর সব পেশি ইচ্ছাধীন এবং অস্থি বা টেণ্ডনের সঙ্গে যুক্ত। পেশিকোষতন্তু বহুকেন্দ্রকযুক্ত, দীর্ঘ এবং শাখায়িত নয়। এদের সঙ্কোচন যথেষ্ট দ্রুত ও শক্তিসম্পন্ন। এরা প্রধানত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অধীন।

মসৃণ পেশির সঙ্কোচন ইচ্ছাধীন নয়। দেহের আন্তরযন্ত্রগুলো এই পেশি দ্বারা গঠিত; যেমন—পাকান্ত্রিক পথ, রক্তবাহ, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র ও লসিকাতন্ত্রের যন্ত্রসমূহ। পেশিকোষগুলো এককেন্দ্রকযুক্ত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের অধীন।

হৃৎপিণ্ডের পেশি অনৈচ্ছিক প্রকৃতির হলেও এর বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোবদ্ধ সঙ্কোচন ক্ষমতায়। তা ছাড়া এর তন্তুগুলো ছোট, রেখাঙ্কিত ও শাখায়িত এবং পেশিকোষগুলো এককেন্দ্রকযুক্ত। এগুলোও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত।

**রু. হা.**

## পো, এডগার অ্যালান [১৮০৯—১৮৪৯]

মার্কিন সাহিত্যের (দ্র) অন্যতম কবি ও কথাশিল্পী। এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe) জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে। বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সারা জীবন কাটে নানা রকম যন্ত্রণা, আর্থিক দৈন্যদশা ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে। বিশ বছর বয়স হবার আগেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন এবং তখনই তাঁর কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ সালে পো রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জীবদ্দশায় এক দিকে তিনি অসংযমী জীবন যাপন করেছেন,

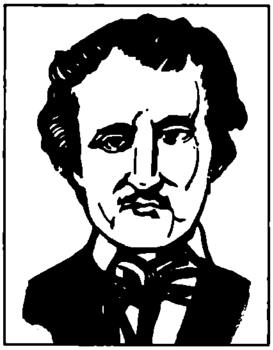

জুয়ো খেলেছেন, অসুস্থ হয়েছেন, মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ঘুমের বড়ি খেয়ে এক বার আত্মহত্যারও প্রয়াস পান। অন্য দিকে এত সবের মধ্যেও কয়েকটি গভীর আবেদনময় কবিতা ও ব্যতিক্রমধর্মী ছোটগল্প রচনা করে শুধু মার্কিন সাহিত্যভুবনে নয়, বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে নিজের জন্য একটি গৌরবমণ্ডিত স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'হেলেনের প্রতি', 'স্বপ্ন', 'ইস্রাফিল', 'দাঁড়কাক', 'অ্যানাবেল লী' প্রভৃতি। 'দ্য রেভেন' বা 'দাঁড়কাক' কবিতাটি রোম্যান্টিকতা, মোহন সুরেলা ছন্দোময়তা ও তার রহস্যময় পরিমণ্ডলের জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা- রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পো তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রহস্যময়, ভুতুড়ে, মৃত্যুর গন্ধমাখা, খুনখারাবি ভরা, আতঙ্কতাড়িত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। গোয়েন্দা-গল্পের (দ্র) ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। উপরি-উক্ত ধারার রচনার মধ্যে 'আমন্তিলাডোর পিপা', 'কালো বিড়াল', 'রু মর্গের হত্যাকাণ্ড' এবং 'চুরি যাওয়া চিঠি' তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে।

পো-র উচ্চমানের রচনাশৈলী এবং প্রতীকবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী কালের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আইরিশ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স্ (দ্র) ও ফরাসি কথাসাহিত্যিক মোপাসাঁ (দ্র) এবং কবি শার্ল্ বোদ্ল্যার্ (দ্র) ও পল্ ভালেরি। আজও পো-র সাহিত্যকর্ম সাধারণ পাঠক ও বিদগ্ধ সমালোচক সবার কাছে সমাদৃত হচ্ছে।

**ক. চৌ.**



www.pathagar.com

**পোলারয়েড** (polariod)

এক রকম পাতলা স্বচ্ছ ফিল্মের ব্যবহারিক নাম পোলারয়েড, যার ভিতর দিয়ে আলো প্রেরিত হলে আলোর তল-পোলারায়ণ ঘটে। সেলুলোজ নাইট্রেটের শিটকে আলট্রামাইক্রোস্কোপিক (বা অতিআণুবীক্ষণিক) দ্বিপ্রতিসারক কেলাসের সঙ্গে প্যাক করে পোলারয়েড তৈরি করা হয়। এই দ্বিপ্রতিসারক কেলাসগুলির আলোকীয় অক্ষ পরস্পরের সমান্তরাল থাকে। এর মধ্য দিয়ে গমনের সময় আলোকরশ্মি তল-পোলারায়িত হয়। অর্থাৎ বিশেষ একমুখী তরঙ্গগুলি এটা ভেদ করে যেতে পারে; অন্যান্য তরঙ্গ আটকে গিয়ে বাদ পড়ে যায়।

শা. ত.

**পোলিও / পোলিওমায়েলাইটিস** (poliomyelitis)

স্নায়ুরজ্জুতে (spinal cord) ভাইরাসের (দ্র) সংক্রমণের ফলে পোলিওমায়েলাইটিস, সংক্ষেপে 'পোলিও' রোগ দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহে আকস্মিক জ্বর নিয়ে পোলিও রোগের সূচনা, পরে প্যারালাইসিস (দ্র) দেখা দেয়। রোগটি 'ইনফ্যান্টাইল প্যারালাইসিস' নামেও পরিচিত।

পৃথিবীর (দ্র) সব দেশেই কম বেশি পোলিও রোগ দেখা যায়। তবে আমেরিকাসহ কোনো কোনো দেশে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়ে থাকে। সাধারণত শিশুদেরই পোলিও হয়, তবে বড়দের মধ্যেও কখনো কখনো এ রোগ দেখা যায়। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন্ রুজভেল্ট্ (দ্র) প্রাপ্ত বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পোলিও একটি সংক্রামক রোগ। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

মার্কিন বিজ্ঞানী জোনাস এডোয়ার্ড সল্ক (Jonas Edward Salk) সর্বপ্রথম পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। পরে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ব্রুস স্যাবিন্ মুখে সেবনযোগ্য 'সাবিন্স্ ভ্যাকসিন' (Sabin's vaccine) আবিষ্কার করেন, যা পোলিও-প্রতিষেধক হিসাবে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সি. না. হ.

**পোলো**

এই খেলার উৎপত্তিস্থল হল পারস্য (৫২২—৪৮৬ খ্রি. পূ.)। পারস্য থেকে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের লোকেরা এই

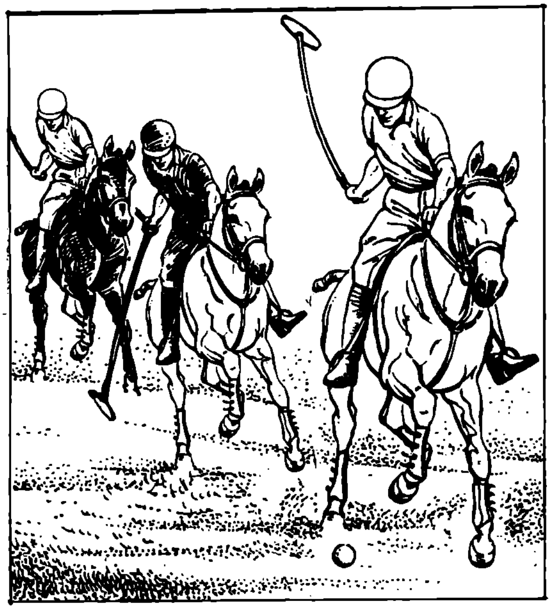

খেলা শিখে নেয় ও পরে অষ্টাদশ শতকে ভারতে (দ্র) ইংরেজ রাজত্বের সময় এই খেলাটি নতুনভাবে আরম্ভ হয়। তবে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বকালে চৌগান বা পোলো খেলার বহুবিধ নজির বিভিন্ন চিত্রে দেখা যায় ও বিভিন্ন রচনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত থেকেই পোলো খেলা পৃথিবীর (দ্র) অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ঘোড়ার পিঠে চার জন করে প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে। দুই দলের মধ্যে এই খেলা হয়ে থাকে। ঘোড়ার পিঠে বসে ৪৮ ইঞ্চি হতে ৫৪ ইঞ্চি লম্বা লাঠি— যার মাথাটা হাতুড়ির মতো—তা দিয়ে ৪$\frac{১}{৪}$ হতে ৪$\frac{৩}{৪}$ আউন্স ওজনের বল নিয়ে খেলা চলে। লাঠির ওজন এক পাউণ্ড বা প্রায় আধা সের হয়ে থাকে। দুই জন আম্পায়ার খেলাটির বিচারকার্য চালান। মাঠ হয় ৩০০ গজ লম্বা, গোলপোস্ট ২৪ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উঁচু। ৮ মিনিট খেলা, ৩ মিনিট বিশ্রাম—এইভাবে ১ চক্কর হয়।

কা. আ. আ.

**পোলো, মার্কো** মার্কো পোলো দ্র
**পোস্ট-ইম্প্রেশনিজ্‌ম্** ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট দ্র

**পোস্ট-মর্টেম** (post-mortem)

মানুষের মৃতদেহ এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে



www.pathagar.com

পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করাকে পোস্ট-মর্টেম বা ময়নাতদন্ত বলা হয়। পোস্ট-মর্টেম একটি লাতিন শব্দ, যার অর্থ মৃত্যুর পর। সাধারণত খুন, আত্মহত্যা বা অন্য কোনো অপরাধজনিত কারণে মৃত্যু হলে পোস্ট-মর্টেম করানো হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে পোস্ট-মর্টেমকে অটোপ্‌সি (autopsy) বা নেক্রোপ্‌সি (necropsy)-ও বলা হয়।

রোগজনিত মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম মৃত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার (দ্র) চিকিৎসক হেরোফাইলাস (Herophilus) ও এরাসিস্ট্রাটাস (Erasistratus)।

অপরাধী শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম পোস্ট-মর্টেম করা হয়েছিল ১৩০২ সালে জনৈক বিচারকের আদেশে। রাসায়নিক ও শারীরিক পরীক্ষার বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি এখন পোস্ট-মর্টেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

**পোস্টার** (poster)

পোস্টার হল মুদ্রিত কাগজ বা কার্ডবোর্ডের অংশ, যা জনসমক্ষে সাঁটা হয় প্রচারের জন্য। বেশির ভাগ পোস্টারই হয় সচিত্র। তাতে সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য লেখা থাকে।

পোস্টার হতে পারে নানা বিষয়ের ওপরেই। যেমন—নাটক, চলচ্চিত্র কিংবা চিত্রপ্রদর্শনী। তা ছাড়া বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বার্তাও বহন করে এই সব পোস্টার। কোনো কোনো পোস্টার তৈরি হয় সাধারণ মাপেই। এগুলোর রঙ হয় উজ্জ্বল। অক্ষরগুলো থাকে বড়, যাতে সহজেই তা পথচারীকে আকর্ষণ করতে পারে। অনেক পোস্টারের আকার হয় বিরাট, যাতে দূর থেকেও তা মানুষের চোখে পড়ে।

*'স্বাধীনতা' : ১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ চিত্রশিল্পীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পোস্টার মিছিল করেন শহীদ মিনার থেকে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন*



www.pathagar.com

## সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

| বৈষম্য বিষয় | বাংলাদেশ | পশ্চিমপাকিস্তান |
|---|---|---|
| রাজস্ব খাতে ব্যয় | ১৫০০ কোটি টাকা | ৫০০০ কোটি টাকা |
| উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ৩০০০ কোটি টাকা | ৬০০০ কোটি টাকা |
| বৈদেশিক সাহার্য্য | শতকরা ২০ ভাগ | শতকরা ৮০ ভাগ |
| বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী | শতকরা ২৫ ভাগ | শতকরা ৭৫ ভাগ |
| কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী | শতকরা ১৫ জন | শতকরা ৮৫ জন |
| সামরিক বিভাগে চাকরী | শতকরা ১০ জন | শতকরা ৯০ জন |
| চাউল মণ প্রতি | ৫০ টাকা | ২৫ টাকা |
| আটা মণ প্রতি | ৩০ টাকা | ১৫ টাকা |
| সরিষার তৈল সের প্রতি | ৫ টাকা | ২.৫০ পয়সা |
| স্বর্ণ প্রতি ভরি | ১৭০ টাকা | ১৩৫ টাকা |

*১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার।*
*তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান*

*১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পোস্টার—এঁকেছেন শিল্পী কামরুল হাসান*

পোস্টার আঁটা হয় দেয়ালে কিংবা রাস্তার এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে এবং যেখান থেকে সহজে তা পথিকের চোখে পড়ে। অনেক পোস্টার আবার এতটাই বড় যে তা বিলবোর্ডের ওপর লাগাতে হয়। বাণিজ্যিক পোস্টার তৈরি হয় ফটোগ্রাফি, লিথোগ্রাফি ও সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে পোস্টার লেখা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সালে ফরাসি শিল্পী জুল্ শেরে (Jules Chéret : ১৮৩৬–১৯৩২) নব উদ্ভাবিত কালার ফটোগ্রাফির পদ্ধতি খাটিয়ে এক হাজারের বেশি বৃহদাকার রঙিন পোস্টার তৈরি করেন। ১৮৯০ সালে অপর ফরাসি শিল্পী আঁরি দ্য তুলুজ-লোত্রেক (Henri de Toulouse-Lautrec: ১৮৬৪–১৯০১) থিয়েটার ও নৃত্যশালার জন্য আকর্ষণীয় পোস্টার অঙ্কন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের বহু শিল্পীর আঁকা পোস্টার মূল্যবান শিল্পকর্ম হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম পোস্টারটি আছে পোল্যাণ্ডে। এটি হচ্ছে ওয়ারশ নগরীর ন্যাশনাল ব্যাংক অব পোল্যাণ্ডের অতিকায় পোস্টার। পোস্টার অঙ্কনে পোল্যাণ্ডের শিল্পীদের খ্যাতি জগৎজোড়া। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে শিল্পী কামরুল হাসানের (দ্র) আঁকা খুনী ইয়াহিয়া খানের ছবি দিয়ে তৈরি পোস্টার এ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় প্রসঙ্গ হয়ে আছে।

**আ. কা.**

### প্যাগোডা

একটি বিশেষ আকৃতির বৌদ্ধমঠ। এর কাঠামো বহুতল-বিশিষ্ট। ওপরের তলাগুলো নিচের তলা থেকে ক্রমে ছোট হতে হতে চূড়ার মতো আকার ধারণ করে। চতুর্ভুজ আকারের খোলা চত্বরসহ এর প্রতিতলার ছাদ হয় ঝুলন্ত এবং ছাদের কোণাগুলো ওপরের দিকে ঢেউ খেলানো অবস্থায় থাকে। এর তলার সংখ্যা হয় বিজোড়। চীন (দ্র) দেশে প্রথম এই গঠন-আকৃতির মঠ নির্মিত হয়। এটি এখন প্রাচ্য স্থাপত্যকলার একটি নিদর্শন।

সংস্কৃত 'ভগবতী' শব্দ থেকে প্যাগোডার উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। ভারতের হিন্দু-মন্দিরের ঘোরানো পেঁচানো গঠনশৈলী বোঝাতে প্রকৃতপক্ষে প্যাগোডা শব্দটি ব্যবহার



www.pathagar.com

করা হত। বৌদ্ধধর্মের (দ্র) প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত (দ্র) থেকে প্যাগোডা নির্মাণের ধারণাটি চীনসহ পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চীনাদের নিজস্ব নির্মাণকৌশলের সংমিশ্রণে চীনদেশে প্যাগোডা নতুন গঠনকাঠামো লাভ করে। জাপানে (দ্র) বা অন্যান্য দেশে এখন যে প্যাগোডার প্রচলন দেখা যায়, তা চীনাদেরই উদ্ভাবিত। চীনা প্যাগোডা পাথর বা ইটের, কিন্তু জাপানীদের প্যাগোডা কাঠের তৈরি। কোনো কোনো প্যাগোডায় সোনার কারুকাজও খচিত হয়।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্যাগোডাটি বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনের ঠিক মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। ৩২৬ ফুট উঁচু এই প্যাগোডার দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো। এর নাম 'শউ ডাগন প্যাগোডা'।

সুজ. ব.

*বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্যাগোডা রেঙ্গুনের 'শউ ডাগন'*

**প্যান্টোমাইম** মাইম এবং প্যান্টোমাইম দ্র

**প্যাথলজি** রোগবিদ্যা দ্র

**প্যাপিরাস** (papyrus)

প্যাপিরাস এক প্রকার গাছ। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাস গাছের কাণ্ড থেকে এক ধরনের কাগজ তৈরি করত। তারা

*প্যাপিরাস গাছ*

www.pathagar.com

প্যাপিরাস গাছের কাণ্ডকে লম্বা লম্বা পাতের মতো করে কেটে নিত। সবচেয়ে ভিতরকার পাতটি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এসব পাতকে পাশাপাশি এমনভাবে শুইয়ে দেওয়া হত যে এদের একটির কিনার অপরটির কিনারের ওপর খানিকটা লেপটে থাকত। আরো কিছু পাত এদের সঙ্গে আড়াআড়ি করে রাখা হত। এর পর এদের নীল নদের পানি বা গমের ময়দার আটা দিয়ে তৈরি আটা জুড়ে দেওয়া হত। এর পর শিটগুলো হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা হত এবং রোদে শুকানো হত।

প্যাপিরাস গাছ ১ থেকে ৩ মিটার উঁচু হয়। এর কাণ্ডগুলো খুব নরম এবং গোড়ার দিকে মানুষের হাতের কবজির মতো মোটা হয়। চূড়ার দিকে কাণ্ডটি ঝুঁকে পড়ে। এই গাছের শাখা দেখতে কোঁকড়ানো খসখসে চুলের মতো। এর পাতা ছোট, মূল শক্ত সবল। মিশরীয়রা প্যাপিরাস গাছের সরু লম্বা ডাঁটি দিয়ে মাদুর ও নৌকার পাল তৈরি করত। কাণ্ডের ভিতরের মজ্জা শুকিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত। গরিব লোকেরা প্যাপিরাসের মজ্জা সিদ্ধ করে খেত। ইথিওপিয়া ও নীল নদের উজানে এখনো প্যাপিরাস গাছ দেখা যায়। আগে নীল নদের ব-দ্বীপ এলাকায় যত ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ করা হত তত ব্যাপকভাবে এখন আর চাষ করা হয় না।

হো. আ.

## প্যারডি

এক প্রকার হাসির গান, ব্যঙ্গ বা রঙ্গগীতি। কোনো পূর্বরচিত গান অবলম্বনে তার একটি ব্যঙ্গরূপ দিয়ে যে গান রচনা করা হয় তাকেই বলা হয় 'প্যারডি'। এই শব্দটি (parody) ইংরেজি। প্যারডি দুইভাবে হতে পারে: পূর্বরচিত গানের কথা ও সুরকে একই সঙ্গে অবলম্বন করা যেতে পারে; বা শুধু কথা বা শুধু সুরকে অবলম্বন করেও প্যারডি রচনা করা যেতে পারে। তবে সচরাচর পূর্বরচিত গানের কথা ও সুর উভয়কেই একই সঙ্গে অবলম্বন করে প্যারডি রচনা করা হয়। রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক আজু গোঁসাইকে বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রথম প্যারডি-রচয়িতা রূপে উল্লেখ করা হয়। তিনি রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের প্যারডি করতেন।

ক. গো.

## প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost)

*কবি জন মিল্টন*

প্যারাডাইস লস্ট বিশ্বসাহিত্যের অনুপম সম্পদ, ইংরেজ কবি জন মিল্টন (দ্র) কর্তৃক বাইবেলের (দ্র) কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত মহাকাব্য (দ্র)। ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত প্যারাডাইস লস্ট-এর প্রথম সংস্করণ দশটি সর্গ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ১৬৭৪ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রাচীন গ্রিক মহাকবি হোমারের (দ্র) আদর্শ অনুসরণ করে প্যারাডাইস লস্ট বারোটি সর্গে বিভক্ত হয়।

প্যারাডাইস লস্ট-এ বিশ্বের প্রথম মানব আদম (অ্যাডাম) ও তার স্ত্রী হাওয়া-র (ঈভ্) স্বর্গ থেকে পতন অথবা স্বর্গ হারাবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে মিল্টন ঐ কাহিনীর আড়ালে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা, স্বাধীন ইচ্ছার সীমারেখা, বিধাতার অনুশাসন, স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, অহঙ্কারের পরিণতি প্রভৃতি বিষয় এই মহাকাব্যের পরতে পরতে মিশে আছে।

প্যারাডাইস লস্ট-এর নায়ক আদম, কিন্তু বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শয়তানের (দ্র) প্রতিও পাঠকের চিত্তে মাঝে মাঝে প্রশংসার মনোভাব জেগে ওঠে। শয়তান কোনো অবস্থাতেই বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নয়। তার বিবেচনায় স্বর্গে দাস হয়ে থাকার চাইতে নরকের মতো স্থানেও প্রভু হয়ে থাকা ভাল। কেউ কেউ প্যারাডাইস লস্ট-এ পরিবেশিত এই বিদ্রোহের মধ্যে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে বিরাজমান রাজতন্ত্রের (দ্র) বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা মিল্টনের ব্যক্তিগত বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিফলন দেখেছেন। অবশ্য প্যারাডাইস লস্ট-এর প্রধান সুর গভীর ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত। তবে কাব্য হিসাবে এর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে ভাষার ওজস্বিতা, উপমার সম্ভার, বলিষ্ঠ শব্দপ্রয়োগ ও গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনিমাধুর্য।

মিল্টন এই মহাকাব্য রচনার প্রথম পরিকল্পনা করেন গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। তাঁর সমগ্র জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল এই রকম একটি



www.pathagar.com

কালজয়ী মহৎগ্রন্থ রচনা করবার। কঠোর সাহিত্য- সাধনার এক পর্যায়ে মিল্টন দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। ১৬৫২ সালের দিকে তিনি আলো আর অন্ধকারের তফাৎ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারতেন না। প্যারাডাইস লস্ট-এর অনেকখানি অন্ধ মিল্টন মুখে মুখে রচনা করে গেছেন এবং অন্যেরা শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে তা কাগজের পাতায় তুলে নিয়েছে। প্যারাডাইস লস্ট-এর কোনো কোনো অংশে মিল্টনের ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা ও আশাভঙ্গের ব্যথা প্রকাশ পেলেও এর মূল সুর আশাবাদী এবং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ধর্মীয় ভাবে মণ্ডিত।

ক. চৌ.

## প্যারাফিন (paraffin) / সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন (দ্র) দ্বারা গঠিত জৈব যৌগকে হাইড্রোকার্বন (দ্র) বলে। হাইড্রোকার্বনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (১) অ্যালিফাটিক হাইড্রোকার্বন, যেমন— মিথেন, ইথেন ইত্যাদি। (২) অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন, যেমন—সাইক্লোপ্রপেন, (৩) অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন, যেমন— বেনজিন।

অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বনকে পুনরায় সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে আবার অলিফিন ও অ্যাসিটিলিন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল :

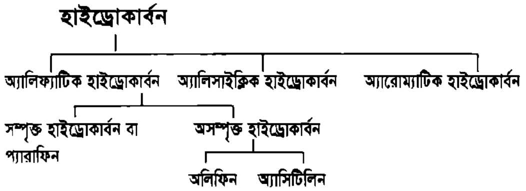


সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন : কার্বনের যোজনী চার। যে হাইড্রোকার্বনে কার্বন পরমাণুগুলি এক যোজনী বাঁধন (single bend) দ্বারা যুক্ত হয় এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজনীগুলি হাইড্রোজেন দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে, তাকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে। হাইড্রোকার্বনে একটি মাত্র কার্বন থাকলে (যেমন $CH_2$) তার যোজনীগুলি শুধু হাইড্রোজেন দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে।

সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহকে প্যারাফিন বলা হয়। প্যারাফিন অর্থ সামান্য আসক্তি (Parum = little; affinis = affinity)। সাধারণ বিকারক (re agents) দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না বলে এদের এরূপ নামকরণ করা হয়। এই জাতীয় হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন (Alkane) নামেও অভিহিত করা হয়। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা প্যারাফিনের সাধারণ সঙ্কেত $C_nH_{2n+2n}$। একটি পূর্ণ সংখ্যা প্যারাফিনগোষ্ঠীর প্রথম হাইড্রোকার্বন হল মিথেন (দ্র)।

অবস্থান : প্রাকৃতিক গ্যাসে এবং কোল গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে মিথেন থাকে। জলাভূমি বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গা থেকে নির্গত হয় বলে একে মার্শ গ্যাসও বলা হয়। বাংলাদেশে (দ্র) প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে মিথেন আছে।

ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুতি : অনার্দ্র সোডিয়াম অ্যাসিটেট ও সোডা লাইম উত্তপ্ত করে ল্যাবরেটরিতে মিথেন তৈরি করা হয়। সোডা লাইম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ হলেও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডই বিক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। শুধু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করা হয় না, কারণ এটি কাচপাত্র ক্ষয় করে।

আ. হ. খ.

## প্যারালাইসিস / প্যারালিসিস (paralysis)

স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা বা অন্যান্য কারণে সৃষ্ট দেহের চালক পেশির অকর্মণ্যতা, বাংলায় সাধারণভাবে 'পক্ষাঘাত' নামে পরিচিত। পক্ষাঘাত দেহের একাংশে, বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বা সম্পূর্ণ দেহে দেখা দিতে পারে। দুই পা-সহ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতকে বলা হয় প্যারাপ্লেজিয়া, দেহের এক দিক অর্থাৎ অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতের নাম হেমিপ্লেজিয়া, মুখের মাংসপেশি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে বলা হয় ফেসিয়াল প্যারালিসিস। পক্ষাঘাত এমনি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পোলিওমায়েলাইটিস (দ্র) শিশুরোগের সাধারণ নাম ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস। প্যারালিসিস এমনি হরেক রকমের হলেও এর চিকিৎসা মোটেই সহজ নয়।

আ. র.



www.pathagar.com

## প্যারাশুট (parachute)

বায়ুতে পতনশীল বস্তুর গতি সীমিত করার জন্য ব্যবহৃত ছাতা সদৃশ উপকরণ।

প্রথম দিকে ক্রীড়া ও দুর্ঘটনায় পতিত বিমানের যাত্রী ও পাইলটদের অবতরণের কাজে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত রকেট (দ্র) ক্যাপসুলের গতি সীমিত করার কাজসহ নানাবিধ কাজে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সামরিক কাজে প্যারাশুটের ব্যবহার অত্যধিক। এ ছাড়া দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী ও ত্রাণকর্মী প্রেরণের কাজেও প্যারাশুটের ব্যবহার লক্ষণীয়।

প্যারাশুট বেলুনের সমসাময়িক। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (দ্র) তাঁর স্কেচবুকে প্যারাশুটের ছবি এঁকেছিলেন, দেখা গেছে। তবে, ১৭৮৩ সালে ফরাসি লুই-সেবাস্তিয়েঁ লেনর্মঁ (Louis-Sébastien Lenormand) প্রথম প্যারাশুটের সাহায্যে গাছ থেকে লাফ দেন। ১৯১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ক্যাপ্টেন অ্যালবার্ট বেরি প্রথম বিমান থেকে প্যারাশুট জাম্পের সূচনা করেন।

১৯৫০ সাল থেকে অ্যাথ্‌লেটিক প্রতিযোগিতার একটি বিষয় হিসাবে প্যারাশুট জাম্প চালু রয়েছে।

মু. হা.

## প্যারিস (Paris)

পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। ফরাসিরা উচ্চারণ করে 'পারী'। খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে এটি ফ্রান্সের রাজধানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শহরটি দেশের প্রাণকেন্দ্র। সরকারি কর্মকাণ্ড এখান থেকে পরিচালিত হয়।

ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ লোকই প্যারিসের শহর ও শহরতলীতে বাস করে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই অফিস ও দোকানে চাকুরি করে। এক সময় ইউরোপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শহর ছিল প্যারিস। ফ্রান্সের শিল্পনগরীগুলোর অগ্রপথিক এই শহর। শহরটিতে প্রকৌশল, রসায়ন, আসবাবপত্র, খাদ্য এবং বিলাসসামগ্রীসহ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প। শিল্পের বিকাশ সাধন ও উন্নয়নের জন্য

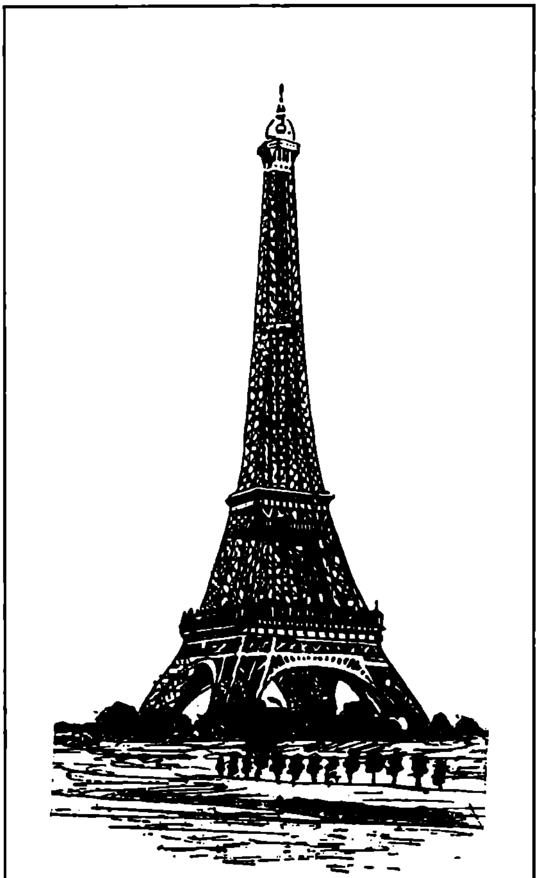

*ইফেল টাওয়ার*



www.pathagar.com

সব রকম ব্যবস্থাই এই নগরীতে রয়েছে। সিইন্ (Seine) নদীর উপর অবস্থিত। প্যারিস ফ্রান্সের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশের অন্যান্য স্থান থেকে প্রধান সড়ক ও রেলপথ এই রাজধানী শহরে এসে মিশেছে। ফলে বাণিজ্যের পথ সহজতর হয়েছে।

ফ্রান্সের সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র এই রাজধানী শহর। পর্যটকদের প্রিয় এই শহরে তাদের মিলনমেলার জন্য রয়েছে নানাধরনের নাট্যশালা, থিয়েটার, আর্ট গ্যালারি, প্রাসাদ ও অট্টালিকা, ফ্যাশন শো'র ব্যবস্থা ও হরেক রকম রেস্তোরাঁ। প্যারিসের সর্বাধিক পরিচিত প্রতীক ইফেল্ টাওয়ার। এটি ১৮৮৯ সালে তৈরি হয়। এ ছাড়া প্যারিসে বেশ কিছু বিখ্যাত সড়ক, স্মৃতিসৌধ ভবন রয়েছে। চিত্রকরদের জন্য রয়েছে স্টুডিও।

হো. আ.

**প্যারীচাঁদ মিত্র** [১৮১৪—১৮৮৩]

তাঁর জন্ম কলিকাতায় (দ্র), ২২শে জুলাই ১৮১৪ সালে। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ডিরোজিও (দ্র) নামে ঐ সময় এক জন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন হিন্দু কলেজে (দ্র)। প্যারীচাঁদ তাঁর ছাত্র ও ভাবশিষ্য ছিলেন। এ কালে বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল। তিনি তাঁর অন্যতম নেতা ছিলেন। কলিকাতায় একটি বিখ্যাত পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। তার নাম ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। তিনি এই পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি এ পদে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি খুব ভাল জানতেন; বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) প্যারীচাঁদ মিত্রের অবিস্মরণীয় অবদান তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ সে সময়ে প্রচলিত কৃত্রিম সাহিত্য-ভাষা বর্জন করেন, কৃত্রিম সাহিত্য-রীতি থেকেও দূরে থাকেন। এই কথ্য ভাষা-রীতির গুণেই 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষা সহজ, সরল ও সরস। ১৮৫৯ সালে তিনি লেখেন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'। উদ্ভট কল্পনা এ গ্রন্থটিতে লক্ষ করা যায়। ১৮৭১ সালে তিনি 'অভেদী' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। 'আধ্যাত্মিকা' তাঁর আরেকটি উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'টেকচাঁদ ঠাকুর'। এই 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি মহিলাদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন রাধানাথ শিকদার। এই পত্রিকাতেই টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে তাঁর লেখা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তিনি যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেন তা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই গ্রন্থটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছিল "The Spoiled Child' নামে।

তিনি কেবল সাহিত্যচর্চা করেন নি, নানা রকমের জনকল্যাণেও ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি পশু-ক্লেশ নিবারণী সভারও সদস্য ছিলেন। বেথুন সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম উদ্যোগ যদি কেউ নিয়ে থাকেন তিনি হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সভার সম্পাদক হন তিনি ১৮৩৮ সালে। তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রচুর লেখা লিখেছিলেন। সেসব ছাপা হয় 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর আরেকটি গ্রন্থ খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটির নাম 'The Zemindar and Ryots'। এই গ্রন্থটি ছিল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (দ্র) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

ভারতে তখন খুব পুলিশের অত্যাচার চলত। তিনি তার বিরুদ্ধে লড়েন এবং সফলকামও হন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে অবশ্য ধর্মতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শিক্ষার যে খুব প্রয়োজন তা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ জন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। তিনি



www.pathagar.com

বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন এবং বিধবাবিবাহে উৎসাহী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার হলে নারীজাতি নিজেরাই এই ব্যবস্থার কুফল সহজেই বুঝতে পারবে এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহেরও বিরোধিতা করেন। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আ. হা.

**প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা** পি এল ও দ্র

## প্রগতি লেখক সংঘ

১৯৩৫ সালে হিটলারের (দ্র) ফ্যাসিবাদ (দ্র) যখন মানব-সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত, তখন বিশ্বের অগ্রগণ্য শিল্পী-সাহিত্যিকেরা প্যারিসে (দ্র) সমবেত হন। তাঁরা মানবজাতির প্রতি সংঘবদ্ধভাবে এই ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। লণ্ডনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে প্রগতি সাহিত্য সংঘ। এরই অনুপ্রেরণায় ১৯৩৫ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ। এই ঘটনার রেশ ধরে ১৯৩৯ সালে ঢাকায় (দ্র) মানবতাবাদী প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। প্রতিষ্ঠানটি যাঁদের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়, তাঁরা হলেন রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন (দ্র), অমৃতকুমার দত্ত, সরলানন্দ সেন, জ্যোতির্ময় সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সোমেন চন্দ গ্রহণ করেছিলেন এর প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা। ১৯৩৯ সাল কেটে যায় প্রস্তুতিপর্ব সমাপন করতেই। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ঢাকায় গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলপ্রাঙ্গণে এক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র)। সম্মেলনে রণেশ দাশগুপ্তকে সম্পাদক এবং সোমেন চন্দকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন বিকাশে সোমেন চন্দর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের কর্মীরা 'ক্রান্তি' নামে একটি সাহিত্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। এটিই পূর্ব-বাংলার প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্যসঙ্কলন। সোমেন চন্দ ছিলেন এ সঙ্কলনের প্রকাশক। বছরশেষে প্রায় একশ কপি 'ক্রান্তি' নিয়ে সোমেন চন্দ কলিকাতা যান। সেখানকার সাহিত্যিকমহলে এর প্রচারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'ক্রান্তি' কলিকাতায় লেখকপরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দুঃখের বিষয়, ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের কাছে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর লেলিয়ে দেওয়া ভাড়াটে গুণ্ডাদের হামলায় বিশিষ্ট গল্পকার সোমেন চন্দ নিহত হন।

আ. কা.

## প্রজাপতি (butterfly)

প্রজাপতির মতো অপূর্ব সুন্দর পতঙ্গ (দ্র) কমই আছে। রঙিন পাখাওয়ালা প্রজাপতিগুলো পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্রই দেখা যায়। পৃথিবীতে ১৫ থেকে ২০ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি আছে। কল্পনায় যত রঙ আঁকা যায়, তত রঙেরই প্রজাপতি হতে পারে। 'রানী আলেকজান্দ্রার বার্ডউইং' পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজাপতি। পাখাদ্বয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এটি প্রায় পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা। ক্ষুদ্রতম প্রজাপতিটির নাম 'ওয়েস্টার্ন পিগমি ব্লু'। লম্বায় মাত্র এক সেন্টিমিটার।

প্রজাপতি দিনের বেলা ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায়, মধু পান করে, ফুলের পরাগায়ণে (দ্র) সাহায্য করে। এদের পঞ্চেন্দ্রিয় উন্নত ধরনের; চোখ যৌগিক, ভিন্ন ভিন্ন রঙ, বস্তু

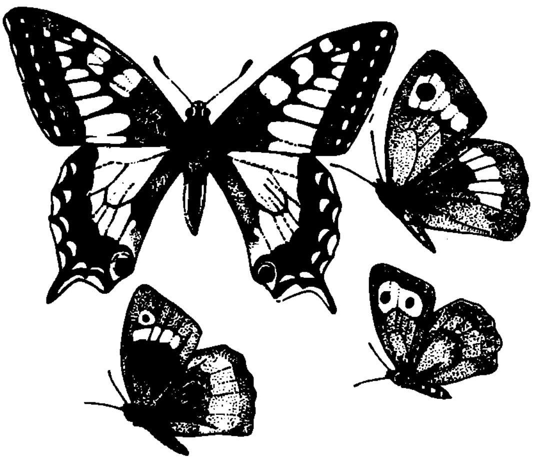



www.pathagar.com

শনাক্ত করতে সক্ষম।

এদের জীবনচক্র বড়ই অদ্ভুত। স্ত্রী-প্রজাপতি সাধারণত পাতার ওপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বেরোয়। লম্বা পোকার মতো কুৎসিত শূককীটের চোখ সরল প্রকৃতির। গাছের পাতা খেয়ে বড় হয় ও বেশ কয়েক বার খোলস বদলায়। গাছ-গাছড়ার বেশ ক্ষতি করে। এরপর গাছের ডালে শক্ত খোলসের সৃষ্টি করে মূককীটে পরিণত হয়। এক দিন খোলস কেটে বেরিয়ে আসে সুন্দর এক প্রজাপতি। এরপর সে সঙ্গী খোঁজে, মিলিত হয় ও বংশবিস্তার করে। বেশির ভাগ প্রজাপতিই মাত্র এক-দুই সপ্তাহ বাঁচে। কোনো কোনোটা আঠারো মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

আ. ন. ম. আ. র.

**প্রজ্ঞাপারমিতা**

বৌদ্ধ দর্শনে মহাযান (দ্র) ও হীনযান (দ্র) এই দু'টি পথ বা উপায় আছে। প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান পন্থায় বোধিসত্ত্বের (দ্র) অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রজ্ঞাপারমিতায় আছে ছয়টি পারমিতা—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞাপারমিতাকে অবলম্বন করে মহাযানী বৌদ্ধদের পরম পবিত্র গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' রচিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ (দ্র) ও তাঁর শিষ্য সুভূতি, সারিপুত্র, পূর্ণমৈত্রায়নীপুত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনের বিষয় এই সূত্রে বর্ণিত আছে। এর বিষয় হল মহাযানী দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। প্রজ্ঞাপারমিতা আয়ত্ত করতে পারলে সাধক উপলব্ধি করেন যে এসব উপদেশ বুদ্ধ দিয়েছেন কেবলমাত্র সাধককে তাঁর লক্ষ্যে পৌছুবার সহায়ক হিসাবে।

'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' নামে বিভিন্ন আকারের বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মতে 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র'ই মূল সূত্রগ্রন্থ। হিউএন-ৎসাঙ (দ্র) ১২টি বিভিন্ন আকারের সূত্রের চীনা অনুবাদ করেছিলেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' মূলত প্রাচীনতম মহাযান-সূত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। চীনা ভাষায় ১৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের অনুবাদ হয়। মহাযানপন্থীদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বৌদ্ধ দেবীর কল্পনা করা হয়েছে।

বি. ব.

**প্রণয় কাব্য** কাব্য দ্র

**প্রতাপ সিংহ** [১৫৪০—১৫৯৭]

মেবারের দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সারা জীবন সম্রাট আকবরের (দ্র) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বাবরের (দ্র) প্রতিদ্বন্দ্বী রানা (অর্থাৎ রাজা) সঙ্গের পৌত্র এবং উদয়সিংহের পুত্র। তিনি ১৫৪০ সালে মেবারের শিশোদীয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

মোগল সম্রাট আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার করার ৪ বছর পর রানা প্রতাপ সিংহ ১৫৭২ সালে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি আকবরের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ও আসফ খান তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন।

বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধে রানা প্রতাপ পরাজিত হন। তবু মোগল সম্রাটের বশ্যতা মেনে না নিয়ে তিনি কয়েক বছর পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করে কাটান এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় মেবারের দুর্গগুলো একে একে শত্রুপক্ষের দখলে চলে যায়। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি চিতোর ও মণ্ডলগড় ছাড়া মেবারের অন্যান্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। উদয়পুরে তিনি তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং মেবারের নানাবিধ সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন (১৫৮৫—৯৭)।

১৫৯৭ সালে সাতান্ন বছর বয়সে প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমরসিংহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

সুজ. ব.

**প্রতাপাদিত্য** [ ? - আনু. ১৬১২]

বঙ্গদেশে সামন্তরাজা বিখ্যাত বারোভূঁইয়াদের (দ্র) অন্যতম এক জন। বারোভূঁইয়াদের ভিতরে ঈসা খাঁ (দ্র), চাঁদ রায়, কেদার রায়, কন্দর্পনারায়ণ প্রমুখ সামন্তপ্রভুরাও বিখ্যাত ছিলেন।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে সুবাদার ইসলাম খানকে (দ্র) যখন বঙ্গদেশে মোগল শাসন সুদৃঢ় করার জন্য পাঠানো



www.pathagar.com

হয়েছিল তখন যশোর-খুলনা-বাখরগঞ্জ এলাকায় যিনি শাসন করতেন তাঁর নাম প্রতাপাদিত্য। এঁর পিতার নাম ছিল শ্রীহরি এবং এঁরা বংশমর্যাদায় হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। ইছামতী ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ধূমঘাট ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। তিনি অগাস্তাস পেড্রো নামে এক পর্তুগিজ নাবিকের সাহায্য নিয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। বারোভূঁইয়াদের সকলেই স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং মোগলশাসন অনেক দূরের দিল্লি শহর থেকে পরিচালিত হত বলে তাকে অস্বীকার করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জমিদারি চালানো কঠিন ছিল না। কিন্তু দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন তা টের পেলেই সামন্তরাজাদের ঔদ্ধত্য দমনের জন্য নতুন সুবাদার-সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি পাঠাত। ইসলাম খানকেও সে কারণেই পাঠানো হয়েছিল এবং মোগল বাহিনীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বারোভূঁইয়ার সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ হয়েছিল; এবং শেষ অবধি সকলেই পরাস্ত হয়ে দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সব মানুষ সমান সাহসী হয় না, বারোভূঁইয়ার সকলেও একই রকম সাহস দেখাতে পারেন নি।

প্রতাপাদিত্য প্রথম দিকে মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আনুগত্যের পরিচয় যথারীতিভাবে দিতে না পারায় মোগলবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য মারা যান এবং তিনি নিজে মোগল সেনাপতি গিয়াস খানের হাতে বন্দি হন (১৬১২)। তাঁকে প্রথমে বঙ্গের রাজধানী ঢাকা (দ্র) নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সুবাদার ইসলাম খান তাঁকে সপরিবারে বন্দি অবস্থায় দিল্লি পাঠিয়ে দেন। দিল্লির পথে বারাণসী বা কাশীর কাছে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাজা প্রতাপাদিত্য বাঙালির মনে বীর ও স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে খুব বড় স্থান দখল করে আছেন। ইতিহাস অবশ্য তেমন সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু তার পরও বাঙালি জাতির স্বাধীনতাচেতনার ইতিহাসে বারোভূঁইয়ার সকলেরই অবদান আছে। সকলের মতো প্রতাপাদিত্যও বিদ্রোহের প্রতীক রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। এর মূল্য বাঙালির জাতীয় জীবনে কম নয়।

হা. মা.

**প্রতিধ্বনি**

শব্দের প্রতিফলন। সুষম মাধ্যমে চলার পর কোনো তরঙ্গ কোনো অস্বচ্ছ মাধ্যমে বাধা পেলে তরঙ্গটি পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। চলার পথে বাধা পেলে শব্দতরঙ্গেরও প্রতিফলন ঘটে।

রাতের বেলা খোলা মাঠে কিংবা বেশ বড় কোনো হলঘরে কোনো শব্দ করলে তার পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। শব্দতরঙ্গ কোনো প্রতিফলকে বাধা পেয়ে প্রতিফলনের ফলে মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তা-ই প্রতিধ্বনি।

শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন ঘটলেই যে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে তা নয়। এর জন্য শ্রোতা ও প্রতিফলকের মধ্যে একটি ন্যূনতম দূরত্ব দরকার। আমরা যখনই কোনো শব্দ শুনি, শোনার পর পরবর্তী ১/১০ সেকেণ্ড ঐ শব্দের রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থাকে। একে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলা হয়। কাজেই প্রতিধ্বনি শুনতে চাইলে মূল শব্দ শেষ হবার অন্তত ১/১০ সেকেণ্ড পরে প্রতিফলিত শব্দ শ্রোতার কানে পৌঁছানো দরকার। বাতাসে শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩২ মিটার যেতে পারে। এ থেকে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য শ্রোতা ও প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব হিসাব করা হয়েছে প্রায় ১৬.৬ মিটার।

প্রতিধ্বনির ব্যবহার করে শব্দের বেগ, মাটির নিচে ভূ-প্রকৃতির স্বরূপ, সমুদ্রের গভীরতা প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

মু. হা.

**প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (reflex action)

যে-ক্রিয়ার আবেগ মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সুষুম্না কাণ্ডের (spinal cord) সহায়তায় এবং বহির্মুখী স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনৈচ্ছিক কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়। উজ্জ্বল আলোর প্রভাবে চোখের তারা সঙ্কুচিত হওয়া, শিশুর হাঁটতে শেখা, ঘুমন্ত অবস্থায় পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে পায়ের পাতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়া, হাতে আগুনের স্পর্শ লাগলে হাত অপসারণ করা ইত্যাদি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ফলেই ঘটে।

রুশ বিজ্ঞানী পাভ্লভের (দ্র) মতে প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রধানত দু' ধরনের, যেমন—সহজাত প্রতিবর্ত (inborn



www.pathagar.com

reflex) এবং অভ্যাসগত প্রতিবর্ত (acquired reflex)। সহজাত প্রতিবর্ত জন্মগতভাবেই প্রাণীদের (দ্র) মধ্যে উপস্থিত থাকে। এ জাতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া কোনো অভ্যাস বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না এবং তা পরিবর্তনশীল নয়। উজ্জ্বল আলোতে চোখের তারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়া, হাঁটার সময় ঝাঁকুনি সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি সহজাত প্রতিবর্তের উদাহরণ।

অভ্যাসগত প্রতিবর্ত জন্মের পর বিভিন্ন অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ জাতীয় প্রতিবর্ত পরিবর্তনশীল। উদাহরণ স্বরূপ—শিশুর হাঁটতে শেখা, সার্কাসে কলা-কৌশল প্রদর্শন, নির্দিষ্ট সময়ে খিদে পাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো ইত্যাদি অভ্যাসগত প্রতিবর্তক্রিয়ার কারণে ঘটে।

সি. না. হ

**প্রতিফলন, আলোর** আলোর প্রতিফলন দ্র
**প্রতিসরণ, আলোর** আলোর প্রতিসরণ দ্র
**প্রত্নতত্ত্ব** পুরাতত্ত্ব দ্র

## প্রথম আন্তর্জাতিক

এই সংগঠনটি 'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন' নামেও পরিচিত। বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্র (দ্র) বা কমিউনিজ্‌মের (দ্র) আদর্শ বা ভাবধারা প্রচারে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের লক্ষ্য থেকে কার্ল্ মার্ক্স্ (দ্র) এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন লণ্ডনে, ১৮৬৪ সালে। কিন্তু এর কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয় মার্ক্সবাদী ও নৈরাজ্যবাদী বা এনার্কিস্টদের মধ্যে দ্বন্দ-বিবাদের ফলে।

'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর চূড়ান্ত ভাঙন সম্পন্ন হয় ১৮৭২ সালে কার্ল্ মার্ক্স্ ও নৈরাজ্যবাদী নেতা মিখাইল বাকুনিনের মধ্যে চরম মতপার্থক্যের ভিতর দিয়ে। পরে সংগঠনটির সদর দফতর স্থানান্তরিত হয় নিউইয়র্কে। কিন্তু তারপরও এর কর্মকাণ্ড প্রসারের পথ তেমন প্রশস্ত না হওয়ায় ১৮৭৬ সালে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-কে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

আ. হ.

## প্রদাহ (inflammation)

দেহে জীবাণুর আক্রমণ কিংবা ভৌত বা রাসায়নিক উপাদানের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে কোষকলার প্রতিক্রিয়ার নাম প্রদাহ। স্থানিক রক্তবাহগুলোতে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চালন এবং রস নিঃসরণের প্রক্রিয়ায় প্রদাহের প্রকাশ ঘটে। ফলে প্রদাহযুক্ত স্থানে রক্তিমাভা, তাপ, ফুলে যাওয়া এবং ব্যথার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। প্রদাহের এই চারটি লক্ষণ রোমান লেখক সেলসাস বহুকাল পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রদাহের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ক্ষয়পূরণের কাজটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রদাহের শুরুতেই আরম্ভ হয় ক্ষতিগ্রস্ত কোষের মেরামতপ্রক্রিয়া। প্রদাহে ক্ষতিকর বস্তু নষ্ট হয়। প্রদাহের মাধ্যমেই রোগসংক্রমণ এবং দেহে রোগজীবাণুর বিস্তার সীমিত বা বন্ধ হয়ে থাকে।

রোগজীবাণুর সংক্রমণ, আগুনে পুড়ে যাওয়া, আঘাত এবং ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান (যেমন— পারমাণবিক রশ্মি, অ্যাসিড, অ্যালকালি) ইত্যাদির কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

প্রদাহ একিউট ও ক্রনিক হতে পারে। একিউট প্রদাহ কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ক্রনিক প্রদাহ মাস বা বছর স্থায়ী হতে পারে। প্রদাহ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধপ্রক্রিয়ার প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা হয়।

আ. আ. হা.

## প্রফুল্ল চাকী [১৮৮৮—১৯০৮]

ইংরেজ রাজকর্মচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বোমা হামলায় ক্ষুদিরাম বসুর (দ্র) সহযোগী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। শহীদ বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম ১৮৮৮ সালে, বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে।

কিশোর বয়সেই প্রফুল্ল চাকী রংপুরে নিজের বাড়িতে কুস্তিচর্চার একটি আখড়া স্থাপন করেছিলেন। ১৯০৬ সালে 'বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাতে যোগদান করেন



www.pathagar.com

এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি তাতে শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯০৬ সালেই তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। বারীন ঘোষ তাঁকে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট র‍্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার দায়িত্ব দেন। তিনি ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। এরপর তিনি কলিকাতায় (দ্র) মানিকতলা বোমা তৈরির আখড়ায় অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন।

১৯০৮ সালে কলিকাতার তৎকালীন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ও ক্ষুদিরাম বসু মজফ্ফরপুরে যান, কারণ কিংসফোর্ড তখন সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাতে তাঁরা ভুলবশত কিংসফোর্ডের গাড়ির বদলে অন্য গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মারেন। এতে মিসেস ও মিস কেনেডি নামে দু'জন ইংরেজ মহিলা নিহত হন।

বোমা হামলার পরদিন ট্রেনে কলিকাতায় পালিয়ে যাওয়ার সময় দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্ল চাকীকে ধরে ফেলেন। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

ফ. মা.

**প্রফুল্লচন্দ্র রায়** [১৮৬১—১৯৪৪]

রসায়নবিজ্ঞানী, মার্কিউরাস নাইট্রাইট-এর আবিষ্কারক এবং 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'-এর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের (দ্র) খুলনা জেলায় ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। কলিকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করেন। বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞান (দ্র), প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় রসায়নশাস্ত্রে (দ্র) গবেষণার জন্য তাঁকে ডি.এসসি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রি প্রদান করে। দেশে ফিরে তিনি প্রথমে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরবর্তী কালে বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গবেষণায়ও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। মার্কিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য।

এছাড়া 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' নামক এক গবেষণা গ্রন্থে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞান-চর্চার ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

অবিভক্ত বাংলায় শিল্প-কারখানার সূচনা করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অবিবাহিত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯৪৪ সালে মারা যান। সাধারণ মানুষজনের মধ্যে তিনি আচার্য পি. সি. রায় নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে।

মু. হা.

**প্রবচন**

খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেসব চিরন্তন ও বাস্তব সত্য তীক্ষ্ণ ও সরসভাবে ভাষায় তুলে ধরা হয় তাকেই সাধারণত প্রবচন বলা হয়। প্রবচন এক দিকে প্রাচীন, অন্য দিকে আধুনিক। প্রাচীন, কারণ এটা দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত। আবার আধুনিক, কারণ তা প্রচলিত মনোভাবকে সমকালে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। প্রবচনের মাধ্যমে সমাজজীবনের বহু পরীক্ষিত সত্য সবার কাছে, বিশেষভাবে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে নীতিমালা ও উপদেশের আকারে পরিবেশিত হয়। কালের স্রোতধারায় প্রবচনের স্রষ্টার নাম লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে প্রবচন বেঁচে থাকে। উপদেশের সঙ্গে প্রবচনে প্রায়ই শ্লেষ-বিদ্রূপ ও বক্রোক্তির প্রকাশ ঘটে। বাংলা ভাষায় (দ্র) অজস্র প্রবচনের মধ্যে



www.pathagar.com

বিশেষ পরিচিত কয়েকটি হল : শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তা-ই সয়; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; গরু মেরে জুতো দান; বানরের গলায় মুক্তোর হার; যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ; সস্তার তিন অবস্থা; অভাবে স্বভাব নষ্ট; অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। অনেক সময় আবার দু'টি প্রবচনে প্রায় বিপরীত তত্ত্ব পরিবেশিত হতে দেখা যায়, যেমন— নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এবং দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু প্রবচনের বর্তমান প্রয়োগযোগ্যতা বা যথার্থতা সম্পর্কে মনে দ্বিধা জাগে, যেমন—লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে; ধর্মের ঢোল আপনি বাজে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অনেক প্রবচন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি আকর্ষণীয় ও কৌতুকদীপ্ত। যেমন— আমরা কখনো একই নদীতে দু'বার পা ডোবাতে পারি না (প্রাচীন গ্রিক); দুধ খেতে চাইলেই গরু কেনার প্রয়োজন হয় না (ক্রিটীয়); অনাহূত অতিথি তাতারের চাইতেও খারাপ (রুশ); সব রোগীই এক এক জন ডাক্তার (আইরিশ); যারা খুব নিচু হয়ে সালাম করে তাদের চেহারা ভাল করে লক্ষ করো (পোলিশ)।

ইংরেজি ভাষার (দ্র) প্রবচনের একটি চমৎকার সঙ্কলন-গ্রন্থ হল 'দ্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব ইংলিশ প্রোভার্ব্‌স্' (১৯৩৫)। বাংলাতেও সুশীলকুমার দে-র 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৫) অত্যন্ত বিখ্যাত বই।

ক. চৌ.

## প্রবন্ধ

একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ, সুচিন্তিত মননশীল গদ্যরচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়। যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ, রাজনীতিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সাধারণভাবে চিন্তা, মনন, তত্ত্ব ও তথ্য প্রাধান্য পেলেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবন্ধকার তাঁর রচনায় স্নিগ্ধ সরসতা ও আবেগ-অনুভূতিও যুক্ত করেন।

যে রচনায় লেখক বিষয়বস্তুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনের চাইতে নিজের আবেগ-অনুভূতি ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সরস ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেন তাকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা 'মন্ময় প্রবন্ধ' বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), প্রমথ চৌধুরী (দ্র), সৈয়দ মুজতবা আলী (দ্র), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (দ্র) প্রমুখ মন্ময় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। অন্য দিকে যে রচনায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিশ্লেষণাত্মক, বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল, যুক্তিসমৃদ্ধ, তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য সুবিন্যস্ত করে তুলে ধরা হয় তাকে 'তন্ময় প্রবন্ধ' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র), কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র) প্রমুখ তন্ময় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

ক. চৌ.

## প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা শব্দের অর্থ বরণ করা, কাম্যদান বা নিবারণ বা মানা। আষাঢ়ী পূর্ণিমা (দ্র) থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা (দ্র) তিন মাস বিহারে (দ্র) থেকে একান্তভাবে ধর্মজীবন যাপন করেন। সে সময় ভিক্ষুগণ নিজেদের দোষ-ত্রুটি বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দোষমুক্ত হবার চেষ্টা করেন। এর নাম প্রবারণা। কার্তিক পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়। তিন মাস বর্ষাবাস বা একান্ত ধর্মজীবন যাপন শেষ হওয়ার পর ভিক্ষুগণ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে ধর্মপ্রচার করেন। এক মাস ধর্মকথা বলা ও প্রচারের পর প্রবারণা পূর্ণিমায় এই উৎসব শেষ হয়। এ সময় বৌদ্ধ বিহারে রঙিন ফানুস ওড়ানোর উৎসব হয়। সিদ্ধার্থ (দ্র) গৃহত্যাগের পর চুল কেটে মুণ্ডিত-মস্তক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে এই পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানো হয়।

বি. ব.

## প্রবাল

প্রবাল সামুদ্রিক প্রাণী (দ্র)। ইংরেজি নাম কোরাল (coral)। অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণীসমূহের মধ্যে প্রবাল সিলেন্টারেটা বা একনালি দেহী পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বহু ধরনের আকার ও আকৃতির প্রবাল দেখা যায়। কতকগুলো একক জীবন-যাপন করে। অধিকাংশ প্রবাল কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কলোনিবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমুদ্রেই বেশিরভাগ প্রবালকলোনি চোখে পড়ে। এদের জীবনধারণের



www.pathagar.com

*সমুদ্রে প্রবাল ও মাছ*

জন্য ২২° সে. তাপমাত্রার বেশি তাপ প্রয়োজন হয়। লম্বালম্বি হিসাব ধরলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০ সেমি-এর নিচে প্রবালেরা টিকতে পারে না। অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরে আলো যতদূর প্রবেশ করে এবং যেখানে কাদা কম সেখানেই তাদের বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য ৮০০০ মিটারের নিচের সমুদ্রগর্ভেও একক জীবনযাপনকারী প্রবালের অস্তিত্ব জানা গেছে। গুচ্ছবদ্ধ নলের মতো কালচে-লাল অর্গান পাইপ কোরাল, হলুদ ও লাল রঙের বৃক্ষশাখার মতো সমুদ্রপাখা বা গর্গোনিয়া, কোবালিয়াস নামের শাখাবৎ লাল প্রবাল। পাখির পালকের মতো সমুদ্র কলম বা পেনাটুলা, রেনিলা নামের সমুদ্র পানসি, শিং প্রবাল বা ম্যাড্রিপোরা, এস্ট্রিয়া, ব্রেন কোরাল ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রবাল সমুদ্রে রয়েছে। অলঙ্কার তৈরিতে স্বর্ণকারেরা প্রবালের কঙ্কাল ব্যবহার করে থাকে। এই কঙ্কাল প্রবালের দেহনিঃসৃত। পৃথিবীর (দ্র) পুরু স্তর গঠিত হয়েছে প্রবালের হাড়ের সাহায্যে। সমুদ্রে প্রবালের হাড় জমে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। 'গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ' (Great Barrier Reef) একটি প্রবালদ্বীপ। বাংলাদেশের (দ্র) সেন্ট মার্টিন দ্বীপকেও (দ্র) প্রবালঘটিত দ্বীপ বলা হচ্ছে। দ্বীপগুলো চুনাপাথরঘটিত। এই চুন প্রবালের দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। প্রবালের দেহ বছরে ৫ মিমি থেকে ২০ মিমি পর্যন্ত বাড়ে। কাজেই ৫০ মি গভীর একটি দ্বীপ গড়তে সময় লাগে ৮০০০ বছর। জানা মতে সকল প্রবালদ্বীপ সম্ভবত ৩০,০০০ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে। অবশ্য প্রবালদ্বীপ গঠনে কেবল প্রবালের হাড় অংশ নেয় না। অন্যান্য প্রাণীর হাড়, উদ্ভিদও অংশ নেয়। তবে সিংহভাগ অবদান থাকে প্রবালের।

ত. চ.

**প্রবোধচন্দ্র বাগচী** [১৮৯৮—১৯৫৬]

১৮৯৮ সালের ১৮ই নভেম্বর যশোর জেলার শ্রীকোলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান খুলনায়। তিনি ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। তিনি ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (দ্র) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁকে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে পাঠান। তিনি সেখানে এক জন বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভির সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই আগ্রহে তিনি ১৯২২ সালে নেপালে (দ্র) যান। নেপাল দরবারের গ্রন্থালয়ে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। তিনি সেখানে গবেষণা শুরু করেন। তারপর তিনি জাপান (দ্র) ও ইন্দোচীনে (দ্র) যান। সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে উপাদান সংগ্রহ করেন। এ সবই তাঁর গবেষণাকাজে সহায়ক হয় এবং তিনি পরে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ১৯২৩ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্যারিসে (দ্র) যান। তিনি দীর্ঘ তিন বছর ১৯২৩-২৬ সালে ভোট ও চীনাভাষা অধ্যয়ন করেন। এই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র পড়েন। তারপর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করেন। এই পঠন-পাঠন ও গবেষণার ফল হচ্ছে তাঁর 'চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র' গ্রন্থ। এটি তিন খণ্ডে রচিত। তিনি দু'খণ্ডে 'সংস্কৃত-চীনা' অভিধানও প্রণয়ন করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই গ্রন্থ দু'টির জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯২৬



www.pathagar.com

*প্রবোধচন্দ্র বাগচী*

সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ঐ বছরেই তিনি দ্বিতীয় বারের মতো নেপালে যান।

এরপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সঙ্গে তাঁর গবেষণাকর্মও চলতে থাকে। 'দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ', 'চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা'—এই দুই গ্রন্থ তিনি এ সময়ে রচনা করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায়ও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম 'Studies in the Tantras'। শুধু গবেষণা ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনাই তিনি করেন নি, অধ্যাপনাও এর সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যান। উপরন্তু তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন তিনি নিজে। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। এর নাম 'Sino-Indian Studies'। এটি চীন-ভারত সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক গবেষণাপত্রিকা।

১৯৪৫ সালে তিনি বিশ্বভারতীতে আসেন। তিনি বিশ্বভারতী চীনাভবনে যে গবেষণাবিভাগ আছে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিদেশভ্রমণে যান। বিদেশ অর্থে স্বভাবতই সেই চীন দেশ, যা তাঁর খুব প্রিয়, নেপালেরই মতো। তিনি চীনে গিয়েছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে, ১৯৪৭ সালে। এখানে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৮–৫১ সালে তিনি পুনরায় বিশ্বভারতীতে কাজ করেন। এখানে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি বিদ্যাভবন গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। এরপর বিশ্বভারতী যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয় তখন তিনি এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে তিনি আরো এক বার চীনে যান। নেতৃত্বে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ১৯৫৪ সালে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ অলঙ্কৃত করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তিনি মারা যান।

**আ. হা.**

**প্রমথ চৌধুরী** [১৮৬৮—১৯৪৬]

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) বীরবল নামে খ্যাত এই সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ নাম প্রমথনাথ চৌধুরী। তিনি প্রমথ চৌধুরী নামে লিখতেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনায়। জন্ম ৭ই আগস্ট ১৮৬৮ সালে, যশোরে। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. (১৮৮৯) এবং ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. (১৮৯০) পাশ করেন। ১৮৯৩ সালে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারের সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) কন্যা ইন্দিরা দেবীকে (দ্র) বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। প্রধানত প্রবন্ধলেখক বলে পরিচিত হলেও তিনি কবিতা ও গল্প প্রচুর লিখেছেন। সেগুলো আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ



www.pathagar.com

‘পদচারণ’ (১৯১৯)। ফরাসি সনেট-রীতিতে তিনি সনেট রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে ‘চার-ইয়ারি কথা’ (১৯১৬), ‘আহুতি’ (১৯১৯), ‘নীললোহিত’ (১৯৩২) সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ (দ্র)-প্রবর্তিত গল্পগুচ্ছের আদর্শ থেকে প্রমথ চৌধুরীর গল্প ভিন্নরীতি প্রবর্তন করেছে।

বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য সাফল্য সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দান এবং ১৯১৪ সালে ‘সবুজপত্র’ (দ্র) নামক পত্রিকা প্রকাশ। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষায় একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রবন্ধকার হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি স্বতন্ত্র ও স্বকীয়। গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখার ধারা পরিহার করে তিনি প্রবন্ধকে বিদ্রূপ-পরিহাসে সরস করে তোলার সাধনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ বিদগ্ধ ভঙ্গিপ্রধান ও ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক।

তিনি ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বি. ব.

**প্রমথেশ বড়ুয়া** [১৯০৩—১৯৫১]

বাংলা চলচ্চিত্রের (দ্র) জনপ্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক। জন্ম আসামের গৌরীপুরের এক রাজপরিবারে, ১৯০৩ সালের ২৪শে অক্টোবর।

প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯২১ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে গণিতশাস্ত্রে অনার্সসহ বি.এসসি. পাশ করেন। এর অত্যল্প কাল পরে এক রাজকীয় আমন্ত্রণে তিনি ইংল্যাণ্ড যান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। ১৯৩০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি পুনরায় আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। সেই সঙ্গে দলের মুখ্য কর্মকর্তার

*প্রমথেশ বড়ুয়া*

দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতায় ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্ নামে একটি চলচ্চিত্রসংস্থার পত্তন হলে, তিনি তার অন্যতম পরিচালক হন। প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) ফেলোও ছিলেন।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথম চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র ‘পঞ্চশর’।

১৯৩০ সালের শেষভাগে প্রমথেশ বড়ুয়া প্যারিস (দ্র) যান এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতায় ‘বড়ুয়া পিকচার্স’ নামে একটি নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণসংস্থার গোড়াপত্তন করেন।

১৯৩২ সালে তিনি প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। স্বপরিচালিত প্রতিটি ছবিতেই তিনি অভিনয় করতেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মোট ১৪ বছরে তিনি ২১টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ১৪টি বাংলা ও ৭টি হিন্দি। তাঁর অধিকাংশ ছবিই ব্যাপকভাবে দর্শকনন্দিত হয়। তবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (দ্র) উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর



www.pathagar.com

পরিচালনায় নির্মিত 'দেবদাস' ছবি তাঁকে পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে সারা ভারতে পরিচিত করে তোলে। প্রমথেশ বড়ুয়া ১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাংলা সিনে টেকনিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন।

১৯৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

**প্রমদাচরণ সেন** [১৮৫৯—১৮৮৫]

শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদক। তিনি বাংলা সাহিত্যে (দ্র) প্রথম কিশোর-উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৫৯ সালের ১৮ই মে কলিকাতায় (দ্র) তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস যশোর জেলার সেনহাটী গ্রামে। পিতা তারিণীচরণ সেন ছিলেন এণ্টালি থানার দারোগা।

শৈশবে প্রমদাচরণ দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৮৭২ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৩ বছর বয়সে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি শিক্ষক হিসাবে পান। এক কালের দুরন্ত বালক প্রমদাচরণ অচিরেই শিবনাথ শাস্ত্রীর (দ্র) প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। ১৮৭৬ সালে তিনি হেয়ার স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হন। এ সময় ব্রাহ্মধর্মে (দ্র) দীক্ষিত হওয়ায় পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তখন অসহায় প্রমদাচরণ পরিচিত এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করে অন্নের সংস্থান করেন এবং শেষ পর্যন্ত কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে নকিপুর উচ্চ ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৮৮০ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য তিনি এই স্কুলে নিজের টাকায় নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক বক্তৃতা কর্মসূচি চালু করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন।

প্রমদাচরণ সেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল 'সখা' নামের বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রথম আদর্শ শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর আগে শিশুদের জন্য সাময়িক পত্রিকা হিসাবে ছিটেফোটা দু'একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও সেসব পত্রিকায় ধর্মীয় প্রচার ও নীতিশিক্ষার প্রাধান্য ছিল বেশি। 'সখা' প্রকাশের মধ্য দিয়েই নির্মল সাহিত্যরস পরিবেশনের নতুন ধারার সূচনা হয়। প্রমদাচরণের সম্পাদনানৈপুণ্যে শিশুসাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো অপার সম্ভাবনায় পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমে 'সখা'কে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। 'সখা'র পাতাতেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (দ্র) প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আসলে প্রমদাচরণ সেন 'সখা' পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি নতুন লেখক তৈরিতেও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তিন বছর 'সাথী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

প্রমদাচরণ সেনের রচিত গ্রন্থগুলো হল : 'ভীমের কপাল' (দ্র) 'মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী', 'চিন্তাশতক', 'সাথী' ইত্যাদি।

১৮৮৫ সালের ২১শে জুন মাত্র ২৭ বছর বয়সে প্রমদাচরণ সেন যক্ষ্মা(দ্র) রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সুজ. ব.

**প্রমিথেউস্** (Prometheus)

গ্রিক পুরাণের মানবপ্রেমিক টাইটান (গ্রিক দেববংশ ও মানবজাতির পূর্বপুরুষ)। দেবতা ও টাইটানেরা প্রমিথেউস্‌কে দূরদর্শী প্রমিথেউস্ নামে ডাকতেন। প্রমিথেউস্ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু দেবরাজ জিউস্ (Zeus) তাঁকে হিংসা করতেন।

দূরদর্শী ও ভবিষ্যদ্রষ্টা প্রমিথেউস্ জানতে পারেন যে দেবরাজ জিউস্ পৃথিবী (দ্র) থেকে মানবজাতিকে নির্মূল করে সেখানে অন্য জীব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। প্রমিথেউস্ তখন মানবজাতিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি মানবজাতিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য গ্রিক ও রোমান পুরাণের সবচেয়ে সুদর্শন দেবতা আপোল্লোন্ (ইংরেজিতে বলে অ্যাপোলো)-এর স্বর্গের অগ্নিরথ থেকে আগুন চুরি করে নিয়ে মানুষকে দিয়ে আসেন এবং আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। আগুনের ব্যবহার শিক্ষার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এতে জিউস্ প্রমিথেউসের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেন। শাস্তির বিধান অনুযায়ী



www.pathagar.com

প্রমিথেউস্‌কে ককেশাসের নির্জন চূড়ায় শক্ত শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং প্রতিদিন জিউসের ঈগল এসে তাঁর যকৃৎ (দ্র) ছিঁড়ে খেত। সারাদিন এই যন্ত্রণাভোগের পর রাতের বেলা আবার তাঁর নতুন যকৃৎ সৃষ্টি হত। পরের দিন সকালে আবার জিউসের ঈগল এসে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া শুরু করত যকৃৎ। এভাবে কয়েক শ' বছর চলার পর গ্রিক পুরাণের শ্রেষ্ঠ বীর হার্কিউলিস্ (দ্র) জিউসের ঈগলকে বধ করে প্রমিথেউস্‌কে বজ্রশৃঙ্খলমুক্ত করেন।

প্রমিথেউসের কাহিনী নিয়ে ঈস্কাইলাসের (দ্র) বিখ্যাত নাটক 'বন্দি প্রমিথেউস্' এবং ইংরেজ কবি শেলির (দ্র) মহৎ কাব্যনাট্য 'Prometheus Unbound' বা 'শৃঙ্খলমুক্ত প্রমিথেউস্' লিখিত হয়।

সুজ. ব.

## প্রয়াগ

ভারতের (দ্র) এলাহাবাদের পুরানো নাম ছিল প্রয়াগ বা ত্রিবেণী। হিন্দুদের প্রাচীনতম তীর্থগুলোর একটি। পুরাণে এর বহু উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোকের (দ্র) সময় থেকে (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী এখানে মিলিত হয়েছে। তবে সরস্বতী নদীকে দেখা যায় না। প্রয়াগে উক্ত তিনটি নদী মিলিত হয়েছে বলে এদের সঙ্গমস্থলের অপর নাম ত্রিবেণী। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এখানে স্নান করে পুণ্য অর্জন করেন।

প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে যে মেলা বসে তাকে বলে কুম্ভমেলা (দ্র)। ছয় বছর পর পর হয় অর্ধকুম্ভ মেলা। আবার প্রতি বছর মার্চ মাসেও একটি বার্ষিক মেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

নি. অ.

## প্রশান্ত মহাসাগর

জলভাগের বিস্তার, গভীরতা ও আয়তনে পৃথিবীর (দ্র) সর্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর, সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ স্থান জুড়ে আছে এই মহাসাগর। এটি পৃথিবীর মোট জলভাগের অর্ধেক জলের আধার। এর আয়তন ১৬,৫২,৪৭,১৮০ বর্গকিলোমিটার বা ৬,৩৮,০১,৯৩৬ বর্গ মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তার ১৫,০০০ কিলোমিটার বা ৯৩২০ মাইল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেখানে এটি সবচেয়ে বড়, তার বিস্তার ১৭,৬৬৬ কিলোমিটার বা ১০,৯৭৭ মাইল। এর গভীরতা কোথাও কোথাও এত বেশি যে সেখানে পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের (দ্র) ৮,৮৪৮ মিটার বা ২৯,০২৮ ফুট উঁচু চূড়াটিও ডুবে যাবে। এই মহাসাগরেই রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম খাত মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ (Marianas Trench)। এর গভীরতা ১১,০২২ মিটার বা ৩৬,১৬২ ফুট।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-পাশে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) মহাদেশ, পশ্চিমে এশিয়া (দ্র) ও অস্ট্রেলিয়া (দ্র) মহাদেশ, উত্তরে উত্তর আমেরিকা (দ্র) ও এশিয়ার সংযোগস্থল বেরিং প্রণালী, দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) বা কুমেরু (দ্র) মহাদেশ। উত্তর দিকে বেরিং প্রণালীর দ্বারা সুমেরু (দ্র) মহাসাগর ও উত্তর মেরুর সঙ্গে এবং দক্ষিণ দিকে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে এই মহাসাগরের যোগ রয়েছে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর ও দক্ষিণে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় বরফশৈল ভেসে বেড়ায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে ২৫ হাজারের মতো দ্বীপ আছে। এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সব সাগর-মহাসাগরের দ্বীপ-দ্বীপপুঞ্জের মোট সংখ্যার চেয়েও অধিক। এখানে প্রবালদ্বীপ সবচেয়ে বেশি। মেলানেশিয়া (দ্র) অঞ্চলের সলোমন ও ফিজি, মাইক্রোনেশিয়া (দ্র) অঞ্চলের ক্যারোলিন, মার্শাল ও গিলবার্ট, এবং পলিনেশিয়া (দ্র) অঞ্চলের বুক, লাইন, সোসাইটি ও টুয়ামাটো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবালদ্বীপ। এ ছাড়াও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া (দ্র), পার্ল হার্বার, হাওয়াই, হনলুলু, তাইওয়ান, তাসমেনিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দ্বীপ এই মহাসাগরেই অবস্থিত। জাপান (দ্র) থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড অঞ্চলের দ্বীপগুলো 'হারিকেন' (দ্র) ঘূর্ণিঝড়ের এলাকা বলে চিহ্নিত। চীন (দ্র) ও ফিলিপাইন অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের হারিকেন ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'টাইফুন্' (দ্র)। পূর্ব উপকূলে আমেরিকার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অঞ্চল ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির জন্য বিখ্যাত।

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলোর মধ্যে ক্রাইস্টচার্চ, ওয়েলিংটন, অকল্যাণ্ড, সিডনি, ব্রিসবেন, ম্যানিলা,



www.pathagar.com

সিঙ্গাপুর, হংকং, বেইজিং, সাংহাই, ওসাকা, সানফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেল্স্, সান্ সাল্ভাদোর, পানামা, লিমা উল্লেখযোগ্য।

তিমি (দ্র), হাঙ্গর, পিরান্হা (দ্র), ডল্ফিন্ (দ্র), অক্টোপাস (দ্র) প্রভৃতি হিংস্র ও বিচিত্র জলজ প্রাণী এই মহাসাগরে পাওয়া যায়। আলবাট্রসের মতো সমুদ্রচারী বড় বড় পাখিরা এর উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে।

পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফের্দিনান্দ মাজেলান (দ্র) প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন 'প্যাসিফিক'। 'প্যাসিফিক' অর্থ 'শান্ত'। সম্ভবত এই মহাসাগরের অথৈ নীল জলরাশির গভীর শান্ত ধীরস্থির স্বভাবের জন্য মাজেলান এর নাম দিয়েছিলেন 'প্যাসিফিক'।

**সুজ. ব.**

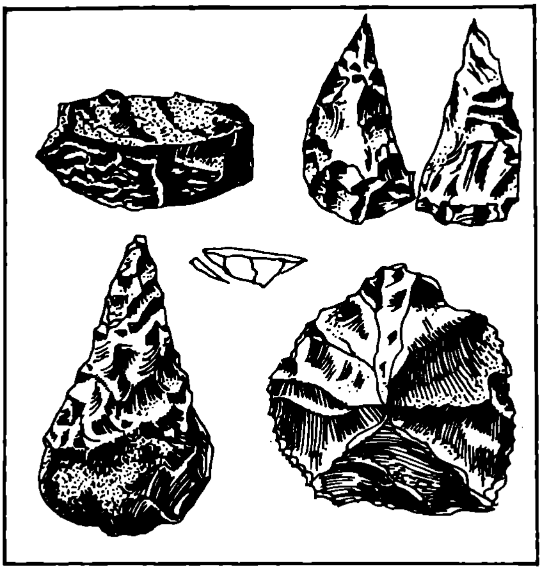

*পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার*

## প্রস্তর-যুগ

মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে যে কালপর্যায়ে মূলত পাথরনির্মিত অস্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর নির্ভর করত, তা সাধারণভাবে প্রস্তর-যুগ নামে পরিচিত। মোটামুটি বিশ লক্ষ বছর আগে হোমো হাবিলিস (দ্র) প্রজাতির মানুষ নানা কাজে পাথরের ব্যবহার শিখেছিল।

পাথরের তৈরি হাতিয়ারপত্রের ধরন দেখে প্রস্তর-যুগকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয় : প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগ এবং নব্যপ্রস্তর বা নবোপলীয় যুগ। এই দু' যুগের মধ্যবর্তী সময়ে অস্ত্রশস্ত্রের ভিন্নতা দেখে অনেকে একে অন্তর্বর্তী একটি পৃথক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। গ্রিক ভাষার সংমিশ্রণে এই তিন যুগকে যথাক্রমে পেলিওলিথিক (ইংরেজিতে ওল্ড স্টোন এজ), নিওলিথিক (ইংরেজিতে নিউ স্টোন এজ) এবং মেসোলিথিক (মধ্যপ্রস্তর বা অন্তর্বর্তী) যুগ বলা হয়।

প্রত্নপ্রস্তর যুগ মোটামুটি আট হাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বলে পণ্ডিতেরা জানান। এ সময়ের হাতিয়ারপত্র অমসৃণ; ততটা উন্নত ও সূক্ষ্ম নয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে এসব ব্যবহৃত হত।

এই অমসৃণ ও অনুন্নত অবস্থা থেকে ক্রমে আরো সুন্দর ও তুলনামূলকভাবে নিখুঁত পাথরের অস্ত্র যখন তৈরি হতে থাকে, তখনকার সময়টাই মেসোলিথিক বা অন্তর্বর্তী যুগ

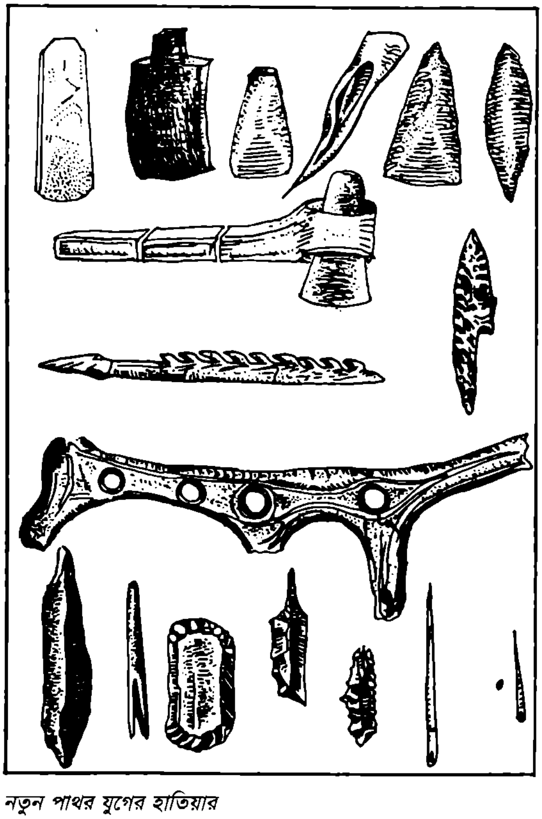

*নতুন পাথর যুগের হাতিয়ার*



www.pathagar.com

নামে পরিচিত।

নব্যপ্রস্তর যুগের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ কেবল জীবজন্তু শিকার কিংবা গাছের ফলমূল আহরণ করেই জীবিকা নির্বাহ করত, নিজে কোনো কিছু উৎপাদন করতে জানত না। আজ থেকে হাজার দশেক বছর আগে মানুষ ক্ষেত থেকে ফসল ফলানোর কায়দা তথা কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের পদ্ধতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে। তখন এই উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য হাতিয়ারপাতি আরো মসৃণ ও উন্নত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা পশুপাখি শিকারের সময় ততটা প্রয়োজনীয় ছিল না। উন্নত ও মসৃণ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির এই যুগটিকেই নব্যপ্রস্তর যুগ বলা হয়।

প্রস্তর-যুগে পাথরের তৈরি অস্ত্র ছাড়াও গাছের ডালপালা, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি হয়তো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত, কিন্তু এসব মাধ্যম ভঙ্গুর বলে এ পর্যন্ত টিকে নেই।

পাথরের যুগ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া (যা সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত) অঞ্চলে শেষ হয় মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে। ঐ সময়ে সে অঞ্চলের মানুষ তামা (দ্র) দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করতে শেখে। ফলে তখন থেকে ঐ যুগ 'তাম্র-যুগ' হিসাবে চিহ্নিত। তবে তাই বলে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি বা অন্যান্য কাজে পাথরের ব্যবহার তখনো একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। এমনকি এই আধুনিক যুগেও শিল-পাটা হিসাবে পাথরের ব্যবহার আমাদের দেশে চালু রয়েছে।

মূলত যে বস্তুটি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে সমাজসংগঠনের প্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখে, সহজভাবে বোঝার জন্য তাই দিয়ে সেই যুগটি চিহ্নিত হয়। এ হিসাবে তাম্র যুগের পরে দেখা যায় ব্রোঞ্জের (দ্র) প্রচুর ব্যবহার। এ জন্য সে সময়টিকে বলা হয় ব্রোঞ্জ-যুগ। লোহা আবিষ্কারের পর বিভিন্ন কাজে লোহা (দ্র) ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সময়টি তাই লৌহ-যুগ নামে পরিচিত।

প্রথমত একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, কোনো যুগই সারা পৃথিবীতে, এমনকি কোনো একটি দেশেও একই সময়ে আরম্ভ কিংবা শেষ হয় নি। একই যুগের পাশাপশি অন্য যুগও বর্তমান থাকতে পারে। আবার সকল যুগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও একই সঙ্গে একই সমাজে বর্তমান থাকতে পারে। আজও বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের লোকদের কখনো কখনো পাথর ছুঁড়ে পশু শিকার করতে দেখা যায়। অন্য দিকে সমতলভূমির লোকদের দেখা যায় বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে পশুপাখি শিকার করতে।

সৈ. আ. ই.

**প্রস্বেদন**

উদ্ভিদের(দ্র) মাটির (দ্র) উপরের অঙ্গসমূহ থেকে বাষ্পের আকারে পানি (দ্র) নিষ্ক্রান্ত হওয়াকে প্রস্বেদন বলা হয়। সাধারণত উদ্ভিদের পাতাই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে বিপুল পরিমাণ পানি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদের জৈবনিক ক্রিয়ায় ব্যয় হয়। বাকি পানি প্রস্বেদনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে (দ্র) চলে যায়।

মাটি থেকে শোষিত পানি কাণ্ডের মাধ্যমে পাতায় আসে। পাতার সম্পৃক্ত কোষ থেকে পানি কোষপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে বাষ্পের আকারে বের হয়ে আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বা পত্ররন্ধ্রের নিচের গর্তে জমা হয়। বাইরে বাতাসের (দ্র) আর্দ্রতা কম থাকলে বাষ্প ব্যাপনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতার বাইরে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। প্রস্বেদনপ্রক্রিয়ার হার আলো, চাপ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, আবহমণ্ডলের চাপ ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রখর সূর্যালোকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। এতে প্রস্বেদনের হার বাড়ে। তাপ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা বাড়ে।



www.pathagar.com

ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে। তাপ বাড়লে পানিও দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। উদ্ভিদের চতুষ্পার্শ্বের বায়ুতে আর্দ্রতা প্রস্বেদনের ফলে বেশি থাকে। বায়ুপ্রবাহ আর্দ্র বায়ুকে সরিয়ে দিলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়। আবহমণ্ডলে চাপ কমা বা বাড়ার ফলে কম বা বেশি তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়। চাপ কমলে প্রস্বেদনের হার বাড়ে, চাপ বাড়লে তা কমে যায়। মাটি থেকে পানি-শোষণ বেশি হলে প্রস্বেদনের হার বাড়ে, বিপরীতে হার কমে। উদ্ভিদে পানির পরিমাণ অতিরিক্ত হলে জৈবনিক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। এই প্রক্রিয়া কোষরসকে উর্ধ্বমুখী হতে সাহায্য করে। কোষরস উপরে না উঠলে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি হত না। এ কারণে উদ্ভিদজীবনে প্রস্বেদনপ্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমে যায়, উদ্ভিদ পানি শোষণ করে কম, পাতা স্বাভাবিক প্রস্বেদনপ্রক্রিয়া চালালেও উদ্ভিদে পানির ঘাটতি হয়। তাই উদ্ভিদ এ সময় পত্র ঝরায়।

ত. চ.

## প্রহসন (farce)

সাহিত্যে নাটক শাখার একটি প্রশাখা হল প্রহসন। প্রহসনে প্রাধান্য পায় রঙ্গরস, হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গ। এখানে নাট্যকার ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জনকে প্রশয় দেন, যেমন চরিত্রসৃষ্টিতে তেমনি ঘটনাবিন্যাসে। প্রহসনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য সমাজে বিদ্যমান কোনো অসঙ্গতি, অনাচার বা দুর্বলতাকে তুলে ধরা। তবে লেখক এই কাজটি করেন লঘু হাসি-তামাসার মধ্য দিয়ে, ক্রোধ ও তিক্ততা পরিহার করে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'(১৮৬০), দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) এবং মীর মশাররফ হোসেনের (দ্র) 'এর উপায় কি' (১৮৭৬) ও 'ভাই ভাই এই তো চাই' (১৮৯৯) প্রহসন হিসাবে সমাদৃত হয়েছে।

ক. চৌ.

## প্রাকৃত ভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা উৎপন্ন। এর উৎপত্তিকাল মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দী ধরা যায়। স্থিতিকাল আনুমানিক ১০ম বা ১১শ শতাব্দী। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা থেকে নব্য বা আধুনিক আর্য ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল। এই উদ্ভবকালে তিনটি স্তর পার হতে হয়—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। মধ্যস্তরে 'প্রাকৃত' ও অন্ত্যস্তরে 'অপভ্রংশ'।

আদি স্তরে প্রাকৃত ভাষা বলতে অশোকের (দ্র) অনুশাসন লেখার ভাষা ও উপভাষা, খরোষ্ঠী অক্ষরে লেখা ধম্মপদের (দ্র) ভাষা এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রধান পালি ভাষা (দ্র) বোঝায়। এই স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক ৫০০ বছর। প্রাকৃত ভাষার মধ্যে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি ১৯ প্রকার প্রাকৃত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। মাগধী প্রাকৃত থেকে অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়। এই মাগধী প্রাকৃত থেকে কালক্রমে বাংলা, বিহারি ও আসামি (অর্থাৎ ওড্র-বঙ্গ-কামরূপী) ভাষার জন্ম। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে পশ্চিমী হিন্দি ও পাঞ্জাবি, অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে পূর্বী হিন্দি এবং মহারাষ্ট্রী থেকে মারাঠি ভাষার উদ্ভব বলে ধরা হয়। জৈনদের ধর্মীয় অনুশাসন অর্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে লিখিত।

খ্রিস্টীয় ২য় শতকে অশ্বঘোষের (দ্র) নাটকে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতিতে লেখা 'গাথাসপ্তশতী' (দ্র) কবিতাসঙ্কলন। এ ছাড়া 'বজ্জালগ্‌গ' কবিতাসঙ্কলন, জৈনদের 'আগমশাস্ত্র', পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা গল্পসঙ্কলন গ্রন্থ 'বড্‌ডকহা' (অর্থাৎ বৃহৎকথা) উল্লেখযোগ্য। বৃহৎকথার সঙ্কলন হল সোমদেবের অনুবাদ 'কথাসরিৎসাগর' (দ্র)।

বি. ব.

**প্রাকৃতিক গ্যাস** গ্যাস, প্রাকৃতিক দ্র

## প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা

সবচেয়ে পুরানো মানুষ, যাদের কথা এ পর্যন্ত জানতে পারা গেছে, যাদের আদিম মানুষ বা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বলা হয়, তাদের আঁকা ছবি ও অন্যান্য শিল্পকলাকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা।

দশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার বছর আগে আদিম মানুষেরা দু'টি কাজ করতে পারত। একটি হল ক্ষুধা



www.pathagar.com

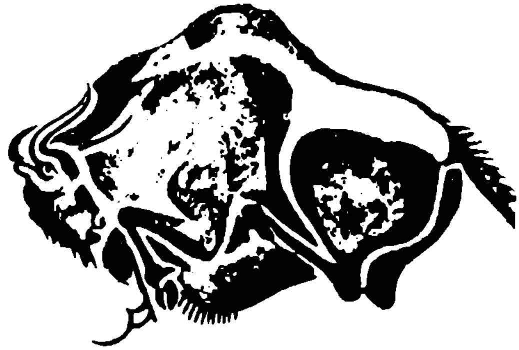

*আদিম মানুষের আঁকা বাইসন*

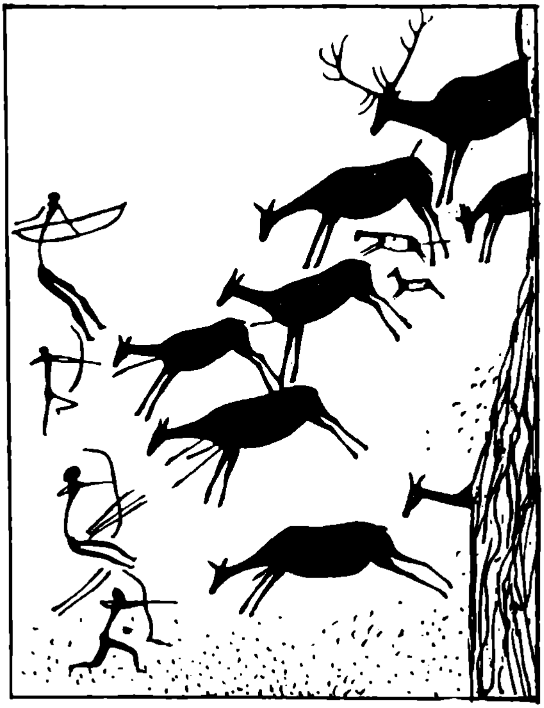

*আদিম মানুষের আঁকা হরিণ শিকার*

নিবারণের জন্য জীবজন্তু শিকার করে খাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল যেসব পাহাড়ের গুহায় তারা বাস করত তাদের দেয়ালে ছবি আঁকা।

১৮৭৯ সালে উত্তর স্পেনের এক জমিদার— নাম সাউতুওলা (Sautuola), তাঁর জমিদারি-অঞ্চলের এক পাহাড়ের গুহায় আদিম মানুষের বসবাসের বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ছ' বছরের মেয়ে। কন্যাটি আপন মনে গুহার ভেতরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'বাবা, ষাঁড়! ষাঁড়!'

মেয়ের চিৎকারে জমিদার সাউতুওলা এগিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, গুহার ভেতর ষাঁড় আসবে কোত্থেকে ? পরে অবাক হয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, ষাঁড়ই তো বটে। তবে জ্যান্ত নয়, পাহাড়ের গায়ে আঁকা। সাউতুওলা আরো এগিয়ে গেলেন—পাহাড়ের গায়ে অনেক ষাঁড়ের ছবি—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় ষাঁড়, যাকে বলা হয় বাইসন। আরো আছে বল্গাহরিণের ছবি।

পাহাড়টির নাম আলতামিরা (দ্র)। সাউতুওলা আর তাঁর ছোট্ট মেয়ের এ আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। গবেষক আর পণ্ডিত লোকদের ভিড় বাড়তে লাগল আলতামিরায়। জল্পনা-কল্পনা চলল, কেন ছবি আঁকত আদিম মানুষ ? কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—হতেই পারে না। আদিম মানুষ ছিল বুনো ও অসভ্য। খাওয়া আর রাঁধাই ছিল তাদের একমাত্র চিন্তা। ছবি আঁকবে কেন ?

নানা রকম তর্ক-বিতর্ক চলল সাউতুওলার আবিষ্কার নিয়ে। এর পরই ১৮৯৫ সালে স্পেনেরই পিরেনিজ পর্বতমালার পাহাড়ি অঞ্চলে আরো অনেকগুলো গুহার খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানেও আদিম মানুষের আঁকা ছবি এবং ছবি আঁকার নানা রকম হাতিয়ার ও জীবন-যাপনের সরঞ্জাম পাওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আরো খোঁজ পাওয়া গেল অনেক গুহার, যেখানে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবি। ফ্রান্স ও আফ্রিকা (দ্র)-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতেরা অনুমান করলেন, এ পর্যন্ত যতগুলো গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের 'লাস্কো' (Lascaux) গুহার চিত্রই সবচেয়ে প্রাচীন। সম্ভবত বিশ হতে তিরিশ হাজার বছর আগে এসব ছবি আঁকা হয়েছিল। সবই শিকারের ছবি। জীবজন্তুগুলো এত নিখুঁতভাবে আঁকা যে কোনোটিকেই চিনতে অসুবিধা হয় না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিকারের প্রয়োজনেই আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে। শিকার করা ছাড়া খাবার যোগাড় করার



www.pathagar.com

*গুহার গায়ে ছবি আঁকছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। মাঝে : দক্ষিণ রোডেশিয়ার গুহার দেয়ালে আদিম মানুষের আঁকা 'শিকারির দল' নিচে: ফ্রান্সের দর্দঞন্ 'ফঁ দ্য গোম্' গুহার দেয়ালে বাইসন ও ম্যামথের ছবি*

www.pathagar.com

অন্য কোনো উপায় তারা তখনো বের করতে পারে নি।

দু'দিন ধরে বাইসনের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। শিকারকে কিছুতেই ধরাশায়ী করতে পারছে না। তিন দিনের দিন শিকারে বেরুবার আগে বাইসনের ছবিটা এঁকে তার গায়ে তীর ও বর্শা বিঁধিয়ে দেওয়ার দৃশ্যও আঁকা হল। বিশ্বাস, এবার বাইসন ধরা পড়বেই। এভাবেই দেখা যায়, জীবজন্তু ও শিকারের ছবিতেই তীর বা বর্শা বিঁধিয়ে দেওয়া। ছবি-আঁকা একটা জাদুবিশ্বাস হিসাবে আদিম মানুষের মধ্যে কাজ করেছে।

অন্য কারণেও আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে। সে যুগে যখন খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যেত, তুষারঝড় হত, সে সময় গুহার বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না। গুহার ভেতরে সময় কাটবে কী করে ? পশুশিকার করাই একমাত্র চিন্তা। তাই আঁকতে গিয়ে এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

জীবজন্তুর ছবি ছাড়া আরো এক ধরনের ছবি এঁকেছে আদিম মানুষ। তা হল হাত—হাতের তালু। হাতকে তারা খুবই মূল্যবান মনে করত। হাতই ছিল তাদের প্রধান সহায়। হাত দিয়ে তারা যুদ্ধ করত, শিকার করত, অস্ত্রশস্ত্র বানাত, আগুন ধরাত। হাতের ইশারায় ভাবের আদানপ্রদান হত—এরূপ অনেক কাজ। হাত আঁকার পদ্ধতি ছিল বেশ মজার। হাতের তালু পাথরের গায়ে রেখে তার চারপাশে রঙ লাগিয়ে বা ছুঁচাল হাড় বা পাথর দিয়ে আঁচড় কেটে হাতের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের যেসব হাতের তালুর ছবি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, কোনোটায় একটা আঙুল কাটা, কোনো হাতের কড়ে আঙুল হয়তো নেই। এতে বোঝা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবনযাত্রা ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টের। শিকার করতে গিয়ে কিংবা পরস্পর মারামারি ও যুদ্ধ করতে গিয়ে হাতের আঙুল খোয়া গেছে।

গুহাচিত্রের শিল্পমান কেমন ? এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞরা রায় দিয়েছেন, অসভ্য হলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ অত্যন্ত উন্নত মানের ছবি উপহার দিয়েছে। জীবজন্তুর বিশেষ বিশেষ দিক বা মূল পরিচয় তারা জোর দিয়ে এঁকেছে। যেমন— তারা শক্তিশালী দেহ, ক্ষিপ্রগতি ও ভয়ঙ্কর চেহারা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত। বর্তমানের মতো ছবিতে আলোছায়া ঠিক হল কিনা, পরিপ্রেক্ষিত বা ছবি আঁকার ব্যাকরণ ঠিক রাখার প্রয়োজন তাদের ছিল না। জন্তুর পরিচয়টাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। জন্তুর স্বভাব-চরিত্র, গতি, বলিষ্ঠতা ইত্যাদি মিলিয়ে আসল রূপটা তারা সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। যেমন— আলতামিরা গুহার বাইসনের ছবি, ফ্রান্সে দর্দঞন্ (Dordogne)-এর ফঁ দ্য গোম্ (Font de gaume) গুহার বল্গাহরিণ, বাইসন ও এক সারি ঘোড়া শিকারের ছবি।

তিনটি রঙের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক ছবি আঁকা হয়েছে। লাল মাটি ও হলুদ মাটি পশুর চর্বির সাথে মিশিয়ে তারা রঙ তৈরি করত। কালো রঙ তৈরি করত পশুর হাড় পুড়িয়ে। রঙ তৈরি করার জন্য এবং রঙ রাখার জন্য পাথরে তৈরি পাত্রের মতো পাত্র গুহায় পাওয়া গেছে। পশুর পশম দিয়ে আদিম মানুষ তাদের ছবি আঁকার তুলি বানিয়ে নিত। কিংবা গাছের ডাল চিবিয়ে থ্যাবড়া করে বা ছোবড়া করে নিয়ে তা দিয়ে ছবিতে রঙ লাগাত। পশুর হাড় কেটে চোখা করে তা দিয়ে পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে গর্ত করে ছবি আঁকা হত।

যে উপায়ে ও যে উপকরণেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছবি আঁকা হোক না কেন, নিখুঁতভাবে ছবি আঁকায় আদিম মানুষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর প্রমাণ, হাজার হাজার বছর পরেও গুহার গায়ে আঁকা ছবিগুলোর ঔজ্জ্বল্য তেমন নষ্ট হয় নি।

ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তরযুগের মানুষ মূর্তিও তৈরি করত। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে জীবজন্তু শিকার চিত্রের বিষয় হলেও ভাস্কর্যের বিষয় হিসাবে মানুষের মূর্তিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এগুলো তৈরি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে আঁচড় কেটে এবং আলাদা আলাদা পাথর কেটে। মূর্তিগুলো প্রায় সবই নারীর। এ থেকে পণ্ডিতগণ ধারণা করেছেন যে মাতৃসত্তা এবং উর্বরতার প্রতীক হিসাবেই এগুলো তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু জীবজন্তুর মূর্তিও পাওয়া গেছে, যেগুলো তৈরি হয়েছে পশুর হাড়, বাইসনের শিং এবং পাথরের টুকরা দিয়ে।

ধীরে ধীরে আদিম মানুষ পাথরকে আরো মার্জিত ও উন্নতভাবে ব্যবহার করতে শেখে। আর এভাবেই নব্য



www.pathagar.com

প্রস্তর-যুগের (দ্র) সূচনা হয়। পুরানো প্রস্তর-যুগের মানুষ ছিল যাযাবর এবং তারা শিকার করে খাদ্য আহরণ করত। তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। নব্য প্রস্তর-যুগের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। তারা এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করত বলে নানা রকম জিনিসপত্রের প্রয়োজন বোধ করে, জীবনধারণের পদ্ধতিও পাল্টাতে থাকে। তারা তৈরি শুরু করে নানা রকম পাত্র কখনো পাথর দিয়ে, কখনো মাটি দিয়ে। সেগুলোতে সঞ্চয় করে রাখত খাবার পানি ও অন্যান্য খাবারদাবার। আর এভাবেই মৃৎশিল্পের সূচনা হয়। ঘরবাড়িও তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় কাঠ, খাগড়া, পাথর কিংবা কাদামাটি দিয়ে। খাড়া করে দু'টি খুঁটি পুঁতে আড়াআড়িভাবে আরেকটি স্থাপন করলে কিন্তু ঘরবাড়ি বা ইমারত তৈরি করতে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। আর এই মূল জিনিসটি প্রস্তরযুগের লোকেরাই আবিষ্কার করে। এভাবেই শুরু হয় স্থাপত্যশিল্প। জর্ডনের জেরিকোতে (Jericho) পাওয়া গেছে সে যুগের স্থাপত্যের নমুনা।

পাথরের তৈরি বাড়ি

স্মৃতিস্তম্ভ : ডলম্যান

পাথরের ভাস্কর্য : নারী

মাটির পাত্র

আরেক ধরনের স্থাপত্য পাওয়া গেছে ইউরোপে (দ্র), যা থেকে ধর্মীয় বোধের স্থাপত্যের সূচনা হয়েছে বলা যায়। রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু নিয়ে মানুষ যখন ভাবতে শুরু করল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো এক অচেনা শক্তির পূজা শুরু করল। আর পূজা করার জন্য প্রয়োজন পড়ল উপাসনালয় তৈরির। এ ছাড়া মৃত মানুষের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তারা সমাধিসৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরিও শুরু করল। যেমন 'ডলম্যান'। মানুষের মাথার খুলি কাদামাটি দিয়ে ভরাট করে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও আদিম মানুষেরা করত।

হা. খা.

**প্রাচীনকীর্তি** পুরাতত্ত্ব দ্র



www.pathagar.com

## প্রাচ্য সঙ্গীত

সঙ্গীতের (দ্র) প্রধান দু'টি ধারা : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয় সঙ্গীত বলতে ভারতবর্ষ (দ্র), জাভা ও বালি (দ্র), চীন, জাপান (দ্র), ইরান, আরব প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গীতকে বোঝায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত বলতে বোঝায় ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকার (দ্র) সঙ্গীতকে। পূর্বে এই দু'টি ধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুব একটা ছিল না। উভয়েরই ভিত্তি ছিল মেলোডি বা সুর। একে সুরের একক রেখাও বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) যে কোনো একটি গানের কথা ভাবলেই আমরা দেখতে পাই যে একটি সুরের একক রেখার ওপর কথাগুলো স্থাপিত। বা গিটারে সেই গানের সুরটি বাজালে আমরা শুনতে পাই যে নানাভাবে সুরের একটি রেখা এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে এই মেলোডি হচ্ছে প্রাচ্য সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যময় ভিত্তি। আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যময় ভিত্তি হচ্ছে হার্মনি বা স্বরসাম্য বা স্বরসঙ্গতি। কর্ড বা স্বরসংবাদ পদ্ধতিতে মেলোডির সঙ্গে মাকড়সার জালের মতো সুরজাল বুনে গেলে হয় হার্মনি। কিন্তু প্রাচ্য সঙ্গীত বা আমাদের সঙ্গীত সুরের একটি রেখাকেই স্বরস্থানের নিচের দিকে, মাঝখানে বা ওপরের দিকে নিয়ে গিয়ে সঙ্গীত রচনা করে। প্রাচ্য সঙ্গীত বা ওরিয়েন্টাল মিউজিক বলতে ভারতবর্ষের রাগসঙ্গীতপদ্ধতিকেও বোঝায়। কেননা এই অঞ্চলের সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবর্ষের রাগসঙ্গীতই সর্বাপেক্ষা নিয়মবদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পাশ্চাত্য-প্রভাবমুক্ত।

ভারতবর্ষের রাগসঙ্গীত দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত : হিন্দুস্থানি সঙ্গীত বা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত বা কর্ণাটিকি সঙ্গীত। আমাদের শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ বা রাগসঙ্গীত হিন্দুস্থানি ধারার অন্তর্গত। এই সঙ্গীতের প্রধান রীতি চারটি : ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র), ঠুংরি (দ্র)। স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী রাগরূপ প্রকাশ করাই এই সঙ্গীতের প্রধান কথা। এই সঙ্গীতের রূপ পূর্বনির্দিষ্ট নয়। গায়ক বা বাদক পূর্বে রচিত একটি গান বা একটি গৎকে শুদ্ধতা বজায় রেখে যথেষ্ট স্বাধীনতার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেন। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের প্রধান চার রীতি প্রতিষ্ঠায় ধ্রুপদে রাজা মান ও তানসেন ; খেয়ালে আমীর খসরু (দ্র), হুসেন শাহ্ শর্কি ও সদারঙ্গ ; টপ্পায় শোরী মিঞা বা গোলাম নবী এবং ঠুংরিতে ওয়াজিদ আলী শাহ্ ও সাদিক আলী খাঁ বিশেষ অবদান রাখেন।

ক. গো.

*প্রাচ্যসঙ্গীতের তিন দিকপাল — তানসেন, আমীর খসরু ও ওয়াজেদ আলী শাহ*



www.pathagar.com

## প্রাণরসায়ন

জীবদেহে সংঘটিত নানা রকম রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। জীবদেহের বিপাক, খাদ্য পরিপাক, শক্তির ব্যবহার, কলার রাসায়নিক গঠন, বিভিন্ন বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তি ইত্যাদি এ শাখার আলোচ্য বিষয়। প্রাণরসায়নবিদগণ জীন্ (দ্র)-এর ভূমিকা, হরমোন (দ্র) এবং বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ায় এন্‌জাইমের (দ্র) কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিভিন্ন রোগের কারণ, চিকিৎসার প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রাণরসায়নের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

আধুনিক প্রাণরসায়নের শুরু অষ্টাদশ শতকে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ্ প্রিস্ট্‌লি ১৭৭৪ সালে অক্সিজেন (দ্র) আবিষ্কার করেন। ফরাসি রসায়নবিদ অঁতোয়ান্ লোরঁ লাভোয়াজিয়ে (Antoine Laurent Lavoisier) প্রমাণ করেন যে জীবের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দরকারি। সুইডিশ রসায়নবিদ কার্ল শিলে জীবদেহ থেকে ল্যাক্টিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ইউরিক অ্যাসিড পৃথক করেন। বিংশ শতকে এসে বিজ্ঞানের পৃথক শাখা হিসাবে প্রাণরসায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। আইসোটোপের (দ্র) ব্যবহার প্রাণরসায়নের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার খুলে দেয়। এর ফলে জীবদেহের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ার রাসায়নিক ধাপ বের করা সহজ হয়।

প্রোটিন সংশ্লেষণ, প্রোটিনের গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়। দেহের রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে প্রাণরসায়নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রোগপ্রতিরক্ষাব্যবস্থা, হর্‌মোন্ চিকিৎসা, ক্যান্সার (দ্র) গবেষণা এবং জীন্ (দ্র) প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অভাবনীয় অগ্রগতি প্রাণরসায়নকে সমৃদ্ধ করেছে।

সা. এ.

## প্রাণিজগৎ / প্রাণী

পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন জায়গায় নানান আকার-প্রকৃতির প্রাণী ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ মাটিতে হেঁটে বেড়ায়, কেউ আকাশে উড়ে বেড়ায়, আবার কেউ পানিতে সাঁতার কেটে বেড়ায়। ঘোড়া (দ্র), দোয়েল (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), ইলিশ (দ্র), প্রজাপতি (দ্র) কিংবা কেঁচো (দ্র) সবই প্রাণী। তেমনি হাতি (দ্র), চিংড়ি (দ্র), সাপ (দ্র), সীল (দ্র)—এরাও প্রাণী। কোনো কোনো প্রাণী এত ছোট যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ (দ্র) যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম নীল তিমি (দ্র)। পর পর আটটি হাতি সারি বেঁধে দাঁড়ালে যত বড় হবে, একটি নীল তিমি তার চেয়েও বড়।

পৃথিবীতে এত প্রাণী রয়েছে যে কেউ তা গুণে শেষ করতে পারবে না। এমনকি কত রকমের প্রাণী রয়েছে সেটা বলাও একটি কঠিন কাজ। বিজ্ঞানীরা প্রায় দশ লক্ষ রকমেরও বেশি প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। তবে প্রতি বছরই এ তালিকায় কয়েক শ' রকমের নতুন প্রাণীর নাম যুক্ত হয়।

বিজ্ঞানীরা জীবজগৎকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ। আমরা সহজেই উদ্ভিদ (দ্র) আর প্রাণী চিনতে পারি। বেশির ভাগ প্রাণী হাঁটা-চলা করতে পারে। আর বেশির ভাগ উদ্ভিদ শেকড় দিয়ে মাটিতে আটকানো। প্রাণীরা অন্য প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে। আর বেশির ভাগ উদ্ভিদ আলো-বাতাস আর পানি থেকে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নেয়।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা প্রাণিজগৎকে নানাভাবে ভাগ করেছেন। যেমন—বন্য প্রাণী ও পোষা প্রাণী, স্থলচর ও জলচর প্রাণী, উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট ও শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। পায়ের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করেও প্রাণীদের ভাগ করা হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শ্রেণীবিন্যাসপদ্ধতি অনুসারে প্রাণিজগৎকে দশটি প্রধান পর্বে ভাগ করা হয় :

১. প্রোটোজোয়া (দ্র)
২. পরিফেরা (Porifera)
৩. সিলেন্টারেটা (Celenterata)
৪. প্লাটিহেল্‌মিন্‌থিস্ (Platyhelminthes)
৫. নেমাথেল্‌মিন্‌থিস্ (Nemathelminthes)
৬. অ্যানেলিডা (Annelida)
৭. আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)
৮. একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)
৯. মলাস্কা (Mollusca)
১০. কর্ডাটা (Chordata)

প্রথম নয়টি পর্বের প্রাণীদের কোনো মেরুদণ্ড নেই। এদের অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী বলা হয়। শেষের পর্বের প্রাণীদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়; কারণ এদের দেহে



www.pathagar.com

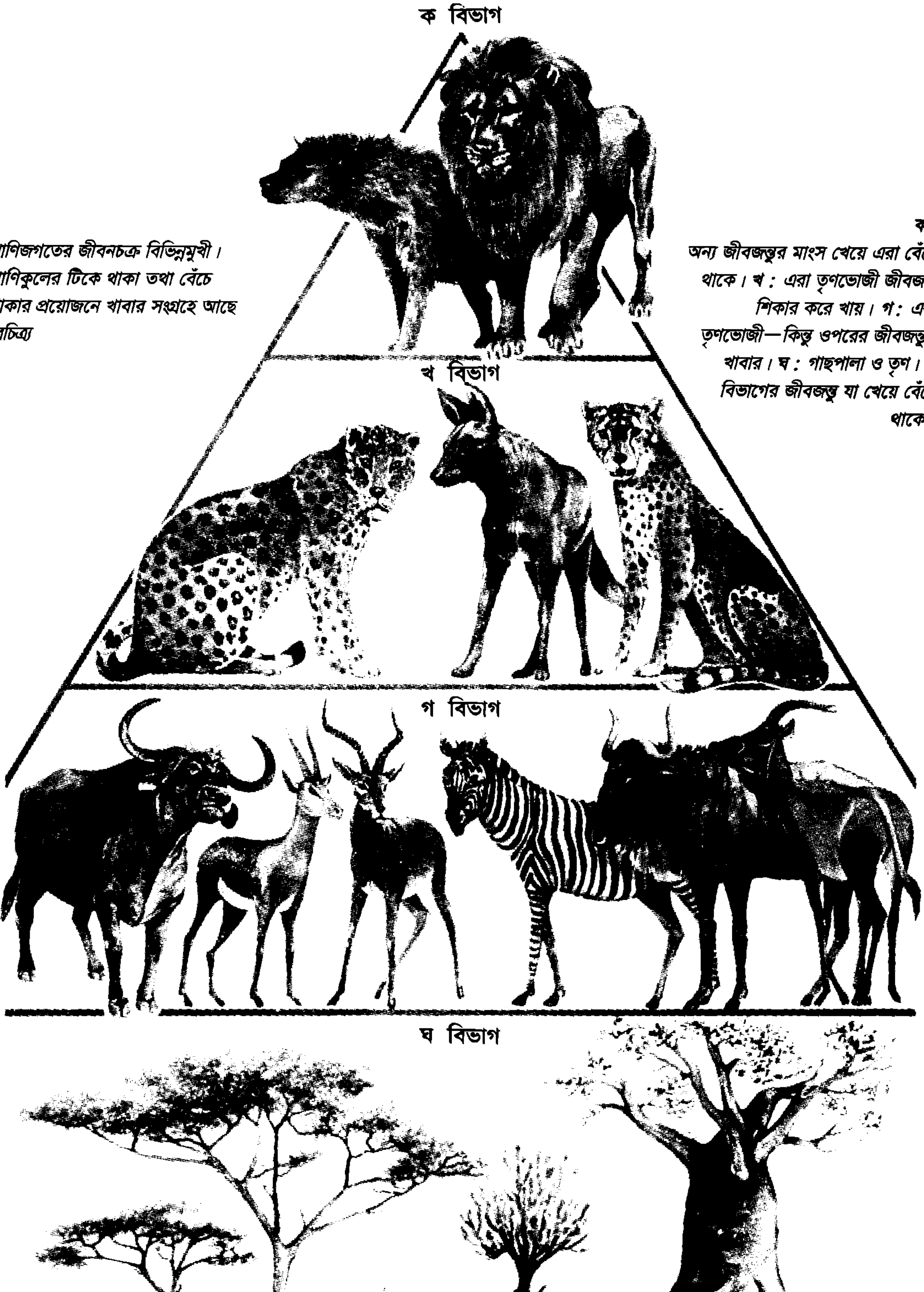


*প্রাণিজগতের জীবনচক্র বিভিন্নমুখী। প্রাণিকুলের টিকে থাকা তথা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে খাবার সংগ্রহে আছে বৈচিত্র্য*

*ক: অন্য জীবজন্তুর মাংস খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। খ: এরা তৃণভোজী জীবজন্তু শিকার করে খায়। গ: এরা তৃণভোজী—কিন্তু ওপরের জীবজন্তুর খাবার। ঘ: গাছপালা ও তৃণ। গ বিভাগের জীবজন্তু যা খেয়ে বেঁচে থাকে।*



www.pathagar.com

মেরুদণ্ড রয়েছে।

অন্যান্য প্রাণী না থাকলে মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে টিকে থাকা সম্ভব হত না। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রাণিজগৎ অপরিহার্য। প্রাণীদের কাছ থেকে আমরা খাদ্য, পোশাক এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাই। প্রাণী না থাকলে আমরা মাংস, দুধ (দ্র), ডিম (দ্র), মধু (দ্র), পশম, রেশম (দ্র)—এসব কিছুই পেতাম না। অবশ্য অনেক প্রাণী মানুষের ক্ষতিও করে। বাঘ (দ্র), সিংহ (দ্র), হাঙ্গর কিংবা কুমির (দ্র) অনেকের প্রাণ নিয়েছে। নানা রকম পোকামাকড় এবং পরজীবী (দ্র) প্রাণী মানুষের রোগব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মশা (দ্র)-মাছি (দ্র) রোগ ছড়ায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণীরা মানুষের অপকারের চেয়ে উপকারই বেশি করে।

পৃথিবীতে দিন দিন মানুষ বাড়ার ফলে বনজঙ্গল কমে যাচ্ছে। চাষাবাদ ও শিল্পকারখানা স্থাপনের ফলে প্রাণীদের বিচরণের জায়গা কমে যাচ্ছে। ফলে অনেক প্রজাতির প্রাণী চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ জন্য অকারণে প্রাণী শিকার করা উচিত নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে বড় বড় অভয়ারণ্য তৈরি করে সেখানে বিভিন্ন প্রাণীদের নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সা. এ.

**প্রি গঁকুর্** (Prix Goncourt)

**'প্রি গঁকুর'** অর্থ গঁকুর পুরস্কার। ফ্রান্সের এদ্মঁ গঁকুর্ (Edmond Goncourt : ১৮২২–৯৬) ও জুল্ গঁকুর (Jules Goncourt : ১৮৩০–৭০) নামে দুই ভাই তাঁদের সময়ের অত্যন্ত খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী সাহিত্যিক ছিলেন। এদ্মঁ গঁকুর্ মৃত্যুর সময়ে গঁকুর্ একাডেমী (Academie Goncourt) স্থাপনের জন্য অর্থ রেখে যান। ঐ একাডেমী গঁকুরের পক্ষ থেকে সাহিত্যের জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে তারই নাম প্রি (অর্থাৎ প্রাইজ, পুরস্কার) গঁকুর্। এর মূল্যমান বেশি নয়, কিন্তু বিচারের মান এত উঁচু যে গঁকুর্ পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক প্রায় নোবেল পুরস্কার (দ্র) পাওয়ার মর্যাদা পান।

হা. মা.

**প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁ** ইব্রাহীম খাঁ (প্রিন্সিপাল) দ্র

**প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** [১৯১১—১৯৩২]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী ও শহীদ। ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ও মাতা প্রতিভা ওয়াদ্দেদার। ছাত্রী হিসাবে প্রীতিলতা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ডিস্টিংশনসহ বি. এ.পাশ করেন।

ঢাকার (দ্র) ইডেন কলেজে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবী সংগঠন 'দীপালী সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হন এবং কলিকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের (দ্র) অস্ত্রাগারলুণ্ঠন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সূর্য সেনের (দ্র) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সূর্য সেনের নির্দেশে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের জন্য তিনি স্যুটকেসে লুকিয়ে কলিকাতার গোপন কারখানা থেকে তৈরি বোমার খোল আনয়ন করেছিলেন।

শিক্ষাজীবনশেষে প্রীতিলতা ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের নন্দনকানন অপর্ণাচরণ মধ্য-ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে



www.pathagar.com

প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি এখানে তিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের চার জন মেয়ে ও অন্য কয়েক জন ছাত্রী নিয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। এই চক্র থেকে বিপ্লবীদের জন্য প্রীতিলতা নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করতেন।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন প্রীতিলতা চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র পটিয়ার ধলঘাটের সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হামলা করলে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড গুলিবিনিময়ে ইংরেজ ক্যাপ্টেন ক্যামারুন এবং বিপ্লবী নির্মল সেন ঘটনাস্থলে মারা যান। কিন্তু সূর্য সেন ও প্রীতিলতা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। এ সময় প্রীতিলতাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়।

১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে সূর্য সেনের নির্দেশে প্রীতিলতা সাত জন বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে নিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। এই সফল আক্রমণ পরিচালনার পর প্রীতিলতা যখন বিপ্লবী যোদ্ধাদের পেছন পেছন ফিরে আসছিলেন, তখনই নালার মধ্যে আত্মগোপনকারী এক ইংরেজ যুবকের গুলিতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এই অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা পড়ার আগেই তিনি পটাশিয়াম সায়েনাইড খেয়ে আত্মদানের সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

**প্রেমচন্দ, মুন্সি** [ ১৮৮০ –১৯৩৬]

উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের জীবনবাদী কথাশিল্পী। হিন্দি সাহিত্যে তিনি 'উপন্যাস-সম্রাট' হিসাবে খ্যাত। আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের জনক বলেও তাঁকে অভিহিত করা হয়।

১৮৯৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে চুনারের লণ্ডন মিশন স্কুলে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। জীবনের প্রথম রচনা একটি উর্দু উপন্যাস। রচনা করেন ১৯০১ সালে। প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে বারাণসীর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

১৯০৯ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (দ্র) বিষয়ে একটি উপন্যাস লিখে সরকারি রোষানলের শিকার হন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি তাঁর আসল নাম ধনপত রায় পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেন ছদ্মনাম—প্রেমচন্দ এবং এ নামেই তিনি পরিচিত। ১৯১০ সালে 'বড়ে ঘরকী বেটি' প্রকাশিত হলে উর্দু সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদান'।

প্রেমচন্দের ওপর রুশ সাহিত্যিক তল্‌স্তোয়ের (দ্র) ছিল গভীর প্রভাব। বাংলায় যেমন শরৎচন্দ্র (দ্র), উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যে তেমনি জনপ্রিয় প্রেমচন্দ। তাঁর প্রায় যাবতীয় সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় (দ্র) অনূদিত ও বহুল পঠিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (দ্র) তাঁর রচনা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৬ সালের ৮ই অক্টোবর।

আ. হু.

**প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) চালু একটি গবেষণা-বৃত্তি। সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মের জন্য এই বৃত্তি সংরক্ষিত থাকে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (১৮৩১–১৯১৮) নামে জৈন ধর্মাবলম্বী জনৈক গুজরাটি ধনী ও জনহিতব্রতী ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' লক্ষ টাকা দান করেন; ঐ অর্থের সুদ থেকে বৃত্তিটি ১৮৬৮ সাল থেকে চালু করা হয়। বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদা (দ্র), ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার (দ্র), স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (দ্র), বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (দ্র) প্রমুখ বহু বিখ্যাত বাঙালি এই বৃত্তি লাভ করেছেন।

হা. মা.

**প্রেমেন্দ্র মিত্র** [১৯০৪—১৯৮৮]

রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পরবর্তী কালের বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এক জন উৎকৃষ্ট ছোটগল্পলেখক এবং সুখ্যাত কবি। তা ছাড়া তিনি শিশুদের জন্য কল্পবিজ্ঞান (দ্র)-কাহিনীও লিখেছেন, আর লিখেছেন মজার গোয়েন্দা-গল্প। ছোটদের জন্য কবিতা ও



www.pathagar.com

ছড়াও লিখেছেন তিনি। তবে ছোটগল্পের জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০৪ সালে, বেনারসে অর্থাৎ কাশীতে। তাঁর পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, মায়ের নাম সুহাসিনী দেবী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছিল নানা স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন রেলের এক জন কর্মচারী, চাকুরির কারণে তাঁকে নানা জায়গায় থাকতে হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রও পিতার সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর লেখাপড়াও ঠিক সুস্থিরভাবে হয় নি। কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি এবং এখান থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনেও (দ্র) ছিলেন। এখান থেকে ফিরে আসেন সাউথ সুবার্বন কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ), পরে ঢাকার (দ্র) জগন্নাথ কলেজে আই. এসসি. শ্রেণীতে ভর্তি হন। ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হবেন। কিন্তু পড়াশোনা আর অগ্রসর হয় নি। এরপর তিনি জীবিকার সন্ধানে বের হন। প্রথমে করেন স্কুলের শিক্ষকতা। তারপর বিভিন্ন পেশায় ও কাজে তিনি জড়িয়ে পড়েন—কখনো বিজ্ঞাপনসংস্থার চাকুরি, কখনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অ্যাসিস্ট্যান্ট, কখনো ব্যবসা, কখনো রেডিও অফিসের কাজ। সিনেমাতেও জড়িত হন তিনি। প্রথমে সিনেমা কোম্পানির প্রচারের কাজ করতেন, পরে সিনেমার প্রযোজক হন এবং চিত্রনাট্য লেখেন। জীবিকার জন্য নানা কাজ করতে হলেও সাহিত্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের মূল পেশা ও নেশা ছিল।

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' লেখা শুরু করেন, কবিতাও লিখতেন ঐ সময়। 'পাঁক' গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯২৪ সালে। ঐ বছরেই প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'সংহতি' নামক এক পত্রিকায়। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি প্রবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, সে আমলের বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। এই অভিজাত পত্রিকাতেই ১৯২৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম সাড়া জাগানো গল্প 'শুধু কেরানী' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে অনবরত তিনি লিখেছেন। সে আমলে আরেকটি বিখ্যাত পত্রিকা ছিল 'কল্লোল'। নতুন ধারার তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের তৈরি করেছিল এ পত্রিকা। এঁরা সবাই 'আধুনিক' সাহিত্য লিখতে চেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পত্রিকার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হন। 'কালিকলম' নামের একটি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসু (দ্র) ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (দ্র) প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই তিন জন মিলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (দ্র) মোড় ফিরিয়ে দেন। অল্পদিনের মধ্যে গল্প ও কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সারা জীবন অসংখ্য বই লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এক শ'র বেশি হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র উঁচুমানের গল্পলেখক। ছোটগল্প রচনার কলাকৌশলে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রপরবর্তী কালের এক জন সেরা ছোটগল্পলেখক। তাঁর অনেক স্মরণীয় গল্প আছে। 'পঞ্চশর' (১৯২৯), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'অরণ্য-পথ' (১৯৩৪), 'অফুরন্ত' (১৯৩৫), 'ধুলিধূসর' (১৯৪৩), 'মহানগর' (১৯৪৩), 'জলপায়রা' (১৯৫৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বড় উপন্যাস না লিখলেও তাঁর কয়েকটি ভাল উপন্যাস আছে। 'পাঁক' উপন্যাসের কথা আগে বলা হয়েছে। অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল : 'মিছিল' (১৯৩৩), 'উপনয়ন' (১৯৩৪), 'আগামীকাল' (১৯৩৪), 'প্রতিশোধ' (১৯৪১), 'প্রতিধ্বনি ফেরে' (১৯৬৫)। শুধু কবিতা লিখলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র এক জন স্মরণীয় কবি হতে পারতেন। রবীন্দ্রপরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও একটি স্থান আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৫৯)। তিনি গানও লিখতেন।

শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন আকর্ষণীয় ধারা সৃষ্টি করেন, বিশেষ করে বিজ্ঞানভিত্তিক



www.pathagar.com

গল্প রচনায়। তাঁর ঘনাদা সিরিজের বইগুলো ছোটদের খুবই প্রিয়। ঘনাদা বাংলা সাহিত্যের এক মজার উদ্ভট চরিত্র। উদ্ভটের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষপাত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর গোয়েন্দাকাহিনীর নায়ক পরাশরও উদ্ভট প্রকৃতির। প্রেমেন্দ্র মিত্র শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক গল্প, কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। তাই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি স্মরণীয় নাম।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদও আছে। আর আছে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধ। অর্থাৎ সাহিত্যের নানা শাখায় রয়েছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ। বাংলা সাহিত্যে এ রকম বহুমুখী লেখক খুব কম পাওয়া যাবে। সাহিত্যসাধনার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন। শেষ জীবনে চোখের অসুখে খুব কষ্ট পান তিনি।

১৯৮৮ সালে চুরাশি বছর বয়সে তিনি মারা যান।

আ. ক.

**প্রেসিডেন্সি কলেজ** হিন্দু কলেজ দ্র

**প্রোকন্সাল্ আফ্রিকানাস্** (Proconsul Africanas)

১৯৩১ সালে আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশের কেনিয়া অঞ্চলে 'এপ' (দ্র) জাতীয় জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এদের

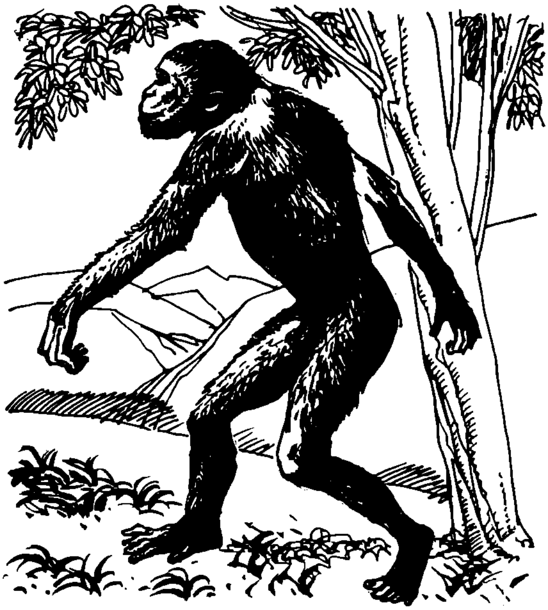

*প্রোকন্সাল্ আফ্রিকানাস্*

সাধারণ নাম প্রোকন্সাল্। ১৯৪৭ সালে এদের আরো বহু দেহাবশেষ পাওয়া যায়—চোয়াল, দাঁত, হাড়গোড় এবং মাথার খুলি। ভূতাত্ত্বিক হিসাবে এরা মায়োসিন যুগের অধিবাসী। এদের আকার ছিল শিম্পাঞ্জির আকার থেকে গরিলার (দ্র) আকার পর্যন্ত। লেজযুক্ত বানর থেকে লেজবিহীন এপ ধরনের জীবের এরা অন্তর্বর্তী স্তর বলে মনে করা হয়। মানুষ এবং অ্যানথ্রপয়েড এপ জাতীয় কোনো মধ্যবর্তী বিলুপ্ত প্রাণীর সঙ্গে এরা সম্বন্ধযুক্ত বলে কেউ কেউ মনে করেন।

সৈ. আ. ই.

**প্রোটন** (proton)

পরমাণুকেন্দ্রিণের উপাদান। সকল পদার্থের পরমাণু (দ্র)-তে প্রোটন রয়েছে। অর্থাৎ এটি সকল পদার্থের সর্বজনীন উপাদান। সর্বাপেক্ষা হালকা মৌল হাইড্রোজেন-পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রনটি (দ্র) সরিয়ে নিলে তা প্রোটনে পরিণত হবে।

প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী। প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জের (দ্র) পরিমাণ ইলেক্ট্রনের বৈদ্যুতিক চার্জের সমান। অর্থাৎ প্রোটন একক ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী। কোনো পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সংখ্যা সমান থাকে বলে পরমাণু বিদ্যুৎনিরপেক্ষ। প্রোটনের ওজন প্রায় হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের সমান, $১.৬৭২৬৫\times১০^{-২৪}$ গ্রাম।

প্রোটন মূলত মৌল কণা কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। আধুনিক কস্মোলজির তত্ত্বে প্রোটনের ভাঙন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যার সঙ্গে এই মহাবিশ্বের (দ্র) চূড়ান্ত পরিণতির প্রশ্নটি জড়িত।

মু. হা.

**প্রোটেস্ট্যান্টবাদ** (protestantism)

খ্রিস্টধর্মের (দ্র) অন্তর্গত এই প্রতিবাদী মতবাদের মূলকথা হচ্ছে ঈশ্বর ও ব্যক্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে অন্য কোনো মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার না করা।

এই ধর্মের অনুসারীদের অভিমত : ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সরাসরি; ঈশ্বরের কৃপা কিংবা আশীর্বাদ লাভে যাজক বা গির্জার স্থান শূন্য; ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি নির্ভর করে ঈশ্বরের প্রতি তার ব্যক্তিগত গভীর বিশ্বাস, কর্ম এবং স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপরই।



www.pathagar.com

ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ওপর গোঁড়া খ্রিস্টযাজক সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র বা যথেচ্ছ আধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের এই বিদ্রোহী অভিমত ছিল এক প্রবল আঘাতস্বরূপ। এর পরিণতিতেই রাষ্ট্রের ওপর রোমের পোপতন্ত্রের আধিপত্যে ভাঙনের সূচনা দেখা দেয়, এবং তা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে শুরু করে। ধর্মীয় নানা কুসংস্কার ও চার্চের কঠোর বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তিসাধনে এই ধর্মমত পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা। ইউরোপে (দ্র) মধ্যযুগের (দ্র) শেষ দিকে সংস্কারবাদী আন্দোলনের যুগে এর উদ্ভব ঘটে। এই ধর্মমত বা ধর্মীয় আদর্শবাদের প্রবক্তা জার্মানির মার্টিন লুথার (দ্র)। সেই থেকে খ্রিস্টান জগৎ রোমান ক্যাথলিক (দ্র) ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদ এই দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

আ. হু.

## প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্

নৃতত্ত্ববিদগণ ইংরেজিতে মানবগোষ্ঠীর এক দলকে নাম দিয়েছেন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্। বাংলায় এদের বলা হয় আদি-অস্ট্রেলীয় বা আদি অস্ত্রাল। এদের দেহবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সিংহলের (দ্র) ভেড্ডা এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মিল রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) আদিবাসীদের সঙ্গে এই মিল থেকেই এদের আদি-অস্ট্রেলীয় বলা হয়। নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই জনগোষ্ঠী এক সময় মধ্যভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল হয়ে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যারা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ মাথা, প্রশস্ত নাসা, তামাটে চুলের মানুষ, তারা আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর। পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মানুষদের বিশাল অংশ, মধ্যভারতের কোল, ভীল, করোয়া, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি ইত্যাদি এবং দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুর ইত্যাদি লোকেরা এই আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীভুক্ত। বাঙালিদের মধ্যেও আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে প্রচুর। বাংলা অনেক শব্দও এসেছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে, যেমন— কুড়ি, পণ–এর মতো সংখ্যা বাচক শব্দ। খাঁ খাঁ, কানি, ঠোঁট, দাঁত ইত্যাদি শব্দও অস্ট্রিক ভাষাজাত।

সৈ. আ. ই.

**প্রোটোজোয়া** অমেরুদণ্ডী দ্র

*প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্*

## প্রোটোপ্লাজম্ (protoplasm)

সব রকম জীবের (দ্র) শরীর অসংখ্য ছোট ছোট পরস্পর-সংলগ্ন কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের (দ্র) ভেতরে ঘন আঠালো দানাদার জেলির মতো এক রকম জটিল রাসায়নিক পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। একে প্রোটোপ্লাজম্ বলে। কোষ-প্রাচীর ছাড়া কোষের বাকি অংশ মিলে প্রোটোপ্লাজম্ গঠিত। এটাই জীবনের মূল সত্তা। জড় পদার্থে কোনো প্রোটোপ্লাজম্ থাকে না।

প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন জটিল। এর আসল উপাদান নির্ণয় করা কঠিন। সকল জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম্ এক রকম নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা কার্বন (দ্র), হাইড্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র), নাইট্রোজেন (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র), সোডিয়াম, পটাসিয়াম (দ্র), ম্যাগনেসিয়াম, সালফার (দ্র), ফসফরাস (দ্র), ক্লোরিন, লোহা (দ্র) ইত্যাদি মৌল দিয়ে গঠিত। এগুলো ছাড়া আরো অনেক মৌল অল্প পরিমাণে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের মৌলগুলি বিভিন্ন যৌগরূপে



www.pathagar.com

*ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা মানুষের দেহকোষ*

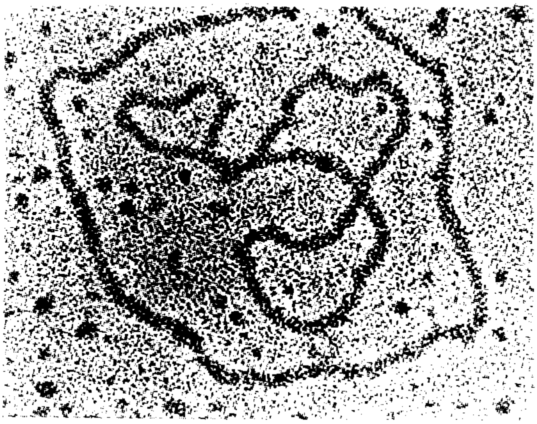

*কোষের ক্রোমোজোম*

থাকে। যৌগগুলি দু'রকমের— অজৈব যৌগ এবং জৈব যৌগ। সাধারণত প্রোটোপ্লাজ্‌মের যৌগসমূহের ৯০ ভাগ জৈব যৌগ এবং বাকি ১০ ভাগ অজৈব যৌগ দিয়ে গঠিত। জৈব যৌগের মধ্যে প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট (দ্র), লিপোপ্রোটিন, নিউক্লিওপ্রোটিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব উপাদানের মধ্যে প্রোটিনই প্রধান। প্রোটোপ্লাজ্‌মে বিভিন্ন রকমের অজৈব লবণ থাকে; যেমন— সোডিয়াম, পটাসিয়াম (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র), ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কার্বনেট ইত্যাদি। প্রোটোপ্লাজ্‌মে পানির পরিমাণ ৬৫-৯৬ শতাংশ।

গঠনগত দিক দিয়ে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— সাইটোপ্লাজ্‌ম্ এবং নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের যে স্বচ্ছ, ঘন ও তরল অংশ থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজ্‌ম্ বলে। ইলেক্ট্রন (দ্র) অণুবীক্ষণযন্ত্রের (দ্র) সাহায্যে এর মধ্যে খুব ছোট ছোট অঙ্গাণু দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—মাইটোকণ্ড্রিয়া, গল্‌জি দ্রব্য, আন্তঃপ্লাজ্‌মীয় জালিকা, রাইবোজোম, প্লাস্টিড (উদ্ভিদকোষে), সেন্ট্রিয়োল (প্রাণীকোষে) ইত্যাদি। প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঘন, অস্বচ্ছ, পাতলা ঝিল্লি দ্বারা ঘেরা গোলাকার পদার্থকে নিউক্লিয়াস বলে। এর মধ্যে ঝিল্লি, নিউক্লিওপ্লাজ্‌ম্, ক্রোমোজোম (দ্র) এবং নিউক্লিয়োলাস থাকে। কোষের সব রকম কাজকর্ম নিউক্লিয়াস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সা. এ.

## প্লবতা

কোনো কঠিন বস্তুকে পানিতে ডোবালে হালকা বা কম ওজনের মনে হয়। শুধু পানি নয়, যে কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থে কোনো বস্তুকে ডোবালে তার ওজন কমে যায় এবং হালকা মনে হয়। এর কারণ, তরল বা বায়বীয় পদার্থ ডুবন্ত বস্তুটির উপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ প্রয়োগ করে। তরল বা বায়বীয় পদার্থের এই ঊর্ধ্বমুখী চাপজনিত বল বস্তুর ওজনের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, ফলে বস্তুর ওজন কম বলে মনে হয়। কোনো বস্তুকে তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ ডোবালে তরল বা বায়বীয় পদার্থের ঊর্ধ্বচাপের জন্য বস্তুটি উপরের দিকে যে লব্ধি বল অনুভব করে তাকে প্লবতা বলে। প্লবতা হল (দ্র) তরল পদার্থ দ্বারা বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল ঊর্ধ্বমুখী বল। তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল প্লবতার মান বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান। কোনো বস্তু পানিতে ডুববে না ভাসবে তা ঐ বস্তুর ওজন ও তার উপর ক্রিয়াশীল প্লবতার উপর নির্ভর করে। বস্তুর ওজন তরলের প্লবতার চেয়ে বেশি হলে বস্তুটি তরলে ডুবে যাবে। বস্তুর ওজন প্লবতার সমান হলে বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে তরলের ভিতরে যে কোনো জায়গায় সাম্যাবস্থায় থাকবে। বস্তুর ওজন তরলের প্লবতার চেয়ে কম হলে বস্তুটি আংশিক ডুবে ভাসবে।

শা. ত.



www.pathagar.com

**প্লাঙ্কটন** (plankton)

মিঠা পানি বা লোনা পানিতে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদকে প্লাঙ্কটন বলা হয়। প্লাঙ্কটন দুই ভাগে বিভক্ত। প্লাঙ্কটনের অন্তর্ভুক্ত ভাসমান প্রাণীদের জ্যুপ্লাঙ্কটন বা অণুপ্রাণীকণা এবং ভাসমান উদ্ভিদের ফাইটো প্লাঙ্কটন বা অণুউদ্ভিদকণা নাম দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটনদের চলাচলের ক্ষমতা সীমিত। মূলত ওরা পানির টানেই ভেসে চলে। পানিপ্রবাহের গতির সঙ্গে ওদের চলার গতি নির্ভর করে। আকারের তারতম্য বিচার করেও প্লাঙ্কটনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(১) মাইক্রোপ্লাঙ্কটন, (২) ন্যানোপ্লাঙ্কটন ও (৩) ম্যাক্রোপ্লাঙ্কটন। তিন মিলিমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্র প্লাঙ্কটনেরা হল মাইক্রোপ্লাঙ্কটন। এই দলে রয়েছে প্রোটোজোয়া (দ্র), রোটিফেরা ও ক্ল্যাডোসেরা প্রভৃতি প্রাণী। একেবারে ক্ষুদ্র অর্থাৎ ৬০ মাইক্রনের চেয়েও ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটনকে ন্যানোপ্লাঙ্কটন বলা হয়। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ হল মাইক্রন। ন্যানোপ্লাঙ্কটনদের দলে উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হল ডায়াটম্ (দ্র) এবং ইউগ্লেনা (দ্র), প্যারামেসিয়াম নামের প্রাণী। কতকগুলো প্লাঙ্কটনকে চোখে দেখা যায়। মাইক্রো মানে ছোট ও ম্যাক্রো অর্থ বড়। চোখে দেখা সম্ভব এমন বড় জাতীয় প্লাঙ্কটনদের ম্যাক্রোপ্লাঙ্কটন বলা হয়। যেমন— কোরেথেরা নামের প্লাঙ্কটন। বড় বড় প্রাণী ভাসমান এ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটনকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ (দ্র) ও অন্যান্য মৎস্য চাষের জন্য প্লাঙ্কটন উৎপাদন করানোর কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এতে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যয় অনেক কম হয়।

ত. চ.

**প্লাজ্‌মা** রক্ত দ্র

**প্লাস্টার-অব-প্যারিস** জিপ্‌সাম্ দ্র

**প্লাস্টিক**

গ্রিক plastikos থেকে প্লাস্টিক শব্দটি এসেছে। এর অর্থ 'ইচ্ছে মতো আকার দেওয়া যায়'। প্লাস্টিক কৃত্রিম পদার্থ যার আকার ইচ্ছে মতো বদলানো যায়। এর নানান রকম ও নানান রঙ হতে পারে। সিল্কের মতো নরম প্লাস্টিকও আছে, আবার লোহার (দ্র) মতো কঠিন প্লাস্টিকও সম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) প্রাকৃতিক পদার্থ গলিয়ে প্লাস্টিকের মতো সামগ্রী তৈরির প্রচলন ছিল। লাক্ষা (দ্র), গাটা-পার্চা (দ্র) ইত্যাদি গলিয়ে এগুলি বানানো হত। ১৮৬৯ সালে জন ডব্লিউ. হায়াট (John Wesley Hyatt) প্রথম সেলুলয়েড় (দ্র) আবিষ্কার করেন। এটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক। এর পর দিনে দিনে নানা রকম প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট প্লাস্টিক অর্ধেকের বেশি উৎপাদিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

কৃত্রিম রেজিন (দ্র) দিয়ে প্লাস্টিক বানানো হয়। আর কৃত্রিম রেজিন বানানো হয় কয়লা (দ্র), চুনাপাথর (দ্র), পেট্রোলিয়াম (দ্র), লবণ (দ্র) এবং পানি (দ্র) দিয়ে।

বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীগণ শত শত রকম প্লাস্টিক তৈরি করেছেন। বিভিন্ন প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। কোনো কাজে শক্ত প্লাস্টিক, আবার কোনো কাজে নরম প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। কঠিন প্লাস্টিক দেখতে কাচের মতো, কাঠের মতো, ধাতুর মতো কিংবা অন্য রকম হতে পারে। ডিনার সেট, হেলমেট, ঘড়ি-রেডিও-ক্যামেরার বাক্স তৈরি করার জন্য শক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। মেলামাইন এক ধরনের শক্ত প্লাস্টিক। মেলামাইনের তৈরি থালা-বাসন সহজে ভাঙে না, কিংবা এতে দাগ পড়ে না। প্লাস্টিকের তন্তু দিয়ে কাপড় বানালে তা বেশ নরম এবং কোমল হয়ে থাকে।

তরল প্লাস্টিক রঙ এবং আঠা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পলিথিন (দ্র), সিলিকন (দ্র), পলিভিনাইল এবং ইউরেথেন নরম প্লাস্টিক। এগুলো দিয়ে খেলনা, বোতল, বাস্কেট ইত্যাদি বানানো হয়।

পলিস্টাইরিন, পলিভিনাইল, অ্যাক্রিলিক এবং পলিথিলিন স্বচ্ছ প্লাস্টিক। এগুলি শক্তও হতে পারে, নরমও হতে পারে। নানা রকম খাম, মোড়ক, খেলনা ইত্যাদি বানানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। লেন্স্ (দ্র) তৈরির জন্যও এদের ব্যবহার আছে। অ্যাক্রিলিক দিয়ে তৈরি কন্ট্যাক্ট লেন্স্ চশমার বদলে ব্যবহার করা যায়।

প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রী দেখতে সুন্দর, সহজে ব্যবহার করা যায়, দামে কম এবং টেকসই। প্লাস্টিক আমাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আরামদায়ক করেছে।

সা. এ.



www.pathagar.com

## প্লীহা (spleen)

প্লীহা দেহের সর্ববৃহৎ লসিকা গ্রন্থি। সাদামাটা বাংলায় একে আমরা 'পিলে' বলি। স্পঞ্জের মতো নরম, প্রচুর রক্তসমৃদ্ধ এই গ্রন্থিটি দেখতে বড়সড় বীচির মতো। উদরগহ্বরের বাঁ দিকে পাঁজরের নিচে এর অবস্থান। ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

প্লীহার প্রধান কাজ দেহের বিপাকক্রিয়া ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নেওয়া এবং রক্তের অন্যতম প্রধান আধার হিসাবে কাজ করা। লিম্ফোসাইট জাতীয় শ্বেত কণিকা তৈরির প্রধান কেন্দ্র প্লীহা। রেটিকুলো-এণ্ডোথেলিয়াল কোষের সাহায্যে লোহিত-কণিকা ভেঙে পিত্তরঞ্জক তৈরি করা থেকে লৌহের বিপাক-ক্রিয়াও প্লীহার অন্যতম কাজ। প্লীহা জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়।

ম্যালেরিয়া (দ্র), কালাজ্বর (দ্র) ও বিশেষ ধরনের রক্তাল্পতায় প্লীহা আকারে ও আয়তনে বড় হয়ে থাকে। প্রয়োজন প্লীহা অপসারণ করা চলে।

রু. হা.

## প্লুটো (Pluto)

সূর্যের (দ্র) নবম গ্রহ প্লুটো। প্লুটো সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ। এই দূরত্ব ৫৯০ কোটি কিলোমিটার। প্লুটো তাই সূর্যের তাপ ও আলো অনেক কম পায়। এই গ্রহটি ইউরেনাস (দ্র) বা নেপচুনের (দ্র) মতো গ্যাসের তৈরি নয়, পাথরের তৈরি, যা বিজ্ঞানীদের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। পৃথিবী (দ্র) থেকে প্লুটোকে খালি চোখে দেখা যায় না। প্লুটোর ব্যাস ২,৩২০ কিলোমিটার। সূর্যের চারদিকে এর এক বার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৪৮ বছরের মতো। প্লুটোর কক্ষপথ অত্যন্ত হেলানো ও অনেক বেশি উপবৃত্তাকার বলে এটি মাঝে মাঝে নেপচুনের কক্ষপথ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে প্লুটো প্রকৃত গ্রহ নয়, কোনো এক সময় হয়তো এটি নেপচুনেরই একটি উপগ্রহ ছিল, কোনো কারণে নেপচুন থেকে বেরিয়ে আলাদা গ্রহে পরিণত হয়েছে। ক্যারন (Charon) নামে প্লুটোর একটি উপগ্রহও আবিষ্কৃত হয়েছে।

নেপচুনের আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীরা গ্রহগুলোর চলাফেরায় গরমিল লক্ষ করেছেন। স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ পারসিভাল লোয়েল (Percival Lowell) অঙ্ক কষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সৌর জগতে আরো একটি গ্রহ রয়েছে। কিন্তু তিনি সেটি খুঁজে পান নি। তাঁর মৃত্যুর ১৪ বছর পর ১৯৩০ সালে লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড্ টোম্‌বাউ (Clyde William Tombaugh) গ্রহটি আবিষ্কার করেন। এঁদের প্রথম জনের নাম থেকে 'প্লু' আর দ্বিতীয় জনের নাম থেকে 'টো' অংশ নিয়ে এর নাম রাখা হয় প্লুটো।

সে. শা.

## প্লুটোনিয়াম (plutonium)

একটি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক মৌল (Element)। ইউরেনিয়াম (দ্র)-পরবর্তী মৌলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। প্লুটোনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯৪। সব সময় আলফা কণিকার (দ্র) বিকিরণের কারণে প্লুটোনিয়াম সাধারণত উষ্ণ। দেখতে রূপালী বর্ণের, তবে বাতাসে ফেলে রাখলে তা হলুদ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত জানা সব ক'টি আইসোটোপই (দ্র) তেজস্ক্রিয়।

আইসোটোপসমূহের মধ্যে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি ফিশনযোগ্য এবং অর্ধজীবন তুলনামূলকভাবে বেশি (২৪,৩৬০ বছর)। তবে এর ক্রান্তিভর খুব কম বলে সাবধানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণে এটি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর।

পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, খনি ও তৈলকূপ খননের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং চিকিৎসাসহায়ক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরিতে প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। হৃদ্‌রোগীদের জন্য যে কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র বা পেস্‌মেকার (pace-maker) চালু হয়েছে তার ব্যাটারিতে প্লুটোনিয়াম-২৩৮ ব্যবহৃত হয়; এটি একনাগাড়ে ১০ বছর পর্যন্ত সচল থাকে।

মু. হা.

## প্লেটো [৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.]

ভাববাদী দার্শনিক। আনুমানিক ৪২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিস দেশের এথেন্স নগরীতে প্লেটোর (Plato) জন্ম। পিতার নাম এরিস্টন, মাতার নাম পেরিক্তিওন। প্লেটো তাঁর আসল নাম নয়। আসল নাম এরিস্টক্লিস। প্লেটো শব্দের অর্থ হচ্ছে



www.pathagar.com

বিশাল কাঁধ। বিশাল কাঁধের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে প্লেটো বলে ডাকা হত।

প্লেটো ছিলেন গ্রিসের মহান দার্শনিক সক্রেটিসের (দ্র) শিষ্য। তাঁর লেখা সবগুলো বইয়েরই নায়ক সক্রেটিস। সক্রেটিসের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথনের আকারে দর্শনের বিষয়ে বই লিখেছেন তিনি। 'রিপাবলিক', 'অ্যাপোলজি', 'ক্রিটো', 'ফিদো', 'পার্মিনাইদিস', 'থিটিটাস', 'সিম্পোজিয়াম' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

সক্রেটিসের অন্যায় মৃত্যুদণ্ড প্লেটোর মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে সময়ের অন্যান্য অভিজাত পরিবারের অনেক তরুণের মতো ছোটবেলা থেকেই সক্রেটিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি মিশর, সিরিয়া, দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ৩৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সে ফিরে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একাডেমী স্থাপন করেন। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক আরিস্টোটল (দ্র) ছিলেন প্লেটোর এই একাডেমীর ছাত্র।

প্লেটোর সময়ে গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল দাসপ্রথা এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের শোষণের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের সমস্ত সঙ্কট কেবল দার্শনিক বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণই দূর করতে পারেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের রক্ষক হবেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সে জন্য রাষ্ট্রের সব সুবিধা এই দুই শ্রেণী ভোগ করবে। দাস এবং অন্য শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থান হবে তাঁদের নিচে। শাসক দার্শনিকদের কোনো জীবিকা- নির্বাহের চিন্তা থাকবে না। তাঁদের যেমন কোনো সম্পত্তি থাকতে পারবে না তেমনি থাকতে পারবে না কোনো অভাব। ফলে তাঁরা নিশ্চিন্তে উন্নত রাষ্ট্রশাসনের কৌশল সহজেই আয়ত্ত করতে পারবেন। ছোটবেলা থেকে শাসকদের সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যেন তারাও ভবিষ্যতে রাষ্ট্রশাসন করতে পারে।

প্লেটো মনে করতেন, এই পৃথিবীর (দ্র) যা-কিছুই আমরা দেখি তার কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়, তা এক মহাসত্যের অংশ মাত্র। সেই মহাসত্য অদৃশ্য। আমরা সত্যের যে সামান্য অংশ দেখি, কবিরা তাকে অনুকরণ করে কবিতা রচনা করেন। তাই কবিদের রচনা সত্যকে প্রকাশ করে না। অনুকরণের মধ্যে মৌলিক সত্য থাকতে পারে না বলে প্লেটো তাঁর কল্পনার রাষ্ট্রব্যবস্থায় কবিদের কোনো স্থান দেন নি।

তাঁর মতে রাষ্ট্রশাসন সবচেয়ে উন্নত কাজ। শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন যদিও রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় তবু তার মূল্য কম। প্লেটোর পরবর্তী কালের অনেক দার্শনিক এই সব চিন্তাধারা সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রকাশ করে গেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর দর্শন-চিন্তার গুরুত্ব হ্রাস পায় নি। তাই বলা হয়, সক্রেটিস যদি দর্শনশাস্ত্রের জনক হন, তবে প্লেটোকে বলতে হবে তাঁর পূর্ণতাদানকারী।

**আ. মা.**

## প্ল্যাটিনাম (platinum)

প্ল্যাটিনাম একটি মূল্যবান মৌলিক ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Pt, পারমাণবিক ওজন ১৯৫.২৩, পারমাণবিক সংখ্যা ৭৮। কঠিন ধাতব পদার্থ। অত্যন্ত ভারি। কোনো অ্যাসিডে এটি দ্রবীভূত হয় না (তাই একে বলে Noble metal)। খুব বেশি তাপসহ। অস্‌মিয়াম, ইরিডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মেশানো অবস্থায় কোনো কোনো খনিজ পদার্থে পাওয়া যায়। প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূল্যবান ধাতু হিসাবে অলঙ্কারাদিতেও এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে। প্রচলিত ধাতুগুলির মধ্যে প্ল্যাটিনাম সবচেয়ে মূল্যবান, সোনার চেয়েও বহু বেশি দামি। দেখতে রূপার মতো সাদা, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য, কাঠিন্য ও অন্যান্য নানা গুণ ও ধর্মে প্ল্যাটিনাম উৎকৃষ্টতর। ধাতুটির পারমাণবিক ওজন ১৯৫.২৩। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২১.৪, গলনাঙ্ক ১৭৫০° সে.। এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যও সোনার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, কিছুতেই এর বিকৃতি ঘটে না। প্ল্যাটিনামকে অতি সূক্ষ্ম তার ও পাতে পরিণত করা যায়। তাই মণিমুক্তাখচিত মূল্যবান অলঙ্কার তৈরি করতে ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। রসায়নাগারেও এর বিশেষ ব্যবহার আছে।



www.pathagar.com

অত্যধিক গলনাঙ্কের জন্য ধাতুটি সহজে গলে না, অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে এর বিক্রিয়াও ঘটে না। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে বিশেষ বিশেষ সক্রিয় প্ল্যাটিনাম বিশেষ কার্যকরী প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আজকাল কানাডাতেই সারা পৃথিবীর অর্ধাংশ পরিমাণ প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায়, রাশিয়ার (দ্র) স্থান দ্বিতীয়। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া (দ্র) প্রভৃতি দেশেও প্ল্যাটিনাম ও এই শ্রেণীর মূল্যবান ধাতুগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। খনিজ প্ল্যাটিনামের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই প্যালাডিয়াম, ইরিডিয়াম ও রেডিয়াম ধাতু প্রাকৃতিক খনিজের আকারে মেশানো থাকে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এদের পৃথকভাবে নিষ্কাশিত করা হয়।

প্ল্যাটিনাম ধাতুর একটা বৈশিষ্ট্য হল, উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে ধাতুটির সঙ্কোচন ও প্রসারণের হার কাচের প্রায় অনুরূপ, তাই কাচ গলিয়ে তার মধ্যে প্ল্যাটিনামের তার ঢুকিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করলে তারটা এঁটে থাকে। কাচ ফেটে যায় না। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অত্যধিক তাপসহ বলে উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক বাতি ও যন্ত্রপাতিতে প্ল্যাটিনামের তার সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আজকাল এসব কাজে মূল্যবান প্ল্যাটিনাম ধাতু ব্যবহারের আর প্রয়োজন হয় না, এর পরিবর্তে প্ল্যাটেনাইট নামক এক প্রকার ধাতুসঙ্কর ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

**প্ল্যানচেট** (planchette)

শব্দটি ফরাসি, উচ্চারণ 'প্লঁশেৎ'; কিন্তু ইংরেজি উচ্চারণ 'প্ল্যানচেট'ই আমাদের দেশে চালু।

প্ল্যানচেট হল পরিচিত মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটি পদ্ধতি। পরলোকতত্ত্বে ও প্রেতাত্মায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থাৎ তাঁর আত্মার কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে লাভ করেন। প্ল্যানচেট প্রকৃতপক্ষে একটা জিনিসের নাম : দুটো ছোট্ট চাকার উপরে বসানো ত্রিভুজাকৃতির একটা তক্তা এবং ঐ তক্তার শীর্ষ কোণটির কাছে একটি ছিদ্রে একটা পেন্সিল ঢোকানো থাকে। ঐ তক্তার নিচে একটা কাগজ রাখা হয়। সবটুকু নিয়েই প্ল্যানচেট। এটি টেবিলের উপরে রাখা হয়। যাঁরা প্ল্যানচেটে বসেন তাঁদের মধ্যে এক জন বা দু' জন ঐ প্ল্যানচেটের ওপরে হাতের আঙুল রাখেন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করেন। মৃত আত্মা ঘরের মধ্যে এসে পড়লে তখন নাকি তক্তাটি নড়ে ওঠে এবং মৃত আত্মাকে কোনো প্রশ্ন করলে আত্মার কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় তা পেন্সিল দিয়ে কোনো অজানা শক্তি কাগজের উপরে লিখতে থাকে। উনবিংশ শতকে সারা বিশ্বে প্ল্যানচেটের খুব প্রচলন হয়েছিল।

হা. মা.

**প্ল্যানেটেরিয়াম** (planetarium)

একটি বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন বস্তু তথা সূর্য (দ্র), চন্দ্র (দ্র), নক্ষত্রমণ্ডলী, গ্রহমণ্ডলীর আপাতগতি প্রদর্শন করা হয়।

যতদূর জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে জর্জ গ্রাহাম প্রথম মেকানিক্যাল প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরি করেন। অনেক পরে ১৯২৩ সালে জার্মানির মিউনিখ শহরে প্রথম প্রজেক্টরের সাহায্যে আকাশের চিত্রাবলি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণত একটি গম্বুজাকৃতির ঘরের মাঝামাঝি স্থানে একটি প্রজেক্টর থাকে। গম্বুজের দেয়ালটিকে প্রজেক্টরের পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে তাতে আকাশের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। সময়ের সঙ্গে সূর্য, চাঁদ, গ্রহমণ্ডলী প্রভৃতির গতিশীলতা পর্দায় ফুটে ওঠে। আজকাল নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিশীলতা ছাড়াও বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনাবলির যেমন সুপারনোভা বিস্ফোরণ, কৃষ্ণবিবর (দ্র) প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়। কোনো কোনো প্ল্যানেটেরিয়ামে দর্শকদের বিভিন্ন মহাজাগতিক শব্দ শোনানোরও ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষার উপকরণ হিসাব প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিজ্ঞান জাদুঘরে (দ্র) একটি প্ল্যানেটেরিয়াম বসানোর উদ্যোগ চলছে।

মু. হা.



www.pathagar.com

## শিশু-বিশ্বকোষ : তৃতীয় খণ্ড

## ঝ থেকে প

'বিশ্ব' বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সব কিছু নিয়েই বিশ্বকোষ। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কাহিনী, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ভূগোল ও সভ্যতার কথকতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কার এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী ও তাঁদের অবদান—এসব কিছু নিয়ে অসংখ্য তথ্য আর তত্ত্ব এখানে রয়েছে। গাছগাছালি কি পাখপাখালি, তাও বাদ যায় নি। গান-বাজনা আছে, খেলাধুলো আছে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—এসবও আছে। তবে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সবই করা হয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখে।

দেশের অর্ধশতাধিক বিদ্বজ্জন প্রভূত পরিশ্রম করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' বইয়ের ভুক্তিগুলো রচনা করেছেন।

একাধিক খণ্ডে প্রণীত এই বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের মতো। প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে সহস্রাধিক রঙ-বেরঙের ছবি—মানুষজনের, পশুপাখির, যন্ত্রপাতির। তার ওপর এতে আছে দেশ-বিদেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি। এসব চিত্ররচনা এবং এর বিন্যাস ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ।

বিশ্বকোষ আজীবন সঙ্গী হয় ধীমান শিক্ষিত মানুষের। ভুক্তি নির্বাচন তাই এভাবেই করা হয়েছে—'শিশু-বিশ্বকোষ' যেন শিশু-কিশোরদেরই শুধু নয়, বড়দেরও প্রয়োজন মেটায়।

**বাংলাদেশ শিশু একাডেমী**

ISBN : 984-09-0376-4